গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক

(শিক্ষা বর্ষ:২০১০-১১, রেজিঃ নং-১৭৪)

২০১৫

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা

পিএইচ. ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন মোল্যা,

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান,

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উৎসর্গ

চার বছর বয়সে হারানো আমার জান্নাতবাসীনি মা জমিলা বেগম ও গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করে পিএইচ. ডি. ডিগ্রী প্রাপ্তির জন্য যিনি সার্বক্ষণিক পরম করুণাময়ের কাছে দোয়া করতেন তিনি আমার শ্রদ্ধেয় পিতা মোঃ হাসমত আলী সরকার এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার প্রতিপাদ্য

আমি মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক প্রত্যয়ন করছি যে, 'গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতিঃ কর্মসূচী ও বাস্তবতা' শিরোনামে গবেষণাটি একটি মৌলিক গ্রন্থ। আমার জানামতে, কোন গবেষকের এমন মৌলিক অভিসন্দর্ভ অদ্যাবধি বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়নি। এ গবেষণার অংশবিশেষ কোন প্রবন্ধে ও পত্রিকায় লেখা হয়নি। তাছাড়া ডিপ্লোমাসহ অন্য যে কোন ডিগ্রী অর্জনের জন্য দেশ ও বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহেও এটি উপস্থাপিত হয়নি।

তারিখঃ
ঢাকা,
৩০.০৩.২০১৫

মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক
পিএইচ. ডি. গবেষক
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণায় সহযোগিতা

গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতিঃ কর্মসূচী ও বাস্তবতা শিরোনামে গবেষণার কর্মক্ষেত্রে যিনি সার্বিকভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন তিনি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোঃ গিয়াসউদ্দিন মোল্যা। যখনই গবেষণাকর্ম সম্পাদানে সমস্যার সন্মুখীন হয়েছি, দিনক্ষণ বিচার না করে তখনই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর রুমে কখনও বা আবাসে দ্বারস্থ হওয়া মাত্র আমার সমস্যার সমাধান করে আজকের গবেষণা কর্মটি সম্পন্নে সবচেয়ে বেশী সহযোগিতা করেছেন। গবেষণা কর্মে বিভিন্ন লেখকের লেখা পুঁথি-পুস্তক, গষেণামূলক প্রবন্ধ এবং দৈনিক পত্রিকা হতে সংগৃহীত তত্ত্ব ও তথ্যাবলীর সহায়তাও নেয়া হয়েছে। তাছাড়া আমার স্ত্রী তামান্না আফরোজ মিতু, ছেলে এ. এম. তাহমিদ ছিদ্দিক শান, শ্বশুর (ময়মনসিংহের সাবেক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক) আলহাজ্ব মোঃ আবদুল হালিম, শাশুরী রিজিয়া হালিম, সহকর্মীগণসহ কিছু ছাত্র/ছাত্রী আমাকে সার্বিকভাবে সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

তত্ত্বাবধায়কের অভিমত

গ্রামোন্নয়ন নিয়ে অনেক গবেষক বিভিন্ন শিরোনামে অদ্যাবধি বহু গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করেছেন। গবেষক মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক 'গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা' শিরোনামে গবেষণা চালিয়ে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী ও বাস্তবতার বিভিন্ন দিকদর্শন এবং নেতিবাচক ও ইতিবাচক বিষয় নিয়ে যুগোপযোগী তথ্য উপাত্ত সংযোজনের মাধ্যমে অভিসন্দর্ভটি রচনা করেছেন। এটি একটি মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ। গ্রামোন্নয়নের জন্য গবেষণাটি সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অপরাপর গবেষকের প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লিখিত শিরোনামে তাত্ত্বিক আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত হয়ে গবেষণার অধ্যায়সমূহের ক্রমধারা ও বিষয় সম্পৃক্ততা যথাযথভাবে সংরক্ষিত আছে। ফলশ্রুতিতে তিনি গবেষণার মূল বক্তব্য থেকে পথভ্রষ্ট হননি।

তারিখ:
ঢাকা,
৩০.০৩.২০১৫

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
পটভূমিকা

		পৃষ্ঠা
১)	গবেষণার সূচনা	২
২)	গবেষণার আবশ্যকতা ও লক্ষ্য	২
৩)	অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫
৪)	গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
৫)	গবেষণা প্রণালী	৮
৬)	গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ	১২
৭)	তথ্য উপাত্ত যোগান পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা	১৫
৮)	গবেষণার কর্মক্ষেত্র	১৯
৯)	উপসংহার	২১
১০)	তথ্য পঞ্জী	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়
গ্রাম পরিচিতি ও ক্রম-উন্নয়ন

১)	সূচনা	২৪
২)	গ্রাম পরিচিতি	২৪
৩)	গ্রামের উদ্ভব	২৬
৪)	গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৭
৫)	ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়ন	৩৮
৬)	প্রাচীন যুগ	৩৯
৭)	মধ্য যুগ	৪০
৮)	মুঘল আমল	৪০
৯)	বৃটিশ শাসন আমল	৪১

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১০) পাকিস্তান শাসন আমল ৪২

১১) বাংলাদেশ শাসন আমল ৪৩

১২) শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল (১৯৭২-৭৫) ৪৩

১৩) মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫-৮১) ৪৬

১৪) লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২-৯০) ৪৭

১৫) বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমল (১৯৯১-১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৬) ৪৯

১৬) শেখ হাসিনার শাসন আমল (১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৯-) ৫০

১৭) গ্রামের শ্রেণীবিভাগ ৫১

১৮) উপসংহার ৫৪

১৯) তথ্য পঞ্জী ৫৫

তৃতীয় অধ্যায়
গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক সাহিত্য

১) আরব্ধ ৫৭

২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৫৭

৩) হাসনাত আব্দুল হাই ৬০

৪) ড. ওয়াকিল আহমেদ ৬১

৫) ড. আতিউর রহমান ৬৩

৬) উপসংহার ৬৭

৭) তথ্য পঞ্জী ৬৮

চতুর্থ অধ্যায়
গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

১) সূচনা ৭০

২) গ্রামের মানুষের স্তর বিন্যাস ৭০

৩) গ্রামীণ অবকাঠামোগত জীবনযাত্রা ৮২

৪) সামাজিক অবকাঠামো ৮৩

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা
৫)	অনুকূল অবকাঠামো	৮৩
৬)	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮৩
৭)	জনস্বাস্থ্য	৯০
৮)	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৯৩
৯)	প্রতিকূল অবকাঠামো	৯৪
১০)	অর্থনৈতিক অবকাঠামো	৯৫
১১)	যাতায়াত ও পরিবহন	৯৫
১২)	যোগাযোগ	৯৭
১৩)	বিদ্যুৎ শক্তি	৯৮
১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৮
১৫)	অবহেলিত নারী সমাজ	১০১
১৬)	উপসংহার	১০৫
১৭)	তথ্য পঞ্জী	১০৬

পঞ্চম অধ্যায়
এনজিওদের গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রম

১)	সূচনা	১০৮
২)	এনজিও পরিচিতি	১০৮
৩)	জাতীয় বেসরকারী সংস্থা	১০৯
৪)	গ্রামীণ ব্যাংক	১০৯
৫)	ব্র্যাক	১১৩
৬)	প্রশিকা	১২১
৭)	আশা	১২৪
৮)	আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা	১২৭
৯)	কেয়ার	১২৭

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১০)	ওয়ার্ল্ড ভিশন	১৩০
১১)	বেসরকারী সংস্থার সফলতা	১৩৩
১২)	বেসরকারী সংস্থার ব্যর্থতা	১৩৩
১৩)	এনজিওদের কর্মসূচীর বাস্তবতা	১৩৪
১৪)	কুফল	১৩৪
১৫)	সুফল	১৩৭
১৬)	উপসংহার	১৩৯
১৭)	তথ্য পঞ্জী	১৪১

ষষ্ঠ অধ্যায়
সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী

১)	ভূমিকা	১৪৩
২)	সরকারী কর্মসূচীর পরিচিতি	১৪৩
৩)	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী	১৪৪
৪)	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	১৪৬
৫)	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১৪৭
৬)	সরকারী ঋণ দান কর্মসূচী	১৬৪
৭)	যুব উন্নয়ন	১৬৮
৮)	গ্রামীণ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭১
৯)	সমাজ সেবা	১৭১
১০)	গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী	১৭৮
১১)	ভূমি জটিলতা নিরসন আইন	১৭৮
১২)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ	১৭৮
১৩)	উপসংহার	১৭৯
১৪)	তথ্য পঞ্জী	১৮০

সপ্তম অধ্যায়
গ্রামোন্নয়নে মনীষীদের অবদান

		পৃষ্ঠা
১)	সূচনা	১৮৩
২)	ড. আখতার হামিদ খান	১৮৩
৩)	তোফায়েল আহমেদ	১৯২
৪)	আবদুল বায়েস	১৯৩
৫)	ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	১৯৪
৬)	এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন	১৯৫
৭)	আব্দুলাহ আল-মামুন	১৯৬
৮)	গাজী সালেহ উদ্দিন	১৯৭
৯)	বাংলাদেশ পলী উন্নয়ন একাডেমীর গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতা	১৯৯
১০)	উপসংহার	২০১
১১)	তথ্য পঞ্জী	২০২

অষ্টম অধ্যায়
বাংলাদেশের রাজনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বাস্তবতা

১)	উপক্রমণিকা	২০৪
২)	গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা	২০৪
৩)	নেতিবাচক বাস্তবতা	২০৪
৪)	কৃষি উন্নয়ন	২০৪
৫)	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ	২১৩
৬)	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	২১৫
৭)	মানব সম্পদ উন্নয়ন	২১৫
৮)	স্বাস্থ্য সেবা	২১৭
৯)	গ্রামীণ যাতায়াত	২২৪
১০)	রেল পথ বাস্তবতা	২৩১

		পৃষ্ঠা
১১)	নৌপথে যাতায়াত অবস্থা	২৩২
১২)	পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী	২৩৪
১৩)	জনবসতি স্থাপন বাস্তবতা	২৩৯
১৪)	প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি	২৪০
১৫)	খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী	২৪২
১৬)	পলী বিদ্যুৎ বাস্তবতা	২৪৩
১৭)	সরকারের ঋণ দান কর্মসূচীর অনিয়ম	২৪৩
১৮)	বন্যা দুর্ভোগের বাস্তবতা	২৪৫
১৯)	অসহায় নারী সমাজ	২৪৬
২০)	সরকারের গ্রামীণ সমাজ সেবা	২৫২
২১)	গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ইতিবাচক বাস্তবতা	২৫৬
২২)	কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার	২৫৭
২৩)	শিক্ষা	২৬৬
২৪)	জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন	২৬৬
২৫)	সহজসাধ্য যাতায়াত	২৬৮
২৬)	কর্মসংস্থান কর্মসূচী	২৬৯
২৭)	ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	২৭০
২৮)	বিদ্যুৎ ভোগের সুবিধা	২৭৩
২৯)	ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ	২৭৪
৩০)	উন্নত আবাসন সুবিধা ও অন্যান্য	২৭৪
৩১)	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প	২৭৫
৩২)	ডাচ-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি দান কর্মসূচী	২৭৫
৩৩)	উপসংহার	২৭৬
৩৪)	তথ্য পঞ্জী	২৭৭

নবম অধ্যায়
উপসংহার

		পৃষ্ঠা
১)	কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার	২৭৯
২)	শিক্ষার উন্নয়ন সাধন	২৮২
৩)	স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	২৮৩
৪)	গ্রামীণ যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি	২৮৪
৫)	রেলপথের দৈন্যদশা দূরীকরণ	২৮৫
৬)	নৌ-পথে যাতায়াতে গুরুত্বারোপ	২৮৫
৭)	বিদ্যুতায়নের সুবিধা প্রাপ্তি	২৮৬
৮)	জনসংখ্যা হ্রাস	২৮৬
৯)	নারীর ক্ষমতায়ন	২৮৭

সারণী
দ্বিতীয় অধ্যায়

১)	সারণী নং- ২.১: বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার	৩৫
২)	সারণী নং- ২.২: শহর ও গ্রামের তুলনামূলক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য	৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

১)	সারণী নং- ৪.১: গ্রামে কৃষি জমির মালিকানা ও ভূমিহীন সৃষ্টি	৭৩
২)	সারণী নং- ৪.২: ভাগ চাষীদের মালিকানা নিরাপত্তা	৭৫
৩)	সারণী নং- ৪.৩: শ্রমিকের কৃষি ও অকৃষি ভূমি খাতে শ্রম বিক্রয় প্রাপ্যতা	৭৬
৪)	সারণী নং- ৪.৪: বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান	৮৫
৫)	সারণী নং- ৪.৫: ক্যালরী ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ বৈষম্য	৯৩
৬)	সারণী নং- ৪.৬: কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ শ্রম বৈষম্য	১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

১)	সারণী নং- ৫.১: আশার বাৎসরিক ঋণ বিতরণ	১২৫
২)	সারণী নং- ৫.২ এক নজরে আশার ঋণ পরিকল্পনা	১২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

পৃষ্ঠা

১) সারণী নং- ৬.১: সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ১৫২

২) সারণী নং- ৬.২: যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ ১৬৯

৩) সারণী নং- ৬.৩: সরকারের বয়স্ক ভাতা বিতরণ ও উপকার ভোগীর সংখ্যা ১৭৭

রেখাচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) রেখাচিত্র নং- ২.৩: ব্রিটিশ সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো ৪২

২) রেখাচিত্র নং- ২.৪: বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো ৫১

৩) রেখাচিত্র নং- ২.৫: শ্রেণীভেদে গ্রামোন্নয়ন ৫১

চতুর্থ অধ্যায়

১) রেখাচিত্র নং- ৪.১: মানুষের মর্যাদা এবং স্তরায়ন ৭১

২) রেখাচিত্র নং- ৪.২: মানব সম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামো ৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

১) রেখাচিত্র নং-৬.১: নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কলা কৌশল ১৭৪

চিত্র

প্রথম অধ্যায়

১) চিত্র নং- ১.১ : গবেষণা পদ্ধতির চিত্র (মহীরূহ) ১২

২) চিত্র নং- ১.২ : তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত প্রথম নমুনায়ন গ্রাম ১৬

৩) চিত্র নং- ১.৩ : তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত দ্বিতীয় নমুনায়ন গ্রাম ১৭

৪) চিত্র নং- ১.৪ : তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত তৃতীয় নমুনায়ন গ্রাম ১৮

৫) চিত্র নং- ১.৫ : গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বাংলাদেশের মানচিত্র ২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

১) চিত্র নং- ২.১ : গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে গ্রামে মারমারি ৩০

পৃষ্ঠা
২) চিত্র নং- ২.২ : গ্রামীণ উৎপাদনমুখী সংস্কৃতি ৩৫

অষ্টম অধ্যায়

১) চিত্র নং- ৮.১ : কৃষি অবহেলার বাস্তবতা ২০৫
২) চিত্র নং- ৮.২ : সরকারের বীজ সরবরাহ ২০৬
৩) চিত্র নং- ৮.৩ : বিদ্যুায়ন বোর্ডের বাস্তবতা ২০৮
৪) চিত্র নং- ৮.৪ : গ্রামীণ যাতায়াত সমস্যা ২০৯
৫) চিত্র নং- ৮.৫ : রাজনৈতিক সহিংসতার বাস্তবতা ২১১
৬) চিত্র নং- ৮.৬ : কষ্ৃি পণ্য সংরক্ষণে হিমাগারের অভাব ২১২
৭) চিত্র নং- ৮.৭ : পোনা মাছ নিধন ২১৪
৮) চিত্র নং- ৮.৮ : ভৌত অবকাঠামোগত বাস্তবতা ২১৫
৯) চিত্র নং- ৮.৯ : শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল ২১৬
১০) চিত্র নং- ৮.১০: চিকিৎসা সেবা পেতে রোগীকে মাথায় করে বহন ২১৮
১১) চিত্র নং- ৮.১১: মানসিক রোগীর চিকিৎসা ২১৯
১২) চিত্র নং- ৮.১২: কবিরাজের তাবিজ-কবচের চিকিৎসা সেবা ২২০
১৩) চিত্র নং- ৮.১৩: দন্ত রোগের চিকিৎসা ২২০
১৪) চিত্র নং- ৮.১৪: পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা ২২১
১৫) চিত্র নং- ৮.১৫: পুষ্টিহীনতার বাস্তবতা ২২২
১৬) চিত্র নং- ৮.১৬: জরাজীর্ণ গ্রামীণ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ২২৩
১৭) চিত্র নং- ৮.১৭ (ক) : কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ২২৪
১৮) চিত্র নং- ৮.১৮ (খ) : কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ২২৪
১৯) চিত্র নং- ৮.১৯: গ্রামীণ জনপদে মানুষের যাতায়াত অবস্থা ২২৮
২০) চিত্র নং- ৮.২০: নিম্মানের উপকরণ দিয়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ ২২৯
২১) চিত্র নং- ৮.২১: পাকা রাস্তা সংস্কারের ধীরগতি ২৩০
২২) চিত্র নং- ৮.২২ (ক) : স্বেচ্ছাশ্রমে কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ২৩০

পৃষ্ঠা

২৩) চিত্র নং- ৮.২২ (খ) : স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণের বাস্তবতা ২৩৩

২৪) চিত্র নং- ৮.২৩: রেলপথ বাস্তবতা ২৩১

২৫) চিত্র নং- ৮.২৪: নদী ভরাট বাস্তবতা ২৩৩

২৬) চিত্র নং- ৮.২৫: নদী পথের নব্যতা হ্রাস ২৩৪

২৭) চিত্র নং- ৮.২৬: দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানিতে ফসলের ক্ষতি ২৩৫

২৮) চিত্র নং- ৮.২৭: নদী খনন বাস্তবতা ২৩৬

২৯) চিত্র নং- ৮.২৮: নদী ভাঙ্গনের বাস্তবতা ২৩৬

৩০) চিত্র নং- ৮.২৯: জলাবদ্ধতার বাস্তবতা ২৩৭

৩১) চিত্র নং- ৮.৩০: নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বাস্তবতা ২৩৮

৩২) চিত্র নং- ৮.৩১: জনবসতি স্থাপনের বাস্তবতা ২৩৯

৩৩) চিত্র নং- ৮.৩২: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ২৪০

৩৪) চিত্র নং- ৮.৩৩: ভিজিডি, ভিজিএফ কর্মসূচীর বাস্তবতা ২৪২

৩৫) চিত্র নং- ৮.৩৪: ঋণদান বাস্তবতা ২৪৫

৩৬) চিত্র নং- ৮.৩৫: বন্যা দুর্ভোগের বাস্তবতা ২৪৫

৩৭) চিত্র নং- ৮.৩৬: বাল্য বিবাহ ২৪৬

৩৮) চিত্র নং- ৮.৩৭: নারী হত্যা ২৪৮

৩৯) চিত্র নং- ৮.৩৮: তালাক প্রবণতা ২৪৮

৪০) চিত্র নং- ৮.৩৯: অসহায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রা ২৪৯

৪১) চিত্র নং- ৮.৪০: নারী শিশু শ্রমিক ২৫০

৪২) চিত্র নং- ৮.৪১: গ্রামীণ নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৈষ্যমতা ২৫১

৪৩) চিত্র নং- ৮.৪২: মেয়ে শিশুর যৌন নিপীড়ন ও আত্মহত্যা ২৫২

৪৪) চিত্র নং- ৮.৪৩: পেটের দায়ে শিশুদের শ্রম বিক্রি ২৫৩

৪৫) চিত্র নং- ৮.৪৪: বিদ্যালয়ের অভাবে শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত ২৫৪

৪৬) চিত্র নং- ৮.৪৫: বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্রম বিক্রির বাস্তবতা ২৫৪

		পৃষ্ঠা
৪৭)	চিত্র নং- ৮.৪৬: শিশু ভিক্ষাবৃত্তি	২৫৫
৪৮)	চিত্র নং- ৮.৪৭: সরকারের বয়স্ক ভাতা প্রদান	২৫৬
৪৯)	চিত্র নং- ৮.৪৮: সেচ সুবিধা	২৫৭
৫০)	চিত্র নং- ৮.৪৯: উন্নত বীজের ব্যবহার	২৫৭
৫১)	চিত্র নং- ৮.৫০: পাবিত জলাশয়ে শাক-সব্জি উৎপাদন	২৫৮
৫২)	চিত্র নং- ৮.৫১ : ফুল চাষ	২৫৯
৫৩)	চিত্র নং- ৮.৫২: অনাবাদি জমিতে ফসল উৎপাদন	২৬০
৫৪)	চিত্র নং- ৮.৫৩: পাহাড়র অঞ্চলে ফসল উৎপাদন	২৬১
৫৫)	চিত্র নং- ৮.৫৪: ভূমি কর্ষণে পাওয়ার টিলার ব্যবহার	২৬২
৫৬)	চিত্র নং- ৮.৫৫: ফসল মাড়াইয়ে কলের ব্যবহার	২৬৩
৫৭)	চিত্র নং- ৮.৫৬: পানি সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ বাস্তবতা	২৬৪
৫৮)	চিত্র নং- ৮.৫৭: জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বাস্তবতা	২৬৬
৫৯)	চিত্র নং- ৮.৫৮: সহজসাধ্য যাতায়াত	২৬৮
৬০)	চিত্র নং- ৮.৫৯: কর্মসংস্থান কর্মসূচীর বাস্তবতা	২৬৯
৬১)	চিত্র নং-২৬০ : বিদ্যুৎ ভোগের সুবিধা	২৭৩
৬২)	চিত্র নং- ৮.৬১ : উন্নত আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা	২৭৪
১)	**পরিশিষ্ট (APPENDIX) - ক**	২৯২
২)	পরিশিষ্ট - ক (১)	২৯২
৩)	**BIBLIOGRPHY**	২৯২
৪)	পরিশিষ্ট - ক (২)	৩১০
৫)	তথ্য পঞ্জী	৩১০
৬)	**পরিশিষ্ট (APPENDIX) - খ**	৩১৬
৭)	পিএইচ.ডি. গবেষণা কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা	৩১৬

গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতিঃ কর্মসূচী ও বাস্তবতা

মোঃ এ, বি, ছিদ্দিক
পিএইচ.ডি. গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

গবেষণার সারসংক্ষেপ

'গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতিঃ কর্মসূচী ও বাস্তবতা' শিরোনামে অন্যান্য গবেষণাকর্মের মত পদ্ধতিগতভাবেই সম্পন্ন করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন অধ্যায়ের সূত্রপাত হয়েছে। অধ্যায়সমূহে বিশ্লেষণে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দ্বার-প্রান্তে উপনীত। স্বাধীনতা অর্জন দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও পৃথিবীর অপরাপর দেশ উপনিবেশের শৃঙ্খলমুক্ত হয়ে অল্প দিনের মধ্যেই যেভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন। বিশেষ করে গ্রামোন্নয়নে। অথচ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে এদেশের গ্রামের কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বস্তরের জনতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তারা প্রত্যেকটি গ্রামকে এক একটি দূর্গে পরিণত করে দেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। পাক সেনারা গ্রামের মানুষের সহায়সম্পদ ও হাজার হাজার ঘর বাড়ী পুঁড়িয়ে প্রতিটি গ্রামকে ধ্বংসযজ্ঞের লীলাভূমিতে পরিণত করে চিরদিনের মত এ সমাজের অনেক পরিবারকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করে ফেলে। বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৮০ ভাগ বাস করে গ্রামে। সুতরাং গ্রামের এ বিপুল জনগোষ্ঠীর ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে জাতীয় উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। তাই বিশ্বদরবার থেকে এ জাতি দারিদ্র্যতা বিমোচন করে এখনও মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারেনি। পৃথিবীতে দারিদ্র্যসীমার নিচে যে সকল দেশ রয়েছে, তার পিছনের কাতারে অবস্থান করছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

ইতিহাস পাঠ থেকে জানা যায়, স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরক্ষণ থেকে অদ্যাবধি জনপ্রতিনিধি, অপরাপর রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও আমলারা নানাভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ে। তাঁদেরকে জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের পরিবর্তে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকতে দেখা যায়। অনেক রাজনৈতিক নেতা গ্রামের সহজ, সরল মানুষকে নানা অবকাঠামোমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের ভুয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের ভোট নিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নেতারা যে কোন নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের অর্থ ব্যয়ের অঙ্গীকার নামার শর্ত ভঙ্গ করে কখনও কখনও গোপনে প্রচুর কালো টাকা খরচ করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন। নির্বাচিত এসব জনপ্রতিনিধি পরবর্তীতে জনগণকে দেয়া উন্নয়নকর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা একেবারেই ভুলে যান। কোন কোন প্রতিনিধি তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের সাথে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের টাকা নামেমাত্র কাজ দেখিয়ে ভাগ বাটোয়ারা করে

Dhaka University Institutional Repository

থাকেন। তাছাড়া সরকারী কর্তা সাহেবদের যোগসাজসেও জনপ্রতিনিধিরা গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত টাকা বখরা হিসেবে লুটপাটের মহোৎসবে মেতে উঠেন। জনপ্রতিনিধিরা পরিবার পরিজন নিয়ে রাজধানী অথবা মফস্বল শহরে বিলাস বহুল আবাসে জীবনযাপন করে থাকেন। জনগণ তাদের প্রয়োজনে তৃণমূল নেতাদের সহায়তায় শহরে গিয়ে তাঁদের (জনপ্রতিনিধি) সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসব জনপ্রতিনিধিরা দলীয় মদদপুষ্ট নেতাদের মাধ্যমে গ্রামের জনগণের সন্তানদের সরকারী চাকরী, বিদেশে লোক পাঠানো, ঠিকাদারদের টেন্ডারের কাজ পাওয়ার সুযোগ করে দেয়া, গ্রামোন্নয়নমূলক প্রকল্প কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি করানোসহ নানাপ্রকার তদবিরের কাজে জড়িত হয়ে পরিচিত চাটুকারদের সাহায্যে প্রচুর টাকার মালিক হয়ে থাকেন। অবহেলিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সন্তানদের জন্য সরকারী নিয়োগে কোটা পদ্ধতি চালু থাকলেও গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তানদের জন্য এমন কোন সুযোগ নেই।

জনপ্রতিনিধি বা উপর পর্যায়ের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব সরকারি বা বেসরকারি দু'একটি প্রকল্পের কাজ উদ্বোধন করে জনপ্রিয়তার বিস্ফোরণ ঘটানোর জন্য মাঝে মাঝে দলীয় নেতা/কর্মীদেরসহ গাড়ীর বহর নিয়ে শহর থেকে গ্রামে আগমন করেন। গ্রামের তৃণমূল নেতারা তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য সুরম্য ফটক নির্মাণ, মাল্যদান ইত্যাদির মাধ্যমে গুণগান গেয়ে ব্যাপকভাবে জনসমক্ষে তাঁর গুরুত্ব ও জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে থাকেন। জনপ্রতিনিধিদের মদদপুষ্ট ঠিকাদারগণ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ নিুমানের উপকরণ দিয়ে সম্পন্ন করেন; যা অল্প দিনের মধ্যেই বিনষ্ট হয়ে দেশের মানুষের ক্ষতি সাধিত হয়। খাল খনন প্রকল্পে খাল খনন না করে দু' পাশের আগাছা পরিস্কার করে খনন কাজ শেষ করা হয়। কাঁচা রাস্তা মেরামতের কাজে মাটি ভরাট না করে চার পাশের মাটি এনে গর্ত ভরাট করে মেরামত সম্পন্ন হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাকা ইমারত নির্মাণের এক বছরের মধ্যেই তাতে ফাঁটল ধরে। পাকা রাস্তা নির্মাণের এক মাসের মাথায় তাতে বৃহদাকার খানাখন্দে পরিণত হয়। আবার কখনও কখনও প্রকল্পের কাজ বছরের পর বছর অসম্পন্ন থাকায় ব্যাপক জনদুর্ভোগ সৃষ্টি হয়। এমনও দেখা যায়, প্রকল্পের কাজ সম্পাদানকারী ঠিকাদারগণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমনঃ বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদিতে ক্ষতির কারণ দেখিয়ে বার বার সরকারের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে থাকে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব রাজনীতিকে ব্যবসায়িক স্বার্থে ব্যবহার করে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ নানা কৌশল খাটিয়ে অপব্যবহার করেন। বিশেষ করে পরবর্তী নির্বাচনে জয়লাভের জন্য ঐসব জমানো টাকা দরিদ্র/স্বার্থান্বেসী জনগণের মধ্যে বিতরণ করে থাকেন। তাই বলা যায়, সরকার আসে, সরকার পরিবর্তন হয়, জনপ্রতিনিধিদের ভাগ্যোন্নয়ন হয়, কিন্তু গ্রামের জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন স্থিরই থাকে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতার লোভে বিভোর। তাঁরা শুধু ক্ষমতা যাওয়ার হিসেব কষেন। এ জন্য রিষারিষিতে জড়িত হয়ে নিজেদের স্বার্থোদ্ধারে গণতান্ত্রিক অধিকার দাবী করে তাঁরা নানাপ্রকার অগণতান্ত্রিক কর্মসূচী দিয়ে মানুষের জীবনকে অতিষ্ট করে তোলে। এক্ষেত্রে বিরোধী দলগুলো নিয়মতান্ত্রিক হরতাল ও অবরোধের মত শান্তিপ্রিয় রাজনৈতিক কর্মসূচীকে হিংসাত্মক কর্মসূচীতে পরিণত করে রাস্তা ঘাটে যানবাহন ও পরিবহন চলাচল বন্ধ করে সাধারণ জনগণকে জিম্মি করে রাখেন। বর্তমানে এসব সহিংসতা মারাত্মক রূপ ধারন করেছে। রাজনৈতিক কর্মসূচীর নামে প্রতিদিন দুষ্কৃতিকারীদের নিক্ষিপ্ত পেট্রোল বোমার আঘাতে দগ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করছে গ্রামের অসংখ্য নিরীহ মানুষ ।গ্রামের মানুষের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা উপার্জিত পয়সায় ও ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ক্রয় করা বাস ও মালবাহী ট্রাক আগুনে পুঁড়িয়ে একটি পরিবারকে চিরদিনের মত পঙ্গু করা হচ্ছে। এসব কর্মসূচীর কারণে পরিবহনের অভাবে গ্রামের কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ও কাঁচামাল যথাসময়ে শহরে পৌঁছতে না পারায় তা পঁচে গিয়ে কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়। প্রতিদিন তারা কোটি কোটি টাকা গচ্ছা দিতে বাধ্য হচ্ছেন। এসব ধ্বংসাত্মক কর্মসূচী গ্রামোন্নয়নে পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে মানুষের জীবনযাত্রার মান নিম্মুখী করছে।

গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতার আদিঅন্ত যাচাই করলে আমরা দেখতে পাই, বাংলাদেশের গ্রাম গুলো প্রাচীনকাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন শাসকের শাসন আামলে ধাপে ধাপে নানামুখী ক্রম-উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে আজকের পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সাহিত্যিক কেহ গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেছেন, কেহ বা তাঁদের লেখনীর মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নের সবক বয়ান করে গ্রামবাসীকে উন্নয়নের সংস্পর্শে আসার তালিম দিয়েছেন। আবহমানকাল ধরে গ্রামের মানুষের মধ্যে স্তর বিন্যাস বিদ্যমান রয়েছে। মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে এ স্তর বিন্যাসে ব্যাপক বৈচিত্র্য দৃশ্যমান। এদের মধ্যে রয়েছে ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষী, ভূমিহীন শ্রমিক। তাছাড়া শিক্ষিত ও অশিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণীর লোক নিয়ে গ্রামের মানুষের স্তর বিন্যাস পরিলক্ষিত হয়। এ সমাজে চলমান অবকাঠামোগুলোর মধ্যে রয়েছে নিম্মানের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ। তাছাড়া অন্যান্য সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যার ঘনত্ব, ঋণ প্রাপ্তি ও শোষিত নারী সমাজের জীবনমানের দৈন্যতা। স্বাধীনতা পূর্ব, যুদ্ধকালীন সময় ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর জনকল্যাণমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে অসহায়, অসচেতন মানুষের সেবাদানের জন্য বেসরকারী কিছু সংস্থা জন্ম লাভ করে। তারা সেবাদানের পাশাপাশি গ্রামীণ পুঁজিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে জামানতবিহীন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী চালু করে। পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

তারা গ্রামের মানুষের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের জন্য বহুমুখী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। ক্ষুদ্র ঋণ মডেল উদ্ভাবনের জন্য গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মোহাম্মদ ইউনুস ও তাঁর ব্যাংককে ২০০৬ সালে নবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে। তবে এতে হতভাগ্য মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের চেয়ে এনজিওদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে শতভাগ বেশী। স্বল্প পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করে দরিদ্র মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী পরিচালনা করে তার সুদ আদায়ের মাধ্যমে এক একটি এনজিও জিরো থেকে হিরোতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নানামুখী পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে আসছেন। এসব পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, যাতায়াত, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, ঋণ দান ইত্যাদি অবকাঠামোগত সুবিধা ছাড়াও যুব ও নারী উন্নয়ন, সমাজ সেবা অধিদপ্তরের সেবাদান কর্মসূচী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ উল্লেখযোগ্য।

সরেজমিনে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দু'টি দিক উন্মোচিত হয়। একটি হলো নেতিবাচক দিক, অপরটি হলো ইতিবাচক দিক। নেতিবাচক দিকগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বেশীরভাগ ক্ষেত্রে কৃষিউন্নয়ন ও খাদ্য সংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সমস্যা সমাধান এখনও গ্রামের মানুষের জন্য পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। অপরদিকে ইতিবাচক দিক গুলো বিশ্লেষণ করলে এটাও দেখা যায়, গ্রামের ধনী মানুষ উল্লিখিত অবকাঠামোমূলক দিকগুলোর সুযোগসুবিধা যথাযথভাবে ভোগ করছেন। তাছাড়া গ্রামের বিভীষিকা দারিদ্র্যের রূপ আজ অনেকাংশে কমে গেছে। তারা তিন বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পচ্ছে। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ায় শ্রমিকদের প্রারিশ্রমিকের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। গ্রামে শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসার আদি রূপ অনেকটা পরিবর্তিত হয়ে মানুষ আধুনিক স্বাস্থ্য সেবা ভোগ করায় অকাল মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে। কোন কোন গ্রামে রাস্তা-ঘাট পাকা হওয়ায় এসব রাস্তায় রিক্শা, ভ্যান, ঠেলা গাড়ী চালিয়ে দরিদ্র মানুষের আয় বেড়েছে। এতে কম সময়ে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে পৌঁছে প্রয়োজনীয় কর্ম সম্পাদানে সক্ষম হচ্ছেন। কিছু কিছু গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ ও সৌর বিদ্যুতের সুবিধাভোগ করছেন।

পরিশেষে সার্বিক বিচার বিশ্লেষণে দেখা যায়, গ্রামের স্বল্প সংখ্যক মানুষের জীবনের মানোন্নয়নকে গ্রামোন্নয়নের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়না। এক্ষেত্রে রূপক অর্থে বলা যায়, বৈঠা হাতে মাঝির পাল তোলা নৌকা যেমন মৃদু মন্দ বাতাসে মন্থরগতিতে এগিয়ে চলে, বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবতার নিরিখে তেমন গতিতেই এগিয়ে চলছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

		পৃষ্ঠা
১)	গবেষণার সূচনা	২
২)	গবেষণার আবশ্যকতা ও লক্ষ্য	২
৩)	অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ	৫
৪)	গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
৫)	গবেষণা প্রণালী	৮
৬)	গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ	১২
৭)	তথ্য উপাত্ত যোগান পদ্ধতি ও সীমাবদ্ধতা	১৫
৮)	গবেষণার কর্মক্ষেত্র	১৯
৯)	উপসংহার	২১
১০)	তথ্য পঞ্জী	২২

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পরিচিতি ও ক্রম-উন্নয়ন

১)	সূচনা	২৪
২)	গ্রাম পরিচিতি	২৪
৩)	গ্রামের উদ্ভব	২৬
৪)	গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ	২৭
৫)	ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়ন	৩৮
৬)	প্রাচীন যুগ	৩৯
৭)	মধ্য যুগ	৪০
৮)	মুঘল আমল	৪০

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা
৯)	বৃটিশ শাসন আমল	৪১
১০)	পাকিস্তান শাসন আমল	৪২
১১)	বাংলাদেশ শাসন আমল	৪৩
১২)	শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল (১৯৭২-৭৫)	৪৩
১৩)	মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫-৮১)	৪৬
১৪)	লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমল (১৯৮২-৯০)	৪৭
১৫)	বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমল (১৯৯১-১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৬)	৪৯
১৬)	শেখ হাসিনার শাসন আমল (১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৯-)	৫০
১৭)	গ্রামের শ্রেণীবিভাগ	৫১
১৮)	উপসংহার	৫৪
১৯)	তথ্য পঞ্জী	৫৫

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক সাহিত্য

১)	আরব্ধ	৫৭
২)	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৭
৩)	হাসনাত আব্দুল হাই	৬০
৪)	ড. ওয়াকিল আহমেদ	৬১
৫)	ড. আতিউর রহমান	৬৩
৬)	উপসংহার	৬৭
৭)	তথ্য পঞ্জী	৬৮

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

		পৃষ্ঠা
১)	সূচনা	৭০
২)	গ্রামের মানুষের স্তর বিন্যাস	৭০
৩)	গ্রামীণ অবকাঠামোগত জীবনযাত্রা	৮২
৪)	সামাজিক অবকাঠামো	৮৩
৫)	অনুকূল অবকাঠামো	৮৩
৬)	মানব সম্পদ উন্নয়ন	৮৩
৭)	জনস্বাস্থ্য	৯০
৮)	কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ	৯৩
৯)	প্রতিকূল অবকাঠামো	৯৪
১০)	অর্থনৈতিক অবকাঠামো	৯৫
১১)	যাতায়াত ও পরিবহন	৯৫
১২)	যোগাযোগ	৯৭
১৩)	বিদ্যুৎ শক্তি	৯৮
১৪)	জনসংখ্যার ঘনত্ব	৯৮
১৫)	অবহেলিত নারী সমাজ	১০১
১৬)	উপসংহার	১০৫
১৭)	তথ্য পঞ্জী	১০৬

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

এনজিওদের গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রম

		পৃষ্ঠা
১)	সূচনা	১০৮
২)	এনজিও পরিচিতি	১০৮
৩)	জাতীয় বেসরকারী সংস্থা	১০৯
৪)	গ্রামীণ ব্যাংক	১০৯
৫)	ব্র্যাক	১১৩
৬)	প্রশিকা	১২১
৭)	আশা	১২৪
৮)	আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা	১২৭
৯)	কেয়ার	১২৭
১০)	ওয়ার্ল্ড ভিশন	১৩০
১১)	বেসরকারী সংস্থার সফলতা	১৩৩
১২)	বেসরকারী সংস্থার ব্যর্থতা	১৩৩
১৩)	এনজিওদের কর্মসূচীর বাস্তবতা	১৩৪
১৪)	কুফল	১৩৪
১৫)	সুফল	১৩৭
১৬)	উপসংহার	১৩৯
১৭)	তথ্য পঞ্জী	১৪১

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী

পৃষ্ঠা

১)	ভূমিকা	১৪৩
২)	সরকারী কর্মসূচীর পরিচিতি	১৪৩
৩)	কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী	১৪৪
৪)	মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন	১৪৬
৫)	গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন	১৪৭
৬)	সরকারী ঋণ দান কর্মসূচী	১৬৪
৭)	যুব উন্নয়ন	১৬৮
৮)	গ্রামীণ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম	১৭১
৯)	সমাজ সেবা	১৭১
১০)	গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী	১৭৮
১১)	ভূমি জটিলতা নিরসন আইন	১৭৮
১২)	প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ	১৭৮
১৩)	উপসংহার	১৭৯
১৪)	তথ্য পঞ্জী	১৮০

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামোন্নয়নে মনীষীদের অবদান

১)	সূচনা	১৮৩
২)	ড. আখতার হামিদ খান	১৮৩
৩)	তোফায়েল আহমেদ	১৯২
৪)	আবদুল বায়েস	১৯৩
৫)	ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার	১৯৪

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

৬) এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন ১৯৫

৭) আব্দুল্লাহ আল-মামুন ১৯৬

৮) গাজী সালেহ্ উদ্দিন ১৯৭

৯) বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতা ১৯৯

১০) উপসংহার ২০১

১১) তথ্য পঞ্জী ২০২

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বাস্তবতা

১) উপক্রমণিকা ২০৪

২) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা ২০৪

৩) নেতিবাচক বাস্তবতা ২০৪

৪) কৃষি উন্নয়ন ২০৪

৫) মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ২১৩

৬) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন ২১৫

৭) মানব সম্পদ উন্নয়ন ২১৫

৮) স্বাস্থ্য সেবা ২১৭

৯) গ্রামীণ যাতায়াত ২২৪

১০) রেল পথ বাস্তবতা ২৩১

১১) নৌপথে যাতায়াত অবস্থা ২৩২

১২) পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী ২৩৪

১৩) জনবসতি স্থাপন বাস্তবতা ২৩৯

১৪) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ২৪০

১৫) খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী ২৪২

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা
১৬)	পল্লী বিদ্যুৎ বাস্তবতা	২৪৩
১৭)	সরকারের ঋণ দান কর্মসূচীর অনিয়ম	২৪৩
১৮)	বন্যা দুর্ভোগের বাস্তবতা	২৪৫
১৯)	অসহায় নারী সমাজ	২৪৬
২০)	সরকারের গ্রামীণ সমাজ সেবা	২৫২
২১)	গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ইতিবাচক বাস্তবতা	২৫৬
২২)	কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার	২৫৭
২৩)	শিক্ষা	২৬৬
২৪)	জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন	২৬৬
২৫)	সহজসাধ্য যাতায়াত	২৬৮
২৬)	কর্মসংস্থান কর্মসূচী	২৬৯
২৭)	ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র	২৭০
২৮)	বিদ্যুৎ ভোগের সুবিধা	২৭৩
২৯)	ব্যাংকিং সুবিধা ভোগ	২৭৪
৩০)	উন্নত আবাসন সুবিধা ও অন্যান্য	২৭৪
৩১)	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান প্রকল্প	২৭৫
৩২)	ডাচ-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি দান কর্মসূচী	২৭৫
৩৩)	উপসংহার	২৭৬
৩৪)	তথ্য পঞ্জী	২৭৭

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

		পৃষ্ঠা
১)	কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার	২৭৯
২)	শিক্ষার উন্নয়ন সাধন	২৮২
৩)	স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণ	২৮৩
৪)	গ্রামীণ যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি	২৮৪
৫)	রেলপথের দৈন্যদশা দূরীকরণ	২৮৫
৬)	নৌ-পথে যাতায়াতে গুরুত্বারোপ	২৮৫
৭)	বিদ্যুতায়নের সুবিধা প্রাপ্তি	২৮৬
৮)	জনসংখ্যা হ্রাস	২৮৬
৯)	নারীর ক্ষমতায়ন	২৮৭

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র

প্রথম অধ্যায়

			পৃষ্ঠা
১)	চিত্র নং- ১.১	: গবেষণা পদ্ধতির চিত্র (মহীরূহ)	১২
২)	চিত্র নং- ১.২	: তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত প্রথম নমুনায়ন গ্রাম	১৬
৩)	চিত্র নং- ১.৩	: তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত দ্বিতীয় নমুনায়ন গ্রাম	১৭
৪)	চিত্র নং- ১.৪	: তথ্য উপাত্ত সংগৃহীত তৃতীয় নমুনায়ন গ্রাম	১৮
৫)	চিত্র নং- ১.৫	: গবেষণা কাজে ব্যবহৃত বাংলাদেশের মানচিত্র	২০

দ্বিতীয় অধ্যায়

১)	চিত্র নং- ২.১	: গোষ্ঠী দ্বন্দ্বে গ্রামে মারমারি	৩০
২)	চিত্র নং- ২.২	: গ্রামীণ উৎপাদনমুখী সংস্কৃতি	৩৫

অষ্টম অধ্যায়

১)	চিত্র নং- ৮.১	: কৃষি অবহেলার বাস্তবতা	২০৫
২)	চিত্র নং- ৮.২	: সরকারের বীজ সরবরাহ	২০৬
৩)	চিত্র নং- ৮.৩	: বিদ্যায়ন বোর্ডের বাস্তবতা	২০৮
৪)	চিত্র নং- ৮.৪	: গ্রামীণ যাতায়াত সমস্যা	২০৯
৫)	চিত্র নং- ৮.৫	: রাজনৈতিক সহিংসতার বাস্তবতা	২১১
৬)	চিত্র নং- ৮.৬	: কষ্ৃি পণ্য সংরক্ষণে হিমাগারের অভাব	২১২
৭)	চিত্র নং- ৮.৭	: পোনা মাছ নিধন	২১৪
৮)	চিত্র নং- ৮.৮	: ভৌত অবকাঠামোগত বাস্তবতা	২১৫
৯)	চিত্র নং- ৮.৯	: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জায়গা দখল	২১৬

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

১০) চিত্র নং- ৮.১০ : চিকিৎসা সেবা পেতে রোগীকে মাথায় করে বহন ২১৮

১১) চিত্র নং- ৮.১১ : মানসিক রোগীর চিকিৎসা ২১৯

১২) চিত্র নং- ৮.১২ : কবিরাজের তাবিজ-কবচের চিকিৎসা সেবা ২২০

১৩) চিত্র নং- ৮.১৩: দন্ত রোগের চিকিৎসা ২২০

১৪) চিত্র নং- ৮.১৪ : পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা ২২১

১৫) চিত্র নং- ৮.১৫: পুষ্টিহীনতার বাস্তবতা ২২২

১৬) চিত্র নং- ৮.১৬: জরাজীর্ণ গ্রামীণ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ২২৩

১৭) চিত্র নং- ৮.১৭ (ক) : কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ২২৪

১৮) চিত্র নং- ৮.১৮ (খ) : কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা ২২৪

১৯) চিত্র নং- ৮.১৯ : গ্রামীণ জনপদে মানুষের যাতায়াত অবস্থা ২২৮

২০) চিত্র নং- ৮.২০: নিম্মানের উপকরণ দিয়ে পাকা রাস্তা নির্মাণ ২২৯

২১) চিত্র নং- ৮.২১ : পাকা রাস্তা সংস্কারের ধীরগতি ২৩০

২২) চিত্র নং- ৮.২২ (ক) : স্বেচ্ছাশ্রমে কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ২৩০

২৩) চিত্র নং- ৮.২২ (খ) : স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণের বাস্তবতা ২৩৩

২৪) চিত্র নং- ৮.২৩: রেলপথ বাস্তবতা ২৩১

২৫) চিত্র নং- ৮.২৪ : নদী ভরাট বাস্তবতা ২৩৩

২৬) চিত্র নং- ৮.২৫: নদী পথের নব্যতা হ্রাস ২৩৪

২৭) চিত্র নং- ৮.২৬: দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানিতে ফসলের ক্ষতি ২৩৫

২৮) চিত্র নং- ৮.২৭: নদী খনন বাস্তবতা ২৩৬

২৯) চিত্র নং- ৮.২৮ : নদী ভাঙ্গনের বাস্তবতা ২৩৬

৩০) চিত্র নং- ৮.২৯: জলাবদ্ধতার বাস্তবতা ২৩৭

৩১) চিত্র নং- ৮.৩০: নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বাস্তবতা ২৩৮

৩২) চিত্র নং- ৮.৩১ : জনবসতি স্থাপনের বাস্তবতা ২৩৯

পৃষ্ঠা

৩৩) চিত্র নং- ৮.৩২: প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি ২৪০

৩৪) চিত্র নং- ৮.৩৩: ভিজিডি, ভিজিএফ কর্মসূচীর বাস্তবতা ২৪২

৩৫) চিত্র নং- ৮.৩৪: ঋণদান বাস্তবতা ২৪৫

৩৬) চিত্র নং- ৮.৩৫: বন্যা দুর্ভোগের বাস্তবতা ২৪৫

৩৭) চিত্র নং- ৮.৩৬: বাল্য বিবাহ ২৪৬

৩৮) চিত্র নং- ৮.৩৭: নারী হত্যা ২৪৮

৩৯) চিত্র নং- ৮.৩৮: তালাক প্রবণতা ২৪৮

৪০) চিত্র নং- ৮.৩৯: অসহায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রা ২৪৯

৪১) চিত্র নং- ৮.৪০: নারী শিশু শ্রমিক ২৫০

৪২) চিত্র নং- ৮.৪১: গ্রামীণ নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৈষ্যমতা ২৫১

৪৩) চিত্র নং- ৮.৪২: মেয়ে শিশুর যৌন নিপীড়ন ও আত্মহত্যা ২৫২

৪৪) চিত্র নং- ৮.৪৩: পেটের দায়ে শিশুদের শ্রম বিক্রি ২৫৩

৪৫) চিত্র নং- ৮.৪৪: বিদ্যালয়ের অভাবে শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত ২৫৪

৪৬) চিত্র নং- ৮.৪৫: বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্রম বিক্রির বাস্তবতা ২৫৪

৪৭) চিত্র নং- ৮.৪৬: শিশু ভিক্ষাবৃত্তি ২৫৫

৪৮) চিত্র নং- ৮.৪৭: সরকারের বয়স্ক ভাতা প্রদান ২৫৬

৪৯) চিত্র নং- ৮.৪৮: সেচ সুবিধা ২৫৭

৫০) চিত্র নং- ৮.৪৯: উন্নত বীজের ব্যবহার ২৫৭

৫১) চিত্র নং- ৮.৫০: প্লাবিত জলাশয়ে শাক-সব্জি উৎপাদন ২৫৮

৫২) চিত্র নং- ৮.৫১: ফুল চাষ ২ ৫৯

৫৩) চিত্র নং- ৮.৫২: অনাবাদি জমিতে ফসল উৎপাদন ২৬০

৫৪) চিত্র নং- ৮.৫৩: পাহাড়র অঞ্চলে ফসল উৎপাদন ২৬১

Dhaka University Institutional Repository

পৃষ্ঠা

৫৫) চিত্র নং- ৮.৫৪: ভূমি কর্ষণে পাওয়ার টিলার ব্যবহার ২৬২

৫৬) চিত্র নং- ৮.৫৫: ফসল মাড়াইয়ে কলের ব্যবহার ২৬৩

৫৭) চিত্র নং- ৮.৫৬: পানি সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ বাস্তবতা ২৬৪

৫৮) চিত্র নং- ৮.৫৭: জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বাস্তবতা ২৬৬

৫৯) চিত্র নং- ৮.৫৮: সহজসাধ্য যাতায়াত ২৬৮

৬০) চিত্র নং- ৮.৫৯: কর্মসংস্থান কর্মসূচীর বাস্তবতা ২৬৯

৬১) চিত্র নং-২৬০ : বিদ্যুৎ ভোগের সুবিধা ২৭৩

৬২) চিত্র নং- ৮.৬১ : উন্নত আবাসন ও অন্যান্য সুবিধা ২৭৪

Dhaka University Institutional Repository

রেখাচিত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

		পৃষ্ঠা
১)	রেখাচিত্র নং- ২.৩: ব্রিটিশ সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো	৪২
২)	রেখাচিত্র নং- ২.৪: বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার কাঠামো	৫১
৩)	রেখাচিত্র নং- ২.৫: শ্রেণীভেদে গ্রামোন্নয়ন	৫১

চতুর্থ অধ্যায়

১)	রেখাচিত্র নং- ৪.১: মানুষের মর্যাদা এবং স্তরায়ন	৭১
২)	রেখাচিত্র নং- ৪.২: মানব সম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামো	৮৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

১)	রেখাচিত্র নং-৬.১: নারী উন্নয়নের বিভিন্ন কলা কৌশল	১৭৪

Dhaka University Institutional Repository

সারণী

দ্বিতীয় অধ্যায়

			পৃষ্ঠা
১)	সারণী নং- ২.১: বাংলাদেশে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার		৩৫
২)	সারণী নং- ২.২: শহর ও গ্রামের তুলনামূলক দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য		৫৩

চতুর্থ অধ্যায়

১)	সারণী নং- ৪.১: গ্রামে কৃষি জমির মালিকানা ও ভূমিহীন সৃষ্টি	৭৩
২)	সারণী নং- ৪.২: ভাগ চাষীদের মালিকানা নিরাপত্তা	৭৫
৩)	সারণী নং- ৪.৩: শ্রমিকের কৃষি ও অকৃষি ভূমি খাতে শ্রম বিক্রয় প্রাপ্যতা	৭৬
৪)	সারণী নং- ৪.৪: বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান	৮৫
৫)	সারণী নং- ৪.৫: ক্যালরী ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ বৈষম্য	৯৩
৬)	সারণী নং- ৪.৬: কৃষি ও অকৃষি ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ শ্রম বৈষম্য	১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

১)	সারণী নং- ৫.১: আশার বাৎসরিক ঋণ বিতরণ	১২৫
২)	সারণী নং- ৫.২ এক নজরে আশার ঋণ পরিকল্পনা	১২৬

ষষ্ঠ অধ্যায়

১)	সারনী নং- ৬.১: সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী	১৫২
২)	সারনী নং- ৬.২: যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ	১৬৯
৩)	সারনী নং- ৬.৩: সরকারের বয়স্ক ভাতা বিতরণ ও উপকার ভোগীর সংখ্যা	১৭৭

Dhaka University Institutional Repository

		পৃষ্ঠা
১)	**পরিশিষ্ট - ক**	২৯২
২)	পরিশিষ্ট - ক (১)	২৯২
৩)	**BIBLIOGRPHY**	২৯২
৪)	পরিশিষ্ট - ক (২)	৩১০
৫)	তথ্য পঞ্জী	৩১০
৬)	**পরিশিষ্ট - খ**	৩১৬
৭)	পিএইচ.ডি. গবেষণা কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা	৩১৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

গবেষণার সূচনা : ২০০৯ ইং সনের ৯ জুলাই গবেষকের 'জাতীয় অবক্ষয়রোধে প্রাথমিক শিক্ষার সংস্কার' শিরোনামে একটি লেখা ময়মনসিংহের দৈনিক প্রকাশিত পত্রিকা (জাতীয় সংবাদপত্র) 'দৈনিক জাহান' এ প্রকাশিত হয়। লেখাটি ছিল মূলত: গ্রামের প্রাথমিক বিদল্যায়গুলোর শিক্ষার মান নিয়ে চিন্তাধারামূলক একটি লেখা। দৈনিক পত্রিকায় লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নিয়ে লেখার প্রতি গবেষকের আগ্রহ বেড়ে যায়। এরপর থেকে কিছু দিন পর পর 'দৈনিক জা হান' পত্রিকায় আরও কিছু লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। যেমন: ২০০৯ ইং সনের ২৩ জুলাই 'সন্ত্রাসরোধ ও উন্নয়ন মূলক সমাজ গঠনে তৃণমূল পর্যায়ে প্রশাসন বি-কেন্দ্রীয়করণ প্রয়োজন,' ২০০৯ ইং সনের ৩ আগষ্ট 'উথুরা ডাকাতিয়া আংগাড়গাড়া রাস্তায় জনদুর্ভোগের কিছু কথা,' ২০০৯ ইং সনের ১৮ আগষ্ট 'নিঝুরী খালের উপর মরণ ফাঁদ টানা ব্রীজটির পাকাকরণ প্রসঙ্গে' ইত্যাদি শিরোনামে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নের জন্য লেখা গুলো প্রকাশিত হয়।

গবেষক বাংলাদেশের একটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদলয়ে অধ্যয়নকালে তিনি গ্রাম ও শহরের মানুষের জীবনমানে ব্যাপক পার্থক্য খুঁজে পান। নিজের জীবনেও যার প্রতিচ্ছবি উদ্ভাসিত হতে থাকে। গ্রামীণ মানুষের দুর্বিসহ জীবন ও শহরে মানুষের বিলাসবহুল জীবন। একই দেশের নাগরিকদের মধ্যে জীবনযাত্রার বৈষম্য সৃষ্টির বিষয়টি তাঁর মনকে পীড়া দিতে থাকে। এ কারণে ভবিষ্যতে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতা এবং গ্রামোন্নয়ন না হওয়ার পিছনে রহস্য উদ্ঘাটনে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন। যা বর্তমান গবেষণার হাতেখড়ি।

গবেষণার আবশ্যকতা ও লক্ষ্য : বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৮০ ভাগ বাস করে গ্রামে। সম্পূর্ণভাবে কৃষির উপর ভর করে এ জনগোষ্ঠী জীবনধারণ করে থাকে। কৃষি আবাদী-অনাবাদি ভূমির অধিকাংশের মালিক ধনী কৃষক পরিবার। বাকী ভূমির মালিক মধ্যবিত্ত, বর্গাচাষী ও গরীব কৃষক পরিবার। যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং যাদের অন্য কোন আয়-রোজগার নেই। এসব মানুষ কোনভাবে খেয়ে না খেয়ে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে বেঁচে থাকে। অভাব-অনটন যাদের নিত্য সঙ্গী। এ সমাজের মানুষ ব্যাপকভাবে অশিক্ষা, অসচেতনতা ও স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হয়ে প্রতিনিয়ত রোগ-শোকে ভোগে এবং কেহ কেহ অকালে বিনা চিকিৎসায় মৃত্যু বরণ করে।

কৃষির উপর নির্ভরশীল দেশের অর্থনীতির দৈন্যতা এখনও পুরোপুরি কাটেনি। সারা বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে কৃষকরা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করলেও বাংলাদেশের কৃষক সমাজ মান্ধাতার আমলের

দু'টো রুগ্ন হালের বলদ ও একটি কাঠের লাঙ্গলই সভ্য জগতে ফসল উৎপাদনের একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। আবার হালের গরুর অভাবে অনেক দরিদ্র কৃষক পরিবার নিজেরাই মিলে লাঙ্গল টেনে চাষাবাদ করে থাকে।

তবে এ কথা ঢালাওভাবে বলা যাবে না যে, বাংলাদেশের কৃষি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ঘটেনি। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি যেমন: কলের লাঙ্গল, গভীর নলকূপে পানি সেচ, উন্নত বীজ, ফসল মাড়াই যন্ত্র ইত্যাদির সুবিধা ভোগ করেন গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার। ঐ সকল যন্ত্রপাতি ক্রয় করার ক্ষমতা বাংলাদেশের দরিদ্র কৃষক পরিবারের নেই। কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য তাদের দ্বারস্থ হতে হয় ধনী কৃষক পরিবারগুলোর কাছে। টাকার বিনিময়ে প্রযুক্তির সুযোগসুবিধা ভোগ করে যে পরিমান ফসল উৎপন্ন হয়, তা তাদের কাছে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশী।

সরকার তফসিলি ব্যাংক থেকে গ্রামীণ দরিদ্র কৃষক পরিবারগুলোর জন্য জমি বন্ধক রেখে ঋণ দান কর্মসূচী চালু করলেও ব্যাংকের দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কমচারীরা জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় দালালদের মাধ্যমে ঋণের টাকার অধিকাংশ বা তার চেয়েও বেশী নিজেরা রেখে বাকী টাকা দিয়ে সহজ সরল কৃষকদের বিদায় করে থাকেন। সরকারী ঋণ পরিশোধের সময় কৃষকদের পুরো সুদাসলের টাকা শোধ করতে যেয়ে অনেক সময় ভিটে বাড়ীও বিক্রি করতে হয়। আবার অনেক দরিদ্র কৃষক পরিবার আর্থিক সংকটে পড়ে চড়া সুদে গ্রামের অর্থ লগ্নীকারী সুদখোর মহাজনদের কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। তাদের ফসল ঘরে উঠার আগেই তা বিক্রি করে ঋণের সুদাসলের টাকা পরিশোধ করতে যেয়ে উৎপাদিত ফসল শেষ হয়ে যায়। এভাবে নি:স্ব হয়ে দিনের পর দিন অনেক পরিবারকে পেটের দায়ে গ্রাম ছেড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে শহরে পাড়ি জমাতে দেখা যায়। কৃষকগণ উন্নত যাতায়াত অবকাঠামোর অভাবে উৎপাদিত কাঁচামালগুলো গ্রামের হাট-বাজারে পানির দামে বিক্রি করে থাকেন। কখনও অবিক্রিত কাঁচামাল পঁচে গিয়ে কৃষকদের ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়।

গ্রামীণ যুব সমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত। এরা শুধু কৃষি ফসল উৎপাদন মৌসুমে নামে মাত্র কয়েক দিন কাজ করে বছরের প্রায় সবটা সময় কর্মহীন অলস জীবনযাপনকরে। তারা গ্রামের হাঁট বাজারে বসে বসে আড্ডা মেরে সময় কাটায়। যুব সমাজের এ অংশটি নিরক্ষরও বটে। নিজেরা মেধা-বুদ্ধি খাটিয়ে অন্য কোন রোজগারের পথ সৃষ্টি করাও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। সরকার 'National Service Scheme' চালুর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ঘোষণা দিলেও তার সার্বজনীনতা অমাবস্যার অন্ধকারেই রয়েছে।

শিক্ষা-দীক্ষা, চাকরী-বাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্য সর্বক্ষেত্রে সারা বিশ্বসহ বাংলাদেশের শহরের নারী সমাজ জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম হলেও গ্রামের একজন অশিক্ষিত নারী স্বামীর ভাত রান্না-

বান্না ও ঘন ঘন সন্তান প্রসব ছাড়া অন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজেই অবদান রাখতে পারে না। তাছাড়া গ্রামীণ নারীরা অনেকাংশই স্বামী, শশুর, শাশুরী ও তাদের পৃষ্ঠপোষক অন্যান্য আত্মীয় স্বজন দ্বারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হয়ে অকালে মৃত্যুবরণ করে ।

গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের জন্য সরকার ও অন্যান্য বেসরকারী সংস্থা যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা গ্রামীণ নারী সমাজের উন্নয়নে নগণ্য বললে অত্যুক্তি হবে না। ধনী কৃষকের দুলালীরা শহরে গিয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পেলেও গরীব কৃষক পরিবারের মেয়েরা এক্ষেত্রে অবহেলার শিকার।

পাঁচটি মৌলিক চাহিদা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ অন্যান্য পল্লী অবকাঠামো যতদিন না গ্রামের মানুষের জন্য নিশ্চিত হবে, ততদিন গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে না। এজন্য প্রয়োজন প্রতিটি বিষয়ে পৃথক পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করে তার যথাযথ বাস্তবায়ন। এ বিষয়ে বাংলাদেশে এখনও কোন মৌলিক গবেষণা সম্পন্ন হয়নি। তাই গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের আবশ্যক হিসেবে এ গবেষণার বিষয়টি অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে বিশ্বাস রাখা যায়।

গবেষণার লক্ষ্যে স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে, সত্যিকারের গ্রামোন্নয়ন কী? গ্রামোন্নয়ন কী আবহমান কাল ধরে এমনিভাবেই চলতে থাকবে? গ্রামোন্নয়নের জন্য কারা ভূমিকা রাখতে পারেন? গ্রামীণ জনগণ কীভাবে শিক্ষিত, সচেতন ও সংগঠিত হয়ে গ্রামোন্নয়নে অংশ নিবেন? দুর্নীতিবাজদের মুলোৎপাটন পন্থা কীভাবে উদ্ভাবন হবে? ইত্যাদি প্রশ্ন গুলোর জবাব পাওয়া এবং গ্রামোন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবায়নের কৌশল খুঁজে বের করাই এ গবেষণার হাতেখড়ি ।

বাংলাদেশের গ্রামের মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন না হওয়ায় সরকারের বিপক্ষে আন্দোলন করে যথাযথভাবে গ্রমোন্নয়নের সুবিধা ভোগ থেকে ব্যর্থ হচ্ছে। যারা সচেতন তারা শহরে বিলাসবহুল জীবনযাপনে অভ্যস্ত। তারা গ্রামোন্নয়ন চান না এবং বাকী জনগোষ্ঠী তাদের (ধনী) মত হয়ে গড়ে উঠুক এটাও তাদের কাম্য নয়। গ্রামীণ অসচেতন গোষ্ঠীকে তাঁরা হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন। ঐ জনগোষ্ঠী ভূমিতে বা অন্য কোন জায়গায় শুধু শ্রম বিক্রি করে জীবনধারণ করে। নিজের পরিবার ও গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই।

প্রায় প্রতিটি দম্পতিরই কাম্য জনসংখ্যার তুলনায় ততোধিক সন্তান-সন্ততি রয়েছে। এত গুলো সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে সচেতন মানুষ করার কর্মক্ষমতা (Capacity) তাদের নেই। জনসংখ্যার ঘনত্ব ও শিক্ষার অভাবই গ্রামোন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। যে সকল যুবক-যুবতী নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে শিক্ষার সুযোগ লাভ করে, তারা নিজেদের কৃষিতে সম্পৃক্ত না করে সোনার হরিণ সরকারী চাকুরীর পিছনে হন্যে হয়ে ছুটাছুটি করেন।

কৃষিতে শিক্ষা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন না হওয়ায় কাঙ্খিত উৎপাদন সাধিত হচ্ছে না। জনসংখ্যাধিক্য গ্রামীণ পরিবারগুলো নিজের সংসারের ভরণ-পোষণেই ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। এমন নিু জীবনযাত্রায় তারা বসবাস করায় অনেক সময় নানা প্রকার রোগে আক্রান্ত হয়। বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করার সংগতি এবং সচেতনতা কোনটিই তাদের নেই।

একজন শিশু যে বয়সে লেখা পড়া শেখার কথা ক্ষুধার জ্বালায় ঐ বয়সে সে নানা ভাবে শ্রম বিক্রি করে নিজের খাবার নিজেই যোগাড় করে। গ্রামের অশিক্ষিত, সহজ ও সরল মানুষগুলো অনেক সময় নানা প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে মহাজন, দালাল, বাটপারদের খপ্পড়ে পড়ে সহায়-সম্পত্তি, ভিটে-বাড়ী হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ে । এ সব ঘটনা গ্রামের মানুষের জন্য নিত্য নৈমিত্তিক।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ করেন দুর্নীতিবাজ ও কিছু কিছু গ্রাম্য হাতুড়ে এলিটের লালসার কারণে তা পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়না। নামেমাত্র কাজ দেখিয়ে কর্মসূচীর কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। এসব কার্যক্রমের রহস্য উদ্‌ঘাটন করাই এ গবেষণার লক্ষ্য।

অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Hypothesis) : বিশ্বের মানুষ যখন চরম উৎকর্ষে জীবনযাপন করছে বাংলাদেশের মানুষ তখন দরিদ্র সীমার সর্বনিু পর্যায়ে অবস্থান করছে। Railway Station, Bus Stoppage, শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই অনেক মানুষকে খাবারের জন্য হাত বাড়িয়ে দিয়ে দু'টি টাকার জন্য কাকুতি-মিনতি করতে দেখা যায়। এ দৃশ্যপট দু'এক দিনের নয়। এ অবস্থা চলে আসছে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী। শিশু, নারী, পঙ্গু, বৃদ্ধ, অসুস্থ থেকে শুরু করে টগবগে যুবতী, কারও কোলে একটি কঁচি বাচ্চা, সাথে আরও একটি শিশু বাচ্চা। হাতে একটি ভিক্ষের থলে বা বাটি। আবার কখনও বা এরা রাস্তার ধারে বাচ্চা শুইয়ে রেখে ভিক্ষে করে থাকে। অনুরূপ বয়সের কোন কোন যুবককেও ভিক্ষের জন্য হাত বাড়াতে দেখা যায়। এসব মানুষ বয়সে তরুণ হলেও চেহারা দর্শনে স্পষ্টতই মনে হয়, নিত্য সঙ্গী দারিদ্র্যতার কষাঘাত তাদের জীবনকে পিষ্ট করছে আবহমানকাল ধরে ।

শহরের রাস্তার ধারে অথবা কোন খালি জায়গা ছেঁড়া পলিথিন বা কাগজ টানিয়ে তার নিচে স্ত্রী-সন্তান নিয়ে তারা ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন করে। তাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় এত নোংরা যে তা জীব-জনোয়ারকেও হার মানায়। এসব মানুষ যত্রতত্র মল-মূত্র ত্যাগ করার ফলে আশ-পাশের পরিবেশ কলুষিত হয়ে মানুষের স্বাভাবিক চলাচলে অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করে। মানুষ গুলো গোসল না করেই পাঁচ-দশ দিন কাটিয়ে দেয়। অনেক সময় তারা নর্দমা বা ময়লাযুক্ত পানিতে গাত্রাত করে কিছুটা হলেও নির্মলতার স্বস্তিবোধ করে।

ডাষ্টবিন বা রাস্তা থেকে কুড়ানো নোংরা কাগজ বা অনুরূপ কোন জ্বালানী সংগ্রহ করে একটি অপরিচ্ছন্ন হাড়ি-ঘটিতে রান্না করা খাবার খেয়ে এরা মানবেতর জীবনযাপন করে। রোগ-শোক যাদের নিত্য সঙ্গী । এমতাবস্থায় অনেকে অকালেই মৃত্যুরকোলে ঢলে পড়ে। এসব মানুষ কোন হোটেল বা বাসা বাড়ীর আঙ্গিনা ও নর্দমা থেকে পরিত্যক্ত ময়লাযুক্ত পঁচা খাবার কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেয়ে জীবনধারণকরে। যা স্বাভাবিকভাবেই মানব সভ্যতাকে হার মানায়। এদের শিশু সন্তান গুলো এমন পরিবেশে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠে পূর্বসুরীদের জীবনযাত্রার উত্তরাধিকার হয়ে থাকে। কেহ কেহ আবার অপরাধ জগতের লোকদের সাথে সম্পৃক্ততা গড়ে তোলে নানা অপকর্ম ঘটিয়ে সুশৃঙ্খল সমাজে হুমকি ও অস্থিরতা সৃষ্টি করে। শীত ও বর্ষায় এ জগতের মানুষগুলো বন্য পশু-পাখির মত জীবন কাটিয়ে থাকে। শিক্ষা-দীক্ষা ও আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে এদের আদৌ কোন ধারণা নেই। আদিম মানুষের জীবনযাত্রার মত এরা জীবন অতিবাহিত করে।

সভ্য সমাজে মানুষের জীবন চলার পথ এমন দু:সহ হতে পারে তা গবেষককে দারুণভাবে ব্যথিত করে। এসব মানুষের জীবনযাত্রার মান তাঁর চিন্তার জগতকে প্রসারিত করতে থাকে। দীর্ঘদিনযাবত তিনি নিরবে নিভৃতে এর সত্যতা যাচাইয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেন এবং সঠিক চিত্রাঙ্কণে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকেন। পরিশেষে তিনি এর সফলতার মুখ দেখতে পান। এসব লোকগুলোর শতকরা ৯৯ জনেরই আগমন ঘটে বাংলাদেশের কোন না কোন গ্রাম থেকে। গ্রামোন্নয়নের রূপরেখা নিয়ে তিনি অগ্রসর হতে থাকেন। আর এ ধারণার উপর ভর করে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন তথা গ্রামোন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার, বেসরকারি সংস্থা ও বিভিন্ন মনীষী কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতার বিচার বিশ্লেষণে তিনি সংকল্পবদ্ধ হন।

গবেষণার যৌক্তিকতা : বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রায় অর্ধশতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত। দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটানোর বিনিময়ে ছিল ৩০ লক্ষ মানুষের রক্ত ও দু'লক্ষ মা-বোনের ইজ্জত এবং নয় মাসের একটি সশস্ত্র যুদ্ধ। যার মধ্য দিয়ে বিশ্ব দরবারে উদীয়মান হয় স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজের পতাকা। স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এ দেশের মানুষের আত্মত্যাগের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এ ত্যাগের পিছনে যে সব কারণ ছিলতা এদেশের উপর চেপে বসা দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন-শোষণের অবসান ঘটিয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচার অধিকার ছিনিয়ে আনা। প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকারসহ সকলপ্রকার অধিকার নিশ্চিত করে একটি উন্নত সমাজ কাঠামো গঠন করা। স্বাধীনতা যুদ্ধে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন, তাদের সঙ্গে এদেশের গ্রাম-গঞ্জের কৃষক, শ্রমিক, হত দরিদ্র মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাক-সেনাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছিলেন। প্রতিটি গ্রামকে এক একটি দূর্গে পরিণত করেছিলেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও গ্রাম-গঞ্জের মানুষের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলন এখনও ঘটেনি। এর কারণ খুঁজতে যেয়ে বলা যায়, আগে ছিল উপনিবেশিক শোষণ এখন হচ্ছে স্বাধীন দেশীয় মানুষের শোষণ। শোষণের কোন পরিবর্তন হয়নি। শহীদানের রক্ত ও মা-বোনের ইজ্জতের বিনিময় এ দেশের মানুষ এখনও পুরোপুরি পায়নি। আর এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী অবহেলার শিকার হয়েছেন গ্রামের মানুষ। স্বাধীনতাপূর্ব এদেশে গ্রাম গুলোর যে করুণ চিত্র দৃশ্যমান ছিল, তার বাস্তবতার ব্যত্যয় কিছুটা ঘটলেও এখনও সম্পূর্ণভাবে ঘটেনি।

গ্রামের মানুষের একটি আশাপূরণ হয়, তা হলো ভোট দেয়া। প্রতিবার নির্বাচন আসা মাত্র গ্রামের মানুষের ধারণা থাকে, এবার হয়তো তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ হবে। কিন্তু সে আশা আতুর ঘরেই থেকে যায়। সরকার আসে, সরকার যায়। জন প্রতিনিধিদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটলেও গ্রামের মানুষের ভাগ্য অপরিবর্তিতই থাকে। গণপ্রতিনিধিরা আশ্বাস দেন, রাস্তা পাকা করণের, বিদ্যুতায়নের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার, হাসপাতাল তৈরীর, বেকার সমস্যা সমাধান করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার সহ কতই না পাহাড় সমান উন্নয়নের কর্মসূচী। পরিশেষে দেখা যায়, লেখাপড়া, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য পূর্বের ন্যায় গ্রামবাসীকে শহর অভিমুখেই দৌঁড়াতে হয়।

পৃথিবীর কোন দেশ যখনই স্বাধীনতা অর্জন করেছে, সে সকল দেশ গ্রামোন্নয়নসহ রাষ্ট্রের সর্বিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ এখনও দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এমনভাবে দুর্নীতিগ্রস্ত যে সামান্য কাজ সম্পূর্ণ করেই কর্মসূচী অসম্পূর্ণ রাখে। তাকে আলোর মুখ দেখতে দেয়না। সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের গৃহীত সকল কর্মসূচী বাতিল ঘোষণা করেন। আবার নিজেদের মত করে কর্মসূচী গ্রহণ করেন।

পাকা রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হওয়ার এক মাসের মধ্যেই খানাখন্দে পরিণত হয়। ব্রীজ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গৃহ নির্মাণের এক বৎসরের মধ্যে তাতে ফাঁটল ধরে। খাল খনন কর্মসূচীর নামে বরাদ্দকৃত অর্থ খাল খনন না করে দু'পাশের আগাছা পরিস্কার করেই খনন কার্য সম্পূর্ণ করা হয়। কাঁচা রাস্তায় মাটি ভরাট কমূসচীতে মাটি ভরাট না করে রাস্তার গর্তের চার পাশের মাটি এনে গর্ত ভরাট করে নির্মাণ কাজ শেষ করে। সরকার গৃহীত প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ দুর্নীতিবাজরা লুটপাটের মহোৎসবে মেতে উঠে । এ পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, একজন রোগীকে ডাক্তারের অস্ত্রোপচারের পর তার পেটের ভিতর সুঁই, সুতা, ব্যান্ডেজ রেখেই পেট সেলাই করে রোগী সুস্থ করার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। তাই অবস্থা দৃষ্টে গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী বাস্তবায়ন না হওয়ার কারণ হিসেবে

"গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা" শিরোনামটি নিয়ে গবেষণার যথেষ্ট যৌক্তিকতা রয়েছে।

গবেষণা প্রণালী (Methodology) : গবেষণা প্রণালীটি নিয়ে যদি গোড়ার দিকে আলোকপাত করা হয় তাহলে দেখা যায়, এ পদ্ধতিটি নিয়ে প্রথম চিন্তা শুরু করেন প্রাচীন সভ্যতায় উর্বর লীলাভূমি গ্রীসের দার্শনিকগণ। তাঁদের গবেষণা পদ্ধতি ছিল মূলতঃ চিন্তা নির্ভর দর্শনশাস্ত্র। "তাঁরা কী, কেন এবং কিভাবে?"[১] এ সকল প্রশ্ন থেকে উদ্ভুত চিন্তা নিয়েই গবেষণা কর্ম চালাতেন।

ইউরোপে রেনেসাঁ চলাকালীন সময় দর্শনের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসে বিজ্ঞান। মূলত: পদ্ধতিগত কারণেই বিজ্ঞান আলাদা হয় দর্শন থেকে। এর পর থেকে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী বৈজ্ঞানিক সভ্যতার উৎকর্ষে এসে গবেষকগণ ঐ সকল চিন্তা শক্তি বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহার ও বিশ্লেষণ শুরু করেন। তাঁরা প্রবেশ করেন জ্ঞান ভান্ডারের মহাসমুদ্রে। মহাসমুদ্রে পন্ডিতগণ এক একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম চালাতে থাকেন। কেহ দর্শন, কেহ বিজ্ঞান, কেহ সাহিত্য, কেহ সামাজিক বিজ্ঞান ইত্যাদি। বিখ্যাত গবেষক Katzer, Cook and Crough (2000) সহজে বুঝাবার জন্য গবেষণা পদ্ধতির একটি সংক্ষিপ্ত ও সাবলীন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, "I define research here as the systematic process of collecting and analysing information (data) in order to increase our understanding of the phenomenon with which we are concerned or interested."[2]

গবেষকগণের মতে কতগুলো পদক্ষেপ অনুসরণ করে পদ্ধতিগত গবেষণা চালানো হয়ে থাকে। এ পদক্ষেপগুলো হলো নিন্মরূপ:[৩]

ক) সমস্যা থেকে উদ্ভুত প্রশ্ন সংগ্রহ করা।

খ) সমস্যা সমাধানের জন্য উদ্বুদ্ধ হওয়া।

গ) সমস্যা সমাধানের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করা।

ঘ) সমস্যা সমাধানের কৌশল নির্ধারণ করা।

ঙ) কৌশল ব্যবহার করে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

তাছাড়া গবেষণা ভালভাবে বুঝার জন্য লেখকগণ গবেষণার তিনটি শ্রেণি বিভাজন করেছেন। নিচে গবেষণার শ্রেণিবিভাজন তিনটি দেখানো হলো :[8]

ক) ব্যাখ্যামূলক গবেষণা (Explantory Research) : এ ধরণের গবেষণার মূল বিষয় হলো আলোচনা, পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ।

খ) পদ্ধতিমূলক গবেষণা (Testing out Research) : কোন একটি গবেষণা যখন পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে না পারে তখন সেটির উপর পুনরায় গবেষণা করতে হয়।

গ) সমস্যা সমাধানমূলক গবেষণা (Problem Solving Research) : কোন বাস্তব সমস্যার সমাধানের জন্যই এ ধরণের গবেষণার উদ্যোগ নেয়া হয়।

ড.কাজী সাইফুদ্দী তাঁর 'পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান ও গবেষণা পদ্ধতি' বইয়ে উল্লেখ করেন, "A research project is that work activities which maintain conventional method, to achieve new information or knowledge on the basis of specific object."[5]

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ ও উন্নয়নে গবেষণা অপরিহার্য। জ্ঞানের প্রতিটি শাখায় সে কারণেই ব্যাপকভাবে গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের গবেষণার জন্য বিভিন্ন ধরণের গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্ ধরণের পদ্ধতি কার্যকরী হবে তা উহাদের উদ্দেশ্য ও কলা কৌশলের ধরণ ও প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। "জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরণ ও বৈচিত্রের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে বিভিন্ন রকমের গবেষণা পদ্ধতি।"[৬]

নিম্নে পন্ডিতগনের কয়েকটি গবেষণা পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করা হলো :

æa. Basic Research b. Theoretical Research c. Applied Research d. Emperical Research e. Historical Research f. Experimental Research g. Field Research h. Survey Research i. Anthropological Research j. Action Research k. Philosophical Research l. Evaluative Research m. Case-Study Research n. Content Analysis Research."[7]

গবেষাণা পদ্ধতিকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ না করে ফলাফল প্রস্তুত করা ঠিক নয়। এ প্রসঙ্গে Robert A. Day (1979) যথার্থই বলেছেন, "You should not start the result section by describing methods which you inadvertently omitted from the materials and method section."[8]

গবেষণার অনুসৃত পদ্ধতিসমূহ নিম্নরূপ :

ক) গৌণ (Secondary) উপাত্ত ব্যবহার করা হয়েছে।

খ) নমুনায়ন (Sampling) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

গ) পর্যবেক্ষণ (Observation) পদ্ধতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষক গবেষণার কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদানের জন্য উপরোল্লিখিত তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। যা তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ সহ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্য ও সময়ের দিকটিও এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে।

গবেষক ২০১১ সালে গবেষণার রসদ সংগ্রহের জন্য কয়েকবার কুমিল্লা ও বগুড়ায় 'Bangladesh Academy for Rural Development (BARD)' এ গমন করে সেখানে প্রথম প্রথম Academy সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের সাথে পরিচিত হয়েছেন এবং তাদের সহায়তায় লাইব্রেরীতে গবেষণা সম্পৃক্ত বইগুলো যাচাই-বাচাই করে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি যোগাড় করতে সক্ষম হয়েছেন। Academic তথ্য সংগ্রহের পর সাধারণ ভাবেই মনোনিবেশ করা হয় গবেষণার আসল জায়গা বাংলাদেশের অজপাড়া গাঁ গুলোতে। গ্রাম গুলোতে পৌঁছতে কোথাও পায়ে হেঁটে, কোথাও গরু বা মহিষের গাড়ীতে, কোথাও সাইকেলে, কোন কোন গ্রামে ভ্যান গাড়িতে, কোথাও আবার দাড় বাওয়া নৌকায় চড়ে।

গ্রামে যে সকল লোকের সাথে গ্রামোন্নয়ন বিষয়ের কথা বলা হয় তারা নিরক্ষর কৃষক-শ্রমিক, অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ কৃষক-শ্রমিক, ধনী কৃষক (মোড়ল), যাদেরকে গ্রাম্য এলিটও বলা হয়, শিক্ষকসহ বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণির লোক। কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির বেশীর ভাগ লোক বলেছেন, গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। তবে তারা বলেছেন, তারা শুধু দেখেন কোথায় কী কাজ হচ্ছে। তাদের ধারণা সবকারী সাহায্যেই ঐ সকল কাজ সম্পন্ন হয়ে থাকে। গ্রামীণ মহিলারা দু'একজন বাদে বাকীরা বলেছেন, গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। স্বল্প সংখ্যক লোক যারা জনপ্রতিনিধিদের সাথে চলাফেরা করেন, তারা বলেছেন, কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ কোত্থেকে এসেছে।

তারপর যোগাযোগ করা হয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে, যারা সাবেক ও বর্তমান ওয়ার্ড মেম্বার, সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার। তারা কেহ কেহ এস.এস.সি থেকে্লাতক পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন। গ্রামোন্নয়ন সম্পর্ক তাঁদের বিশেষ কোন কোন ক্ষেত্রে ধারণা থাকলেও বাকী জনপ্রতিনিধিরা বলেছেন, চেয়ারম্যান সাহেব তাদের কর্মসূচী বাস্তবায়নে কাজের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাঁর পরামর্শ মত তারা কর্মসূচী সম্পন্ন করে থাকেন। ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক ও বর্তমান চেয়ারম্যান যাঁরা ইউনিয়ন পরিষদের প্রধান জনপ্রতিনিধি বা মধ্যমনি হিসেবে আখ্যায়িত, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে তথ্য নেয়া হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, তাঁদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিরক্ষর (শুধু স্বাক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন) থেকে অনেক্লোতকোত্তর শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া জানেন।

গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে চাইলে, জন প্রতিনিধিগণের বেশীর ভাগই অপরিপক্ক জবাব দিয়েছেন। বাকী জনপ্রতিনিধিদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বেশ ধারণা আছে। কেন কেহ বলেছেন, উপজেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে সচিবালয় পর্যন্ত কর্মসূচী অনুমোদন করানোর পেছনে খড়-কুটো পোঁড়ানোর কথা। তাঁরা এও বলেছেন, গ্রাম পর্যন্ত কর্মসূচী বাস্তাবায়ন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের অনেক খেসারত দিতে হয়। তারা কর্মসূচী অনুমোদনের জন্য জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য ও মন্ত্রী মহোদয় গণের ভূমিকার কথাও বলেছেন।

এভাবে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে গ্রামের সাধারণ জনগণ থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবদের কাছে বার বার গমনের ফলে সর্ব মহলে গবেষক বেশ পরিচিত হয়ে উঠেন। চেয়ারম্যান সাহেবদের সাথে মাঝে মাঝে চা পানের ফলে তাদের সাথেও বেশ সখ্যতা জমে উঠে । এমতবস্থায় তাঁরাও কী কী ভাবে কমূর্সচীতে কিছুটা ভাগ বসান তাও বেরিয়ে এসেছে। গবেষক এসব পদ্ধতিকে গবেষণা কর্ম সফল করার একটি কৌশল হিসেবে নিয়েছেন। যার ফলশ্রুতিতে সমস্ত তথ্য তাঁরা অকপটে দিয়ে গবেষণা কার্যক্রমকে সাফল্য মন্ডিত করতে সহায়তা করেছেন।

এ প্রসেঙ্গ অধ্যাপক ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা যথার্থই বলেছেন, “Leadership is an important factor for the successful functioning of an organization, to know the kind of people who run the institution.”[9]

পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানদ্বয় (একজন সংরক্ষিত আসনে মহিলা) সহ উপজেলার সরকারী কর্মকর্তা যেমন: উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউ.এন.ও), কর্মসূচী বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পি.আই.ও), তাছাড়া জেলা প্রশাসক এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্যগনের কাছ থেকেও সাধ্য অনুযায়ী যোগাযোগ করে গবেষণার উপকরণ সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। তাঁরা অতীত ও বর্তমান কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন দিক তোলে ধরে জ্ঞানগর্ভ কথা বলেছেন। কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তব সমস্যার সঠিক কিছু কিছু রূপরেখার কথাও উল্লেখ করেছেন। গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিয়ে যে সকল সংগঠন, পন্ডিত ব্যক্তি, যাঁরা পত্রিকায় ও গবেষণামূলক Journal গুলোতে প্রবন্ধ লিখেন, তাদের কাজ থেকে যথাযথ তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

সবশেষে গমন করা হয় কর্মসূচী বাস্তবায়নের দরপত্র (Tender) আহ্বানকারী কর্তৃপক্ষের অফিস গুলোতে। দরপত্রের কাজ পাওয়ার জন্য ঠিকাদারদের লঙ্কাকান্ড গবেষক নিজে প্রত্যক্ষ করেন। দরপত্রের বাক্স ছিনতাই, মারামারি, এমনকি দরপত্র নিজের অনুকূলে নেয়ার জন্য প্রতিপক্ষের সাথে সংঘর্ষে ঠিকাদারদের অনেকে খুন পর্যন্ত হয়ে থাকেন। এসবের পিছনে বেশীর ভাগ তৎপর দেখা যায়, সরকারী দলের মদদপুষ্ট বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতা/কর্মীদের।

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থাদৃষ্টে কর্তৃপক্ষকে একটি দরপত্র বার বার আহ্বান করতে যেয়ে একদিকে সময় অপচয়, অন্য দিকে কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘসূত্রিতা পরিলক্ষিত হয়। আবার যারা দরপত্রের অনুমোদন পায়, তারাও কচ্ছপের গতিতে কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রসর হন। বার বার উল্লেখিত অফিস গুলোতে গমন করে গবেষক নিজে পর্যবেক্ষকের কাজ করে তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

গবেষণা পদ্ধতি যোগাড় করতে যেয়ে স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে গবেষক গবেষণা পদ্ধতিটিকে একটি মহীরুহের সাথে তুলনা করেছেন। নিচে চিত্রের মাধ্যমে তা দেখানো হলো :

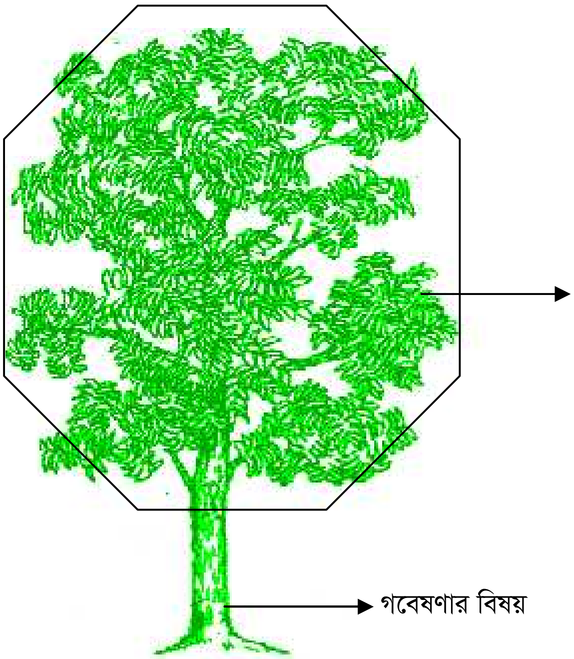

চিত্র নং - ১.১

মহীরূহের কান্ড বা গুড়ি গবেষণার বিষয়। কান্ড থেকে শাখা-প্রশাখা, পাতা, পাতার শিরা-উপশিরায় গমন করে তথ্য সংগ্রহ করতে পারলেই গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল পাওয়া সম্ভব হবে। আর এ পদ্ধতিতে মহীরূহের পাতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পৌঁছা অত্যন্ত কঠিন কাজ। যাঁরাই এ ক্ষেত্রে সফল হবেন তাঁরাই গবেষণার পদ্ধতি উদ্ভাবনে সক্ষম হবেন।

গবেষণার পরিকল্পনা গ্রহণ : বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত: গ্রাম ভিত্তিক কৃষিনির্ভর। কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে, দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়ে এবং কোন কারণে উৎপাদন ব্যাহত হলে জীবনযাত্রার মান নিু পর্যায়ে চলে যায়। এর মূল কারণ, বাংলাদেশের কৃষি ব্যবস্থাপনা পুরোপুরি প্রকৃতি নির্ভর। প্রকৃতি যখনই বিরূপ হয়, যেমন: খরা, অতিবৃষ্টি, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঝড়-তুফান, নদী ভাঙ্গন ইত্যাদিতে প্রতি বছর ব্যাপক ভাবে শস্য হানি ঘটে থাকে। তাছাড়া দক্ষিণাঞ্চলের বিশেষ প্রাকৃতিক দুর্যোগের আগ্রাসী ছোবল যেমন: সুনামী, আইলা, লাইলা ইত্যাদির প্রচন্ড আঘাতে পুরো

এলাকা একেবারে লন্ডভন্ড হয়ে যায়। এভাবে দেশে ফসল হানির পাশাপাশি ঘর-বাড়ী বিধ্বস্ত, সম্পদ ধ্বংস, মানুষ, পশু-পাখির জীবন নাশ ও নানা প্রকার পরিবেশগত ক্ষতিও সাধিত হয়।

মঙ্গা পীড়িত নামে অভিহিত উত্তর বঙ্গের মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থাও অনুরূপ। দেশে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগ কোন নিত্য নতুন ঘটনা নয়। এ অবস্থা শত সহস্র বছর বা তারও আগে থেকে চলে আসা। উপনিবেশিক শাসকরা এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়নের প্রয়োজনও বোধ করেনি। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর মানুষ আশা করেছিল স্ব-শাসিত রাষ্ট্রের সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিষযে বাংলাদেশ সরকার যে একেবারেই কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেননি তা নয়। যতটুকু হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য। সরকারের এমন সহায়তা এসব অঞ্চলের মানুষের জন্য সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই।

গ্রামোন্নয়নের জন্য স্বাধীনতার পর থেকে অদ্যাবধি সরকারগুলো কতই না কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ফল একটাই অর্থাৎ গুড়ে বালি। প্রায়ই দেখা যায়, কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ রুই-কাতলের সহায়তায় কর্মসূচী 'নামকা ওয়াস্তে' বাস্তবায়ন করে বরাদ্দকৃত অর্থ নানা কৌশল খাটিয়ে লুটপাট করে আংগুল ফুলে কলাগাছ হয়েছেন বা হচ্ছেন। আর গ্রামের সাধারণ জনগণ গ্রামোন্নয়নের আশায় তীর্থের কাকের মত তাকিয়ে আছেন।

রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনের পূর্বে গ্রামোন্নয়নের জন্য নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে গ্রামের মানুষের ভোট নিয়ে ক্ষমতাসীন হয়ে থাকেন। পরবর্তীতে তারা জনগণকে দেয়া ওয়াদা ভুলে যান, না হয় দু'একটি কর্মসূচী বাস্তাবয়ন করে দায়িত্ব শেষ করেন। যা গ্রামোন্নয়নের কোন ভূমিকাই রাখেনা।

আসলে যে দলই সরকার গঠন করুন না কেন, তারা চান না গ্রামোন্নয়নের মাধ্যমে মানুষ একটি সচেতন শ্রেণিতে পরিণত হয়ে তাদের রাজনৈতিক 'Fashion' পরিবর্তন করে ফেলুক। স্বাভাবিক ভাবেই তারা মনে করেন, গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হলে, নতুন নেতার জন্ম হবে, সনাতন নেতাদের নেতৃত্বের সংকটে পড়তে হবে। তারা এ ভয়েই গ্রামোন্নয়ন ব্যাহত করে রাখে।

গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও সনাতন পদ্ধতি অনুসরণ করে চলছে। উপনিবেশিক শাসকদের প্রতিষ্ঠিত একখানা প্রাথমিক বিদ্যালয়ই চার থেকে সাত হাজার বা কোন গ্রামে ততোধিক জন বসতি অধ্যুষিত গ্রামের জনগণের সন্তানদের লেখাপড়ার একমাত্র অবলম্বন। নানা বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে, যারা লেখাপড়ার বৈতরণী পার হন, তাদের ভাগ্যে সরকারী চাকুরী কমই জুটে। ছেলেমেয়েদের চাকুরী পাওয়ার সেলামী দেয়ার সামর্থ্য গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের পিতা-মাতার নেই। চাকুরীর

জন্য বিভিন্ন অনুন্নত শ্রেণি লোকদের 'কোটা'(Quota) পদ্ধতির ব্যবস্থা থাকলেও অনুন্নত, অসচেতন কৃষক শ্রেণির মানুষের সন্তানের জন্য এমন কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে অশিক্ষিত পিতামাতা সন্তানদের বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে কৃষি অথবা অন্য কোন কর্মে সম্পৃক্ত করে নিজেদের অর্থনৈতিক মুক্তি ও কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করে থাকেন।

স্বাধীনতার পর হতে সরকার গ্রামীণ শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন তা অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবায়নের সংকটে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। আবার কিছুটা বাস্তবায়িত হলেও জন সংখ্যার তুলনায় তা অতি নগণ্য। ফলে দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষার সুযোগ কমই পেয়ে থাকে।

গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরলেও জনগণের চিকিৎসা সুবিধার জন্য তেমন কোন সরকারী চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কোনো কোনে উপজেলার দু'একটি ইউনিয়নে ছোট খাটো একটি দাতব্য সাব চিকিৎসা কেন্দ্র থাকলেও সেখানে মান সম্মত ডাক্তার ও ঔষধ পাওয়ার তেমন ব্যবস্থা নেই। যতটুকু আছে তার সুযোগও হত দরিদ্র গ্রামবাসী পায়না।

জনসংখ্যা সমস্যা বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা, এটা সবাই জানেন। এ বিস্ফোরণ শহরের তুলনায় গ্রাম গুলোতে বহু গুণে বেশী। পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতির ধারণা সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং চিত্তবিনোদনের অভাব থাকায়, গ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়েই চলছে। এ কারণে গ্রামীণ পরিবারের শিশু গুলো পুষ্টিকর খাবার তো দূরের কথা অনেক সময় অনাহারে পর্যন্ত থাকতে দেখা যায়। এ শিশু গুলো রোগে আক্রান্ত হলে চিকিৎসা করার ক্ষমতাও দরিদ্র পিতা-মাতার থাকে না। পরিবারের ভরণ পোষণ ব্যতিরেকে চিকিৎসার খরচ চালানো একটি পরিবারের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে বিনা চিকিৎসায় অনেক শিশু অকালেই মৃত্যুবরণ করে। গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবার জন্য সরকার উন্নতমানের চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করার তেমন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের উদ্যোগ এখন পর্যন্ত হাতে নেননি।

দিবাভাগে আল্লাহ প্রদত্ত সূর্যের আলো এবং রাত্রে শুক্ল পক্ষে চাঁদের আলোই গ্রামের মানুষের অন্ধকারে পথচলার একমাত্র ভরসা। দেশের স্বল্প সংখ্যক গ্রামে পল্লী বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকলেও এখন পর্যন্ত মানুষ পুরোপুরি এর সুবিধা হতে বঞ্চিত হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখে বিদ্যুতায়নের বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণের কথা শোনা গেলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন নেই। রাতের কৃষ্ণপক্ষে অনেক সময় চোর-ডাকাতরা মানুষের সর্বস্ব লুন্ঠন করে নিয়ে যায়। এতে কোন কোন পরিবার চিরদিনের মত নি:স্ব হয়ে পড়ে।

স্বাধীনতার পর থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী যাবৎ যেভাবে কচ্ছপের গতিতে গ্রামোন্নয়ন হচ্ছে এভাবে উন্নয়ন সম্পন্ন হতে কত শতাব্দী লাগবে তা উপর ওয়ালাই বলতে পারবেন। তাই গ্রামোন্নয়নের জন্য কর্মসূচী ও বাস্তবতা বিষয়টিকে নমুনা হিসেবে বাছাই করে তা কর্মক্ষেত্রে উপর গবেষণা করা একান্তই যুক্তিসংগত ও ফলদায়ক।

লোক মুখে শোনা যায় এবং অনেক সময় পত্রিকায়ও দেখা যায়, ঢাকা শহরে ফকিরের ভিক্ষের পয়সায় মাস্তানরা ভাগ বসায়। জনপ্রতিনিধ ও সরকারী কর্মকর্তারাও অনুরূপভাবে গ্রামোন্নয়ন মূলক কর্মসূচীতে ভাগ বসান। তাই ফকিরের ভাগ্যের যেমন পরিবর্তন নেই, গ্রামবাসীর ভাগ্যেরও তেমন পরিবর্তন নেই। ফকির যেমন মাস্তানদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। এদেশের গ্রামের মানুষও তেমনি জনপ্রতিনিধি ও সরকারী সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখে না। তাই গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এ গবেষণা কর্মটি একটি‘ ‘Model’ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

তথ্য উপাত্ত যোগান পদ্ধতিঃ যে কোন গবেষণা কর্ম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের অন্যতম পদ্ধতি তথ্য-উপাত্ত যোগান পদ্ধতি। তথ্য হলো গুণবাচক ও সংখ্যাবাচক এবং উপাত্ত হলো শুধু সংখ্যাবাচক। এ সম্পর্কে গবেষকগণ যা বলেছেন, “এটি যে কোন ধরণের পদ্ধতিগত গবেষণা বা অনুসন্ধানের ফল, এটি সংখ্যাবাচক বিষয় বা তথ্য।”[১০] এক্ষেত্রে উপাত্ত সংগ্রহ পরিচালিত গবেষণা পদ্ধতি পূর্ব উদ্দেশ্য থাকে এবং এর উপর ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণও সাধারনীকরণ প্রয়োগ করে তত্ত্ব তৈরী করা হয়। উপাত্ত সম্পর্কে বলতে গিয়ে জার্মান লেখক G.R. Adams and J.D. Schvaneveldt (1985) বলেছেন, “Data is the information on observation of the world.”[11] অবশ্য বর্তমান কালে এ সংজ্ঞাটি উপাত্ত সম্পর্কে ভাল ও ব্যাপক ধারণা দিতে ব্যর্থ হওয়ায় আধুনিক গবেষক যে সংজ্ঞাটি দিয়েছেন তা হলো, “Data is that numerical output of the systematic investigation already conducted purposefully. ” [12]

পন্ডিত ব্যক্তিগণের উপরোক্ত আলোচনায় তথ্য উপাত্ত যোগানে গবেষণার কর্মক্ষেত্র ব্যাপক হওয়ায় অর্থ্যাৎ “গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতিঃ কর্মসূচী ও বাস্তবতা” শিরোনামে বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। গবেষণার কর্মপরিধির ব্যাপকতা সম্পর্কে অধ্যাপক ড. গিয়াসউদ্দিন মোল্যা তাঁর ‘Village Government in Bangladesh’ গ্রন্থে যথার্থই বলেছেন, “It was not possible to cover 68,000 villages of Bangladesh.”[13]

এ পদাঙ্ক অনুসরণ করে, সময়ের স্বল্পতা ও অর্থ ব্যয়ের সামর্থ্যের দিকটিও লক্ষ্য রেখে গবেষক তাঁর গবেষণা কর্মের জন্য বাংলাদেশের ৩টি গ্রাম তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বেছে নেন।

তিনটি গ্রামের বৈশিষ্ট্য হলো: ১) শহরের পাশাপাশি একটি উন্নত গ্রাম, ২) শহর থেকে কিছু দূরে পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত একটি স্বল্পোন্নত গ্রাম, ৩) শহর থেকে বহু দূরে অর্থ্যাৎ প্রত্যন্ত অঞ্চলের অজপাড়া গাঁয়ে অবস্থিত একটি অনুন্নত গ্রাম।

প্রথম গ্রামটি হলো গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার পূর্ব কেওয়া গ্রাম। এ গ্রামটি রাজধানীর কাছাকাছি এবং শ্রীপুর উপজেলার সংলগ্ন হওয়ায় অবকাঠামোগত সকল দিক দিয়ে শহরের মতোই উন্নত। তাছাড়া গ্রামটি ভাওয়ালের উঁচু পরগণায় অবস্থিত বিধায় এখানে বেশ কয়েকটি মিল-ফ্যাক্টরী, পোল্ট্রি খামারসহ নানা ধরণের শিল্প প্রতিষ্ঠান অবস্থিত রয়েছে এবং মানুষের জীবনযাত্রার মান অনেকটা উন্নত। গ্রামের লোকসংখ্যা ২৪১৬ (দুই হাজার চার শত ষোল) জন এবং পরিবারের সংখ্যা ৬২১ (ছয় শত একুশ) টি। এ গ্রামের মানুষের আধুনিক শিক্ষা ও চিকিৎসা সুবিধা তাছাড়াও অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন আশানুরূপ। নিচে গবষেণা কর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নির্বাচিত গাজীপুর জেলার মানচিত্রে (তীর চিহ্ন) শ্রীপুর উপজেলার পূর্বকেওয়া গ্রামটির অবস্থান দেখানো হলো:

চিত্র নং ১.২

দ্বিতীয় গ্রামটি হলো ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার মেদুয়ারী ইউনিয়নের মেদুয়ারী গ্রাম। এ গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন বলতে মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য দু'টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি দাখিল মাদ্‌রাসা রয়েছে। তিন বর্গ কিলোমিটারের মত বিদ্যুৎ অবকাঠামোর সুবিধা এবং প্রায় দু' কিলোমিটার পাকা রাস্তা রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য দিক দিয়ে প্রত্যন্ত গ্রাম বলতে যা বোঝায় তাই। গ্রামটির লোকসংখ্যা ৭২৬৫ (সাত হাজার দুই শত পয়ষট্টি) জন এবং ১৭৫৭ (এক হাজার সাত শত সাতান্ন) টি পরিবার রয়েছে। নিচে গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য

ময়মনসিংহ জেলার মানচিত্রে (তীর চিহ্ন) ভালুকা উপজেলার নির্বাচিত মেদুয়ারী গ্রামটির অবস্থান দেখানো হলো:

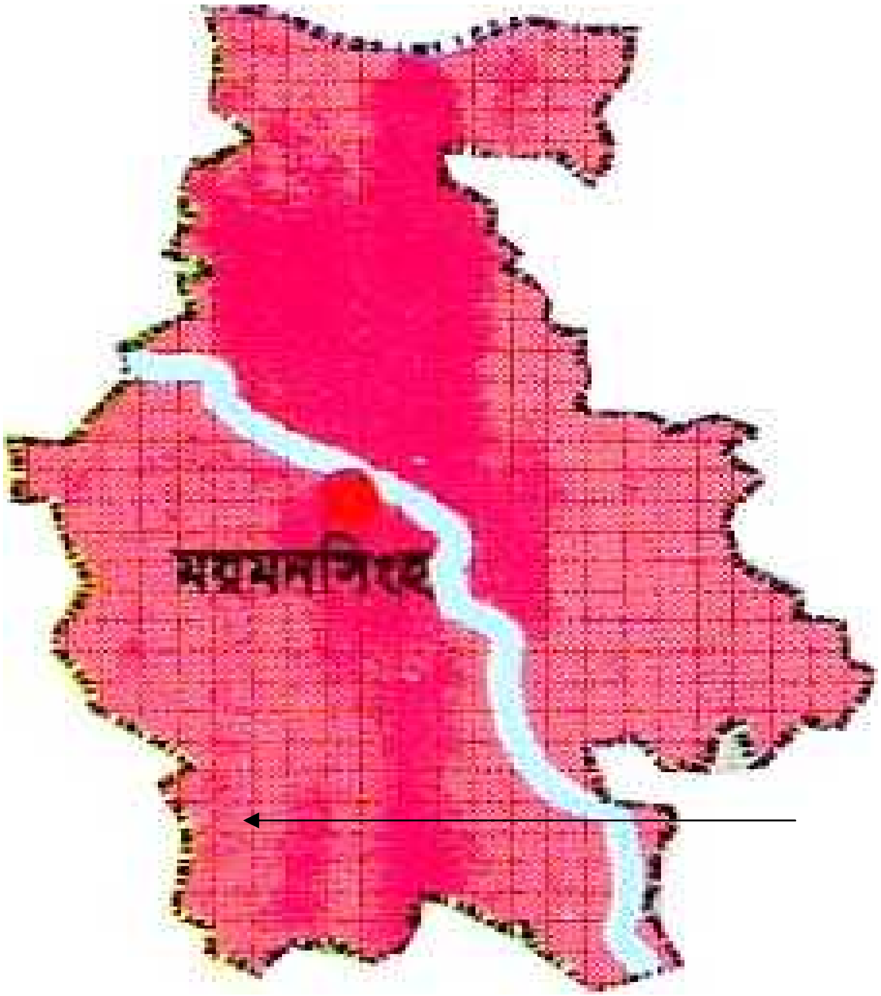

চিত্র নং ১.৩

তৃতীয় গ্রামটি হলো নওগাঁ জেলার আত্রাই উপজেলার সুদরানা গ্রাম। জেলা ও উপজেলা সদর থেকে বহুদূরে অজপাড়া গাঁয়ে গ্রামটি অবস্থিত। এ গ্রামে অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা বলতে একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় থাকলেও অন্য কোন প্রকার উন্নয়নের সংস্পর্শতা নেই। বর্ষাকালে নৌকা ও শুষ্ক মৌসুমে পায়ে হাটা ছাড়া মানুষের চলাচলের অন্য কোন সুবিধা নেই। এ গ্রামে লোকসংখ্যা ১২৮০ (এক হাজার দুই শত আশি) জন এবং পরিবারের সংখ্যা ২৫০ (দুই শত পঞ্চাশ) টি। গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য নিচে নওগাঁ জেলার মানচিত্রে (তীর চিহ্ন) আত্রাই উপজেলার নির্বাচিত সুদরানা গ্রামটির অবস্থান দেখানো হলো:

চিত্র নং ১.৪

তিনটি গ্রাম থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য পূর্ব থেকেই একটি প্রশ্নমালা তৈরী করা হয়। প্রতিটি গ্রামে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য তিন ধরণের লোক নিয়োগ করা হয়। যথা: ১) একজন পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ, ২) পাঁচজন মাঠ কর্মী ও ৩) একজন মহিলা মাঠকর্মী। মাঠ জরিপের পূর্বে গবেষক এবং পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ মাঠকর্মীদের প্রশ্নমালা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রশ্নমালা ভিত্তিক তথ্য উপাত্ত যোগাড় করা হয়। গ্রামের পরিবারগুলোর মধ্য হতে ১৫ ভাগ পরিবার কে দৈব চয়নের মাধ্যমে সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য নির্বাচন করা হয়।

গ্রামের মানুষের জীবন ধারণের মান নির্ণয় করতে যেয়ে যে সকল বিষয়গুলোর উপর গুরুত্বারোপ করা হয় তা হলো, ভূমির মালিকানা, চাষাবাদের মান, অবকাঠামোগত সুবিধা, যেমন: মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা), স্বাস্থ্য, যাতায়াত, বিদ্যুৎ, খাবারের মান (পুষ্টিকর, অপুষ্টিকর), পোষাক পরিচ্ছদ, নারীর জীবনযাত্রা, ঋণ গ্রহণ পদ্ধতি (সরকারী, বেসরকারী, মহাজন), ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা, মানুষের স্তরবিন্যাস ও পেশা ভিত্তিকজীবন ব্যবস্থা। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে মাঠকর্মীরা প্রথমত গ্রামে ঘুরে ঘুরে ১৫ টি পরিবারের সাথে পরিচিতি হন। তারপর ক্রমান্বয়ে প্রতিটি পরিবারে গমন করে পরিবার প্রধানের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেন। কোন কারণে পরিবারের প্রধানের সাক্ষাৎ না পেলে ঐ পরিবারের প্রধানের স্ত্রী অথবা ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। এভাবে পর্যায়ক্রমে মাঠকর্মী গণ নিখুঁত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের জন্য একাধিক বার উল্লেখিত পরিবারে গমন করেন।

তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজটি পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞ তত্ত্বাবধান করতে থাকেন। গবেষক গবেষণা কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ মত তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি দেখার জন্য নির্বাচিত গ্রাম গুলোর পরিবারের কাছে গমন করে মাঠকর্মী ও পরিসংখ্যান বিশেষজ্ঞের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে দীর্ঘদিন তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করে সাধারণীকরণের মাধ্যমে ফলাফল নির্ণয় করা হয়। এ ফলাফল গবেষণা কর্মের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

সীমাবদ্ধতা: তিনটি গ্রামের ১৫ ভাগ উত্তর দাতার নিকট হতে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের ভিত্তিতে প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের সকল গ্রামের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। সমীক্ষাটি সীমিত অর্থের আওতাভূক্ত থাকায় এবং সময়ের স্বল্পতার দরুণ গবেষণায় নমুনার পরিমান কম রাখতে হয়েছে। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে গিয়ে মাঠকর্মীরা বার বার দৈব চয়নভূক্ত দু'একটি পরিবারের কাছ থেকে ইচ্ছা থাকলেও তাদেরকে বাড়ীতে উপস্থিত না পেয়ে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করতে পারেননি। তাছাড়া অনেক সময় ব্যতিক্রম মন মানসিকতার দু' একজন লোক সঠিক তথ্য- উপাত্ত উপস্থাপন করেননি। এসব কিঞ্চিত সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও গবেষণায় তিনটি গ্রামের ভিন্ন ভিন্ন চিত্র সাধারণীকরণ করে যেহেতু ফলাফল সন্নিবেশ করা হয়েছে, তাতে কিছুটা বিচ্যুতি থাকলেও পুরো গবেষণাটি সফল হয়েছে বলে মনে করা হয়।

গবেষণার কর্মক্ষেত্র : পর্যবেক্ষণ ও তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, গ্রাম নিয়ে অদ্যাবধি বাংলাদেশে বহু গবেষণা কর্ম সম্পাদিত হয়েছে। কোন গবেষক একটি গ্রাম, কোন কোন গবেষক একাধিক গ্রাম, আবার কোন কোন গবেষক বাংলাদেশের গ্রাম গুলোর বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করেছেন। অবস্থা দৃষ্টে দেখা যায়, গবেষকগণ বিভিন্নভাবে গবেষণার কর্মক্ষেত্রের নক্শা অঙ্কন করে গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করেছেন। কারণ গবেষণার জন্য গবেষণার কর্মক্ষেত্র নির্বাচন করা একটি অপরিহার্য বিষয়। এ গবেষণায়ও তার ভিন্নতা ঘটেনি।

এ গবেষণার কর্মক্ষেত্রটি নির্বাচন করা হয়েছে "গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা।" উল্লেখ্য বাংলাদেশে ৬৮ (আটষট্টি) হাজার গ্রাম রয়েছে। সকল গ্রামের উন্নয়নের দৃশ্যপট এক রকম নয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে কিছু না কিছু বৈসাদৃশ্য রয়েছে। এ চিন্তা ধারাটি মাথায় রেখে পুরো বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী ও বাস্তবতার সঠিক ইতিহাস পাওয়ার জন্যই গবেষণা কর্মক্ষেত্রটি নির্বাচন করে তার নক্শা অঙ্কন করা হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশের ভৌগলিক সীমারেখার মধ্যে অবস্থিত গ্রাম গুলোর জন্য গৃহীত উন্নয়নের কর্মসূচী ও বাস্তবতার চিত্রটিই গবেষণার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

নিচে গবেষণার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের মান চিত্রটি দেখানো হলো:

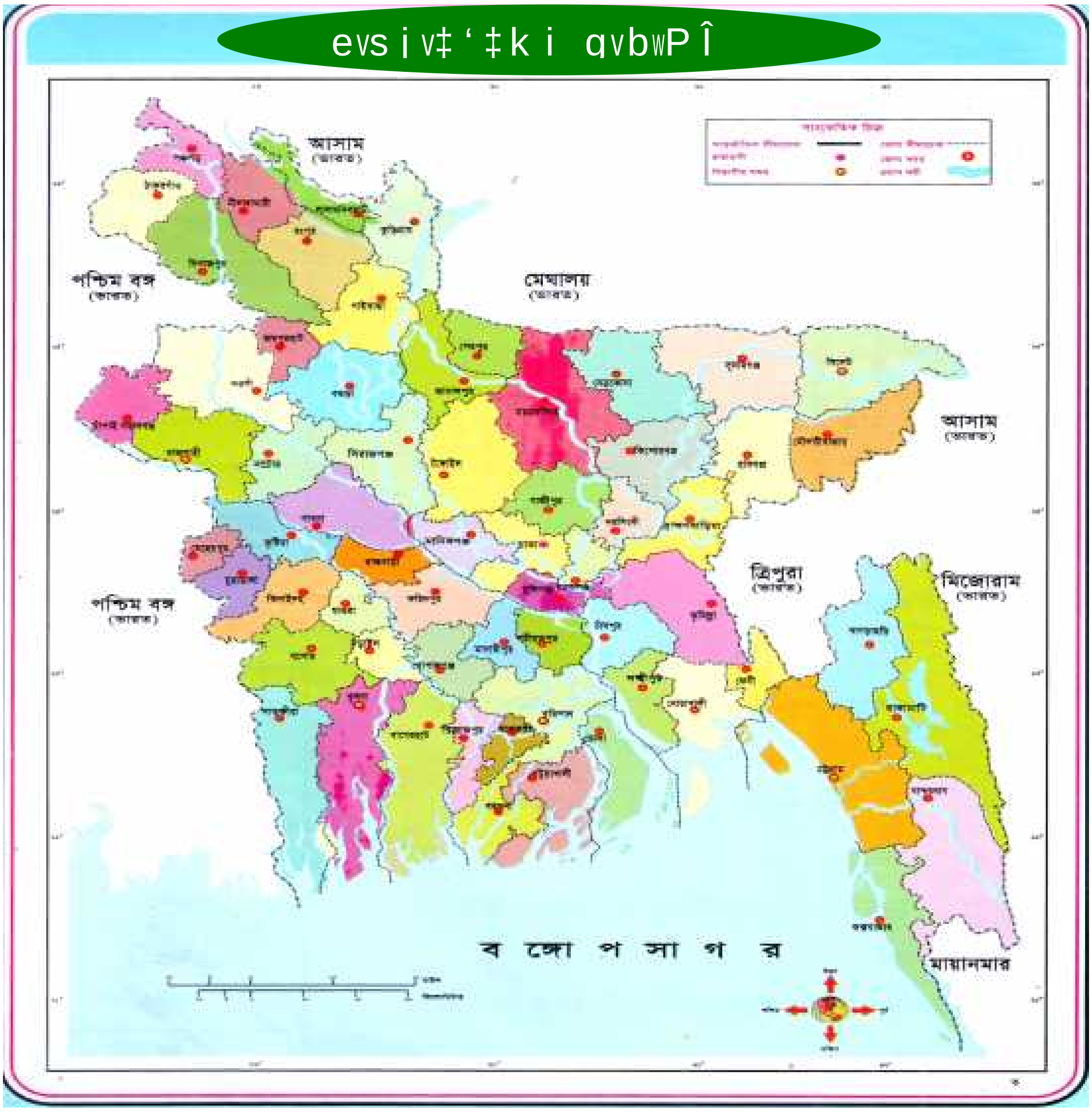

চিত্র:১-৫

যেহেতু গবেষণার শিরোনাম "গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা"এবং গবেষণার বিস্তৃতি ব্যাপক হওয়ায় এক্ষেত্রে কর্ম পরিচালনা দুঃসাধ্য বিধায় সহজ ভাবে গবেষণা কর্ম সম্পাদানের জন্য বাংলাদেশের তিনটি জেলার তিনটি গ্রামকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজে বেছে নেয়া হয়েছে। তবে গবেষণাকে পুরোপুরি সাফল্যমন্ডিত করার লক্ষ্যে আনুসাংগিক কিছু কিছু রসদ সংগ্রহের প্রয়োজনে গবেষককে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পর্যবেক্ষণের জন্য গমন করতে হয়েছে। সে দিকটি বিবেচনায় এনেই গবেষণার কর্মক্ষেত্র হিসেবে বাংলাদেশের মানচিত্রটিও দেখানো হয়েছে।

উপসংহার

গবেষকের কিছু সৃজনশীল লেখা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁকে গবেষণার প্রতি আগ্রহশীল করেছে। এ অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে গবেষক 'গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা' শিরোনামে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের (Hypothesis) উপর পর্যবেক্ষণ শুরু করেন। এক পর্যায়ে তিনি এর সত্যতা খুঁজে পান। পরবর্তীতে উপরোল্লিখিত শিরোনামে তিনি পিএইচ.ডি.গবেষণা চালিয়ে যেতে ব্রত হন। অন্যান্য গবেষকের মত তিনিও কিছু পদ্ধতিগত দিক নিয়ে গবেষণা কর্মটি উপস্থাপনে সচেষ্ট হন।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) সাইফুদ্দীন, ড. কাজী , পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান ও গবেষনা পদ্ধতি, ঢাকা: আবীর পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ, ১১।

২) প্রাগুক্ত পৃ, ১১।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১২।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১৩।

৫) প্রাগুক্ত পৃ, ১২।

৬) প্রাগুক্ত পৃ, ১৪।

৭) প্রাগুক্ত পৃ, ১৯।

৮) প্রাগুক্ত পৃ,২৪।

৯) Molla, Dr. Md. Gyasuddin, Village Government in Bangladesh, Dhaka: Publisher Ashraf, July-1992, P. 03.

১০) সাইফুদ্দীন, ড.কাজী, পরীক্ষণ মনোবিজ্ঞান ও গবেষণা পদ্ধতি, প্রাগুক্ত পৃ, ৪৭।

১১) প্রাগুক্ত পৃ, ৪৭।

১২) প্রাগুক্ত পৃ, ৪৮

১৩। Molla, Dr. Md.Gyasuddin, Village Government in Bangladesh, Ibid P, 05.

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পরিচিতি ও ক্রম-উন্নয়ন

দ্বিতীয় অধ্যায়

গ্রাম পরিচিতি ও ক্রম-উন্নয়ন

সূচনাঃ পূর্ববর্তী অধ্যায় আমরা গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন তাথ্যিক ও তাত্ত্বিক উপ-শিরোনাম নিয়ে আলোচনা করেছি। যেমনঃ গবেষণার সূচনা, আবশ্যকতা ও লক্ষ্য, অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, যৌক্তিকতা, গবেষণা প্রণালী, পরিকল্পনা গ্রহণ, তথ্য-উপাত্ত যোগান ও সীমাবদ্ধতা এবং কর্মক্ষেত্র ইত্যাদি। এ অধ্যায় সূচনা, গ্রাম পরিচিতি, গ্রামের উদ্ভব, গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্য সমূহ, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়ন; প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ, মুঘল আমল, বৃটিশ শাসন আমল, পাকিস্তান শাসন আমল, বাংলাদেশ শাসন আমল; যেমনঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল, লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমল, বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমল, শেখ হাসিনার শাসন আমল, গ্রামের শ্রেণি বিভাগ যেমনঃ উন্নত, স্বল্পোন্নত এবং অনুন্নত গ্রাম ইত্যাদি উপ-শিরোনাম নিয়ে নিচে আলোচনা করা হলোঃ

গ্রাম পরিচিতিঃ গ্রাম সম্পর্কে বিভিন্ন সমার্থক শব্দ রয়েছে, যেমন: গাঁ, গাঁও, গেয়ো, পল্লী, গ্রামীণ জনপদ ইত্যাদি। অভিধানের ভাষায় গ্রাম হলো æA collection of the houses in the country, smaller than a town.”[১] শ্যামল শোভায় শোভিত আবহমান বাংলার চিরায়িত রূপ তা এ দেশের গ্রামেরই রূপ। নন্দন, বিনন্দিত বন, উপবন, পুষ্প-পল্লব, আর বিহংগের কল ধ্বনিতে মুখরিত প্রকৃতির অনাবিল লীলা ভূমিই গ্রাম। সৌন্দর্য্য সম্ভারে পরিপূর্ণ পাখ-পাখালির দেশ আমাদের গ্রাম বাংলার এ দেশ। গাছে গাছে, বন-জঙ্গলে, পাহাড়-পর্বতে বাস করে বিচিত্র ধরণের পাখি। সকাল বিকালে পাখির কুজনে গ্রামে গ্রামে অনুরণিত হয় এক অপূর্ব সুরের মুর্ছনা। কবি গ্রাম গুলোকে যখন ছবির মত বলে আখ্যায়িত করেছেন, তখন বলা যায় এ রূপকে একটুও সম্প্রসারণ করে বলেননি। তাঁর ধারণা নবীন কলা গাছের পাতা সারাক্ষণ পত্ পত্ করে পতাকার মত নড়তে থাকে। আর নিঝুম প্রান্তরে পূণ্যবান তাপসের মতো স্থির দাঁড়িয়ে থাকে বয়স্ক বট গাছ। মানুষকে সে দান করে সুশীতল ছায়া। তাই কবি তাঁর কবিতার ছন্দে গ্রামের এমন দৃশ্যের বর্ণনা করে বলেন-

> “অবারিত মাঠ গগণ ললাটে চুমে তব পদ ধুলি
> ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রাম গুলি।”[২]

নদী মাতৃক এ দেশের গ্রামের আনাচে-কানাচে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাওর ও ছোট জলাশয়। বৈশাখ মাসে ছোট নদী গুলোর পানি শুকিয়ে যাবার সাথে সাথে ছেলেমেয়েরা যে ভাবে মাছ ধরে তার চিত্রাঙ্কণ করে কবি গুরু তাঁর কবিতার পংক্তিতে উল্লেখ করেন-

Dhaka University Institutional Repository

" সকালে বিকালে কভু নাওয়া হলে পরে
আঁচলে ছাঁকিয়া তারা ছোট মাছ ধরে।"[৩]

সবুজ গাছ গাছালির সমাহারে ঘেরা এবং এরই ভিতর দিয়ে মাঠ-প্রান্তর পেরিয়ে চলমান অবারিত মেঠো পথ এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঢুকে মানুষের যাতায়াতকে সহজ সাধ্য করে। এ পথ চলা রাস্তা গুলোর দৃশ্য পটে মুগ্ধ হয়ে কবি গুরু আবারও গানের সুরে গেয়েছেন -

"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ,
আমার মন ভুলায় রে!"[৪]

গ্রামের টেক-টিলা, পাহাড়ের পাদদেশ, নদীর কিনার এবং মাঠে মাঠে লক লকে সবুজ ঘাসে রাখালের চড়ানো গরু, ছাগল ও ভেড়ার পাল যেন প্রকৃতিরই রূপ। এরই মাঝে রাখালের বাঁজানো বাঁশির সুর মানব হৃদয়কে মোহিত করে। অপর দিকে বৈকালের আকাশে দল বেঁধে নদী থেকে কাঙ্খে কলসী বয়ে পানি আনা তরুণীরাও যেন ঐ দৃশ্যে একাকার হয়ে যায়। স্বদেশের এমন সৌন্দর্য্যে উদ্বেলিত হয়ে কবি অবতারণা করেছেন–

"এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সেযে আমার জন্মভূমি।" [৫]

বাংলাদেশের মানুষের শতকরা ৮০ জন বাস করে নিভৃত পল্লীতে। অভাব-অনটন ও দারিদ্র্যতার ছোবলে গ্রামের মানুষগুলো জর্জরিত। গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এবং পুকুর ভরা মাছ পল্লী জনপদে আজ যেন রূপ কথার স্বপ্নপুরী। পল্লী কবি জসীম উদ্দীন তাঁর কবিতায় গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কারও কারও জীবনযাত্রার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে –

"বাড়ি তো নয় পাখীর বাসা, ভেন্না পাতার ছানি
একটু খানি বৃষ্টি হলেই গড়িয়ে পড়ে পানি।"[৬]

এ পল্লীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে আমাদের কৃষি, আমাদের কৃষ্টি, আমাদের সভ্যতা। কিন্তু বর্তমান সভ্যতা শহর উন্নয়নে ধাবিত হয়ে পল্লীকে একেবারে অবহেলিত করে রেখেছে। শহরের পুঁজিবাদী জীবন ব্যবস্থার সর্বনাশা স্রোত কেড়ে নিয়েছে গ্রামের সুনিবীড় শান্তির নীড়। গ্রামগুলো আজ শ্মশাণে পরিণত হয়েছে। গ্রামের মানুষ শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের মধুময় স্মৃতি মুছে ফেলে বাঁচার তাগিদে পঙ্গপালের মত ছুটছে শহর পানে। পল্লী আজ অরক্ষিত, বসবাসের অযোগ্য।

বাংলাদেশের স্বল্পসংখ্যক গ্রামের মানুষ বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত সুবিধা ভোগ করলেও বাকী গ্রামের মানুষের জীবন ব্যবস্থা সূর্যাস্তের সাথে সাথে অন্ধকারের গহীনে তলিয়ে যায়। মনে হয় এ জনপদ যেন সভ্য জগতের কোন অংশ নয়। দুর্নীতিবাজদের শোষণে সরকারের গ্রাম উন্নয়নমূলক

সংশ্লিষ্ট কর্মসূচীগুলো বেশীর ভাগই আলোর মুখ না দেখে আবহমান কাল ধরে তিমিরেই লুকোচুরি খেলছে।

গ্রামের উদ্ভব: গ্রামের উদ্ভব কখন হয়েছে সে সম্পর্কে ইতিহাস থেকে সঠিক কোন তথ্য পাওয়া যায় না। তবে অনুমান করা হয়, গ্রাম উদ্ভবের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি মানুষকে বেশী প্রভাবিত করেছিল তা হলো খাদ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে সংগঠিত বা দলবন্ধ হওয়া। এর আগে মানুষ যখন বিচ্ছিন্নভাবে একা একা শিকার করতো তখন তাদের ভাগ্যে কখনও শিকার মিলত কখনও বা শিকার মিলত না। হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণের ভয় ও নিরাপত্তা হীনতার বিষয়টিও ছিল বড় ধরণের সমস্যা। ফলে ভুখা (Hungry) থেকে মানষকে কষ্টকরভাবে জীবনযাপন করতে হতো। কালের আবর্তনে, এদের মধ্যে থেকে দু'এক জন জ্ঞানী লোক একা একা শিকারের চেয়ে সংগঠিত বা দল বন্ধ হয়ে শিকার করার প্রয়োনীয়তা উপলব্ধি করে। সংগঠিত হবার পর তারা বড় বড় পশু বধ সহ ফলমূল ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী পূর্বের তুলনায় বেশী সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। এতে তারা তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খেয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণে সংগঠনের সুফল অনুভব করে। আগের অমসৃণ হাতিয়ার গুলো ঘসে-মেজে মসৃণ করে তারা আরও বেশী শিকার করতে সক্ষম হয়। পর্যায়ক্রমে সংগঠনের ঐক্য অটুট রাখার জন্য প্রয়োজন হয় সুশৃঙ্খলতা এবং দেখা দেয় নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা। সাধারণত: বুদ্ধিমান লোকের উপর নেতৃত্বের দায়িত্ব অর্পিত হয়। নেতার আদেশ, উপদেশ মত তারা কাজ করতে থাকে। কেহ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে নেতার আদেশে তাকে তিরস্কার, এমনকি কখনও কখনও অপরাধ অনুযায়ী শারীরিক শাস্তিও প্রদান করা হতো। সুশৃঙ্খল জীবনযাপনের সুফল ভোগ করার ফলে তারা সভ্যভাবে চলার শিক্ষা লাভ করতে থাকে। "মহিলারাও অলস জীবনের পরিবর্তে পুরুষদের পাশাপাশি কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বিশেষ করে তারা বসত এলাকার আশে পাশে কৃষিজ ফসল, ফলমূল ও শাক-সব্জি উৎপাদনে পুরুষদের আগেই নিজেদের নিয়োজিত করে।"[৭]

নারীর কাছ থেকে কৃষি ফসল উৎপাদনের কৌশল শিক্ষা গ্রহণ করে পরবর্তীতে পুরুষরাও আর পশু বধ ও অন্যান্য খাবারের উপর নির্ভরশীল না থেকে কৃষি ফসল উৎপাদনে নিজেদের শ্রম বিনিয়োগ করে। তারা দূরে গিয়ে কষ্টকর শিকার করার চেয়ে নিজেরা বসত এলাকায় কৃষি ফসল উৎপাদনে মহিলাদের সাথে একত্রে কাজ করতে থাকে। এতে সহজেই তারা খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়।

"কৃষি প্রবর্তনের পর মানুষ আর শিকারী অথবা খাদ্য সংগ্রহক থাকে না। সে আগের মত মাঠে ঘাটে ভ্রমণ করেনা। স্থায়ী বসতি সম্ভব হয়। এর ফলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম গড়ে উঠে, যেখানে ইতিহাসের প্রথম বাস গৃহ নির্মিত হয়। মানুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে শিখে। বসতির

আরাম-আয়েশ ও নিরাপত্তার জন্য মানুষ আইন প্রণয়ন করে এবং তা মেনে চলে। দল, নেতৃত্ব ও সংগঠন, যা পরবর্তীতে সরকার পদ্ধতিতে উন্নীত হয়।"[৮]

সভ্যতার ক্রম-উন্নতির সাথে সাথে সংগঠনের প্রসারতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। আইনকানুন মেনে চল্‌লে জীবন চলার পথ সহজ হয়, এ ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। আইন কানুনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় বুদ্ধিমান নেতার উপর। অঞ্চল ভিত্তিক নেতার গোষ্ঠী এবং অন্যান্য লোকেরা তার (নেতার) আদেশ উপদেশ তালিম করতে করতে এলাকায় নেতার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে নেতার নেতৃত্বে প্রভাবিত হয়ে মানুষ এক একটি একক (Unit) গড়ে তোলে। এ একক (Unit) গুলোই পরবর্তীতে গ্রাম নামে পরিচিতি লাভ করে।

গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ (Characteristics of the Village): বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন কেন বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে তার আদি কথা ইতি কথা বিশ্লেষণ করলে কিছু বৈশিষ্ট্য সবার সম্মুখে পরিস্ফুট হয়ে উঠে। গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে ক্রমান্নয়ে আলোচনা করা হলো:

অসচেতন (Unconscious) : বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের দৃশ্যপট যাচাই করলে দেখা যায়, জনগণ নিজেদের অধিকার-কর্তব্য সম্পর্কে অসচেতন। গ্রামে যে সকল মানুষ সচেতন তারা প্রায় সবাই শহরে গিয়ে বিলাস বহুল জীবনযাপনে অভ্যস্থ। বিলাস বহুল জীবনযাপন রেখে গ্রামে গিয়ে মানুষকে সচেতন করে গ্রামোন্নয়নের জন্য তারা মাথা ঘামানো প্রয়োজন বোধ করেন না। বরং অসচেতন এ জন গোষ্ঠী অনুন্নত জীবনযাপন করে তাদের বিলাস বহুল জীবনে হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। গরীব বর্গাদাররা ধনী কৃষকদের চাষাবাদকৃত জমির উৎপাদিত ফসল বিক্রয় করে, বিক্রয় লব্ধ অর্থ নিজেরাই বহন করে শহরে বসবাসরত ধনী লোকদের কাছে পৌঁছে দেয়। এ সকল অশিক্ষিত, অসচেতন, দরিদ্র মানুষ গ্রামোন্নয়নের কলা-কৌশল সম্পর্কে কোন ধারণা রাখে না। গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন সম্বন্ধে তাদের কোন চিন্তা চেতনা কাজ করেনা। জনপ্রতিনিধি এবং সরকারী কর্তকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তাদের নেই। দু'এক জন এ ব্যাপারে এগিয়ে আসলেও জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তারা পকেটে কিছু ঢুকিয়ে দিলে তারাও প্রতিবাদের পরিবর্তে ঐ সকল অন্যায়কারীদের পকেটের লোক হয়ে যায়।

জনগণকে সংগঠিত করে গ্রামোন্নয়নের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলার মত 'ক্যারিসমেটিক' কোন নেতা গ্রামগুলোতে এখনও জন্ম গ্রহণ করেননি । আবার কেহ কেহ দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলে জনপ্রতিনিধিরা থানার সাথে যোগাযোগ করে বিনা অপরাধে পুলিশের লোকজনের মাধ্যমে তাদেরকে গ্রেফতার করে থানা নিয়ে জালিয়াতি মামলা দিয়ে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করেন। আদালতের রায়ে অনেককে জেল হাজতে বসবাস করতে হয়। কোন কোন সময়

Dhaka University Institutional Repository

শরীরিকভাবেও প্রতিবাদকারীকে নির্যাতন করা হয়। এতে পরিবারের লোকজনকেও বহু খেসারত দিতে হয়।

তাই গ্রামোন্নয়নের পিছনের বাধা বিপত্তি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, যত দিন না পুরো গ্রামের মানুষ সচেতন ও সংগঠিত হয়ে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করবে ততদিন গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে না।

সহজ সরল (Simplicity) : গ্রামের মানুষের জীবনযাপন অত্যন্ত সহজ সরল। তারা সহজেই মানুষকে বিশ্বাস করে। জীবন চলার পথে কোন কুট-কৌশল অবলম্বন করা সম্পর্কে তারা একেবারেই অজ্ঞ। কোন অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা থেকে সব সময় নিজেরা বিরত থাকে। সরলতার সুযোগে অসৎ মানুষগুলো তাদের (গ্রামের মানুষকে) নানা ভাবে প্রতারিত করে থাকে। প্রতরণা শিকার হয়ে অনেক সময় তারা জমা-জমি, ভিটে-বাড়ী হারিয়ে নি:স্ব হয়ে যায়। কোন প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা সম্পর্কে সহজ, সরল মানুষ গুলোর ধারণা নেই। তারা নীতি বাক্যে অকপট থাকে এবং মানুষের সাথে অমায়িক আচার-আচরণ করে থাকে। ঝগড়া-ফ্যাসাদ, মামলা-মোকদ্দমাকে তারা ভয় পায়। সাদা-সিদে পোশাক পরিচ্ছদ পরিধান করে। শিক্ষিত লোককে সম্মান করে এবং তাদের সাথে হাসি মুখে কথা বলে। কেহ কোন কিছু চাইলে লজ্জা-শরমের ভয়ে তা দিয়ে দেয়। কারও সাথে কোন ওয়াদা করলে তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে চেষ্টা করে। তারা কোন অপরিচিত লোককে নিজের ঘরে ঘুমাতে দিয়ে নিজেরা বাইরে ঘুমিয়ে থাকে।

শহরের লোকদের তারা প্রচুর সম্মান করে। আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি থেকে তারা অনেকটা দূরে। ছেলেমেয়েদের বিবাহ অনুষ্ঠানে জমা-জমি বিক্রি করে অবাধে অর্থ খরচ করার ফলে অনেক পরিবারকে নি:স্ব হয়ে যেতে দেখা যায়। গ্রামে এখনও অনেক মানুষ গায়ে জামা না পরে, কাঁধে ঝুলিয়ে এবং জুতা পায়ে না পরে তা হাতে নিয়ে কোথাও ভ্রমণ করে। এসব লোকেরা কাঁধে সব সময় একটি গামছা ঝুলিয়ে রাখাকে কৃতিত্ব মনে করে। তারা বাঁশের বাহক কাঁধে ঝুলিয়ে জিনিষ পত্রের ভার বহন করে। মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে বিশ্বাসী গ্রামের মানুষ দেশের প্রচলিত আইন-কানুনের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল। আইন ভঙ্গ করে জেল-হাজতে যাওয়াকে তারা খুব ভয় পায় এবং অসম্মানজনক মনে করে। অনেক পরিবার ছেলে মেয়েকে স্কুলে না পাঠিয়ে কৃষি কাজে সম্পৃক্ত করে। তারা এও বলেন তাদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখলে সরকারী চাকরী পাবে না। সুতরাং তারা ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পরিবর্তে কৃষি ক্ষেত্রে বা অন্য কোন জায়গায় শ্রম বিক্রি করে দু'পয়সা উপার্জন করতে উৎসাহ প্রদান করে। গ্রামোন্নয়নের কর্মসূচী সম্পর্কে তাদের কোন ধারণা নেই। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন প্রশ্ন করলে, তারা বলে এটি সরকারের কাজ।

ধর্মীয় গোঁড়ামী (Fanaticism) : ধর্মীয় গোঁড়ামী গ্রামীণ সমাজের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রোথিত। ধর্মীয় মহান ভাবাদর্শের সঠিক ব্যাখ্যার পরিবর্তে গ্রামের কাটমোল্লা নামে পরিচিতি আলেম সমাজ ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে মানুষের সামাজিক বিকাশ বাধাগ্রস্থ করছে। এক্ষেত্রে বেশী শিকার হয় গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নারী সমাজ। এ সমাজের দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসচেতন নারীদের বিবাহ, তালাক, পর্দা, ঘরের বাইরে কাজ কর্ম আলেম সমাজের বেশী গোচরীভূত হয়। আলেম সমাজ অন্ধ ধর্ম বিশ্বাসী গ্রামের লোকদের সংগঠিত করে ফতোয়া দিয়ে থাকে এবং তদনুযায়ী সালিশের মাধ্যমে বিচারকার্য পরিচালনা করে। কোন কোন সময় দরিদ্র মেয়েদের তালাকের ক্ষেত্রে ফতোয়া দিয়ে কাট মোল্লারা মেয়েদের মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে থাকে। এতে অনেক 'Victim' মেয়ে মৃত্যু বরণ করে। কেহ বেঁচে থাকলেও অপমানের দুঃসহ জ্বালা সহ্য করতে না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করে। কখনও কখনও মেয়ের পিতা মাতাকেও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিযুক্ত করে শারীরিক নির্যাতন করা হয় এবং গ্রাম থেকে বের করে দেয়া হয়। এভাবে অনেক পরিবার গ্রাম ছাড়া হয়ে সহায় সম্পত্তি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপনকরে থাকে। সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন না করে ফতোয়া দেয়া সর্বোৎকৃষ্ট ইসলাম ধর্ম মোটেই সমর্থন করে না। কিন্তু এ সমাজেরই প্রভাবশালী শিক্ষিত সচেতন শ্রেণির লোকদের বিপক্ষে অনুরূপ কর্মের জন্য গ্রামের আলেম সমাজ কোন ভূমিকাই রাখেন না। তারা ঐ সমাজের নারীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ফতোয়া দেয়ার সাহস পান না।

ইসলাম ধর্মে অপরাধের জন্য ধনী-দরিদ্র যেই হউক না কেন, সকলের জন্য সমান শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কাটমোল্লাদের ফতোয়া সম্পর্কে পরবর্তীতে বিজ্ঞ আলেমগণ তা অসত্য প্রমাণ করেন। অন্যায় কাজের জন্য ফতোয়াবাজদের আইনের আওতায় আনা হলে, এহেন কর্ম করা তাদের ভুল হয়েছে বা কারও কাছে শুনে এমন কাজ করেছেন বলে স্বীকার করে।

বংশ মর্যাদা (Clan Dignity) : বংশ মর্যাদা নিয়ে গ্রামের মানুষ খুব বেশি রশি টানাটানি করে। চৌধুরী, শাহ্, খান, মোড়ল, পাঠান, মিয়া, ফকির, তালুকদার, শেখ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি বংশে জন্ম গ্রহণকারী লোকেরা নিজেদের খুব গর্বিত মনে করে। তাঁরা অন্য বংশের লোকদের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। কোথাও কোন লোকের সাথে পরিচয় দিতে গিয়ে অমুক বাড়ীর, অমুক বংশের লোক বলে পরিচিতি দিয়ে থাকে। তাঁরা আলাদা সমাজ গঠন করে ধর্মীয়সহ অন্যান্য আচার অনুষ্ঠানাদি পালন করে থাকে। অন্য বংশের লোকদের তাঁরা হেয় চোখে দেখে। প্রয়োজন ছাড়া তারা নিচু বংশের লোকদের সাথে কমই মিশে থাকে।

গ্রামের নিরীহ মানুষ গুলো বংশ মর্যাদাবান লোকদেরকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে। বংশ মর্যাদার গর্ব অবশ্য আগের তুলনায় গ্রামে এখন অনেকটা কমতে শুরু করছে। কোন কারণে উঁচু বংশের সাথে

Dhaka University Institutional Repository

নিচু বংশের কোন ছেলে মেয়ে নিজস্ব মতামতে বিয়ে-শাদী হলে নিচু বংশের ছেলে মেয়ে, তার পিতামাতা বা গোষ্ঠীকে উঁচু বংশের লোকেরা হুমকি এমনকি শারীরিকভাবে উৎপীড়ন করে থাকে। হাট বাজার, বিচার-সালিশ বা অন্য কোন জনপদে উঁচু বংশের লোকদের কথা সহজ সরল গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিশেষভাবে মান্য করে। সাধারণ লোকেরা বংশীয় মর্যাদাবান লোকদের নামের পরিবর্তে বংশের নাম নিয়ে ডাকেন। যেমনঃ খান সাহেব, তালুকদার সাহেব, ঠাকুর মহাশয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এতে বংশীয় লোকেরা পুলকিত হয়ে গর্ববোধ করেন। স্কুল-কলেজে অধ্যয়নরত উঁচু বংশের ছেলে-মেয়েদেরকে পিতামাতা নিচু বংশের ছেলে মেয়েদের সাথে মিশতে নিষেধ করে। এমনিভাবেই গ্রাম বাংলার প্রতিনিধিত্বকারী বংশ মর্যাদাবান পরিবারগুলো নিজেদের জাহির করে থাকে। যা গ্রামীণ জীবনের সার্বজীনতার প্রতি হুমকি স্বরূপ।

গোষ্ঠী-গোষ্ঠী অন্তর্দ্বন্ধ (Clans Schism) : গোষ্ঠী-গোষ্ঠীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব গ্রামগুলোতে আবহমানকাল ধরে চলে আসছে। কোন তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এতে জান মালের ব্যাপক ক্ষতি সাধন, সংঘর্ষে বাড়ী ঘর জ্বালিয়ে দেয়াসহ জমির ফসল নষ্ট পর্যন্ত হয়ে থাকে। ফলে মামলা-মোকদ্দমা, থানা পুলিশের হয়রানিতে গ্রামের লোকদের জীবনযাত্রা দারুণভাবে বাধাগ্রস্থ হয়। এসব কর্মকান্ডের পিছনে অর্থ ব্যয় করে কোন কোন পরিবার চিরদিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে। এতে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

এমন দ্বন্দ্বের উৎস হলো, কোন যুগে পূর্ব পুরুষদের (Predecessors) মধ্যে এক গোষ্ঠী অন্য গোষ্ঠীর সাথে সামান্য বিষয়ে একটু ঝগড়া হয়েছিল। তার রেশ ধরেই প্রতিশোধ গ্রহণের স্পৃহায় তারা (গ্রামবাসী) প্রায়ই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে এ সংক্রান্ত ঘটনা নিত্য নৈমিত্তিক। এমন কোন্দলের চিত্র নিচে দেখানো হলো:

চিত্র-নং ২.১

সংঘর্ষ কোন কোন সময় বিচ্ছিন্ন ভাবে দিন বা মাস ব্যাপী চলতে দেখা যায়; যা গোষ্ঠী গুলোকে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে উন্নয়নের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে। এসব দ্বন্দ্ব অনেক সময় সামাজিক থেকে রাজনীতিতে মোড় নেয়। ফলশ্রুতিতে কোন গোষ্ঠীর আদর্শের দল সরকার গঠন করলে তারা অপর রাজনৈতিক দলের আদর্শে অনুপ্রাণিত গোষ্ঠীর লোকদের গ্রামছাড়া করে দেয়। ফলে তাদেরকে যাযাবরের মত জীবনযাপন করতে দেখা যায়।

অনুরুপভাবে অপর মতাদর্শের রাজনৈতিক দল ক্ষমতায় আসলে তারাও উহার প্রতিশোধ গ্রহণে একই পন্থা অবলম্বন করে। পরবর্তীতে এক গ্রাম অন্য গ্রামের প্রতিপক্ষে পরিণত হয়। এসব ঝগড়া মোকাবেলা করতে প্রশাসন ম্যাজিষ্ট্রেট সহ পুলিশ বাহিনী পাঠিয়ে থাকেন। পুলিশের গুলিতে কোন কোন সময় হত্যাকান্ডও সংঘটিত হয়।

প্রভাবশালীদের আধিপত্য (Supremacy of Influentials) : গ্রামের প্রতিটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবশালীদের আধিপত্য লক্ষ্য করা যায়। বিচার-সালিশ, বিবাহ অনুষ্ঠান, জমা-জমি

বিক্রি, সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বক্ষেত্রেই প্রভাবশালীদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে সম্পন্ন হয়ে থাকে। তারা কোন জায়গায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে গ্রামের অপরাপর নিরীহ জনগণের দ্বারা ঐ কার্য সম্পাদন করা সম্ভব হয় না। মত প্রকাশ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গরীব, নিরীহ মানুষ কখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। যদি করে, তবে তারা প্রভাবশালীদের দ্বারা দারুণ ভাবে তিরস্কৃত হয়। কোনো কোনো সময় সমাজ থেকে বের করে দেয়া সহ শারীরিক শাস্তি ভোগ করতে হয়।

গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গকে উপেক্ষা করা মানেই চরম বেয়াদবির সামিল হওয়া। গ্রামের সাধারণ নিরীহ জনসাধারণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে নীরব ভূমিকা পালন করে। তারা প্রভাবশালীদের শরাণাপন্ন হয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রভাবশালীদের এহেন কার্যকলাপ সাধারণ গ্রামবাসীদের ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

কুৎসা রটনা (Discredit Publicity) : কুৎসা রটনা গ্রামের মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এক জন মানুষের ভুল ত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। কারও ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে গ্রামের মানুষের নাগ গলানো একটি স্বভাবজাত অভ্যাস। কোন দম্পতি ঝগড়া করলে, কোন ছেলেমেয়ে ইচ্ছামত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলে গ্রমের মানুষ তা গ্রামব্যাপী রটিয়ে বেড়ায়। এ ধরণের ঘটনা প্রকাশ করাকে তারা গর্ববোধ মনে করে এবং যতক্ষণ না একজন অন্য জনের কাছে তা প্রকাশ করে ততক্ষণ তার ঘুম হারাম হয়ে যায়। যার বিপক্ষে এমন কুৎসা রটনা করা হয়, সে লজ্জা বোধ করে এবং ঘর হতে বের হওয়ার সাহস পায় না। এভাবে মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপারে দোষ রটনাকে গ্রামের মানুষ কৌতুহল হিসেবে দেখে। যা নিজেদের অজ্ঞতাকেই প্রকাশ করার শামিল। কোন কোন সময় এমন কুৎসা রটনার অপমানের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অনেককে আত্মহত্যা করতেও দেখা যায়।

লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Discrimination) : লিঙ্গে বৈষম্য সৃষ্টি করা গ্রামের মানুষের চিরাচরিত অভ্যাস। পুত্র সন্তান এবং কন্যা সন্তানকে পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন তথা গ্রামের মানুষ ভিন্ন দৃষ্টি কোণ থেকে দেখে। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করাকে তারা অভিশাপ হিসেবে এবং ছেলে সন্তানকে আশির্বাদ হিসেবে মনে করে। একজন কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণ করা মানেই পিতামাতা মনে করেন তাদের উপর একটি বিপদ নেমে এসেছে। এ সন্তানটি বসিয়ে বসিয়ে ভরণ পোষণ করা পরিবারের জন্য বাড়তি একটি চাপ। তাছাড়া কন্যা সন্তানটি বড় হওয়ার পর বিবাহ-শাদী দেয়া কষ্টকর ব্যাপার বটে। কন্যা সন্তান পিতমাতার আয়-রোজগার বা উৎপাদনে কোনই কাজে আসে না। বিবাহের পূর্ব পর্যন্ত তাকে দেখভালে অতিরিক্ত চিন্তা করতে হয়। কন্যা সন্তানের খাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদেও পিতামাতা বৈষম্যের দৃষ্টিতে দেখে। গ্রামের সাধারণ পরিবারগুলো কন্যা সন্তানের জন্য

Dhaka University Institutional Repository

ভাল পোশাকের পরিবর্তে কোন রকমে লজ্জা নিবারণে অতি সাধারণ পোশাক দিয়ে থাকে। রোগ-শোকে আধুনিক ডাক্তার দেখানো পরিবর্তে ঝাঁড়-ফুঁক দিয়ে দায়িত্ব শেষ করে।

সন্তান সম্ভাব্য পিতামাতার সব সময় কামনা থাকে তাঁদের আগত সন্তানটি যেন পুত্র সন্তান হয়। পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ মাত্রই তারা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। বড় হয়ে সে পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে পিতামাতার সংসারের হাল ধরবে। তাদের অভাব অনটন দূর হবে। ছেলেকে বিয়ে দিয়ে তার শ্বশুর বাড়ী থেকে যৌতুক হিসেবে অনেক আর্থিক সুবিধা পাওয়া যাবে। পিতা মাতা পুত্র সন্তানটিকে মেয়ে সন্তানের পাশেই পুষ্টিকর খাবার দেয়। প্রয়োজনে মেয়েকে রেখে ছেলেকে বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকে। অথচ বর্তমান জগতে ছেয়ে-মেয়ে উভয়ই উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এমন লিঙ্গ বৈষম্যই গ্রামোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির পূর্ব শর্ত হিসেবে কাজ করে।

জনসংখ্যার ঘনত্ব (Density of Population) : আমাদের মত ছোট একটি রাষ্ট্রে জনসংখ্যার এত ঘনত্ব যা পৃথিবীর আর কোন দেখা যায় না। তবে জনসংখ্যার ঘনত্বের এ হার শহরের চেয়ে গ্রামে অনেক বেশী। অবশ্য কেহ কেহ মনে করেন জনসংখ্যা যে কোন দেশের সম্পদ। জনসংখ্যা বেশি হলে তা বিভিন্ন খাতে (Sector) উৎপাদন কার্যে ব্যবহার করা যায়, দেশ সমৃদ্ধি লাভ করে। কিন্তু বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্বের ঐ ধারণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। জন্মগ্রহণের পর গ্রামের একজন শিশু খাবারে যে পরিমান খাদ্য প্রাণ (Calorie) পায় তা শরীরের চাহিদা পূরণের চেয়ে অনেক কম। তাই দরিদ্র পরিবারের শিশুরা প্রায় সারা বছরই রোগ-শোকে ভোগে বর্ধিত (Growth) হয়ে যৌবনে পৌঁছে। শরীরে প্রয়োজনীয় শক্তি না থাকায় তারা অন্য দেশের মানুষের তুলনায় দুর্বল থাকে।

গ্রামগুলোতে বাল্য বিবাহের দরুণ একজন দম্পত্তি সন্তানের ভরণ-পোষণের সামর্থ্যের তুলনায় অধিক বেশি সন্তান জন্ম দেয়ায় তাদের যথোপযুক্ত যত্ন নিতে পারে না। আবার ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে একজন পুরুষ একাধিক বিয়ে করায় শিশু জন্ম হার বেড়ে যাওয়ায় জনসংখ্যার ঘনত্ব ক্রমাগত ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্পদের তুলনায় জনসংখ্যা অনেক গুণ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পদে পদে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়, "পরিবার পরিকল্পনায় প্রায় ৪২.৫ ভাগ সক্ষম দম্পতি কোন ধরণের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করে না। ৫৭.৫ ভাগ জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেও গ্রামের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও বিনামূল্যে সরকারী সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব উপকরণ সংগ্রহ করাই মানুষের জন্য বড় সমস্যা।"[৯]

অশিক্ষা (Illiteracy) : স্বাধীনতা অর্জনের পর বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে শিক্ষার হার বাড়লেও তাতে আশানুরূপ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশের শিক্ষার হার শহরের তুলনায় অনেক কম। সরকার ও N.G.O-দের প্রচেষ্টায় ইদানীং গ্রামে শিক্ষার হার অবশ্য বেড়ে চলছে। একটি জাতির উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হলো শিক্ষা। প্রবাদ বাক্যে আছে, 'শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না।' গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার প্রধান বাহন হলো কৃষি। কিন্তু বাংলাদেশের কৃষকরা অশিক্ষিত থাকায় কৃষিতে কাঙ্খিত ফল বয়ে আনতে পারছেন না।

শিক্ষা উপকরণের ক্রয়মূল্য বেশি এবং কৃষকের সীমিত আয় ও একাধিক সন্তান থাকায় সকল সন্তানের শিক্ষার ব্যয় বহন করা তাদের (কৃষক) পক্ষে সম্ভব হয় না। গ্রামের বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা চাহিদা মত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে না পারায়, অশিক্ষিত কৃষকরা শিক্ষার পরিবর্তে সন্তানদের কৃষি বা অন্য কোন কাজে নিয়োজিত করে পরিবারের আয় বাড়নোর বেশি পক্ষপাতি।

বেকারত্ব (Unemployment:) : বেকার সমস্যা গোটা দেশের সমস্যা হলেও গ্রামে এ সংখ্যা অনেক বেশি। জনসংখ্যার অনুপাতে গ্রামে বিভিন্ন বয়সের বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী। এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিদেশে এবং শহরে গিয়ে মাত্র কিছু কিছু বেকার আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলেও বাকী শিক্ষিত, অশিক্ষিত বেকাররা কর্মসংস্থানের সুযোগ হতে বঞ্চিত। একটি নির্দিষ্ট সময়ে কৃষি কাজ করে বাকী সময় তারা ঘরে বসে সময় কাটায়। বেকারদের আয় উপার্জন না থাকায় তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে নানা প্রকার অসামাজিক কার্যকলাপের সাথে জড়িত হয়ে গ্রামে অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করে। যেমনঃ মাদকাসক্ত, চুরি, ডাকাতি, দালালী-প্রতারণা, সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়া ইত্যাদি।

অলস জীবন (Idle Life) : অলস জীবনযাপনকরা গ্রামের মানুষের একটি স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য। কৃষিকাজ শেষ করে ফসল পাকা পর্যন্ত তারা গ্রামের হাট বাজারে, চা স্টলে, বিভিন্ন খেলাধুলা, এমনকি আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে ঘুরে অলসভাবে সময় কাটায়। তাই মেধা-বুদ্ধিহীন এসব মানুষের জীবন তিলে তিলে দুর্বিসহ হয়ে উঠছে। এতে অনেকে জমি-জমা, সহায় সম্পদ বিক্রি করে পরিবারের ভরণ পোষণ করতে যেয়ে চিরদিনের মত নিঃস্ব হয়ে পড়ে। স্ত্রী সন্তানরা ক্ষুধার তাড়নায় নিজেরাই খাদ্যের সন্ধানে বের হয়। পরিবারের আদর্শ বিলীন করে যার যার মত জীবন চলার পথ বেছে নেয়।

দারিদ্র্যতা (Poverty) : বাংলাদেশে গ্রামের মানুষের বেশীর ভাগই দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করে । হাতে গুণা কয়েকজন মানুষ ব্যতীত বাকী জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রাম করে

জীবন ধারণ করে থাকে। যাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রবাদ বাক্যের কথায় 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়।' খাবার অন্বেষণই এ শ্রেণির মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য। এক সমীক্ষা থেকে জানা যায়, "গ্রামের ৬৮ শতাংশ মানুষ দিন মজুরের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে। কৃষিকাজ করে আয় নির্বাহ করে মাত্র ৯ শতাংশ মানুষ এবং মৎস্য ও পশু পালনের উপর নির্ভরশীল ৬ শতাংশ মানুষ। এসব মানুষের ৭২ শতাংশ আয় ব্যয় হয় খাদ্য চাহিদা মেটাতে।"[১০]

মানুষ যখন ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে ব্যস্ত থাকে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষা, স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা ভাবনা করার সময় পায় না। এ ক্ষেত্রেই দারিদ্র্যতা গ্রামের মানুষকে ছোবল মেরে উন্নয়নের গতিপথ রুদ্ধ করে ফেলে। এসব মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন হয় গাণিতিক হারে আর অভাব আঘাত হানে জ্যামিতিক হারে। দক্ষিণাঞ্চলের একটি চরের হিসাব অনুযায়ী, "৬৩ শতাংশ লোকেরই নিজস্ব কোন জমি নেই, বাকী ৩৭ শতাংশের মধ্যে আবার ৮৬ শতাংশই ০.০৫ শতাংশ ভূমির মালিক এবং ৩৩ শতাংশ লোকের শুধুই নিজস্ব বসত ভিটা রয়েছে।"[১১]

সারণী নং-২.১ : নিচে বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যের একটি সারণী ১৯৬৩/৬৪ থেকে ৭৫- (শতকরা হার) দেখানো হলো:

বছর	চূড়ান্ত দারিদ্র্য		অতি দারিদ্র্য	
	পরিবার	ব্যক্তি	পরিবার	ব্যক্তি
১৯৬৩-১৯৬৪	৫১.৭	৪০.২	৯.৮	৫.২
১৯৬৮-১৯৬৯	৬৪.১	৬৫.০	৩৪.৬	২৫.১
১৯৭৫-	৭০.৩	৬১.৮	৫০.৫	৪১.০

সূত্র: আবুল বরকত খান, দি ইকনমি অব বাংলাদেশ, সন-১৯৭৬. পৃ,১৫।

সংস্কৃতি (Culture) : বিশ্বের প্রতিটি জাতি কোন না কোন সংস্কৃতির ঐতিহ্যে লালিত। সংস্কৃতি কোন জাতির পরিচয় বহন করে। বাঙ্গালী জাতিরও কিছু সংস্কৃতি রয়েছে। তবে শহর এবং গ্রামের সংস্কৃতির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। বাংলা সনের প্রথম মাস বৈশাখ। এ বৈশাখ মাস থেকেই গ্রাম বাংলার সংস্কৃতির যাত্রা শুরু হয়। মাস ব্যাপী গ্রামের গ্রামে উদ্‌যাপিত হতে থাকে বৈশাখী মেলা। মেলায় থাকে ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্য বিভিন্ন ধরণের খেলাধুলার সামগ্রী এবং বাহারী খাবারের সমারোহ। আয়োজন করা হয় নানা প্রকার পল্লী গানের আসর। এ দিন গ্রামে থাকে

উৎসবের আমেজ। মেলায় যোগ দেয় ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল বয়সের মানুষ। ছেলেমেয়েদের বাজানো বাঁশির সুর এবং মেলায় পল্লী গানের মুর্ছনা মানুষের হৃদয়ে বইতে থাকে আনন্দের জোয়ার।

বর্ষার পানিতে ডুবু-ডুবু খাল, বিল, হাওর-বাওর ও নদী-নালায় চলে নানা আকার ও বর্ণের পাল তোলা নৌকা এবং প্রতিযোগিতামূলক নৌকা বাইচ। শরৎকালে খাল-বিলে ফুঁটে শাপলা ফুল এবং নদীর দু'তীর ভরে যায় সাদা কাশ ফুলে। এসময় ঘরে ঘরে শুরু হয় তালের পিঠার খাওয়ার উৎসব। হেমন্ত কালে থাকে মাঠ ভর্তি সোনালী ধান। শুরু হয় নবান্নের উৎসব। এ উৎসব মেজাবানসহ দাওয়াত করা হয় আত্মীয় স্বজনদের। গ্রামে পৌষ মাসে খেজুরের রসে তৈরী ফিরনি-পায়েস খাওয়ার সংস্কৃতি বিশ্বখ্যাত। ঋতুরাজ বসন্ত কালে গাছে গাছে গজানো নতুন পাতা যেন প্রকৃতির অপরূপ দান। এ গাছেরই ডালে ডালে বসে কোকিলের গানে মুখরিত থাকে গ্রামের আকাশ বাতাস। এসময় বাংলাদেশর হাওর-বাওর এলাকায় শুরু হয় বোরো ধান কাটার উৎসব।

তাছাড়া গ্রামের সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে জারি, সারি, ভাওয়াইয়া, পল্লীগীতি, যাত্রা, নাটক সহ নানা প্রকার পালা গানের আসর। হাডুডু, দারিয়াবন্ধা, গোল্লাছুট, ঘুড়ি উড়ানো, লাঠি খেলা, ঢাংগুডি, ষাঁড়ের লড়াই/দৌড়, মোরগ যুদ্ধ, সাপের খেলা, বানর নাচানো, ঘোড়-দৌড়, কোড-কোড খেলাসহ বৈচিত্র্যময় খেলা গ্রাম বাংলা সংস্কৃতিকে মহিমান্বিত করেছে। সংস্কৃতির এ রূপ বিশ্বের কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। যদিও শহরের এবং বিদেশী নানামুখী সংস্কৃতি আজ গ্রাম বাংলায় হানা দিয়ে আদি সংস্কৃতিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তবুও এ সংস্কৃতি এখনও মানব হৃদয়ে হৃদয়ে উজ্জীবিত রয়েছে।

তাছাড়া গ্রামের দরিদ্র মানুষ খেয়ে পরে বেঁচে থাকার জন্য নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে সংসারের আয় বৃদ্ধি কর থাকে। নিচে এমন একটি উৎপাদনমুখী গ্রামীণ সাংস্কৃতিক কর্মসূচীর বাস্তবতা দেখানো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ২.২

বাংলাদেশের গ্রামের ছেলে-মেয়েরা মাঠে-ঘাটে বিশেষকরে চারণ ভূমিতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়াসহ নানা প্রজাতির পশু-পাখি চরিয়ে পরিবারের আয় বর্ধন করে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখার সংস্কৃতি আবহমানকাল ধরে চলে আসছে । গ্রামের একজন ছোট ছেলের ছাগল চরাণোর এমনি একটি দৃশ্য উপরের চিত্রে দেখানো হয়েছে।

কুসংস্কার (Superstition) : বিশ্ব সভ্যতায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে মানুষ যখন উন্নত জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অগ্রসরমান তখন বাংলাদেশের গ্রাম বাংলার মানুষ বাস্তব এবং কোন প্রকার যৌক্তিকতা ছাড়াই কুসংস্কারকে অন্ধভাবে লালন করছে। প্রাচীন সমাজের কাল্পনিক চিন্তাভাবনা এখনও গ্রামের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান। যে সকল কুসংস্কার এখনও গ্রামের মানুষ বিশ্বাস করে, তা হলো: কোন দিন শুভ হয়, কোন দিন অশুভ হয়। শেওড়া গাছে ভূত থাকে। রাতে বাড়ীতে কেহ মাছ মাংস বয়ে আনলে তার সাথে জ্বীন-ভূত আসে এবং আগুন দিয়ে তাপ দিয়ে এ অশুভ শক্তিকে তাড়াতে হয়। কোন মানুষ মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেল্লে তাকে জ্বীন-ভূত ধরেছে বলে মনে করা হয়। তাই রোগীকে সুস্থ করে তোলতে শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। কখনও বা পানিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে জ্বীন-ভূত তাড়ানোর চেষ্টা চালানো হয়। এতে অনেক সময় রোগী মৃত্যু বরণ করে থাকে।

সকালে ঘুম থেকে উঠার পর যাত্রা পথে কোন মহিলার কাঙ্গে খালি কলসী দেখ্লে যাত্রা অশুভ হয়। গভীর রাতে ভূত সাদা কাপড় পড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থান যাতায়াত করে। এদের যাত্রা পথে কেহ সন্মুখে পড়লে, ভূত ঐ লোকের রক্ত চুষে খায়। রাতে বড় বড় গাছে শয়তান আগুন জ্বালায়।

গর্ভবতী মহিলার স্বামী কোন প্রাণী জবাই করলে সন্তান অসম্পন্ন হয়। আতুর ঘরে আগুন জ্বালিয়ে ধুম্রজাল তৈরী করতে হয়, এর ব্যতিক্রম হলে 'চোরা' নামক অপশক্তি সন্তানের রক্ত চুষে খায়। স্বামীর আগে স্ত্রী আহার করলে স্বামী অকালেই মারা যায়। সন্তান সম্ভবা মহিলাকে কম খাবার খেতে হয়। কারণ পুষ্টিকর খাবার বেশী খেলে বাচ্চা বড় হয় এবং প্রসবের সময় মায়ের মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত বাচ্চার কপালের পার্শ্বে কালির তিলক (চিহ্ন) দিতে হয়। তিলক না দিলে বাচ্চা দেখে মানুষ চোখ মেরে থাকে। ফলে সন্তানের কোন না কোন অঙ্গহানি হয়। কেহ অসুস্থ হলে পীরের মাজারে শিরনী দিলে তার আরোগ্য লাভ হয় ।

বড় বড় পুকুর, জলাশয় বা বাড়ীর কাছে নদী-নালার গভীর পানিতে আজর (অশুভ শক্তি) থাকে। অশুভ কোন শক্তি বাড়ীতে যাতে ক্ষতি করতে না পারে এ জন্য ঘরের কোণে ঝাড়ু বেঁধে রাখা হয়। মাছ ধরতে যাবার পূর্বে তিন রাস্তার মাঝখানে খর দিয়ে আগুন ধরিয়ে মাছ ধরার উপকরণ ছেঁকে নিলে প্রেতাত্মা দূর হয় এবং এতে বেশী মাছ ধরা যায়। ছোট বাচ্চাদের দুধ দাঁত ইদুরের গর্তে রেখে দিলে দাঁত বেশী বড় না হয়ে ইদুরের দাঁতের মতই বাচ্চার দাঁত ছোট হয়। অমবস্যার রাতে বড় বড় গাছে বাতি দিলে অশুভ শক্তি খুশী হয়ে মানুষের ক্ষতিকর কিছু করে না। রাতে কোন বাড়ীতে পিঠা তৈরি করলে ভূত পিঠা খেতে আসে।

তিন রাস্তার মাঝ খানে পশু পাখির মল রাখলে শাক-সব্জির ক্ষেতে রোগ বালাই কম হয় এবং শাক-সব্জির পঁচন রোধ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। নতুন গাছের প্রথম ফল এবং শাক-সব্জি মালিক না খেয়ে কোন ধর্ম প্রাণ মানুষকে খাওয়ালে পরবর্তীতে ফল ও শাক-সব্জির ফলন বৃদ্ধি পায়। ভোরে কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়। কোন বাড়ীর পার্শ্বের গাছে রাতে নিশাচর পাখি ডাকলে ঐ বাড়ীর লোকজনের উপর অশনি (ক্ষতিকর কিছু) আগমনের সম্ভাবনা থাকে। নতুন ফসল কাটার শুরুতে এক মুঠো ফসল কলা পাতায় পেঁচিয়ে ঘরের ভিতরে এক কোণে ঝুঁলিয়ে রাখতে হয়।

ছাত্র/ছাত্রীদের পরীক্ষা অংশ গ্রহণের পূর্ব মুহুর্তে ডিম খেতে হয়না, তাতে মাথা গরম হয় এবং পরীক্ষার ফলাফল খারাপ হয়। ইত্যাদি ইত্যাদি কুসংস্কার বাংলাদেশের গ্রাম গুলোতে বিরাজমান থাকায় যথাযথ গ্রামোন্নয়নের পথ অনেকাংশে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়ন : দেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থার সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম একক (Unit) হলো গ্রাম। বহু উত্থান-পতন তথা বিবর্তনের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় এ গ্রামীণ ব্যবস্থা। যুগ যুগ ব্যাপী আজকের পর্যায়ে গ্রামগুলো কীভাবে উপনীত হয়েছে তার দীর্ঘ ইতিহাস পর্যালোচনা এবং বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি ও তাঁদের লেখা পুঁথি-পুস্তক থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়নের যে সকল তথ্যাদি পাওয়া যায়, তার ধারাবাহিক রূপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

প্রাচীন যুগ : গ্রাম বাংলার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন। বৈদিক যুগের বহু পূর্বে হতে খৃষ্ট পূর্ব (১৫০০-১০০০) অব্দ সময় কালে 'গ্রাম পরিষদ' নামে অভিহিত ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্রের আভাস পাওয়া যায়। সভা বা মহাসভা নামে পরিচিত 'গ্রাম পরিষদ' কিছু কমিটির মাধ্যমে গ্রাম প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করতেন। এমন তথ্য বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র গ্রন্থ থেকে জানা যায়, "প্রাচীন মৌর্য ও মৌর্য পূর্ব যুগে (খৃষ্ট পূর্ব ৩২৪-১৮৩ অব্দ) গ্রামের বিশিষ্ট পরিবারের প্রবীনদের দ্বারা একটি পরিষদ গঠন করা হতো, যা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম প্রশাসনের কাজ চালাত। গুপ্ত শাসন কালে (৩২০-৫৩৫ খৃষ্টাব্দে) নগর ও গ্রাম পর্যায়ে উভয় ক্ষেত্রে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে দেশ শাসন করা হতো।"[১২]

সমাজ সংগঠনের একক ছিল যেহেতু গ্রাম, সে অনুসারে শুধু বর্তমান বাংলাদেশে নয়, যতদূর জানা যায়, সমস্ত উপমহাদেশেই গ্রামকে একক ধরে স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ভিত্তিক সমাজ সংগঠন গড়ে উঠেছিল। ঐতিহাসিকেরা এর কারণ হিসেবে নানা অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। অভিমত যাই হউক না কেন, স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রাম ভিত্তিক সমাজ সংগঠন এ দেশের অন্যতম প্রাচীন মৌল বৈশিষ্ট্য। অজয় রায়ের লেখা গ্রন্থ 'বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান' থেকে জানা যায়, "গ্রাম জীবনের যে সামান্য চাহিদা তা গ্রামেই মেটাবার ব্যবস্থা ছিল। একই নির্দিষ্ট খাতে গ্রামের জীবনযাত্রাও বয়ে যেত বংশ পরম্পরাক্রমে।"[১৩]

ইতিহাস বিশ্লেষণে জানা যায়, প্রাচীন কালে গ্রাম গুলো কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত না হয়ে এক একটি গ্রাম গোষ্ঠী হিসেবে ছিল স্ব-শাসিত। প্রত্যেক গ্রামেই একটি করে পঞ্চায়েত ছিল। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, গোচারণ ক্ষেত্র, খেলাধুলার মাঠ, মসজিদ, মন্দির, প্রভৃতি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান পঞ্চায়েতই দেখাশুনা করতো । "ভারত বর্ষের অন্যান্য স্থানের মত বঙ্গ দেশের স্থানীয় প্রশাসনের সকল দায়িত্ব ছিল গ্রাম পঞ্চায়েতের উপর।"[১৪]

গ্রামে শিক্ষা-দীক্ষার তেমন সুব্যবস্থা না থাকলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে মানুষ স্বাচ্ছন্দে দিনাতিপাত করতো । প্রচুর পরিশ্রম করে কৃষি কাজের মাধ্যমে এ সময় তারা নানা জাতের ফসল ও শাক-সব্জি উৎপাদন করতো , প্রাচীন পুথিঁ-পুস্তক থেকে এমন তথ্য পাওয়া যায়। সপ্তম শতাব্দীতে বিখ্যাত চৈনিক ভিক্ষু পর্যটক হিউয়েন সাং এদেশে আগমন করেন। গ্রাম বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মানুষের জীবন ধারণের কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, ''গ্রামের সর্বত্র প্রচুর শস্য ও ফল মূল জন্মায়, আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ, আর সরল স্বভাবের লোক গুলো খুব পরিশ্রমী। গ্রামের মানুষের জীবিকার মাধ্যম হলো কৃষি, তাঁত শিল্প, জেলে, কামার-কুমার, মুদি দোকানদার ইত্যাদি পেশা।"[১৫]

মধ্যযুগ : সুলতানী শাসন আমলে সামান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামের কর্তৃত্ব কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করলেও সার্বিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন গ্রামীণ ‘এলিট’ (Elite) গণ। এ সময়ে মুসলিম শাসন আমলে (১৩৪২-১৫৪২ খৃষ্ঠাব্দে) গ্রামের সব ধরণের কাজ-কর্ম গ্রাম পরিষদ সম্পন্ন করতো । পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রামের যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হতো। বিদেশী পর্যটকগণ গ্রাম পরিষদ সমূহের কর্মসূচী দেখে মুগ্ধ হতেন। তারা এগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। “গ্রামের অভিজাত জনগণ, প্রতিনিত্বশীল ব্যক্তি ও বয়োজ্যেষ্ঠ্য পরিবার প্রধানদের সমন্বয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হতো। পঞ্চায়েতই ছিল গ্রামের প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত কার্যবলী সম্পাদানের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। ”[১৬]

গ্রামের প্রধানকে বলা হতো ‘গ্রামন্নী’। যিনি গ্রামের জনগণের ইচ্ছায় এবং কোথাও উত্তরাধিকার সূত্রে নিয়োজিত হতেন। ‘গ্রামন্নী’ ন্যায় বিচারক ছিলেন। তাঁর উপর গ্রামের জনগণ ন্যায়-অন্যায় সঠিক ভাবে পরিচালনার দায়িত্ব অর্পন করেছিলেন। অযথা কারও প্রতি জুলুম-অত্যাচার হলে তিনি কঠোর হাতে তা দমন করতেন। এলাকা এলাকায় জনগণের সুখ-দুঃখ ঘুরে ঘুরে দেখাকে তিনি দায়িত্ব বোধ বলে মনে করতেন। দু’তিন বা পাঁচ সদস্যের একটি পরিষদ তাকে সামাজিক জীবনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও গ্রামীণ ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখা প্রভৃতি কাজে সহায়তা করতেন।

গ্রামে প্রচুর পরিমাণ কৃষিজাত দ্রব্য উৎপাদিত হতো এবং এসবের মূল্য এত সস্তা ছিল যার জন্য বিদেশী পর্যটকেরা সব সময় এদেশের প্রসংশা করতেন। আবহাওয়া প্রায় সব সময়ই অনুকূল থাকায় কৃষকদের পক্ষে স্বল্প পরিশ্রমের মাধ্যমে কৃষিজ ফসল উৎপাদন সহজ সাধ্য ছিল। মুহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসন আমলে মরক্কোর পর্যটক ইব্নে বতুতা এদেশে আগমন করেন। তাঁর লেখা থেকে জানা যায়, “উৎপাদিত দ্রব্য গুলোবিভিন্ন দেশে রপ্তানী করা হতো। বিদেশী বণিকেরা সোনা ও রুপার বিনিময়ে এসব দ্রব্য কিনতেন।”[১৭]

মুঘল আমল (১৫২৬-১৭৫৭) : মুঘল আমলে গ্রামীণ স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপক উন্মেষ ঘটে। এ সময় (১৫৭৫-১৭০৪ খৃষ্টাব্দ) পঞ্চায়েতের উপর গ্রাম প্রশাসনের কর্তৃত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামেই পরিষদ বা পঞ্চায়েত ছিল। পরিষদ কর্তৃক নিযুক্ত গ্রাম প্রধান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতেন। পরবর্তী কালে বাংলার নবাবরা প্রচলিত গ্রাম প্রশাসনের পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন সাধন করেননি। কৃষি কার্য ছিল গ্রামের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান মাধ্যম। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ সময় কৃষকরা জমিতে নানা মুখী পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল জমিতে সেচ পরিকল্পনা গ্রহণ। তাছাড়া মৎস্য চাষ, পশু পালন, শাক-সব্জি উৎপাদন করেও মানুষ জীবনধারণকরতো। ভারতে বিভিন্ন সময়ে প্রশাসনিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে বার বার। কিন্তু

বাংলার স্থানীয় সরকারের শাসন পদ্ধতির কোন পরিবর্তন সাধিত হয়নি। মুঘল যুবাদের কাঠামোগত কর্মসূচী ভারতের অন্যান্য এলাকায় সংস্কার সাধন হলেও এ অঞ্চলে তা পুরোপুরি অক্ষুন্ন ছিল।"The main from of the wealth in pre-British India was land. The main economy was Agriculture."[১৮]

বৃটিশ শাসন আমল : (১৭৫৭-১৯৪৭) ভারতে বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা তথা 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর' ক্ষমতা দখলের ১৩ বৎসরের মাথায় ১৭৭০ সালে বাংলায় নেমে আসে এক মহা দুর্ভিক্ষ। এ দুর্ভিক্ষে শুধু বাংলাই মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ অর্থাৎ এক কোটি মানুষ মৃত্যুবরণ করে। যার প্রায় পুরো অংশই ছিল অজপাড়া গাঁয়ে বসবাসরত দরিদ্র জন গোষ্ঠী। সর্বনাশা এ মহা প্রয়াণের রেশ কাটতে না কাটতেই এর ২৩ বৎসর পর এদেশের মানুষের ভাগ্যাকাশে নেমে আসে আর এক অভিশাপের অধ্যায়। লর্ড কর্ণওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনার পুরো দায়িত্ব অর্পণ করেন জমিদারদের (Land Lords) উপর। এতে গ্রাম বাংলার কৃষক সমাজের মেরুদন্ড (Spinal cord) একেবারেই ভেঙ্গে যায়।

জমিদারদের নায়েব, গোমস্তা, পাইক, পেয়াদারা দরিদ্র কৃষক প্রজাদের কাছ থেকে জোর-জুলুম করে খাজনা আদায়ের ফলে তাদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠে। কৃষকের উৎপাদিত ফসল প্রায় পুরোটাই বিক্রি করে খাজনার ভার বহন করায় তাদেরকে বুভুক্ষ, অর্ধাহারে দিনাতিপাত করতে হতো। বৃটিশ বণিকরা এদেশের উৎপাদিত কাঁচামাল অতি সস্তায় কিনে নিয়ে বৃটেনের কল কারখানায় পণ্য সমাগ্রী তৈরী করে তা আবার কৌশলে এদেশে স্বল্প মূল্যে বিক্রি করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে এদেশের বিশ্বখ্যাত ঐতিহ্যবাহী মসলিন সুতিবস্ত্র ও রেশম শিল্প ধ্বংস হয়ে যায় এবং বেকার হয়ে পড়ে গ্রাম বাংলার অসংখ্য শ্রমিক। ধস নামে গ্রামের সমৃদ্ধ অর্থনীতির। তাছাড়া ইংরেজরা এ দেশের কৃষকদেরকে ধান পাটের জমিতে জোরপূর্বক 'নীল চাষে' বাধ্য করাতে তারা একেবারে নিঃশেষ হয়ে পড়ে।

"১৮৩০ সালে চালর্স মেটকাফ গ্রামকে 'লিটল রিপাবলিক' নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। ইংরেজরা এ দেশে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রামে আইনী কাঠামো প্রবর্তন করেন। তারা ১৮৭০ সালে গ্রাম চৌকিদারী আইন (The Villege Choukidari Act of 1870) প্রবর্তন করে আইন শৃঙ্খলা তদারকির ব্যবস্থা করেন।"[১৯] এ সংক্রান্ত ব্যয় ভার বহন করতে হতো স্থানীয় জমিদার ও গ্রাম্য পঞ্চায়েতকে। জেলা প্রশাসক কতিপয় গ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকার জন্য এ চৌকিদারী পঞ্চায়েত মনোনীত করতেন। পঞ্চায়েতের দায়িত্ব ছিল কর আদায়, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ দমন ইত্যাদি ব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে সহায়তা করা।

বৃটিশ শাসকদের গ্রামোন্নয়নের প্রথম কর্মসূচী ছিল এরূপ: "First attempt to set up rural local bodies was made in 1870: and the first institutional set up for co-operatives was provided by `Bengal Co-operative Societies Act of 1904.' In the subsequent stage during the late 30s programmes for supply of drinking water in the rural areas and rural uplift programmes of the nature of village community services through self-help came as pioneering activities of rural development programmes."[২০]

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তন করে ব্রিটিশরা এদেশের কোন কোন গ্রামে দু'একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কোন কোন থানায় দু'একটি উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। যার উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসন কার্যে সাহায্যকারী জনবল প্রতিষ্ঠা করা। গ্রামের উৎপাদিত কাঁচামাল, খাদ্যদ্রব্যসহ নানা প্রকার কৃষিজ উৎপন্ন সামগ্রী গ্রামের ব্যবসায়ীরা গরু-মহিষের গাড়ী এবং নৌকাযোগে শহর-বন্দরে নিয়ে বিক্রয় করতো। ১৮৮৫ সালে লর্ড রিপনের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে এদেশে তিন স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। নিচে রেখাচিত্রের সাহায্যে তা দেখানো হলো:

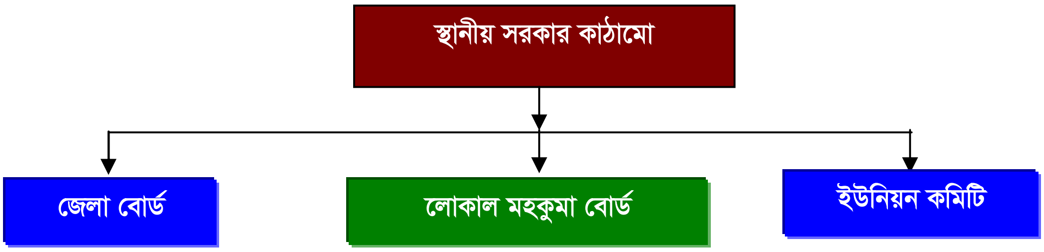

চিত্র : ২.৩

পাকিস্তান শাসন আমল (১৯৪৭-১৯৭১) : বৃটিশদের মত পাকিস্তানী উপনিবেশ পাকিস্তান সৃষ্টি একযুগ পর শাসক আইয়ুব খান ১৯৫৯ সনে মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy) আদেশ প্রবর্তন করে এ দেশের গ্রামের মানুষের সার্বজনীন ভোটাধিকার হরণ করেন। এ অধিকার হরণ করে গ্রামের মানুষকে রাজনৈতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়। 'ইউনিয়ন পরিষদের উপর গ্রামের মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার সাথে সাথে পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, পানি সরবরাহ, শিক্ষা, যোগাযোগ, সমাজকল্যাণ প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। "১৯৬১ সনে আইয়ুব খান অপর এক অধ্যাদেশ জারী করে গ্রামীণ জনসাধারণের বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য 'সালিশী আদালত' (Arbitration Board) গঠন করেন। ১৯৬৮ সনে গ্রাম পুলিশ (Choukidar) বাহিনী বিধি অনুসারে প্রতি ইউনিয়নে একজন দফাদার (Chief of villege guard) সহ কিছু কিছু গ্রাম নিয়ে গ্রাম পুলিশ বাহিনী পুনর্গঠন করা হয়।"[২১]

গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রতিটি জেলা সদরের সাথে থানার (বর্তমান উপজেলা), থানার সাথে দু'একটি ইউনিয়নের এবং ইউনিয়নের সাথে কিছু কিছু গ্রামে কাঁচা সড়ক নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। গুটি বসন্তের মহামারী রোধে গ্রাম গুলোতে টিকা দান কর্মসূচী এবং বসত বাড়ীতে মশা, মাছি, পোকা-মাকড় প্রতিরোধে প্রতি বৎসর কীটনাশক ঔষধ প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জলাশয়ের কচুঁরীপানা পরিস্কার সহ অন্যান্য অনাবাদী জমিতে ফসল উৎপাদনের জন্য গ্রামের কৃষক সমাজকে উৎসাহ প্রদান করা হয়।

কোন কোন ইউনিয়নে আপদকালীন খাদ্য শস্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম (Godown) এবং কৃষকদের উন্নত বীজ সরবরাহের জন্য বীজাগার (Seeds Store) নির্মাণ করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রাম গুলোতে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ কর্মসূচী কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয় এবং কিছু কিছু উচ্চ বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ শাসনামল (১৯৭২-) : দীর্ঘ উপনিবেশিক শাসন, শোষণ, অত্যাচার-উৎপীড়নের মহাপ্রাচীর অতিক্রম করে অবশেষে **১৯৭১** সালে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা অর্জনের কয়েক বৎসরের মধ্যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিয়ে শুরু হয় হানাহানি। সরকার গ্রামোন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন, দুর্নীতিবাজদের কারণে সে সকল কর্মসূচী বহুলাংশে বাস্তাবায়ন সম্ভব হয়নি। রাজনৈতিক নেতৃত্ব জনগণের ভাগ্যের পরিবর্তন না ঘটিয়ে নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নেই বেশি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। শুরু হয় রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পালা। জনকল্যাণে রাজনীতিবিদরা নিজেদের উৎসর্গ না করে পদ লোভ, রাষ্ট্রীয় সম্পদ শোষণ ও ভোগের প্রত্যয় নিয়ে তাঁরা শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার হিসেব কষতে থাকেন। এ ক্ষেত্রে স্বৈরশাসন ও অযোগ্য দুর্বল নেতৃত্বই মূলত দায়ী। বর্তমানে প্রতিহিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাসী এসব রাজনৈতিক নেতৃত্ব নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছুড়াছুড়িতে লিপ্ত রয়েছেন।

স্বাধীনতা অর্জন থেকে শুরু করে অদ্যাবধি বিভিন্ন সরকারের গ্রামোন্নয়ন মূলক কর্মসূচীর বাস্তব চিত্র নিচে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো :

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল (১৯৭২-১৯৭৫): যুদ্ধ বিধ্বস্ত স্বাধীন দেশে ক্ষমতার মহা আসনে অধিষ্ঠিত হলেন স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। তিনি ক্ষমতা গ্রহণের পর গ্রাম গঞ্জের প্রায় সর্বত্রই ছিল পরাজিত বাহিনীর ধ্বংস যজ্ঞের লীলা ভূমি। পাক সেনারা গ্রামের নিরাপরাধ মানুষের হাজার হাজার ঘর-বাড়ি পুঁড়িয়ে ফেলে। লুন্ঠন করে মানুষের ধন-সম্পদ । তারা নির্বিচারে মানুষের গৃহপালিত অসংখ্যা পশু জবাই করে ভক্ষণ করে। যুদ্ধকালীন সময় কৃষকরা

কৃষিকাজে যথাযথভাবে মনোনিবেশ করতে না পারায় গ্রামের কৃষকরা আর্থিক দিক দিয়ে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

স্বাধীনতাত্তোর হাজার হাজার গ্রামে ব্যাপক খাদ্য সংকট দেখা দেয়। অসংখ্য দরিদ্র মানুষ দিনের পর দিন অনাহারে থেকে মৃত্যু বরণ করতে থাকে। সারা বিশ্ব সহযোগিতার হাত প্রসারিত করে সংকট মোকাবেলার চেষ্টা চালায়। তাঁরা বাংলাদেশে খাদ্য সামগ্রী সহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাঠাতে থাকে। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের যাতায়াত ব্যবস্থা এতই খারাপ ছিল যে, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে (Remote Area) ত্রাণ সামগ্রী পৌঁছতে দীর্ঘ সময় লেগে যায়। অন্যদিকে জন প্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তারা ব্যাপকভাবে ত্রাণ সামগ্রী ও অর্থ লুটপাটের মহোৎসবে মেতে উঠে। ফলে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা একেবারে বিপন্ন হয়ে পড়ে।

ঘর-বাড়ি ও শীত বস্ত্রের অভাবে মানুষ গাছের নিচে জীব জন্তুর ন্যায় লতা-পাতা, চটের বস্তা, মুড়িয়ে ঘুমোতে বাধ্য হয়। জন প্রতিনিধিরা ত্রাণের ঢেউটিন, কম্বল ও খাদ্য সামগ্রী ভাগ্যাহত মানুষের মাঝে বিতরণ না করে মাটির নীচে পুঁতে রেখে জন জীবনে ব্যাপক দুর্ভোগের সৃষ্টি করে। অন্য দিকে নানা অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে পীড়িত হয়ে চিকিৎসার অভাবে মানুষ পশু পাখির মত মৃত্যুবরণ করতে থাকে। অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের শিশুরা খাদ্যাভাবে ও পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। রাতের অন্ধকারে চোর, ডাকাত, সন্ত্রাসীরা মানুষের বাড়ী ঘরে ঢুকে টাকা পয়সা, জিনিষপত্র লুণ্ঠন করে নিয়ে যায়। গ্রামের মানুষের মধ্যে সর্বদা আতংক বিরাজ করতে থাকে এবং আর্থিকভাবে তারা অস্বচ্ছল হয়ে পড়ে। খাদ্যাভাবে মানুষ কলা গাছের মাজ, বন্য কঁচু, মৃত পশু ভক্ষণ করে বাঁচতে চেষ্টা করে। হাজার হাজার অসহায় নর-নারী লজ্জা-শরম ছেড়ে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে থাকে। অনেক মানুষকে একটি কাপড় শত তালি-জোড়া দিয়ে পরিধান করতে দেখা যায়। কেহ কেহ চটের বস্তা এবং মাছ ধরার জাল পড়ে লজ্জা নিবারণ করতে থাকে। ফলশ্রুতিতে দেখা যায়ঃ

"Since the emergence of Bangladesh successive regimes have showed deep concern for local government and rural development. Each political change has been followed by new schemes in the field. But poor political base of the regimes on the one hand and inadequacy of the existing institutional structure on the other most often led to unsatisfactory result."[২২]

বাংলাদেশ তথা বিশ্বের জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান এমতাবস্থায় গ্রামোন্নয়নে দৃষ্টি নিবন্ধ করেন। ক্ষমতা আরোহণের কিছুদিনের মধ্যেই কৃষকদের খাজনার বোঝা লাঘব করে ২৫ (পঁচিশ) বিঘা পর্যন্ত ভূমির খাজনা মওকুফ করা হয়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার করার জন্য কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করা হয়। কীটপতঙ্গের হাত থেকে ফসল রক্ষার জন্য বিনামূল্যে জনগণের মধ্যে কীটনাশক ঔষধ বিতরণ করা হয়। স্বেচ্ছাশ্রমে দেশ গড়ার জন্য জনগনকে উৎসাহ প্রদান করা হয়। তাই উল্লেখ্য, "The regime of Sheikh Mujib (1972-1975) start the system of compulsory co-operatives in village."[২৩]

বাংলাদেশে প্রতিটি গ্রামের মানুষ স্বাধীন দেশ গড়ার কাজে কোদাল-ঢালি হাতে নিয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নে রাস্তা-ঘাট নির্মাণের কাজ শুরু করেন। আজকের দৃশ্যমান কাঁচা সড়কের বেশীর ভাগই ঐ সময় নির্মাণ করা হয়। যা গ্রামোন্নয়নে অদ্যাবধি ভূমিকা রাখছে। সরকার কৃষি ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ দানের মাধ্যমে কৃষকদের মঝে পুঁজি সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করেন। জনসংখ্যার ঘনত্ব হ্রাসের জন্য গ্রামের জনগণকে পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে সচেতন করে তুলতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। সক্ষম দম্পতিকে পরিবার পরিকল্পনার স্থায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়।

গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে উপনিবেশিকদের চেয়ে বেশী ছেলে-মেয়েদের শিক্ষিত করে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মনোন্নয়নে চেষ্টা চালানো হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গণের চাকুরী জাতীয়করণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে সরকার বিনামূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী গ্রহণ করায় দরিদ্র মানুষের সন্তানদের মাঝে শিক্ষার হার বাড়তে থাকে। ফলে হত দরিদ্র পরিবারের সন্তানরা শিক্ষিত হওয়ায় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটতে থাকে।

১৯৭৪ সালে ভয়াবহ বন্যায় প্রায় সারা দেশের গ্রামগুলো পানির নিচে তলিয়ে যায়। এতে গ্রামের মানুষের যানমালের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। গ্রামোন্নয়ন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। বন্যার পানিতে রাস্তা-ঘাট ভেঙ্গে যায়। মানুষের সাথে গবাদি পশুও বন্যার পানিতে ভেসে যায়। এতে কৃষকরা দারুণভাবে আর্থিক ক্ষতির সন্মুখীন হয়। গ্রামে গ্রামে ব্যাপকভাবে দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়ে। সরকার তড়িৎ গতিতে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ ও লঙ্গরখানার মাধ্যমে খাবার বিতরণ করলেও গ্রামের বহু মানুষ অনাহারে ও উদরাময়সহ বিভিন্ন ভাইরাস জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। দেশের এমন সংকটময় মুহুর্তে জন প্রতিনিধি ও দুর্নীতিবাজ সরকারী কর্মকর্তারা ত্রাণের মালামাল ও লঙ্গরখানার খাদ্য সামগ্রী থেকে অর্থ আত্নসাৎ করতে থাকেন।

সর্বহারা নামক একটি আন্ডার গ্রাউন্ড রাজনৈতিক দলের নেতা কর্মীরা হত্যাসহ গ্রামের মানুষের ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করে এক ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে। গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকার দীর্ঘ মেয়াদী যেমন: পাঁচশালা, দ্বি-শালা সহ নানামুখী স্বল্প মেয়াদী পরিকল্পনা (কর্মসূচী) গ্রহণ করে মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়াতে সচেষ্ট হন।

এমতাবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কিছু সংখ্যক বিপদগামী সেনা কর্মকর্তার হাতে সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হন।

মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল (১৯৭৫-১৯৮১) : সামরিক শাসক মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সনে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা আরেহাণ করে গ্রামোন্নয়নে মনেনিবেশ করেন। 'গ্রামে অধিক খাদ্য ফলাও' (Grow More Food) নামে সবুজ বিপ্লব কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামকে স্বনির্ভর করার ঘোষণা দেয়া হয়। খড়ার হাত থেকে ফসল মরা রোধে কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য খাল কেটে (Canal Digging) পানি সংরক্ষণ ও নিরাপদ সেচের ব্যবস্থপনায় ফসল উৎপাদন বাড়ানোর কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। রাষ্ট্রপতি নিজ হাতে কোদাল নিয়ে খাল কাটা কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। কর্মসূচী বাস্তবে রুপ দানের জন্য সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারী এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, ছাত্র ও কর্মচারীদেরকে খাল কাটার আহবান জানানো হয়। তাছাড়া এ কর্মসূচী সফল করার জন্য বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণির মানুষও ব্যাপকভাবে সাড়া দিতে থাকেন। তাছাড়া গভীর নলকূপ (Deep Tubewell) বসিয়ে পাতাল থেকে পানি উঠিয়ে সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য জনগণের মধ্যে স্বল্প মূল্যে এসব সেচ যন্ত্র বিতরণ করা হয়।

আমিষের (Protein) অভাব পূরণ করার জন্য এবং গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিতে জনগণকে ব্যাপক ভাবে মাছ চাষে উদ্বুদ্ধ করেন। গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য 'যুব কমপ্লেক্স' গঠন করা হয়। জনসাধারণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামের শিক্ষিত যুবকদের পল্লী চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

জনসংখ্যরোধে গ্রামের অসচেতন জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়। বিনামূল্য গ্রামের মানুষের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিতরণ করা হয়। সক্ষম দম্পতিকে স্থায়ীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণের জন্য পুরস্কারের প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়। নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। নিরক্ষর মানুষকে স্বাক্ষরতা শিক্ষা দানে শিক্ষিত মানুষকে অনুরোধ জানানো হয়। পূর্বের তুলনায় শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়। গ্রাম গঞ্জে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য 'কাজের বিনিময়ে খাদ্য' (Food for work) কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়। এতে এক দিকে অশিক্ষিত বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি

এবং অপর দিকে কাঁচা রাস্তা নির্মাণের ফলে মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজ সাধ্য হয়। গ্রামের মানুষকে শাসন ব্যবস্থার সুফল প্রদানের জন্য গ্রাম সরকার ব্যবস্থা গঠন করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে শাসক দলের লোকজন এ পদ পাওয়ার লোভে ব্যাপক ভাবে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে নিজেদের মধ্যে হানাহানির সৃষ্টি হতে থাকে।

এ প্রসঙ্গে বলা হয়, æDuring the later days of Sheikh Mujib's regime and the early days of Ziaur Rahman's rule (1975-1981) a new villege based self-reliant (Swanirvar) movement was initiated, which was later abandoned and replaced by Gramm Sarker (Villege Government)." [২৪]

এমতাবস্থায় তিনি ১৯৮১ সালে চট্টগ্রামে কিছু সংখ্যক সেনা অফিসারের হাতে তিনি নির্মমভাবে নিহত হলে তাঁর শাসন আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এশরাদের শাসন কাল (১৯৮২-১৯৯০) : লে. জেনারেল হোসাইন মুহাম্মদ এরশাদের শাসনামলে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী গ্রামোন্নয়ন মূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করা হয়। গ্রামের সুদীর্ঘ কালের পঞ্জীভূত অজ্ঞতার অন্ধকার থেকে মানুষ কিছুটা আলোর জগতে প্রবেশ করে এবং তাদের মধ্যে সচেতনতার হাওয়া বইতে থাকে।

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বাংলাদেশের থানাগুলোকে উপজেলায় উন্নীত করা হয়। ক্ষমতায় আরোহণের পর তাঁর গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর একটি ছিল এরুপ, æThe regime of Lt. General Hossain Mohammad Ershed creation of the Bangladesh Academy for Rural Development (BARD) by converting the old IRDP (Institution of Rural Development Programme). In this regime came a slogun, If 68 thousand villeges live, Bangladesh lives."[২৫]

জেলা থেকে গুরুত্বপূর্ণ অসিফ আদালত বিকেন্দ্রীকরণ করে উপজেলায় স্থানান্তর করা হয়। এতে বিচার ও প্রশাসন গ্রামের মানুষের হাতের নাগালে চলে আসে। জেলার প্রায় সকল সরকারী কর্মকান্ড উপজেলায়ই সম্পাদানের ব্যবস্থা করা হয়। প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের পর পরই জেনারেল এরশাদ নজর দেন যাতায়াত অবকাঠামোর উন্নয়নের কাজে। শত শত মাইল পাকা রাস্তা, বড় নদী, ছোট নদী, খাল, বিল ও জলাশয়ের উপর নির্মাণ করা হয় অসংখ্য পাকা ও টানা ব্রীজ, কাল ভার্ট। গ্রামের মানুষের মধ্যে প্রসার ঘটতে থাকে শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বানিজ্যের।

গ্রামের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী সহজেই শহরে বন্দরে পৌঁছতে মানুষের কষ্ট কিছুটা লাঘব হয়। উপজেলা থেকে কিছু কিছু ইউনিয়নে পাকা রাস্তার নির্মাণ করা হয়। এর ফলে গ্রামের মানুষের

ইউনিয়নে এসে উপজেলা, জেলা ও রাজধানীতে পৌঁছার পথ সহজ হয়। গ্রামের শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেকার সমাজ শহরে গিয়ে নানা কর্মে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামান্য হলেও পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়।

সেচের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদনবৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশের কিছু কিছু গ্রামকে পল্লী বিদ্যুতের আওতাভুক্ত করা হয়। পানি সেচের সহজ লভ্যতার ফলে এ সকল গ্রামের মানুষ ধান সহ নানা জাতীয় ফসল, শাক-সব্‌জি, ফল-মূল বেশী উৎপাদন করায় তাদের জীবনযাত্রার মান পূর্বের তুলনায় বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া গ্রামে কিছু ক্ষুদ্র কল কারখানা গড়ে উঠে। এর ফলে এক দিকে ব্যবসা বানিজ্যের প্রসার এবং অন্যদিকে গ্রামের দরিদ্র বেকাররা এসব কল কারখানায় কাজ করে পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে খাস জমি বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ভূমিহীন কোন পরিবারকে বসত ভিটা থেকে উচ্ছেদ না করা জন্য আইন পাশ করা হয়। ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে কৃষকদের অবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ভূমি সংস্কার কমিশন গঠন করা হয়। কমিটির সুপারিশে দেশে ভূমি সংস্কার সাধিত হয়। ভূমি মালিকানা, সীমানা নির্ধারণ, উদ্বৃত্ত জমি ভূমি হীনদের মধ্যে বন্টন, বর্গাচাষীদের অধিকার সংরক্ষণ, ভূমি শ্রমিকদের মজুরী নির্ধারণ ছিল তাঁর উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

ভবঘুরে মানুষকের আশ্রায়ানের জন্য গুচ্ছ গ্রাম কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। সরকারী উদ্যোগে 'গুচ্ছ গ্রামে' বসবাসের জন্য মানুষকে ঘর-বাড়ী নির্মাণ করে দেয়া হয়। জীবন চলার আনুসাঙ্গিক সরঞ্জামাদি প্রদান এবং জীবিকা নির্বাহের অন্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

বন্যার কবল থেকে কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য জলাশয়ের চারপাশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করা হয়। অধিক পানি অবমুক্ত করণের জন্য বাঁধগুলোতে প্রয়োজন অনুসারে স্লুইস গেইট নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৮ সালের ভয়াবহ বন্যার সময় গ্রামের মানুষের জানমাল রক্ষার জন্য দ্রুত গতিতে উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি নিজে গ্রামে গ্রামে গিয়ে ত্রাণ বিতরণে অংশ গ্রহণ করেন। সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ কালীন সময় মানুষের আশ্রয়ের জন্য পাকা বাড়ী নির্মাণ করা হয়। গ্রামের বেকার সমাজের কর্মসংস্থানের জন্য গঠন করা হয় 'যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'। প্রশিক্ষণ শেষে একজন যুবক-যুবতীকে জীবন নির্বাহের জন্য পুঁজি সরবরাহ করা হয়।

নারী নির্যাতন রোধে আইন পাশ করা হয়। জনসংখ্যার ঘনত্ব কমানের জন্য বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়। যৌতুক ও অন্য যে কোন কারণে মেয়েদের শরীরে এসিড নিক্ষেপের জন্য সর্বোচ্চ

শাস্তি মৃত্যুদন্ড প্রদানের বিধান রেখে আইন পাশ করা হয়। সরকারী হাসপাতালে গ্রামের গরীব মানুষের সেবা প্রদানের জন্য বহি:বিভাগ চালু করে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। পরিবেশ দূষণরোধে সরকারী খরচে খাস জমিতে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয় এবং জনগণকেও বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত করা হয়।

পরিশেষে উল্লেখ্য, সামরিক শাসনের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে দেশের রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গুলো তাঁর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তুলেন। প্রায় ৯ বৎসরে শাসনামলে রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন গুলো বিক্ষোভ, মিছিল, সভা-সমাবেশ, লাগাতার হরতাল-অবরোধ কর্মসূচীসহ প্রচন্ড আন্দোলন গড়ে তুলেন। এতে গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অবস্থা প্রেক্ষাপটে তিনি ৬ ডিসেম্বর ১৯৯০ সনে পদত্যাগ করলে তাঁর শাসন আমলের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমল (১৯৯১-১৯৯৬ ও ২০০১-২০০৬) : বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে গ্রামোন্নয়নে তাঁর প্রয়াত স্বামী সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের গৃহীত কর্মসূচীগুলো বহাল রেখে কিছু নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করা হয়। খাল কেটে পানি সংরক্ষণ করে কৃষকদের কৃষি কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। দরিদ্র কৃষকদের খেলাপী কৃষি ঋণের সুদ মওকুফ ও নতুন ঋণ দান কর্মসূচী চালু করা হয়। পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য রাস্তা পাকাকরণ, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত এবং ব্রীজ ও কালভার্ট নির্মাণ করা হয়। গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 'শিক্ষা উপবৃত্তি' প্রকল্প চালু করা হয়। বিধবা, তালাকপ্রাপ্তা, অরক্ষিত (Vurnerable), বয়স্ক অক্ষম নারী-পুরুষের মধ্যে বিনা মূল্যে খাদ্য বিতরণ ও ভাতা প্রদান কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) কর্মসূচী চালু করে একদিকে গ্রামোন্নয়ন অন্যদিকে গ্রামের বেকারদের খাদ্য সংস্থান করে দারিদ্র্যতা দূরীকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দরিদ্রদের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য 'ছাগল পালন' কর্মসূচী গ্রহণ করে বিনা মূল্যে তাদের মধ্যে ছাগল বিতরণ করা হয়। গ্রামে পল্লী বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করে জল সেচের মাধ্যমে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করা হয়। পূর্বের সরকার কর্তৃক বাতিলকৃত 'গ্রাম সরকার' ব্যবস্থা পুন:প্রবর্তন করা হয়। দ্রুততম সময়ের মধ্যে গ্রামোন্নয়নের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়।

বেগম খালেদা জিয়ার প্রথম বারের শাসনামলে কৃষকরা বোরো ফসল উৎপাদনের সময় কৃত্রিম সার সংকট সৃষ্টি হলে তারা (কৃষক) সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ

আন্দোলন থামাতে পুলিশ নির্বিচারে কৃষকদের উপর গুলিবর্ষণ করলে ১৭ জন কৃষকগুলিতে মৃত্যু বরণ করেন।

শেখ হাসিনার শাসন আমল : (১৯৯৬-২০০১ ও ২০০৯-) : বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রথমবারের মত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আরোহণ করেন। গ্রামের জনগণের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধির জন্য 'একটি বাড়ি একটি খামার' কর্মসূচী চালু করে উন্নয়নের কৌশল গ্রহণ করতে জনগণকে উৎসাহ প্রদান কর হয়। যাতে করে প্রতিটি পরিবার চাহিদাঅনুযায়ী নিজের বাড়ী থেকে সবকিছু সরবরাহ করতে পারে। গ্রামের একজন মানুষ যেন কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজের প্রয়োজনীয় জিনিষ নিজের বাড়ি থেকেই মেটাতে সক্ষম হয়।

কৃষকরা যাতে ব্যাপকভাবে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারেন সে জন্য প্রচুর পরিমাণ রাসায়নিক সার সরবরাহ করা হয়। সরকার সার ও ডিজেল তেলের উপর কিছুটা ভর্তুকি প্রদান করে কৃষকদের কল্যানার্থে প্রকল্প গ্রহণ করেন। কৃষি ঋণ বিতরণের সুবিধা প্রাপ্তিতে তারা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সচেষ্ট হন। তাঁর দ্বিতীয় মেয়াদের শাসনকালে প্রথম দিকে কৃষিক্ষেত্রে ভর্তুকিবাবদ কৃষকদের মাঝে নগদ টাকা বিতরণের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মাত্র দশ টাকায় কৃষকরা ব্যাংকে একাউন্ট খুলে ঋণপ্রাপ্তি সুবিধালাভ করেন। পাশাপশি বর্গা চাষীদেরকেও সরকারের ঋণদান কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করা হয়। অসহায় দরিদ্র ভূমিহীন জনগোষ্ঠীকে আবাস স্থানের সুবিধাপ্রদানের জন্য 'আশ্রায়ন প্রকল্প' চালু করা হয়।

তড়িৎ গতিতে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পূর্বের সরকারের মত সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। দু:স্থ ও বিধবা মহিলাদের মধ্যে বিনামূল্যে খাদ্য দান এবং অসহায় বয়স্কদের মধ্যে ভাতাপ্রদান কর্মসূচী অব্যাহত রাখা হয়। গ্রামের মেয়েদের শিক্ষিত করে নারী সমাজের জীবনযাত্রার মান বাড়ানো জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে 'উপবৃত্তি' কর্মসূচী চালু করা হয় এবং টাকার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামে ছয় হাজার লোকের জন্য একটি 'কমিউনিটি হেল্থ কমপ্লেক্স' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। অবশ্য উপজেলা ভিত্তিক বহু সংখ্যক গ্রাম এ কর্মসূচীর আলোর মুখ দেখলেও বাকী গ্রাম গুলোতে এখন পর্যন্ত কর্মসূচীর কার্যক্রম শুরু হয়নি। শিশুদের ৬টি রোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলোর অনুসৃত টিকাদান কর্মসূচী বর্তমানেও অব্যাহত রাখা হয়।

১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দীর্ঘদিন পর সরকার গঠন করে ৮ সদস্য বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করেন। এ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী গ্রাম পর্যায়ে গ্রাম পরিষদ, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, থানায় উপজেলা পরিষদ এবং জেলায় জেলা পরিষদ গঠন করা হয়।

নিচের রেখা চিত্রের সাহায্যে এ সরকারের চারস্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার কাঠামো দেখানো হলো :

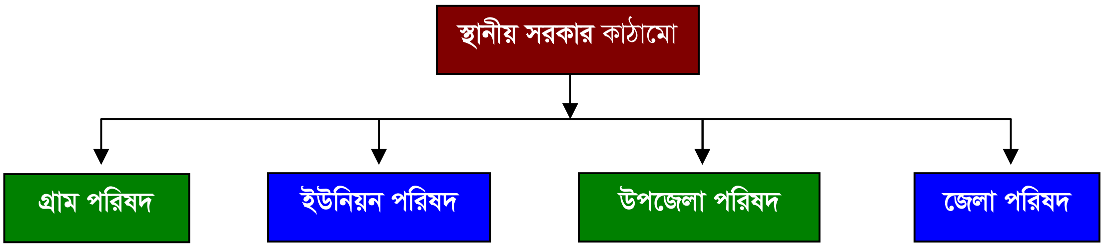

চিত্র নং ২.৪

গ্রামের শ্রেণি বিভাগ : পর্যবেক্ষণ ও গবেষণায় বাংলাদেশের গ্রাম গুলোর উন্নয়নের দৃশ্য পটে কিছুটা বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। উন্নয়নের ভিন্নতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের গ্রামগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। নিচে চিত্রে শ্রেণি বিভাগটি দেখানো হলো :

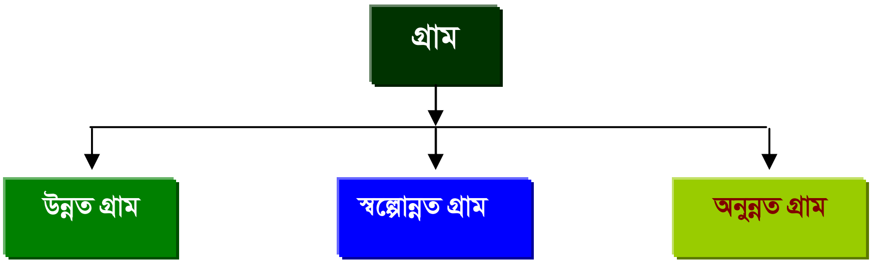

চিত্র নং-২.৫

উন্নত গ্রাম : উন্নত গ্রামগুলো একেবারেই শহর ঘেঁষা। শহরে জনসংখ্যার চাপে এসব গ্রামে আবাসন বৃদ্ধির ফলে শহর সংলগ্ন গ্রামগুলোতে উন্নয়নের হাওয়া বইছে। শহরের মত এ সকল গ্রামের মানুষ আধুনিক অবকাঠামোগত সুযোগসুবিধা ভোগ করছে। তারা পাকা রাস্তা, বিদ্যুৎ সুবিধা, পাকাবাড়ী, রঙ্গিন টিভি, কম্পিউটার, উচ্চশিক্ষার সুবিধা, ডিশ এ্যান্টিনার মাধ্যমে দেশ-বিদেশের খবরা-খবর এবং উন্নত সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড উপভোগ করতে পারে। গ্রামগুলোর জমির দাম বৃদ্ধির সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন হয়েছে। ছেলেমেয়েরা শহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। তারা সরকারী বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী করে পরিবারের আয় বর্ধনে সহায়তা করছে। রোগ-

শোকে আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে এসব গ্রামের মানুষ উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হচ্ছে। এমন গ্রামের মানুষ উন্নত জীবনযাপনের সুযোগ ভোগ করছে।

স্বল্পোন্নত গ্রাম : রাজধানী ঢাকা থেকে বিভিন্ন জেলায়, জেলা থেকে বিভিন্ন উপজেলায়, উপজেলা থেকে বিভিন্ন ইউনিয়নে এবং কোথাও বা গ্রামের দিকে বহমান পাকা রাস্তার আশ-পার্শ্বে অবস্থিত গ্রামগুলোকে স্বল্পোন্নত গ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। কারণ হিসেবে উল্লেখ্য, পাকা রাস্তার পার্শ্বে গ্রামসমূহে হাট-বাজারসহ বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠায় জমির দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব গ্রামে বিদ্যুতের সুবিধা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠায় মানুষ সামান্য হলেও উন্নত জীবনের সুবিধা ভোগ করছে। পাকা রাস্তা ব্যবহার করে গ্রামের মানুষ উপজেলা বা জেলা শহরের সাথে শিক্ষা, চিকিৎসাসহ ব্যবসা বানিজ্যের সুযোগসুবিধা ভোগ করে জীবনমানের উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে।

অনুন্নত গ্রাম : অনুন্নত গ্রামগুলো দেশের প্রত্যন্ত (Remote) অঞ্চলে অবস্থিত। যাকে নিভৃত পল্লী বা অজপাড়া গাঁ বলা হয়ে থাকে। গ্রামগুলো আধুনিক সভ্যতা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছে। একমাত্র কৃষিনির্ভর মানুষ প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে জীবনধারণ করে। গ্রামীণ অবকাঠামোর মধ্যে পায়ে হাটা মেঠোপথই চলাচলের একমাত্র মাধ্যম। দু'এক কিলোমিটার কাঁচা সড়ক পথ থাকলেও বর্ষাকালে হাঁটু সমান কাঁদা ও শুষ্ক মৌসুমে ধুলো মাড়িয়ে ঐসব সড়ক দিয়ে গ্রামের মানুষকে যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া বর্ষাকালে বৈঠা টানা নৌকা দিয়ে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে চলাচল করতে হয়। অবশ্য বর্তমানে ইঞ্জিল চালিত অনেক নৌকা গ্রামের জলাশয়ে চলাচল করতে দেখা যায়।

গ্রামে বিদ্যুতায়নের জন্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হলেও এখনও গ্রামের মানুষ পুরোপুরি তার সুফল পায়নি। চোখে পড়া স্বল্পসংখ্যক গ্রামে বিদ্যুৎ ভোগের ব্যবস্থা থাকলেও 'Load Sheeding' এর কারণে দিনে তিন-চার ঘন্টার বেশী মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপযোগিতা ভোগ করতে পারেনা।

অদ্যাবধি বৃটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ই গ্রামের মানুষের শিক্ষার সুযোগলাভের একমাত্র উৎস। আবার সব গ্রামে বিদ্যালয় না থাকায় এক গ্রামের ছেলেমেয়েদেরকে অন্য গ্রামে গিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে হয়। অজপাড়া গাঁয়ে কোন উচ্চ বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় যথাযথভাবে না থাকায় অনেকেরই প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন শেষে লেখাপড়ার ইতি টানতে হয়। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার ও স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা থেকে এসব গ্রামের মানুষ বঞ্চিত

অজপাড়া গাঁয়ের মানুষ মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা এবং কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করায় গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে তাদের বাস্তব ধারণার এখনও বোধোদয় হয়নি। সার্বিকভাবে অনুন্নত গ্রাম ও

শহরের মানুষের তুলনামূলক জীবনযাত্রার ক্যালরীভিত্তিক খাবারের মানে দরিদ্র ও চরম দারিদ্র্যতার চিত্র বেরিয়ে আসে।

সারণী নং- ২.২: নিচের সারণীতে গ্রাম ও শহরের মানুষের ক্যালরী ভিত্তিক খাদ্য গ্রহণ দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্য (%) দেখানো হলো:

দারিদ্র্যের ধরণ	এলাকা	১৯৮১-৮২	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৮-৮৯	১৯৯১-
দারিদ্র্য	পল্লী	৭৩.৮	৫৭.০	৫১.০	৪৮.০	৪৭.৮
	শহর	৬৬.০	৬৬.০	৫৬.০	৪৭.৬	৪৬.৭
চরম দারিদ্র্য	পল্লী	৫২.২	৩৮.০	২২.০	২৮.৬	২৮.২
	শহর	৩০.৭	৩৫.০	১৯.০	২৬.৪	২৬.২

উৎস : বাংলাদেশ পরিসংখ্যার ব্যুরো (পরিসংখ্যান পকেট বই), সন-১৯৯১, পৃ, ৭।

উপসংহার

গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এদেশের শহর, বন্দর, শিল্প, বাণিজ্য এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের নানামুখী কর্মধারা। আদি কাল থেকে গ্রামে সামান্য ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণের প্রচলন বিদ্যমান থাকলেও তার সুফল বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ ঘটাতে মানুষ সক্ষম হয়নি। ঐ শিক্ষা পদ্ধতি গ্রামের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মধ্যে মানব সম্পদ উন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। ধর্মীয় শিক্ষার মূল ভাবধারা থেকে এ সমাজের মানুষ ছিল বিচ্ছিন্ন। সভ্যতার ক্রম-উন্নয়নে নদীমাতৃক দেশে অঞ্চল ভিত্তিক নদ-নদী ও জলাশয়ের তীরে হাট-বাজার ও ব্যবসা-বাণিজ্যিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। ঐসব স্থানে ক্রমান্বয়ে গণসংযোগ বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সভ্যতার লালন ক্ষেত্র ছোট ছোট শহর। কালের আবর্তনে শহরের অবয়বের প্রসার ঘটে এবং গড়ে উঠে জ্ঞান বিজ্ঞানের রকমারি শাখা-প্রশাখা। গ্রামের সচেতন স্বল্প সংখ্যক ধনী মানুষ শহরে গিয়ে আবাস গড়ে আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে গ্রাম-শহর মিলে উন্নত জীবনযাপন শুরু করে।

অপরদিকে গ্রামের হত দরিদ্র অসচেতন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক বিরাট অজ্ঞ জনগোষ্ঠী গ্রামীণ জনপদকে জীবনধারণের শেষসম্বল হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়। অশিক্ষা, ক্ষুধা, রোগ-শোক ইত্যাদির কঠিন বেড়া জালে আবদ্ধ হযে মানুষগুলো জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করে আদিকাল থেকে অদ্যাবদি কোন রকমে বেঁচে আছে। বিভিন্ন রাজা-বাদশাহ বা শাসকগণ যুগে যুগে শহর উন্নয়নের নানাবিধ কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করলেও সে ক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসুচীর বাস্তবায়ন ছিল নিতান্তই নগণ্য। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর গ্রামোন্নয়নের আদি অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সরকার নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করায় গ্রামে গ্রামে উন্নয়নের হাওয়া কিছুটা হলেও বইতে শুবু করেছে। তবে গ্রামে জনসংখ্যার তুলনায় অবকাঠামোগত উন্নয়ন ক্ষেত্রবিশেষ ব্যতিরেকে এমনভাবে দুর্নীতির আক্রায় আবদ্ধ যা বাকী জনগণের উন্নয়নের জন্য হতাশা ছাড়া কিছুই নয়। প্রযুক্তিগত শিক্ষা, উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ-সুবিধা, ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাপকভাবে প্রসার না ঘটায়, এখনও গ্রামবাসীকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই শহরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হয়।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) Deb, A.T. English to Bengali Dictionary, p. 402.

২) অধিকারী, অধ্যাপক নিরঞ্জন, উচ্চতর বাংলা ব্যকরণ ও রচনা, ঢাকা: মিজান লাইব্রেরী, ২০০৯, পৃ. ১১৮২।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১১৬৭ ।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১১৪৯।

৫) প্রাগুক্ত পৃ, ১১৫৬।

৬) প্রাগুক্ত পৃ, ১১৫৭।

৭) আলী, প্রফেসর ড. ওয়াজেদ, মানব সভ্যতার ইতিবৃত্ত ও প্রাচীন মধ্যযুগ, ঢাকা: নূরুন নাহার চৌধুরী, ২০০৮, পৃ, ৩৮।

৮) প্রাগুক্ত পৃ, ৩৯।

৯) রহমান, ড. আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন্ পথে, ঢাকা: এস.এম. আমিনুল ইসলাম, ২০০৮, পৃ, ৪৫।

১০) প্রাগুক্ত পৃ, ৪৫।

১১) করিম, নাজমুল, সমাজ বিজ্ঞানের সমীক্ষণ, ঢাকা: আব্দুল কাদির খান, ১৯৭২ (প্রথম সংস্করণ), পৃ, ১১৮।

১২) রউফ, জাহান আরা, বাংলাদেশের আদিবাসী, ঢাকা: হোপ মাল্টিমিডিয়া, ২০০৪, পৃ, ৮৭।

১৩) রায়, অজয়, বাংলাদেশের অর্থনীতি অতীত ও বর্তমান, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯, পৃ, ১৫৩।

১৪) নবী, প্রফেসর মোহাম্মদ নূর, বাংলাদেশের ইতিহাস, প্রাচীন কাল থেকে ১৭৯৫, ঢাকা: অ. আ. প্রকাশনী, ২০০৫, পৃ, ১৯।

১৫) সুলতানা, ড. সাবিহা, পরিবেশ পরিচিতি সমাজ, ঢাকা: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বুক, ২০০৮, পৃ, ৬৫।

১৬) সেন, ড. রঙ্গ লাল, বাংলাদেশের সামাজিক স্তর বিন্যাস, ঢাকা: নিউজ এজ পাবলিকেশন, ২০০৮, পৃ, ২১৬।

১৭) আলম, জাহাঙ্গীর, কৃষি উন্নয়ন: অর্থনৈতিক সংস্কার ও বাণিজ্য উদারীকরণ, ঢাকা: শামীমা হক, ২০০৭, পৃ, ৩৫।

১৮) রহমান, এ. এইচ. এম.মোস্তাফিজুর এবং হুসাইন, মোঃ ইকবাল, সমাজ ও সম্প্রদায়, ঢাকা: আবদুল হান্নান, ২০০৪, পৃ, ৯৯।

১৯) Faizullah, Mohammad, Development of Local Government, Dhaka: Shantinagor Published, 1987, P. 84.

২০) Ibid P. 63.

২১) Ibid P. 64.

২২) Ibid P. 66.

২৩) Ibid P. 67.

২৪) Ibid P. 67.

২৫) Ibid P. 68.

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক সাহিত্য

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক সাহিত্য

আরব্ধ: পূর্বের অধ্যায় গ্রাম সম্পর্কে প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি যাবতীয় দৃশ্যপট অংকন করে যা আলোচনা করা হয়েছে তা হলোঃ সূচনা, গ্রাম পরিচিতি, গ্রামের উদ্ভব. গ্রামের মানুষের বৈশিষ্ট্যসমূহ, ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে গ্রামের ক্রম-উন্নয়ন, প্রাচীনযুগ, মধ্যযুগ, মুঘল শাসন আমল, বৃটিশ শাসন আমল, পাকিস্তান শাসন আমল, বাংলাদেশ শাসন আমল যেমনঃ শেখ মুজিবুর রহমানের শাসন আমল, মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসন আমল, লে. জেনারেল হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদের শাসন আমল, বেগম খালেদা জিয়ার শাসন আমল, শেখ হাসিনার শাসন আমল এবং গ্রামের শ্রেণি বিভাগ যথাঃ উন্নত গ্রাম, স্বল্পোন্নত গ্রাম ও অনুন্নত গ্রাম ইত্যাদি উপশিরোনাম। সংশ্লিষ্ট অধ্যায় গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক সাহিত্যে বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবায়ন, হাসনাত আব্দুল হাই, ড. ওয়াকিল আহমেদ ও ড.আতিউর রহমান এর লিখিত গ্রামোন্নয়নের প্রেক্ষাপট নিচে আলোকপাত করা হলোঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরঃ উপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের প্রথম নোবেল বিজয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যিনি জমিদার পরিবারের আরাম-আয়েশের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করেন এবং নিজেও একজন জমিদার হয়ে গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র মানুষের কল্যাণার্থে আজীবন কাজ করেছিলেন। এ জন্য প্রথম পথিকৃৎ হিসেবে দেশের উন্নয়নে তিনি গ্রামোন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। গ্রহণ করেছিলেন নানামুখী উন্নয়নমূলক কর্মসূচী। আর এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নে তিনি সদা ব্যতিব্যস্ত থাকতেন। নিচে কবি গুরুর গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর কিছু কিছু দিক উল্লেখ করা হলোঃ

পতিসরে গিয়ে পল্লী সমাজের উন্নতিকল্পে গ্রাম অধ্যক্ষ (প্রধান) গণকে প্রজাদের কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে কী করতে হবে, তদ্‌বিষয়ে ১৩১৫ বাংলা সনে তিনি কোন এক কর্মীকে যে উপদেশ পূর্ণ পত্র লিখেছেন তা হলো, "প্রজাদের বাস্তুবাড়ী, ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়, ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল-আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতি কাজে লাগাইবা, তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শেখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভ হইবে। কাছারিতে আমেরিকার ভূট্টার বীজ আছে, তা পুনর্বার লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করিতে হইবে কৃষি বিজ্ঞানের উপদেশমত চেষ্টা করিও।"[১]

এক শতাব্দী পূর্বে কবি গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে যে সব কথা ভেবেছিলেন, তার মীমাংসা ও সমবায় মারফতে সে সকল কর্মসূচী সমূহ এখন পর্যন্ত সরকার পরিচালনা করছেন। তাছাড়া ব্যাংক মারফত টাকা প্রাপ্তির সুব্যবস্থার কথা যেভাবে চিন্তা করছিলেন, তা যে গ্রামোন্নতির শ্রেষ্ঠ পন্থা, সেটা রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদগণ আজও স্বীকার করছেন। গ্রামোন্নয়ন সংশ্লিষ্ট গবেষণা কর্মে গবেষকগণ অধ্যাবধি কবির কর্মপন্থা অনুসরণ করে চলছেন।

১৪ জুলাই-১৯০৮ ইং সনে কবি তাঁর গ্রামোদ্যোগের উন্নয়ন পরিকল্পনার কথা মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছিলেন এভাবেই, "বিরাহিমপুর পরগণাকে পাঁচটি মন্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মন্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি। এই অধ্যক্ষেরা সেখানে পল্লী সমাজ স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিত সাধনে সচেষ্ট হয়ে উঠে পথ-ঘাট সংস্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিপদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিস্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা বসায় ইত্যাদি সর্বপ্রকারে গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে ।"[২]

কবির পল্লী সংস্কার পরিকল্পনায় পাঁচটি অঙ্গ ছিল, যেমনঃ চিকিৎসা বিধান, প্রাথমিক শিক্ষা দান, পূর্তবিভাগ স্থাপন বা কুপাদি খনন, রাস্তা ঘাট প্রস্তুত ও মেরামত, জংগল সাফ প্রভৃতি বিষয়ে সর্বজন মঙ্গল কর্ম সমাধান, ঋণদায় হতে দরিদ্র চাষীকে রক্ষার জন্য সমবায় সমিতি স্থাপন ও সর্বনাশা মামলাসমূহ নিস্পত্তির জন্য সালিশী গঠন। মোট কথা গ্রাম স্বরাজের পরিপূর্ণ পরিকল্পনা।

পতিসরের অবকাঠামো উন্নয়নে কবি গুরুর একটি পত্রে এভাবেই উল্লেখ আছে, "পতিসরে আমি কিছুকাল হইতে পল্লী সমাজ গছিবার চেষ্টা করিতেছি। যাহাতে দরিদ্র চাষী প্রজারা নিজেরা একত্রে মিলিয়া নিজেদের দারিদ্র্য, অস্বাস্থ্য ও অজ্ঞান দূর করিতে পারে। নিজেদের চেষ্টায় রাস্তাঘাট নির্মাণ করে এই আমার অভিপ্রায়। প্রায় ৬০০ পল্লী লইয়া কাজ ফাঁদিয়াছি। আমরা যে টাকা দেই ও প্রজারা যে টাকা উঠায় তাহাতে আমাদের ১১,০০০/- (এগার হাজার) টাকার আয় দাঁড়াইয়াছে। এই টাকা ইহারা নিজে কমিটি করিয়া ব্যয় করে। ইহারা ইতিমধ্যে অনেক কাজ করিয়াছে। কিন্তু অপব্যয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা যথেষ্টা আছে। এই জন্য কিছুদিন হইল আমি নিজে গিয়া সকলকে ডাকিয়া নতুন নিয়ম বাঁধিয়া আসিয়াছি।"[৩]

চিকিৎসার জন্য কালীগ্রাম পরগণার তিনটি গ্রাম পতিসর, কামতা ও কতোয়াল বেছে নেয়া হয়। হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগ এবং দু'একটি রোগীকে রাখার মত ব্যবস্থাও করা হয়। দুই শতাধিক অবৈতনিক কাটমোল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে নিরক্ষরতা দূর করার কাজ শুরু করা হয়। রাত্রে ওখানে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য স্কুল বসানো হতো।

গ্রামের মানুষের সেবার জন্য কবি কীভাবে কাজ করতে চেয়েছেন এক আত্মীয়কে লেখা নিম্ন লিখিত পত্র খানি তার সাক্ষ্য বহন করে। তিনি লিখেছেন, "বোলপুরে একটা ধানভাঙ্গা কল চলছে। সেই রকম একটা কল এখানে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এই দেশ ধানেরই দেশ। বোলপুরের চেয়ে অনেক বেশী ধান এখানে জন্মায়। আমার ইচ্ছা ৫/১০ টাকা শেয়ার করে এখানকার অনেক চাষা মিলে এ কলটা যদি চালায় তা হলেই ওদের মধ্যে কাজ করার যথার্থ সূত্রপাত হতে পারবে। আমাদের ব্যাংক (পতিসর কৃষি ব্যাংক) থেকে ধার নিয়ে এ ধান ভাঙ্গার ব্যবসাটা এখানে চালানো যেতে পারে। নগেন্দ্র এবং জানকী দু'জনেরই এ বিশ্বাস এই কাজটা এখানকার যোগ্য এবং এতে প্রজাদের উপকার হবে। এ কলের সন্ধান দেখিস্। তারপরে এখানে চাষাবাদের কোন Industry শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলুম। এখানে ধান ছাড়া আর কিছু জন্মায় না। এদের থাকবার মধ্যে শুধু এটেল মাটি আছে। আমি জানতে চাই Pottery জিনিষটাকে Cottage Industry রূপে গণ্য করা চলে কিনা। একবার খবর নিয়ে দেখিস্। অর্থ্যাৎ ছোটখাটো Furnance আনিয়ে এক গ্রামের লোক মিলে এ কাজ চালানো সম্ভবপর কিনা। মুসলমানরা যে রকম সানকীর জিনিস ব্যবহার করে, এরা যদি সেই রকম মোটা গোছের প্লেট, বাটি তৈরী করতে পারে তা হলে উপকার হয়।"[৪]

রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের ঝগড়া বিবাদ নিস্পত্তি করে তাদের মধ্যে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জমিদারীর শুরুতেই পতিসরে সালিশি বিচার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ফৌজদারী ছাড়া কোন গ্রামীণ বিবাদ যাতে আদালতে না যায়, তার জন্য পরগণার কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি বিচার সভা চালু করেন। যাতে দরিদ্র প্রজাগণ আদালতে দৌড় ঝাপ পেড়ে অযথা হয়রানির শিকার না হন এবং আইনের ফাঁক ফুকুরে ন্যায্য বিচার থেকে বঞ্চিত না হন। এ বিচার ব্যবস্থায় বিবাদ মূল্যায়নের জন্য একটি আপীল বিভাগ ছিল। আপীল বিচারে কেহ সন্তুষ্ট না হলে জমিদার স্বয়ং আপীল শুনানী তদারকি করে রায় প্রদান করতেন। বিবাদ ফয়সালায় কবির এমন হিতৌষী পরিকল্পনায় গ্রামের মানুষ খুব খুশী হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "আদালতের সাহায্য ছাড়া বিনা ব্যয়ে বিনা বিলম্বে মামলার বিচারের এই ব্যবস্থা আরম্ভ হবার পর থেকে প্রজারা এর উপকারিতা অনুভব করছিল।"[৫]

কালীগ্রাম পরগণা তথা পতিসর কাচারী বাড়ী রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব জমিদারি। সে জন্য পতিসর এলাকার মানুষের সাথে রবীন্দ্রনাথের প্রাণের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পতিসরই হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার প্রাণকেন্দ্র। এখানে প্রজাদের কল্যাণে অনেক জনহিতকর কাজ করেন তিনি। যেমন : পতিসরে কৃষি ব্যাংক স্থাপন, রাস্তাঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দাতব্য চিকিৎসালয়

স্থাপন, রেশম চাষ, সমবায় পদ্ধতি, বিচার ব্যবস্থা, পুকুর-দিঘি খনন, চাষাবাদের জন্য কলের লাংগলের প্রচলন, তাঁতের কাপড় বোনা, মাছের ব্যবসা, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা স্থাপন ইত্যাদি।

জমিদার জীবনের শুরুতেই রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন প্রজারা সকলেই ঋণী। গরীব প্রজারা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে পারতেন না। কারণ সুদের হার ছিল অত্যন্ত বেশী। আর সুদের সুদ আদায় করা হতো। প্রজাদের এই দু:খ দুর্দশা দেখে প্রজা দরদি কবি রবীন্দ্রনাথের প্রাণ কেঁদে উঠে। ধার করা টাকা দিয়ে তিনি পতিসরে একটি কৃষি ব্যাংক স্থাপন করলেন।

কবি পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতৃস্মৃতি গ্রন্থে লিখেছেন, “হাজার টাকা ধার নিয়ে পতিসরে একটি কৃষি ব্যাংক খুলে বসলেন। পরবর্তীতে নোবেল পুরস্কারের এক লাখ আট হাজার টাকা পতিসর কৃষি ব্যাংকে ডিপোজিট হিসেবে রেখেছিলেন। প্রজারা কৃষি ব্যাংক থেকে কর্জ নেওয়া শুরু করলে মহাজনরা তাদের কারবার গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়।”[৬]

রবীন্দ্রনাথের গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিয়ে প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই বলেছেন, “পাঠকের স্মরণ আছে কিছুকাল হইতে কবির মন পুনরায় গ্রামোদ্যোগে গিয়াছে; তদুদ্দেশ্যে গত ভাদ্র ও অগ্রহায়ন মাসে তিনি জমিদার পরগণায় ঘুরিয়াছিলেন। পরগনায় ১৯০৭-০৮ ইং সনে একবার পল্লী মঙ্গলের চেষ্টা করিয়া কীভাবে ব্যর্থ হন তাহার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। এবারও পল্লী উন্নতির জন্য মন সাড়া দিতেছে। বঙ্গীয় হিতসাধন মন্ডলীর আয়োজনে ‘কর্মযজ্ঞ’ ও ‘পল্লীর উন্নতি’ নামে দুইটি বক্তৃতা দেবার পর বোধ হয় এ বিষয়ে পুনরায় কবির মন আকৃষ্ট হইয়াছিল।”[৭]

রবীন্দ্রনাথ গ্রামোন্নয়নের যে ধারাকে বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছিলেন (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পল্লী সঞ্জীবন অর্থ্যাৎ গ্রামের মধ্যে প্রাণের নব জাগরণ) তাকে আধুনিক অর্থ বিজ্ঞানের পরিভাষায় পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর সামগ্রিক দৃষ্টি ভঙ্গী বা সিস্টেম এ্যাপ্রোচ হিসেবেই মানতে হয়।

হাসনাত আব্দুল হাই : গ্রাম বাংলার মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে যিনি সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন তিনি হলেন হাসনাত আব্দুল হাই। গ্রামোন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সব সময় তিনি নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন। শত কর্ম ব্যস্ততার মাঝেও তিনি যখনই সুযোগ পেয়েছেন, তখনই গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতা নিয়ে লেখার চেষ্টা করেছনে। তিনি বাংলাদেশের প্রত্যন্ত গ্রাম এলাকা ঘুরে ঘুরে উন্নয়ন/অনুন্নয়ন পরিকল্পনার তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবতার চিত্র তিনি তাঁর- Dateline Gram Bangla’ বইয়ে এভাবে তুলে ধরেছেন:

"For most of the projects, the villagers expected resources from out side, particularly from the Govt. There is nothing immoral about it. The national plan itself is dependent on foreign aid roughly in the same proportion. But the problem lies in the gap between resource availability and the demand for the same. At present Govt. is allocating Tk. 50 lakhs on an average to each upazila under the annual development programme. However much backward a union may be, it is unrealistic to expect development funds of the magnitude as revealed in the village plans from Dhamson Union. It is equally not feasible for the villages to mobilise all the resources locally to meet the gap. What values then the plans so elaborately and painstakingly drawn up by the villagers have? Even the sceptics will admit that the village surveys on which the plans are based provide important and detailed information about the socio- economic and environmental situation of the villages which may provide the data base for implementation of specific programmes by the Govt. or the local Govt. bodies. Some of the major projects included in the village plans, may also be picked up by them for in corporation in their overall plan for implementation. Finally, the projects that lend themselves to implementation through local resources can be taken up by the villagers without waiting for external help." [8]

ড. ওয়াকিল আহমেদঃ শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, সাহিত্যিক ড. ওয়াকিল আহমেদ তাঁর "লোককলা প্রবন্ধাবলি" গ্রন্থে গ্রামীণ কৃষি কর্মসূচীর উদ্ভব ও বাস্তবতা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাচীনকালে কীভাবে প্রথম কৃষি ফসল উৎপাদনের কলা-কৌশলের ধারণা মানুষের মাঝে উদ্ভূত হয়, সে সম্পর্কে তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে। পুরুষের আগে নারী কৃষি ফসল উৎপাদন কর্মসূচী উদ্ভাবন করেন। এক্ষেত্রে নারী গবেষক হিসেবে লক্ষ্য করে, ফল-মূলের পরিত্যক্ত বীজ থেকে গাছ জন্মে ফসল উৎপন্ন হওয়ার কৌশলটি। গাছ জন্মানোর জন্য যে পানির উপযোগিতা রয়েছে তা তাদের মনে বদ্ধমূল হতে থাকে। দীর্ঘদিন অনাবৃষ্টির কারণে গাছের কঁচি চারা মরে যাবার দৃশ্যও সে লক্ষ্য করে। পরবর্তীতে নারী-পুরুষ মিলে ফসলের বীজ সংগ্রহ করে এবং

ফসল উৎপাদনে খরার কবল রোধে গাছে পানি দিয়ে লালন-পালন করে। কখনও বা ফসল রক্ষার জন্য তারা আল্লাহর কাছে পানি দানের অর্থ্যাৎ বৃষ্টি বর্ষণের প্রার্থনা করে। এ পদ্ধতিতে তারা শস্য উৎপাদন করে খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। কালক্রমে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ভূমিতে জৈব সার প্রয়োগের কর্মসূচীও মানুষ গ্রহণ করে।

কৃষি কর্মসূচী উদ্ভবের কথা বলতে গিয়ে ড. ওয়াকিল আহমেদ বলেন, "মানব জীবনে কৃষিক্ষেত্রে ভাল উৎপাদন ও বেশী উৎপাদনের আকাঙ্খা চিরন্তন। পন্ডিতগণের ধারণা, নারী কৃষিবিদ্যার উদ্যোক্তা। আদিতে তারুণ্যের জীবন ব্যবস্থায় পুরুষ পশু শিকার করতো , নারী করতো ফলমূল সংগ্রহ। পরিত্যক্ত ফলমূলের বীজ থেকে শস্যোদ্গম হয় ও ফল-মূলের এ ধারা নারী প্রথম লক্ষ্য করে। ক্রমে মাটিতে বীজবপনের মাধ্যমে কৃষি বিদ্যার আবিস্কার হয়। মানব সমাজের বিকাশের ধারা মানুষ আরণ্য সংস্কৃতি ত্যাগ করে কৃষি সভ্যতায় প্রবেশ করে। ভাল বীজ, ভাল মাটি, ভাল সার, পরিমিত পানি, অনুকূল আবহাওয়া ইত্যাদি বৈজ্ঞানিক কারণসমূহ তাদের জানা ছিলনা। অতএব ক্ষেত্র দেবতা, শস্য দেবতার কল্পনা স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভূত হয়েছে। ফলে শস্যোৎপাদনকে কেন্দ্র করে উর্বরতাবাদের আচার-সংস্কার গড়ে উঠে। বাংলার মৌলিক অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। এ জন্য পল্লীবাসী কৃষি কাজের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করে থাকে। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। সুপ্রাচীন কাল থেকেই বাংলার অর্থনীতি প্রধানত কৃষির উপর নির্ভরশীল। গ্রামবাসীদের অধিকাংশ কৃষক, অতি ক্ষুদ্র অংশ কুটির শিল্প ও অন্তর্বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করতো । সনাতন প্রথায় চাষাবাদ হতো। গরুর টানা লাঙ্গল, দেশজ সার, দুর্নির সাহায্যে সেচ এগুলো চাষের আবহমানকালের রীতি পদ্ধতি। এ ক্ষেত্রে অনুকূল আবহাওয়াই একমাত্র ভরসা। ভাল বৃষ্টি এবং সময়মত বৃষ্টি হলে ফসল ঘরে উঠে। অন্যথায় অনাবাদ, অফসল, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ ও মৃত্যু। সুতরাং ভালো ফসলের জন্য ভালো বৃষ্টির দরকার। বৃষ্টি আবাহনকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে নানা লোকরচনা ও লোকাচার গড়ে উঠেছে। এগুলোর অধিকাংশের ভিত্তিমূল প্রাচীন ধর্মমত বা যাদুবিদ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা অনুসন্ধান করলে মোটামুটি গান, ছড়া, ব্রত, মন্ত্র, বারমাসী ও প্রবনের বৃষ্টির কামনা ব্যক্ত হয়েছে। আল্লাহ মেঘ দে, পানি দে, ছায়া দেরে তুই-বহু প্রচলিত। এ লোকসঙ্গীতে প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহর কাছে পানি অর্থ্যাৎ বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়েছে। স্পষ্টত এ পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের প্রভাবজাত লৌকিক ছড়ায় আদিম চেতনা প্রায় অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। এখানে স্বয়ং আল্লাহকে সম্বোধন করে বৃষ্টি কামনা করা হয়েছে।"[৯]

ড. ওয়াকিল আহমেদ গ্রাম্যচিকিৎসা কর্মসূচীর বাস্তবতা সম্পর্কে তাঁর উপরোল্লিখিত গ্রন্থে বলেন, "আমাদের দেশে গ্রামে কী কী পদ্ধতিতে চিকিৎসা হয়ে থাকে, কারা চিকিৎসা করেন, আমি এ

Dhaka University Institutional Repository

প্রবন্ধে সেসবের বিবরণ দিচ্ছি। লোক সমাজের রোগ, ব্যাধি, চিকিৎসা, ঔষধ পথ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য মিলিয়ে জাতির সে আদি শিকড়ের সন্ধান পাওয়া যায়। অতীতের মত বর্তমান কালেও যারা লোক চিকিৎসায় নিয়োজিত আছেন তারা হলেন ওঝা, গুনী, বেদে, ধাত্রী, পুরোহিত, মোল্লা, পীর, সাধু-সন্নাসী, জ্যোতিষী, হাতুড়ে বৈদ্য প্রমুখ। এমনকি মৃত পীর দরবেশের আত্মাও ভক্তের মন কামনা পূরণ এবং বালামসিবৎ দূর করতে পারে। নারী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধ সব শ্রেণীর রোগী এসব চিকিৎসার পাত্র। তবে শিশু ও নারী রোগীর সংখ্যা বেশী। পুরুষশাসিত সমাজে নারী অসহায় অবস্থা, আর্থিক ভাবে পরনির্ভরতা এবং দৈহিক, মানসিকভাবে দুর্বলতার কারণে স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে তাতে নারী মনোবিকল জনিত নানা রোগে ভোগেন। রোগের আসল কারণ চিহ্নিত করতে না পেরে তাকে ভূত পেয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। চিকিৎসার পন্থা ও উপকরণ মন্ত্র পাঠ, ঝাড়-ফুঁক, গাছ-গাছালি সেবন, তাবিজ-কবচ ধারণ, শরীর বন্ধন ইত্যাদি। সকল প্রকার চিকিৎসার লক্ষ্য রোগ মুক্ত জীবন। চিকিৎসার রীতি পদ্ধতির বিবরণ নিলে বোঝা যায়, দৈবশক্তি বা অলৌকিকতার উপর ভিত্তি করে চিকিৎসা করা হয়। এমনকি মনস্তাত্ত্বিক ছাড়াও বস্তুগত সুফল লোক চিকিৎসায় আশা করা যায় না। অবশ্য Phycho-Theraspeutic বা মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার অংশ বলে বিবেচিত। সাপে কাটা রোগী দিয়ে শুরু করি আধুনিক চিকিৎসার প্রধান ঔষধ অ্যান্টি ভেণাম ইন্‌জেকশন। রক্তের সাথে যে বিষ মিশে রোগীকে কাতর করে এরূপ ইন্‌জেকশন দ্বারা বিষকে তরল করা হয়। গ্রামের মানুষের প্রথাগত চিকিৎসা হলো ওঝা ডেকে এনে তন্ত্রমন্ত্রের সাহায্য নেওয়া। ওঝা এসে প্রথমে মন্ত্র পড়ে রোগীর গায়ে ফুঁ দেয়। তারপর ক্ষত স্থানের উপর বাঁধন দিয়ে ঝাড় ফুঁক শুরু করে। ঝাড় মন্ত্রের নানা পদ্ধতি আছে। পানি ঝাড়া, ফুল ঝাড়া, গাছ ঝাড়া, হাত ঝাড়া, সুতা ঝাড়া, চালুন ঝাড়া ইত্যাদি। এগুলিতে মন্ত্রোচ্চারণের সাথে কিছু ক্রিয়ানুষ্ঠান আছে। লক্ষ্য হলো নির্বিষকরণ। অনেক সময় ক্ষত স্থানে মুখ দিয়ে চুষে বিষ বের করা হয়। মন্ত্রে সাপের দেবী মনসার দোহাই থাকে। বাঘের আক্রমনে আহত রোগীর চিকিৎসাও ঝাড় মন্ত্রের সাহায্যে করা হয়। ভূত-প্রেত, জীন-পরী প্রভৃতি কতক অলৌকিক অশরীরী আত্মা মানুষের দেহে আসর বা ভর করে। এতে রোগী বিকারগ্রস্থ হয়, উন্মাদের মত আচরণ করে।"[১০]

ড.আতিউর রহমান: বিভিন্নমুখী প্রতিভার অধিকারী লেখক, আতিউর রহমান মূলত একজন অর্থনীতিবিদ্ হলেও গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন নিয়ে কিছু লেখার মাধ্যমে তিনি এ সমাজের মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে মহিমান্বিত হয়ে আছেন। গ্রামের মানুষের অতীত অসহায় জীবন ব্যবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্তমান সমাজের মানুষকে জ্ঞাত করিয়ে দেয়ায় তাঁর কাছে এ জনগোষ্ঠীর মানুষ

অনেকাংশে ঋণী বটে। তিনি মান্ধাতার আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি গ্রামের মানুষের জীবন চলার কর্মপদ্ধতি অতি নিখুঁতভাবে তোলে ধরেছেন। আর গ্রামের মানুষ তাঁর লিখিত পুস্তক থেকে জ্ঞান আহরণ করে সে জ্ঞানকে নিজেদের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছেন প্রতিনিয়ত। গ্রামের অতীত ঘুণে ধরা সমাজের মানুষের জীবন মানের সাথে বর্তমান সময়ের মানুষের জীবন মানের চিত্র তিনি স্বচ্ছভাবে তাঁর লেখনীতে অবতারণা করেছেন। বিশ্বায়নের এযুগে বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের জীবন আলেখ্যে তাঁর লেখার অংশবিশেষ নিচে প্রতিস্থাপন করা হলো।

গ্রামীণ মানুষের দৈনন্দিন কর্মপদ্ধতি কীভাবে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে সে প্রসঙ্গে লেখক বলেন, "স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, বিশেষ করে গ্রাম বাংলায় আজ অব্দি কত কিছুই না বদলে গেছে। কী কী পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো সেকথা বলতে গেলে, মানুষের সাধারণ চরিত্র, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার, মুখের ভাষা, খাদ্যাভ্যাস, চলাফেরার অভ্যেস, পরিধেয়, শিক্ষা, কৃষি ইত্যাদি ক্ষেত্রে অনেক কথাই আসবে। মোবাইলের কল্যাণে সারা দেশেই তৈরি হচ্ছে এক নয়া সংস্কৃতি। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের চলা-বলা, চিন্তাভাবনায় এসেছে যুগান্তকারী সব পরিবর্তন। আমাদের গ্রাম-বাংলা বাহাত্তরের পর হঠাৎ করেই যেন নগরায়নের কবলে পড়ে। এই পরিবর্তনের প্রভাবে আমরা দ্রুত সত্যিকারের গ্রাম বাংলাকে হারিয়ে ফেললাম। ফলে অচিরেই আমরা পেলাম এক জগাখিঁচুরী মার্কা নগরায়ন। শুধু অগোচালো ঘরবাড়িই নয়, পরিবেশের অবক্ষয়, অপসংস্কৃতি, সহিংসতা, বৈষম্য, দারিদ্র্য মিলে সর্বত্রই অপনগরের ছড়াছড়ি। অজ পাড়াগাঁয়ের মধ্যে পাকা দালান, পাকা দেয়াল তোলা টিনের ঘরবাড়ি। এখন আর আমাদের ঘরের চালে লাউ-কুমড়োর সবুজ লতানো গাছপাতা শোভা পায় না। বাড়ি সামনে আম-কাঁঠাল কিংবা অন্য কোনো গাছের ছায়াও চোখে পড়ে না। হত দরিদ্র ও দরিদ্র ঘরের ছেলেমেয়েদের এখনো আগের মতো কুপি বাতি জ্বালিয়েই পড়তে হয়। কেরোসিনের যা দাম, তাই তাদের পক্ষে বেশিক্ষণ পড়াশোনার সুযোগ মেলে না। তবে বেড়েছে রাস্তাঘাট। পাকা, অর্থাৎ কংক্রিটের রাস্তা যথেষ্ট হয়েছে। এলজিইডি এ ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রেখেছে। আগের সেই মেঠো রাস্তাও অল্প কিছু ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে সবই হয়ে গেছে পাকা অথবা আধা-পাকা। অবশ্যি অঞ্চল ভেদে। চর ও হাওর অঞ্চলসহ অনেক জায়গার সার্বিক চিত্রের কিন্তু তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। তবে অন্যান্য এলাকায় এখন আর শুকনো দিনে এক হাঁটু ধুলো এবং বর্ষাকালে এক হাঁটু কাদা ভেঙ্গে চলতে হয়না। ঐতিহ্যবাহী ঢেঁকিতে এখন আর ধান বানা হয়না। ধুপ ধুপ শব্দও শোনা যায় না। শোনাও যায় না সেই সব রাস্তায় চলা গরু-মোষের গাড়ির চাকার ক্যাঁচর ক্যাঁচর ছন্দে তোলা শব্দ। গরু দিয়ে ধানও আর মাড়াই হয় না। গরু, মোষ ও ঘোড়ার গাড়ির যুগ অনেক আগেই

শেষ হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় এগুলো দেখা যায়। কিন্তু সেই কাঠের চাকা ও লোহার পাতের পরিবর্তে চলে এসেছে টায়ার ও টিওবযুক্ত চাকা।”[১১]

গ্রামের মানুষের রোজি-রোজগার, সংস্কৃতি ও জীবন ধারণের সার্বিক পদ্ধতির কথা বলতে গিয়ে লেখক বলেন, “উত্তরবঙ্গের সেই ঐতিহ্যবাহী ভাওয়াইয়া গান ‘ওকি গাড়িয়াল ভাই কতারব আমি পন্থের দিহে চায়ারে’ এর পাশাপাশি গাওয়া হচ্ছে ‘বর্তমানে রিক্শা-ভ্যান কাড়িয়া নিছে গাড়িয়ালের কামাই।’ দরিদ্র-অতিদরিদ্রের বাছ-বিচার নেই। তাতে বুঝা যায়, মানুষের উপার্জন হয়তো বেড়েছে। হাতে টাকা আছে। তবে গবেষকরা বলেন, বৈষম্যও বেড়েছে তুলনামূলক ভাবে প্রভূত পরিমাণ। চর ও হাওর অঞ্চলে দারিদ্র্য এখনো তীব্র। এখানে মানুষের জীবন সংগ্রাম আগের মতোই কঠিন। নদী ভাঙ্গনের কবলে পড়া মানুষ আগের মতোই অসহায়। খাওয়ার পানির জন্যে গ্রামের প্রতি বাড়িতে আগে ছিল পাত কুয়া এবং ইঁদারা। আজ তা নিশ্চিহ্ন। তার জায়গায় এসেছে নলকূপ। তবে আর্সেনিকের আলামত নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে গ্রামের মানুষকে। সুদূর অতীতে গ্রামের দরিদ্র মানুষ অনেকেই গোসলের সময় শরীর পরিচর্চায় এ্যালোমাটি ব্যবহার করতো । কিন্তু এখন হত দরিদ্রের হাতেও সুগন্ধি সাবান। গার্মেন্টস কর্মীরা গ্রাম থেকেই শহরে আসে। শহরের জীবন চলার নানা বৈশিষ্ট্য তাদের ভেতর সংক্রমিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছু দিক তারা ফের গ্রামে নিয়ে যায়। আগে অনেক অঞ্চলের গ্রামের মানুষ ঝোপেঝাড়ে প্রাকৃতিক কাজ সারত। এখন তার পরিবর্তন ঘটেছে। স্যানিটারি পায়খানা না হোক, আজ তারা অন্তত বেড়াঘেরা পায়খানা ব্যবহার করছে। সরকারী ও অসরকারী প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার, গণমাধ্যম সহ নানা মহলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতে এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতির যে বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটেছে সে কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শিক্ষার হার গ্রাম-বাংলায় কিছুটা বেড়েছে এটা ঠিক। আবার যে সচেতনতাও অনেকটাই বেড়েছে তাও ঠিক। পূর্বে গ্রামের মানুষ ছিল অলস আর বোকা। অথচ এখন যেন তাদের জীবনই হয়েছে গতিময়, চরিত্রগতভাবেও তারা অনেক চালাক-চতুর। মুখের ভাষাতেও বিচিত্র রকম পরিবর্তন ঘটেছে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে। আগে মানুষের কথাবার্তায় একটা নম্রতা ছিল। এখন হাসি-ঠাট্টাতেও যেন উগ্রতা প্রকাশ পায়। খাদ্যাভ্যাস, কৃষি, ঋতু, আবহাওয়া ইত্যাদিতেও যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। আজকাল কি গরুতে টানা হাতের লাঙ্গলে জমি চষতে দেখা যায়? বোধহয় খুবই কদাচিৎ। কলের লাঙ্গল অর্থাৎ ট্রাক্টরের সাহায্যেই বেশির ভাগ চাষাবাদ হয়ে থাকে। গরু-মোষ পালনেরও ঝক্কি নেই। সবই যন্ত্রের অবদান। আজকাল মাথলা-মাথায় কৃষক দেখতে হলে গ্রাম-গ্রামান্তরে ছুটতে হবে। লাল ডুরে শাড়ি পরা কোনো কিশোরীকে তার কৃষক বাবার জন্য গামছায় বাঁধা ভাতের শানকি বয়ে নিয়ে ক্ষেতের পাশে বাবলা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে খুব কমই দেখা যায়। আগামী ফসলের জন্য

কৃষককে বীজ রাখার চিন্তা করতে হয় না। বাজারে গেলেই তা মেলে। কিন্তু সেই বীজ উচ্চ ফলনশীল। বারে বারে কিনতে হয়। দামও বেশি। এদেশের সর্ষে তেলের জায়গাটি যেদিন সয়াবিন তেল দখল করে নিল, সেদিন থেকেই গ্রাম-বাংলায় একটা প্রকট পরিবর্তন দেখা দিল, এটা সবারই জানা। কোনো গ্রামে আজ আর ঘানির শব্দ শোনা যায় না। কাদেরকে 'কলু' বলা হয় তাও আজকালকার ছেলেমেয়েরা জানে না। বোরো ধান আবাদ করতে গিয়ে গ্রামের মানুষ সরষের চাষ কমিয়ে ফেলেছে। একটা সময় ছিল যখন বর্ষা আসার আগেভাগে গ্রাম বাংলার বাড়িতে বাড়িতে যত্নের সাথে জ্বালানী জমা করে রাখার ধুম পড়ে যেতো। জ্বালানী জমা করে রাখার জন্য পৃথক একটি ঘরই থাকত। কারণ শুধু একটাই বর্ষার সময় কখনো কখনো এক নাগারে সাতদিন, দশদিন অঝোরে বৃষ্টি লেগে থাকতো। খালে বিলে ছিপ নিয়ে বসলেই দু'বেলা আহারের মতো মাছ জুটে যেতো। খাল-বিল, ডোবা-নালা ভরাট হয়ে যাওয়াতে মাছ হয়েছে আজ এ্যাকুরিয়ামের প্রাণী। অর্থাৎ স্রোতস্বিনী খালে-বিলে একদা মাছের যে অবাধ বিচরণ ছিল তার পরিবর্তে এখন মাছের চাষ হয় বদ্ধ জলাশয়ে। তাও শংকর জাতের। দেশজ মাছের দেখা মেলা ভার। শাক-সব্জি ও অন্য তরিতরকারীর ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে।"[১২]

উপসংহার

সাহিত্য জগতের কিছু কিছু লেখক সাহিত্য চর্চায় অবহেলিত গ্রাম বাংলার মানুষের দঃখ দুর্দশা নিয়ে লিখে তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করে সহায়কভূমিকা পালনের ফলে গ্রামবাসীকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন। নিজেরা প্রশিক্ষক হিসেবে অনেক সময় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে হিতকর কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়নও করেছেন। গ্রামের মানুষের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসার সুযোগ যথাযথভাবে প্রাপ্তিতে তাঁরা পৃথক পৃথক পরিকল্পনা গ্রহণ করে সেসবের সফলতার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন যুগ-যুগান্তরব্যাপী। ঘুণেধরা অতীত চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী মানুষকে আধুনিক সভ্যতায় প্রবেশ করানোর ক্ষেত্রে সাহিত্যিকগণের লেখনী সব সময় তাদের (গ্রামবাসীর) অসহায় জীবনমানের চিত্র ফুটিয়ে তোলেছেন আবহমানকাল ধরে। এসব সাহিত্যিকের গ্রামোন্নয়নের গৃহীত কর্মসূচী ব্যাপকভাবে মানুষের মাঝে উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। তাদেরকে কর্মতৎপরতায় নিয়োজিত করার মাধ্যমেই আজকের গ্রামগুলোর অন্ধকার কিছুটা হলেও দূরীভূত হয়ে উন্নয়নের সংস্পর্শে এসেছে। সাহিত্যিকরা গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন, দরিদ্র হতভাগা মানুষকে সভ্যতার এ যুগে সবটুকু না হউক সামান্য হলেও আধুনিকতার ছোয়া জ্ঞাত করাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁদের আদর্শ অনুসরণ করে সরকার ও বেসরকারী সংস্থাসমূহ প্রয়োজনীয় কর্ম পদ্ধতি গ্রহণের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে গ্রামবাংলার মানুষকে সচেতনতায় উদ্ভাসিত করেছেন। সাহিত্যিকদের কর্মসূচীর আদলে অন্যান্য মনীষীরাও গ্রমোন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও সেসবের বাস্তবায়নের কাজ সামান্য হলেও সম্পন্ন করছেন। পরিশেষে এ কথাই বলা যায়, গ্রামোন্নয়নে সাহিত্যিকগণ তাঁদের লেখনীতে যেভাবে এদেশের অসচেতন মানুষকে অনুপ্রাণিত করে আত্মসচেতন হতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা এ নশ্বর জগতে শ্রদ্ধাবনত অবস্থায় গ্রামবাসীর অন্তরে চিরঞ্জীব থাকবে।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) মুখোপাধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য, কলিকাতাঃ বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিতান, ১৩৯৫বাংলা, পৃ, ২২৯।

২) প্রাগুক্ত পৃ, ২২৮, ২২৯।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ৫৩৭।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ৩৪৪, ৩৪৫।

৫) সাহিত্য ও শিল্প সংস্কৃতি বিষয়ক সাময়িকী, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকাঃ ০৮/০৫/২০১৩ইং, পৃ, ২২।

৬) মুখোপধ্যায়, প্রভাত কুমার, রবীন্দ্র জীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য, প্রাগুক্ত পৃ, ৫৩৬।

৭) প্রাগুক্ত পৃ, ৫৩৭।

৮) Hye, Hasnat Abdul, Dateline Gram Bangla, (Notes for Rural Bangladesh), Dhaka: Bangla Academy, 1986, P. 8.।

৯) আহমদ, ড.ওয়াকিল, লোককলা প্রবন্ধাবলী, ঢাকা:সিকদার আবুল বাশার, ২০০৫,পৃ, ১৮৯,১৯০।

১০) প্রাগুক্ত পৃ,১৮৯, ১৯০।

১১) রহমান, ড. আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন্ পথে, ঢাকাঃ এস. এম. আমিনুল ইসলাম মুকুল,২০০৮, পৃ, ১৯৭, ১৯৮। পৃ,

১২) প্রাগুক্ত পৃ,১৯৯, ২০০, ২০১।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

চতুর্থ অধ্যায়

গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রা

সূচনা: আগের অধ্যায় আমরা গ্রামোন্নয়নবিষয়ক সাহিত্যে বিভিন্ন মনীষীকর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও সেগুলো বাস্তবায়নের দিক দর্শন নিয়ে উপশিরোনামে আলোচনা করেছি। যেমন: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাসনাত আব্দুল হাই, ড. ওয়াকিল আহমেদ এবং ড. আতিউর রহমান প্রমুখ। এ অধ্যায়ে যে সকল উপশিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা হবে তা হলো, গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার স্তরবিন্যাস; যেমন: ধনীকৃষক, মধ্যবিত্তকৃষক, প্রান্তিককৃষক ও বর্গাচাষী, ভূমিহীন শ্রমিক, পেশাজীবি শ্রেণি যথা: শিক্ষিত শ্রেণি; চাকরীজীবি, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য। অন্যান্য যেমন: অশিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণি, যথা: সৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী পেশাজীবি এবং অন্যান্য, অসৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী পেশাজীবি। অবকাঠামোগত জীবনযাত্রা; যেমন: সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। সামাজিক; যথা: অনুকূল ও প্রতিকূল। অনুকূল; যেমন: মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনস্বাস্থ্য, কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ। প্রতিকূল; যথা: বাসস্থানের সুযোগসুবিধা, পরিবারকল্যাণ, সাংস্কৃতিক চেতনা, উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থনৈতিক অবকাঠামো; যেমন: যাতায়াত ও পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অবহেলিত নারী সমাজ ইত্যাদি। নিচে উপশিরোনাম গুলো পর্যায়ক্রমে আলোকপাত করা হলো:

গ্রামের মানুষের স্তরবিন্যাস: গ্রামের মানুষের স্তরবিন্যাস আলোচনার পূর্বে স্তরবিন্যাস কি সে সম্পর্কে জানার আবশ্যকতা রয়েছে। স্তরবিন্যাস পরিভাষাটি (Technical Word) মূলতঃ আয় আনুযায়ী মানুষের জীবনযাত্রার শ্রেণি বিভাগকে বুঝানো হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, গ্রামের মানুষকে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করে তাদের জীবনযাত্রা নিয়ে আলোচনাই হলো স্তরবিন্যাস। আদিকাল থেকে মানব সমাজে স্তরবিন্যাস বিদ্যমান ছিল। দুর্বল মানুষের তুলনায় শক্তিশালী মানুষ বেশী খাবার যোগাড় করতো । দুর্বলেরা শক্তিশালীদের ভয় পেত, তাদের আদেশ উপদেশ মেনে চলত বা মানতে বাধ্য করা হতো। তবে ঐ স্তরবিন্যাস ছিল সাধারণ পর্যায়ের। সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সাথে গ্রামের মানুষের স্তরবিন্যাস এক জটিলরূপ ধারণ করতে থাকে এবং যার অস্তিত্ব বর্তমান গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান দেখা যায়। বৈচিত্র্যময় জীবনধারা মানুষকে ক্ষেত্র বিশেষে ব্যাপকভাবে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে। তাই জীবনধারণের একান্ত তাগিদে এক একজন মানুষ তার যোগ্যতা এবং মেধা অনুযায়ী এক একটি বৃত্তি বা পেশা বেছে নিয়েছে।

গ্রাম সমাজে নানা ক্ষেত্রে নানা মাত্রায় অসমতা রয়েছে। রয়েছে নানা আর্থ-সামাজিক স্তরের মানুষ। উচ্চ, ক্রমোচ্চ ও নিচু পর্যায়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষ সহজেই চোখে পড়ে। P.A. Sorokin

Dhaka University Institutional Repository

স্তরায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, æDifferentiation of the given population into hierarchically arranged classes. It means the existence of higher and lower strata. Its basis and true essence consist in an unequal distribution of rights and privileges, duty and responsibility, social riches and scantiness, social power and influence among the members of society.”[1]

স্তরায়ন বর্ণনা করতে যেয়ে আরও একজন স্বনামধন্য গবেষকের সংজ্ঞা চোখে পড়ে, তিনি হলেন F. Merril. আমেরিকান লেখক F.Merril এর উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞাটি এখানে বিবৃত করা হলোঃ তাঁর মতে, æSuper imposed by tradition without the will or even the conscious knowledge of the great majority of the members. Social stratification involves a system of differential privileges, which means that some groups receive more of the goods, services power and emotional gratifications of the society than others.” [2]

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে গ্রামীণ মানুষের মর্যাদা ও স্তরায়নের একটি রেখা চিত্র নিচে দেখানো হলোঃ

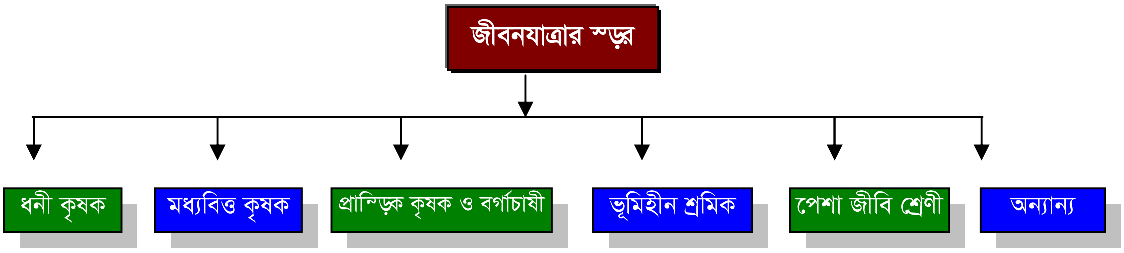

চিত্র নং-৪.১

ধনী কৃষক : গ্রামের কৃষকসমাজের বেশীর ভাগ ভূমির মালিক ধনীকৃষক পরিবার। তারা নিজেরা ভূমিতে শ্রম বিনিয়োগ না করে মজুরী এবং প্রান্তিক বর্গাচাষীদের মাধ্যমে জমি চাষ করিয়ে ফসল উৎপাদন করে থাকেন। উৎপাদিত ফসলের সবটাই পরিবারের ভরণপোষণ তথা খোরাকীর জন্য তাদের ভোগ করার প্রয়োজন হয় না। খরচাদি বাদে বাকী ফসল বিক্রি করে তারা প্রতি কৃষি মৌসুমে প্রচুর কাঁচা টাকার মালিক হন। এ টাকায় তাদের কেহ কেহ প্রান্তিক কৃষকদের জমি ক্রয়, কেহ শহরে বাসা-বাড়ি ক্রয় বা নির্মাণ করেন। তারা গ্রাম-শহর উভয় স্থানে বিলাস বহুল জীবনযাপন করে থাকেন। ছেলেমেয়েদের শহরে রেখে মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া শেখানোর পর তাদেরকে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়িত্বশাসিত সংস্থাসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরীতে নিয়োগের ব্যবস্থা করেন
।

কৃষিকাজে তারা আধুনিক উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করেন। যেমন: কলের লাঙ্গল, পানি সেচের জন্য গভীর নলকূপ, ফসল মাড়াইকল ইত্যাদি। খরা বা অন্য কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগেও তাদের ফসল তেমন একটা ক্ষয়ক্ষতি হয় না। অনেক সময় প্রান্তিক ও মধ্যবিত্ত কৃষক সমাজ ধনী কৃষকদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে চুক্তি ভিত্তিক ঐ সকল কৃষি প্রযুক্তিগত উপকরণ ধার নিয়ে থাকেন। কৃষিতে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে ধনীকৃষক সমাজ ধান, গম ছাড়াও শাক-সব্জি, ফলমূল এবং নানা প্রকারের শস্যাদি উৎপাদন করে অতিরিক্ত আয় করে থাকেন। মাছ চাষ, পশু পালনের মাধ্যমে তারা উন্নত পুষ্টিকর খাবারের ব্যবস্থা করেন। এসব পরিবার গ্রামের অন্যদের তুলনায় উন্নত পোশাক পরিচ্ছদও পরিধান করেন। অনেকে বিদ্যুৎ শক্তির সুবিধাভোগ করেন এবং পাকাবাড়ীর উন্নত আবাসে বসবাস করেন। কারও কারও বাড়িতে রেডিও, টেলিভিশন রয়েছে। এদের অনেকেই শহর থেকে সংবাদপত্র সংগ্রহ করে দেশ বিদেশের খবরাদিও রাখেন। এ শ্রেণির লোকদের কেহ আবার কোন না কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট। জনপ্রতিনিধিদের সাথে সংযোগ রক্ষা করে অনেকে সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচীর দরপত্র গ্রহণ করে নিুমানের উপকরণ দিয়ে নির্মাণকাজ শেষ করেন এবং ব্যবসায় লাভবান হন। এ শ্রেণির লোকদের কেহ কেহ ইউনিয়ন পরিষদ থেকে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকেন।

অসুস্থতায় তারা শহরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের উন্নত ব্যবস্থাপত্র গ্রহণ করে সুস্থ হয়ে উঠেন। গ্রামবাংলার সেই প্রাচীন ঐতিহ্য এখনও দু' একটি পরিবারে বিদ্যমান দেখা যায়। যেমন: গোলা ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু ও পুকুর ভরা মাছ। চাকর-বাকর ও তোষমোদকারী লোকজন তাদের কাজে সদা-সর্বদা সহায়তা করে থাকে। সার্বিকভাবে গ্রামের এ শ্রেণির লোক উন্নত জীবনযাপন করেন।

বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত কৃষি জরিপ ১৯৮৩-৮৪ (প্রকাশিত ১৯৮৬) থেকে দেখা যায়, "১৯৭৭ সালে ক্ষুদে কৃষি খামারের শতকরা অনুপাত ছিল মোট খামারের ৪৯.৭ ভাগ, ৮৩-৮৪ সালে এটি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৩.৩ এ। অন্যদিকে মাঝারি ও বৃহৎ কৃষি খামারের শতকরা অনুপাত কমেছে। মাঝারি খামার শতকরা ৪০.৯ থেকে ২৪.৭ এবং বৃহৎ খামার ৯.৪ থেকে ৪.৯ এ নেমে এসেছে। খামারের শতকরা অনুপাত এবং বিভিন্ন অংশে জমির অনুপাতের হ্রাস বৃদ্ধি বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র খামারের সংখ্যা বেড়েছে ২০ ভাগ, কিন্তু জমি বেড়েছে ১১ ভাগ"[৩]

মালিকানায় দেখা যায়, "মাঝারি খামারের সংখ্যা কমে গেছে প্রায় ১৬ ভাগ এবং জমি কমেছে প্রায় ৪ ভাগ। বৃহৎ খামারের সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু জমি কমেছে তার তুলনায় কম। তথ্য থেকে জানা ক্ষুদ্র কৃষি খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বৃহৎ ও মাঝারি খামারে জমির

কেন্দ্রীভবন স্পষ্ট। ক্ষুদ্র কৃষি খামারের সংখ্যা বৃদ্ধি যে ভূমিহীন সৃষ্টির পূর্বাবস্থা সেটা কারও অজানা নয়।”[৪]

সারণী-৪.১: নিচে সারণীতে কৃষি আবাদি জমির খামারীর মালিকানা হার এবং ক্ষুদ্র কৃষি খামারের সংখ্যা বৃদ্ধিতে ভূমিহীন সৃষ্টির অবস্থা দেখানো হলো:

খামার	খামারে শতকরা হার		মোট আবাদ জমির শতকরা হার	
	১৯৭৭	১৯৮৩-৮৪	১৯৭৭	১৯৮৩-
ক্ষুদ্র খামার	৪৯.৭	৭০.৩	১৮.৮	২৯.০
মাঝারি খামার	৪০.৯	২৪.৭	৪৮.৯	৪৫.১
বৃহৎ খামার	৯.৪	৪.৯	৩২.৪	২৫.৯

উৎস: আনু মুহাম্মদ, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি, ২০০৮, পৃ,১৬৪।

মধ্যবিত্ত কৃষক : গ্রামের ভূমি মালিকানার দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, জনসংখ্যানুপাতে মধ্যবিত্তকৃষক পরিবার ধনীদের চেয়ে কম ভূমি আবাদ করে থাকে। পরিবারের ভরণ-পোষণ, আত্মীয়-স্বজনসহ মানসম্মান নিয়ে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে এ স্তরের মানুষকে জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম (Struggle) করতে হয়। মধ্যবিত্তকৃষক সমাজ ভূমিতে প্রচুর পরিশ্রম করে ফসল উৎপাদন করে। ধনী কৃষকদের মত আধুনিক প্রযুক্তিগত কৃষি ফসল উৎপাদনের উপকরণ ক্রয় করার আর্থিক ক্ষমতা এ শ্রেণির কৃষকদের নেই বললেই চলে। বিশেষ প্রয়োজনে তারা ধনী কৃষকদের কাছ থেকে কৃষি প্রযুক্তিগত উপকরণ টাকার বিনিময়ে লিজ (Lease) নিয়ে ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করেন।

এ সমাজের মানুষ কৃষিকাজ ছাড়াও সামান্য পুশু, হাঁস-মুরগী, পালন মাছচাষ, ফল-মুল, শাক-সব্জি উৎপাদন সহ ক্ষুদ্র ব্যবসা বানিজ্যের মাধ্যমে বাড়তি উপার্জন করে পরিবারের ভরণ পোষণে ব্যয় করেন। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখানোর খরচ মেটানো তাদের পক্ষে কষ্টকর। খরচ মেটাতে অনেক সময় মায়ের গহনা ও হালের গরু বিক্রি এবং ফসলি জমিবন্ধক দিতে হয়। অনেক সময় খরচ বহন করতে না পারার কারণে ছেলেমেয়েদের লেখা পড়ার ইতি টানতে হয়। শিক্ষিতরা স্থানীয় স্কুল ও মাদ্রাসায় চাকুরী করে কিছুটা হলেও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। কেহ কেহ আবার বেকারত্বের কারণে কৃষি কাজে নিজেদের সম্পৃক্ত করেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হলে তাদের গ্রাম্য সুদখোর ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে টাকা ধার নিয়ে সংসারের ব্যয়বহন করতে হয়। কোন কোন কৃষককে টাকা পরিশোধ করতে জমিবন্ধক বা বিক্রিও করতে দেখা যায়। তারা সাধারণ খাবার খেয়ে জীবনধারণ করেন এবং সাধারণ পোশাক পরিধান করেন। ধর্মীয় উৎসব এবং আত্মীয়-স্বজন বাড়ীতে আসলে

খাবার মান একটু বাড়ানোর চেষ্টা করেন। সামজিক দাওয়াত/নিমন্ত্রণে তাদেরকে সাধারণ উপহার দিয়েই তুষ্ট থাকতে হয়। বৎসরের খোরাকী রেখে বাকী ফসল বিক্রি এবং অন্যান্য আনুসাঙ্গিক আয় থেকে তারা উপরোক্ত ব্যয়ভার বহন করে থাকেন। অসুস্থতায় মধ্যবিত্তকৃষক পরিবারগুলো কোন কোন সময় শহরের গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে থাকেন। জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ রাখতে কিছুটা চেষ্টা করলেও সার্বিক দিক দিয়ে এসব পরিবারে জনসংখ্যার ঘনত্ব মধ্যম পর্যায়ের।

প্রান্তিককৃষক ও বর্গাচাষী : গ্রামের প্রান্তিক ও বর্গাচাষীদের চাষযোগ্য জমির পরিমাণ খুবই নগণ্য। নিজের চাষ যোগ্য জমিতে উৎপাদিত ফসলে প্রান্তিক চাষীদের পরিবার পরিজনের সারা বছর ভরণ পোষণ সম্ভব না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই তারা ধনী কৃষকদের জমি বর্গাচাষ করে থাকে। এসব মানুষগুলো সারা বছর পরিবার পরিজনের খাবার সংগ্রহের কাজেই ব্যস্ত থাকে।

বর্গা ও প্রান্তিক চাষীদের ধনী কৃষকদের জমিতে প্রচুর শ্রম বিনিয়োগ করে অধিক ফসল ফলাতে হয়। কোন কারণে বর্গা জমিতে ফসল কম উৎপন্ন হলে ধনী কৃষকরা ঐ কৃষককে জমি বর্গা না দিয়ে অন্য বর্গচাষীকে বর্গা দিয়ে থাকেন। ফলে ঐসব প্রান্তিক চাষীদের পক্ষে পরিবার পরিজনকে সারা বছর খাওয়ানো পরানো কষ্ট সাধ্য হয়ে পড়ে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, "আমাদের দেশে মোট বর্গা প্রদত্ত জমির ৫৫ ভাগই কোন বর্গাচাষী নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে ২ বছরের বেশী সময় ভাগ চাষের আওতায় রাখতে পারে না।"[৫]

বর্গাচাষীরা অতি সাধারণ খাবার খেয়ে জীবনধারণ করে এবং একটি কাপড় দীর্ঘ দিন পরিধান করে থাকে। কখনও কখনও প্রয়োজনের মুহূর্তে কাপড় কেনার আর্থিক সংগতি না থাকায় পরিবারের লোকজন পুরাতন ছেড়া কাপড়টি সুঁই সুতা দিয়ে সেলাই করে পরিধান করে। তারা অনেক সময় অনাহারে দিনাতিপাত করে থাকে। দু'চারটি পরিবার ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠালেও তাদের পাঠদানের গতিপথ অতিদ্রুত রুদ্ধ হয়ে যায়। কারণ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান দেয়া অভিভাবক গণের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। এসব সন্তান গুলো পিতামাতার কাজের সাথী হয়ে দু'পয়সা উপার্জন করে পরিবারের ভরণ-পোষণে ভূমিকা রাখে।

অসুস্থতায় এ স্তরের মানুষ আধুনিক চিকিৎসার পরিবর্তে গ্রাম্য হাতুরে ডাক্তার, পীর-ফকিরের ঝাড়, ফুঁকের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। ফলে সাধারণ রোগে শিশু সহ একজন মানুষকে অকালে মৃত্যুবরণ করতে দেখা যায়। পরিকল্পিত পরিবার গঠনে এরা একেবারেই অজ্ঞ থাকায় জনসংখ্যার ব্যাপক ঘনত্ব এসব পরিবারগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। তারা অতি সাধারণ ভাবে আত্মীয় স্বজনের আপ্যায়ন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও খরচ করে থাকে। অতি আর্থিক সংকটে ধনী কৃষকের কাছে এ স্তরের লোকেরা জমি বিক্রি করে। ১৯৭৭ সালের ভূমি পরিসংখ্যান জরিপ ও কৃষি শুমারী অনুযায়ী,

"বাংলাদেশে মোট চাষ যোগ্য জমির শতকরা ৪৩ ভাগ বর্গাচাষের আওতায় রয়েছে এবং মোট গ্রামীণ পরিবারের শতকরা ৩২ ভাগ কোন কোন বর্গা শর্তে চাষাবাদ করে থাকে।"[৬]

সারণী নং- ৪.২: নিচে সারণীতে ভাগ চাষীদের মালিকানা নিরাপত্তা দেখানো হলো:

বছর	ভাগ চাষী ও মালিক ভাগ চাষী খানার সংখ্যা	ভাগ চাষের অধীনে জমির শতাংশ
১ বছরের কম	৭.০২	৪.৪২
১ বছর	২৩.৮৩	১৭.৪৭
২ বছর	২৪.৪৮	২৪.৪৮
৩ বছর	১৫.৫২	১৮.৪১
৪ বছর	৬.৪০	৬.০৫
৫ বছর এবং তার বেশ	২৩.৭৫	২৭.৬৮

উৎস: কামাল সিদ্দীকি, বাংলাদেশে ভূমি সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি, অক্টোবর, ২০০২, পৃ, ৯৬। (১৯৭৭ সালের Land Occpancy Survey).

এ স্তরের পরিবারগুলো গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগী ও শাক-সব্জি উৎপানের মাধ্যমেও সামান্য আয় করে থাকে। শন, খড় কেহ বা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জরাজীর্ণ দু'একটি টিনের ঘরে পরিবার পরিজন নিয়ে বসবাস করে। সামাজিক মর্যাদায় দু'একজন ছাড়া বাকীরা অবহেলিত।

ভূমিহীন শ্রমিক : ভূমিহীন শ্রমিকদের আয়ের একমাত্র উৎস হলো শারীরিক শ্রম বিক্রি করে উপার্জিত অর্থে পরিবারের ভরণ-পোষণ করা। মোট কথা, শ্রম বিক্রি করতে পারলে পরিবারের পরিজন খেতে পারে। কোন কারণে শ্রম বিক্রি করতে না পারলে পরিবারের লোকেরা উপোস থাকে। যেমন: অসুস্থায় শ্রম বিক্রির সুযোগ না হওয়ায়। বাঁশ, খড়, লতা পাতা দিয়ে তৈরী ভাঙ্গা জরাজীর্ণ ঘরে এ স্তরের মানুষ বসবাস করে। ঘরগুলোতে বর্ষাকালে বৃষ্টির পানি এবং শীতকালে শৈত্য প্রবাহরে ফলে অতি কষ্টে জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করে এদের জীবন অতিবাহিত হয়। বাড়ী ঘরগুলো নোংরা-অপরিচ্ছন্ন।

গায়ের জামাকাপড় ময়লা ও ঘামের দুর্গন্ধযুক্ত, ছেড়া-ফাঁটা, সেলাই করা এবং তালিযুক্ত। এরা বেশির ভাগ সময় ধনী কৃষকের পুরানো কাপড় অনুনয় করে নিয়ে পরিধান করে। বছরে দু'একটি নতুন কাপড় কেনা এদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অতি সাধারণ খাবার খেয়ে কোন মত জীবনধারণ করে। অনেক সময় বাসী পঁচা খাবার খেয়ে নানা রোগে আক্রান্ত হয়। রোগ শোকে নিজে ও পরিবারের সদস্যদের আধুনিক চিকিৎসার কোন সংগতি না থাকায় লতা-পাতা ও গাছ-গাছরার রস খেয়ে অববৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসার কাজ শেষে করে। অনেক সময় সাধারণ রোগেও অকালে

মৃত্যু বরণ করে। পুষ্টিকর খাবার বলতে কী? তারা এ সম্পর্কে কিছুই জানেনা। শারীরিক চেহেরায় দারিদ্র্যতার যাতনা ফুটে উঠে। শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ থেকে এ সমাজের মানুষ বহুদূরে অবস্থান করে। ছোট ছেলেমেয়েদের পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য শিশু বয়সেই ধনী কৃষকের বাড়ীতে শ্রম বিক্রি করতে পাঠিয়ে থাকে এবং অনেক সময় নিজেদের সাথে শ্রম বিক্রি করতে নিয়ে যায়। অল্প বয়সেই ছেলেমেয়েদের বিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করে।

ছেলেরা বিয়ের সাথে সাথেই বিচ্ছিন্ন জীবনযাপনশুরু করে। এসব পরিবারের সন্তানরা কম বয়সে বিয়ের কারণে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে। পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে এদের কোন ধারণা নেই। গ্রামীণ এ সমাজে আবহমানকাল ধরে এহেন পরিবেশ বিরাজমান। ভূমিহীন শ্রমজীবি পরিবার গুলোতে অভাবের তাড়নায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকে। সামাজিক কর্মকান্ডে এদের কোন ভূমিকা নেই। গ্রামের কেহ এদের কথার কোন মূল্যায়ন করে না। শ্রমিক হিসেবে অমর্যাদা নিয়েই সমাজে এ স্তরের মানুষ বসবাস করে।

ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে শ্রমিকদের অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ভ্যান, রিক্শা, বাস-ট্রাকের চালকের সাহায্যকারী এবং ঠেলাগাড়ী চালিয়ে থাকে। আবার কেহ কেহ কুলি-মজুর, রাস্তা ঘাট খুঁড়া-খুঁড়ির কাজ করে দু'পয়সা উপার্জন করে জীবিকা নির্বাহ করে। ১৯৭৭ সালের জরিপ অনুযায়ী , "বাংলাদেশের ৪৮ ভাগ গৃহস্থালী বা পরিবার কার্যত ভূমিহীন। বর্তমানে বাংলাদেশে ভূমিহীনদের সংখ্যা শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ এবং মজুরী হতাশা ব্যঞ্জক।"[৭]

সারণী নং- ৪.৩: নিচে সারণীতে কৃষি ও অকৃষি ভূমি খাতে শ্রম বিক্রি প্রাপ্যতা দিবস % আকারে দেখানো হলো:

মোট শ্রম দিনের মধ্যে মজুরদের অংশ		
সময়কাল	৭.৫০-১০.০০ একর জমির মালিকদের জন্য	১০ একরের বেশী জমির মালিকদের জন্য
১৯৭২	৪৮.৬০	৫১.০০
১৯৮১	৭০.৫০	৭৬.৬০
শতকরা পরিবর্তন ১৯৮২-	২১.৯০	২৫.৬০

উৎস : আনু মুহাম্মদ, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি, ২০০৮, পৃ,১৩৯।

পেশাজীবি শ্রেণি : গ্রামের প্রথম তিনটি স্তর থেকেই পেশাজীবি শ্রেণী মানুষের আগমন। এ শ্রেণির মানুষ পুরোপুরি কৃষির উপর নির্ভরশীল নয়।

গ্রামের পেশাজীবি শ্রেণির মানুষকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন: ১) শিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণি। ২) অশিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণি এবং ৩) অন্যান্য শ্রেণি।

শিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণি :গ্রামের শিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় যেমন: ১) চাকুরী জীবি ২) ব্যবসায়ী শ্রেণী ও ৩) অন্যান্য শ্রেণি।

চাকুরীজীবি শ্রেণি : গ্রামের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ শিক্ষিত কিছু কিছু মানুষ স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসায় শিক্ষক/কর্মচারী হিসেবে চাকুরী করে জীবিকা নির্বাহ করে। আবার অনেকে ইউনিয়ন পরিষদ, তহশিল অফিসসহ শহরে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থায় চাকুরী করে আয় রোজগারের মাধ্যমে পরিবারের ব্যয় মিটিয়ে থাকে। এ শ্রেণির যারা শহরে চাকুরী করে তাদের পরিবার পরিজন গ্রামে বসবাস করে। তারা মাস শেষে বেতন-ভাতা পেয়ে স্বল্প সময়ের জন্য স্ত্রী, সন্তান ও পিতা-মাতা এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করতে গ্রামে আসেন। প্রতি মাসে আয় রোজগার থাকায় এ স্তরের মানুষকে কিছুটা উন্নত জীবনযাপন করতে দেখা যায়। এসব পরিবারে ছেলেমেয়েরা লেখাপাড়া শিখে মানুষ হওয়ার সুযোগ পায়। পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে ধারণা থাকায় দম্পতিরা দু'একটি সন্তান জন্মদান করার ফলে, পরিবারে জনসংখ্যার ঘনত্ব গ্রামের অন্যান্য পরিবার অপেক্ষা কম। ফলে এদেরকের তুলনামূলক ভাবে গ্রামের সুখী পরিবার বলা যায়।

পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে এদের ধারণা আছে। রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে প্রয়োজন বোধে এ সমাজের মানুষ আধুনিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করেন। পাকা, আধা-পাকা বাড়ীতে এ স্তরের লোকেরা বসবাস করে। গ্রামের লোকজন এদের আলাদা ভাবে মূল্যায়ন করে। তারা অন্যান্য লোকের তুলনায় ভাল পোশাক পরিধান করে এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন জীবনযাপন করেন। সম পর্যায়ের লোকদের সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সহ গরীব-দু:খীদের এরা কিছুটা হলেও দান খয়রাত করে থাকেন।

ব্যবসায়ী শ্রেণি : গ্রামের শিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত লোক যারা সরকারী বা বেসরকারী সংস্থায় চাকুরী কর্মরত নন বা চাকুরীতে নিয়োগ প্রাপ্তিতে ব্যর্থ এবং কৃষির উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল নয়, এমন শ্রেণির বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষিত লোকেরা ব্যবসা করে জীবনধারণ করেন। এ স্তরের লোকেরা গ্রামের হাট-বাজার, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং কারও কারও জেলা শহরে ব্যবসা বাণিজ্য রয়েছে। কেহ কেহ চলমান ব্যবসাও করে থাকেন। অনেকে মাছ চাষ, পশু, হাঁস-মুরগী পালন, নার্সারী সহ বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন। এসব ব্যবসায়ীরা নিত্য নতুন কাঁচা পয়সা উপার্জন করেন বলে কেহ কেহ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে উন্নত জীবনের নিশ্চয়তা প্রদানে স্বচেষ্ট হন।

ছেলেমেয়েদেরকে সরকারী বা আধাসরকারী সংস্থায় চাকরীতে নিয়োগের ব্যবস্থাও করে থাকেন। সম-পর্যায়ে পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাথে এদের বিবাহ দিয়ে থাকেন। এরা গ্রামের অন্যান্যের চেয়ে কিছুটা উন্নত জীবনযাপন করেন। পাকা, আধা-পাকা বাড়ীতে বসবাস করেন এবং

অনেকটা উন্নত খাবার খান। কারও কারও বাড়ীতে বিদ্যুৎ শক্তি ভোগের সুবিধা রয়েছে। কেহ কেহ পঁচনশীল খাবার সংরক্ষণের জন্য ফ্রীজের উপযোগিতা ভোগের সুবিধা এবং রেডিও শোনা, টেলিভিশন দেখার সুযোগ পেয়ে থাকেন। তাঁরা আত্মীয় স্বজন আপ্যায়নে এবং উৎসব পর্বে ভাল মানের খাবারের ব্যবস্থা করেন থাকেন। গ্রামের বিচার সালিশে এ স্তরের মানুষের কথা অন্যান্য লোকেরা সম্মানের সাথে মূল্যায়ন করে থাকেন। মসজিদ, মন্দির, মাদ্‌রাসায় দানসহ অসুস্থ মানুষের চিকিৎসায় এরা টাকা ধার বা দান খয়রাত করে থাকেন।

অন্যান্য শ্রেণি : অন্যান্য পেশাজীবি শ্রেণির মানুষকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন : ১) শিক্ষিত ও ২) অশিক্ষিত পেশাজীবি।

শিক্ষিত পেশাজীবি : শিক্ষিত পেশাজীবির আবার দু'টি স্তর রয়েছে যেমন: ১) গৃহ শিক্ষক ও ২) হাতুরে ডাক্তার।

গৃহ শিক্ষক : দরিদ্র পরিবারের স্বল্প শিক্ষিত ছেলেমেয়ে বা বয়স্ক লোকেরা গ্রামের ধনী বা মধ্যবিত্ত পরিবারের নিচের শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছেলেমেয়েদের বাড়ী বাড়ী গিয়ে অথবা এক জয়গায় ছাত্র-ছাত্রীদের একসাথে করে শিক্ষাদান করে থাকেন। বিনিমঢে ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবকগণ তাদের মাসিক কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে থাকেন। যা দ্বারা তাদের জীবিকা নির্বাহের পথ সহজ হয়।

হাতুরে ডাক্তার: শিক্ষিত অন্যান্য শ্রেণীর কিছু স্বল্প শিক্ষিত ছেলেমেয়ে যারা চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট বই পড়ে কখনও বা সরকারি চিকিৎসালয়ে স্বল্পকালীন কোর্সে প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামের দরিদ্র মানুষের চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। এ থেকে যা আয়-রোজগার হয় তা দিয়ে নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে এসব পেশাজীবিগণ খেয়ে পরে জীবনধারণ করেন।

অশিক্ষিত অন্যান্য সৎ পেশাজীবি শ্রেণি : সাধারণত প্রান্তিক বর্গাচাষী ও ভূমিহীন শ্রমিক শ্রেণি থেকে এ পেশাজীবি শ্রেণির উদ্ভব। গ্রামীণ সমাজে অশিক্ষিত পেশাজীবি শ্রেণির লোকদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে । এদের জীবনযাত্রার মান নিু। বলা যায়, দিন আনে দিন খায়। নিচে অন্যান্য সৎ অশিক্ষিত পেশাজীবিদের জীবন ধারনের কর্মপদ্ধতি ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো:

কামার : লোহা পিটিয়ে দা, কুড়াল, শাবল, ছুরি, বটি, কোদাল, বল্লমসহ না জাতীয় লোহার উপকরণ তৈরী করে এরা জীবিকা নির্বাহ করে। এদের ফসলের জমা-জমি নেই। নিজেরা অশিক্ষিত এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সংগতি নেই। এ পেশাজীবিরা ছেলে সন্তানদের বয়স বাড়ার সাথে সাথে নিজেদের কাজে সহায়তার জন্য সম্পৃক্ত করে। তাছাড়া মেয়েরা মাকে গৃহকর্মে সাহায্য ছাড়াও কখন বা ধনী কৃষকের বাড়ী, শহরের বড় লোকের বাসায় ঝিয়ের কাজ এবং পোষাক কারখানায় শ্রম বিক্রির মাধ্যমে দু' পয়সা আয় করে সংসারের হাল ধরে থাকে । স্বাস্থ্য অসচেতন এবং

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে এ শ্রেণির মানুষের কোন ধারণা নেই। এরা অধিক সন্তান জন্ম দান করে এবং অপরিচ্ছন্ন নোংরা পরিবেশে জীবনযাপনকরে।

কুমার : মাটি দ্বারা হাড়ি, পাতিল, কলসী সহ নানা প্রকার গৃহস্থালীর জিনিসপত্র তৈরী করে এরা জীবিকানির্বাহ করে। বর্তমান কালে আধুনিক প্রযুক্তিতে প্লাষ্টিক, মেলামাইন ও চীনা মাটির গৃহস্থালির উল্লেখিত উন্নত মানের জিনিসপত্র তৈরী হওয়ায় এ শিল্পটি একেবারেই ধ্বংসের কাছাকাছি। গ্রামের এ শ্রেণির মানুষ বর্তমানে দুর্বিসহ জীবনযাপনকরছে।

রাজমিস্ত্রী : গ্রামের ধনিকৃষক এবং শহরের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ফলে এ শ্রেণির পেশা জীবিরা গ্রামের বড়লোক এবং শহরে গিয়ে ধনী লোকদের দালানকোঠা নির্মাণের কাজ করে দু'পয়সা উপার্জন করে থাকে। তবে বর্তমানে দালালকোঠা নির্মাণে নানা বিদেশী প্রযুক্তি দেশে আগমন ঘটায়, রাজমিস্ত্রীদের চাহিদা অনেকটা কমে গেছে। তাই এরা বর্তমানে অনেকটা কর্মহীন ও বেকারত্বের অভিশাপে অভিশপ্ত হয়ে দুর্বিসহ জীবনযাপন করছে। এ শ্রেণির মানুষ ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর সুযোগ পায় না। যার ফলে দারিদ্র্যতাও দূর করতে সক্ষম হয় না।

কাঠমিস্ত্রী : কাঠের বাড়ীঘর, আসবাবপত্র তৈরী করে এ শ্রেণির লোকেরা জীবনধারণ করে। কিন্তু বর্তমানকালে প্রযুক্তিগতভাবে প্লাষ্টিক, লোহা, কাঠ দ্বারা বিভিন্ন আসবাবপত্র তৈরী হওয়ায় কাঠমিস্ত্রীদের উপযোগিতা আগের চেয়ে অনেক কমে গেছে।

স্বর্ণকার : এ শ্রেণির লোকেরা শহরে গিয়ে বড়লোকের জুয়েলারী দোকানে স্বর্ণালংকার তৈরী করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে জীবনধারণ করে।

জেলে : বাংলাদেশে জেলেরা বর্তমানে এক ক্রান্তিককাল অতিক্রম করছে। আগে একটি স্লোগান ছিল, জাল যার, জলা তার। আজকাল বেশীর ভাগ প্রাকৃতিক জলাশয়ে প্রভাবশালী মহল কৃত্রিম মৎস্যচাষ করছে। এসব জলমহালে জেলেদের মাছ ধরতে দেয়া হয় না। তাছাড়া নদী, খাল, বিল ভরাট হয়ে পানি শুকিয়ে যাবার ফলে এবং অনাবৃষ্টির কারণে নদীতে পানি না থাকায় প্রাকৃতিক মাছ প্রায় বিলীন হয়ে যাচ্ছে। বর্তমানে জেলেদের মাছ ধরে জীবনধারণ করার কোন সুযোগ না থাকায় অশিক্ষিত এ শ্রেণির মানুষ দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে জীবনযাপন করছে।

তাঁতী : তাঁতে কাপড় বুনন করে এ স্তরের মানুষ জীবনধারণ করে। সুতার দাম বৃদ্ধি, চুরাই পথে সুতা আমদানী, চাহিদা অনুযায়ী সুতা না পাওয়ায় তাঁত মালিকরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে এবং শ্রমিকরা অনেকটা বেকার হয়ে পড়েছে। তাছাড়া মালিকের সাথে দরকষাকষিতে এদের জীবন চলা দুস্কর হয়ে পড়েছে। আধুনিককালে যান্ত্রিক কলের সাহায্যে ভাল মানের কাপড় তৈরী এবং ঐ সকল কাপড়ের চাহিদা বাড়ার দরুণ তাঁত শিল্পটি ধ্বংসের মুখোমুখী দাঁড়িয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কাঠুরিয়া : বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করে যা আয় হয় তা দিয়ে খাবার ক্রয় করে এ শ্রেণির মানুষ জীবনধারণ করে। পরিবেশ দূষণের কারণে সরকারী বন থেকে কাঠ কাটা নিষিদ্ধ হওয়ায় এ শ্রেণির মানুষ বেকার হয়ে পড়েছে এবং তাদের আয় রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে না খেয়ে এরা কোনভাবে জীবনধারণ করছে।

নাপিত : দরিদ্র নাপিতরা আগে মানুষের বাড়ী বাড়ী নরসুন্দরের কাজ করে পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকত। বর্তমানে গ্রামের হাট বাজারে সেলুনে মানুষ চুল ছাটাই শুরু করলে পুঁজিহীন এ শ্রেণির নাপিতরা পথে বসতে শুরু করছে এবং মানবেতর জীবনযাপনকরছে।

ফেরিওয়ালা : শহর থেকে মানুষের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র ক্রয় করে গ্রামের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তা বিক্রি করে যা উপার্জন হয় সেটা দিয়েই কোনভাবে পরিবার পরিজন নিয়ে এরা খেয়ে পড়ে জীবনধারণ করছে।

কসাই : গ্রামের হাট বাজারে গরু, খাসি, মহিষ, ভেড়া জবাই করে মাংস বিক্রি করে যা কিছু লাভ হয় তা দিয়ে এ শ্রেণির লোকেরা দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রাম করে সংসার চালিয়ে থাকে।

গাড়িয়াল : গরু মহিষের গাড়িতে করে ভাড়ায় মালামাল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে যা কিছু পারিশ্রমিক পায় তা দিয়ে এ শ্রেণির লোকেরা খেয়ে পড়ে বেঁচে আছে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া ও উন্নতজীবন তাদের কাছে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়।

বালি, পাথর উত্তোলনকারী : পাহাড়ের পাদ দেশের নদ-নদী থেকে পাথর এবং বালি সংগ্রহ করে পাকা বাড়ী এবং রাস্তা ঘাট নির্মাতাদের কাছে এসব সামগ্রী বিক্রি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে এরা সংসার চালিয়ে থাকে।

গোয়ালা : গ্রামের গোয়ালারা মানুষের বাড়ী বাড়ী বা হাট বাজার থেকে দুধ কিনে তা দিয়ে দই, ঘি ইত্যাদি তৈরী করে তা আবার গ্রামের বাড়ী বাড়ী কখনও বা হাটবাজার এমনকি শহরে বিক্রি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে কোন ভাবে পরিবারের ভরণপোষণ করে যাচ্ছে।

মধু আহরণকারী : বড় বড় বনের আশ-পাশের বাসিন্দারা বন জঙ্গল থেকে মধু আহোরণ করে গ্রাম বা শহরে বিক্রি করে যা উপার্জন হয় তা দিয়ে এ শ্রেণির মানুষ জীবনধারণ করে। বর্তমানে গ্রামের মানুষ বন থেকে অবাধে গাছ কর্তন করায়, বন প্রায় উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এমতাবস্থায় মধু আহরণকারীদের ব্যবসা ভাটা পড়তে শুরু করছে।

পাখি শিকারী : এ ধরণের পেশাজীবিরা ফাঁদ পেতে বিভিন্ন কায়েদায় খাল, বিল, নদী, নালা ও বিভিন্ন জলাশয় এবং বন জঙ্গল থেকে পাখি শিকার করে গ্রামে গ্রামে বা শহরে বিক্রি করে আয়-

রোজগার করে। সরকার এহেন কর্ম সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করায় এ শ্রেণির পেশাজীবিরা বেকার হয়ে পড়েছে।

ধাত্রী : এ পেশাজীবি মহিলারা গ্রামের বাড়ী বাড়ী সন্তান প্রসবে সহায়তার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে দু'পয়সা উপার্জন করে জীবনধারণ করে থাকে। বর্তমান সরকার সব ধাত্রীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাদের অভিজ্ঞতাকে আরো কিছু পাকাপোক্ত করেছেন। তবে আজকাল অনেক পরিবার আধুনিক পদ্ধতিতে হাসপাতালে সন্তান প্রসবের সহায়তা নেয়ায় এ শ্রেণির ধাত্রীদের বর্তমানে তেমন কোন আয় রোজগার নেই।

ঘটক : গ্রামের ছেলেমেয়েদের বিবাহের খোঁজ খবর নিয়ে উভয় পক্ষকে রাজী করানোই ঘটকদের কাছ। আর এ কাজে সফল হতে পারলে বর-কনে উভয় পক্ষই ঘটককে কিছু বক্শিস দিয়ে সম্মানিত করে। যা তাদের জীবন চলার সহায়ক হিসেবে কাজ করে।

দর্জি : গ্রামের মানুষের পোষাক-পরিচ্ছদ তৈরী করাই দর্জিদের একমাত্র কাজ। গ্রামের স্বল্প আয়ের পরিবারের ছেলে এবং কোন কোন গ্রামের মেয়েদেরও এ পেশায় নিয়োজিত থাকতে দেখা যায়। যার মাধ্যমে তাদের রুজি-রোজগারের ব্যবস্থা হয়।

নার্সারী ব্যবসায়ী: বিভিন্ন প্রজাতীর ফুল, ফল, ঔষধি, বনজ গাছের বীজবপন করে চারা সামান্য বড় হলে, সেগুলো গ্রামের বাড়ীতে বা হাট-বাজারে বিক্রি করে এরা আয় রোজগার করে পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে বেঁচে থাকে।

তোষামোদকারী : তোষামোদকারীরা জনপ্রতিনিধি এবং ধনী লোকের পিছনে পিছনে ঘুরে তাদের ন্যায় অন্যায় যে কোন কাজের প্রশংসা করে থাকে। বিনিময়ে ঐ সব জনপ্রতিনিধি, ধনী লোকেরা তোষামোদকারীর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যা কিছু দেন তা দিয়েই তারা সংসারের খরচ চালিয়ে থাকে।

দালাল : গ্রামীণ সমাজের কিছু কিছু মানুষ যাদের সহায় সম্পত্তি নেই, তারা জীবনধারণের জন্য যে কোন বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যস্ততার ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে কার্যোদ্ধারের জন্য নানা প্রকার ছল-ছাতুরীর আশ্রয় গ্রহণ করে উভয় পক্ষকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে থাকে। যেমন: কারও গরু-ছাগল বিক্রিতে সহায়তা, কাউকে ডাক্তার-উকিল এর কাছে নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কাজ করে বিনিময়ে যা পরিশ্রমিক পায় তা দিয়েই নিজের পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে পরে কোন ভাবে জীবনধারণকরে।

পীর-ফকির, সাধু-সন্নাসী : ধর্মের বেশ ধারণ করে অনেক পেশাদারী লোক গ্রামের মানুষের কাছে ধর্মের বয়ান জাহির করে। বিভিন্ন ধরণের উপকারের আশ্বাস দিয়ে নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে এ পেশাজীবিরা জীবনধারণ করে।

সরকারী সহয়তা ভোগী : সরকার গ্রামের অক্ষম ব্যক্তিদের জীবন ধারণের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে খাদ্য সামগ্রী বা নগদ অর্থ প্রদান করে থাকেন। এ স্তরের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে রয়েছে বয়স্ক বৃদ্ধ/বৃদ্ধা, বিধবা, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি অক্ষম মানুষ। যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র পথ সরকারী সাহায্য প্রাপ্যতা।

ভিক্ষাবৃত্তি : গ্রামের একেবারে সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব নারী-পুরুষ বিশেষ করে বৃদ্ধ/বৃদ্ধরা গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরে এক মুঠো করে চাল যোগাড় করে তা খেয়ে পরে মানবেতর ভাবে জীবনধারণ করে।

অন্যান্য অসৎ পেশাজীবি শ্রেণি: গ্রামের কিছু কিছু মানুষ জীবন ধারণের জন্য অবৈধভাবে আয় রোজগার করে থাকে। যদিও এসব উপার্জন বৈধ সমাজ বা রাষ্ট্রের কাছে স্বীকৃত নয়। ঐ সব ব্যক্তিগণের জীবন চলার কর্ম পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হলো :

চোর-ডাকাত : বিভিন্ন ভাবে দুর্নীতিগ্রস্থ অসৎ কিছু লোক রাতের অন্ধকারে গ্রামের মানুষের সঞ্চিত ধন-সম্পদ, টাকা-পয়সা চুরি-ডাকাতি করে নিয়ে যায়। এ শ্রেণির লোকদের একমাত্র আয়ের উৎস হচ্ছে অন্যের সম্পদ চুরি-ডাকাতি করে পরিবার পরিজনের বরণ পোষণ করনো।

পকেটমার : এ শ্রেণির অসৎ লোকেরা গ্রামের হাট বাজারে এবং কখনও রাস্তায়, বাস-ট্রেনে লোকজনের পকেট কেটে টাকা নিয়ে জীবনধারণকরে।

ছিনতাইকারী: অসৎ চরিত্রের মনোভাবাপন্ন লোকেরা পরিকল্পিতভাবে সমবেত হয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রামের রাস্তায় চলমান লোকদের টাকা পয়সা ও মালামাল জোর পূর্বক ছিনতাই করে নিয়ে যায়। ছিনতাইকৃত মালামল ও টাকা-পয়সা দিয়ে এ শ্রেণির লোকেরা জীবনধারণ করে থাকে।

প্রতারক : এ স্তরের মানুষ গ্রামের কিছু কিছু নিরীহ লোককে নানা স্বার্থোদ্ধারের ভূয়া প্রতিশ্রুতি দিয়ে কৌশলে ঠকিয়ে অর্থ আদায়ের মাধ্যমে জীবনধারণ করে।

সন্ত্রাসী/চাঁদাবাজি : এ শ্রেণীর লোকেরা কোন না কোন বড় শক্তির দোহাই দিয়ে নিরীহ জনগণের কাছ থেকে প্রভাব খাটিয়ে অর্থ আদায় করে। মানুষের কোন বৈধ কাজেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা চাঁদা দাবি করে। চাঁদার আদায়কৃত অর্থই তাদের জীবন ধারণের এক মাত্র উৎস।

গ্রামীণ অবকাঠামোগত জীবনযাত্রা : অবকাঠামো শব্দটির অর্থ হলো নিমানের আকার বা গঠন। অর্থ্যাৎ গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যে সকল মাধ্যম রয়েছে সেগুলো দুর্বল

প্রকৃতির। উপনিবেশিক শাসন-শোষণের প্রভাবই এর মূল কারণ। স্বাধীনতা উত্তর রাজনৈতিক নেতৃত্ব, আমলাদের দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে জনগণের আশা অনুযায়ী কাঙ্খিত গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন হয়নি, যতটুকু হয়েছে তা বলা যায়, কচ্ছপের গতিতেই হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জন থেকে অদ্যাবধি দুর্নীতিবাজরা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের বরাদ্দকৃত অর্থ অনেকাংশেই বখ্রা হিসেবে লুটপাট করেছে।

ফলশ্রুতিতে গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কাঠামোগত অবস্থা যথাযথভাবে উন্নয়ন সাধিত না হওয়ায় তা অনেকাংশেই ব্যাহত হয়ে আছে। পন্ডিতগণের মতে, "কতগুলো মৌলিক উপাদানের উপস্থিতিতে গ্রামীণ অর্থনীতি গতিশীল রাখা এবং উন্নয়ন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা একান্তই অপরিহার্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অবকাঠামো দু'টি ভাগে বিভক্ত। যেমন: ১) সামাজিক অবকাঠামো ও ২) অর্থনৈতিক অবকাঠামো।"[৮] নিচে সামাজিক অবকাঠামো আলোচনা করা হলো :

সামাজিক অবকাঠামো : গ্রামের মানুষের সামাজিকভাবে জীবন চলার পথে যে সকল অবকাঠামো তাদে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কার্যকর হয় এবং বিভিন্ন ভাবে প্রভাব বিস্তার করে সে সব অবকাঠামোকেই সামাজিক অবকাঠামো বলা হয়। "শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, ধর্মীয় মূল্যবোধ, পর্দা প্রথা, বাল্য বিবাহ ও বহু বিবাহ, উত্তরাধিকার আইন, যৌথ পরিবার প্রথা প্রভৃতি অবকাঠামো গুলো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।"[৯] সামাজিক অবকাঠামো আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যেমন: ১) অনুকূল অবকাঠামো ও ২) প্রতিকূল অবকাঠামো।

অনুকূল অবকাঠামো : গ্রামের মানুষের কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি করে কর্মঠ ও উদ্যমী হতে যে সকল অবকাঠামো সাহায্য করে সে সকল অবকাঠামোকে অনুকূল অবকাঠামো বলে। এ সকল অবকাঠামো হলো উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্য, কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ, বাসস্থানের সুযোগ-সুবিধা, পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী, সাংস্কৃতিক চেতনা, উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের মানুষকে দক্ষ, কর্মঠ ও উদ্যোগী করে তোলা। বাংলাদেশে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে এখনও অবকাঠামোমূলক কর্মসূচীগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়ন না হওয়ায় তারা নিু জীবনযাত্রায় কালাতিপাত করছে। নিচে এসব অবকাঠামোগত কর্মসূচী সমূহ পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা) : বাংলাদেশ যেহেতু গ্রাম বহুল দেশ সেহেতু গ্রামের জনগণকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের হাতিয়ার হিসেবে শিক্ষামূলক অবকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের শহরগুলোতে যেভাবে আধুনিক শিক্ষা অবকাঠামো গড়ে উঠেছে, সেভাবে গ্রাম গুলোতে গুণগত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন না হওয়ায় এখনও সম্পূর্ণভাবে মানবসম্পদ উন্নয়ন সম্ভব হয়নি। গ্রামের মানুষের জন্য প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা

গতানুগতিক। দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি চল্লিশ বছর অতিক্রান্ত হলেও কারিগরি, চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট এবং ইংরেজী মাধ্যম উৎপাদনমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গ্রাম গুলোতে চোখে পড়েনা। ফলে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে গ্রামের শিক্ষা ব্যবস্থা হোঁচট খেয়েই চলেছে। নিচে রেখা চিত্রের সাহায্যে গ্রামীণ মানবসম্পদ উন্নয়ন অবকাঠামোগত দিকগুলো দেখানো হলো:

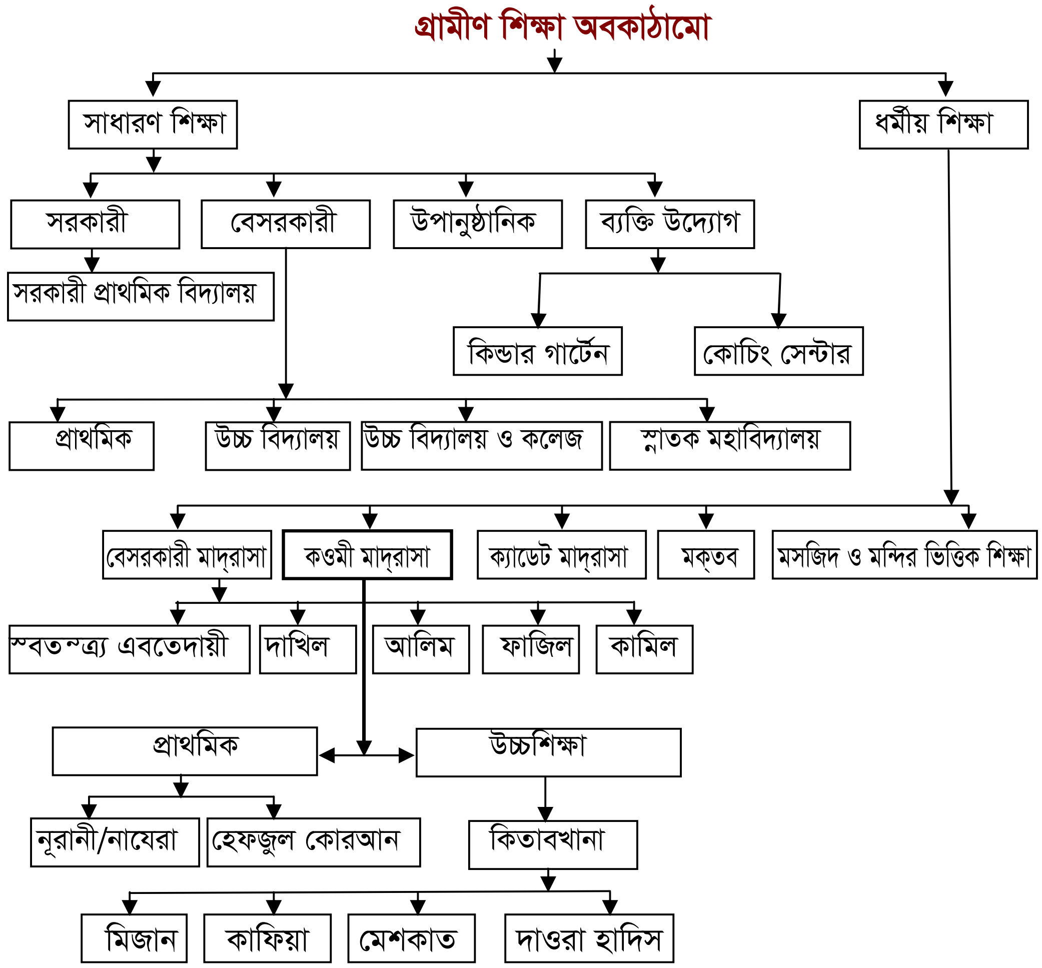

চিত্র নং-৪.২

সাধারণ শিক্ষা: গ্রামীণ সাধারণ শিক্ষা অবকাঠামো নিচে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় : গ্রামীণ জনগণের সন্তানদের সরকারী সুযোগে শিক্ষাদানের একমাত্র উৎস হচ্ছে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষক মন্ডলী কর্তৃক এ শিক্ষা দান পরিচালনা করা খুবই কষ্টকর ব্যাপার বটে। প্রায় প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় ৪/৫ জন শিক্ষক/ শিক্ষিকা, ৪/৫ শত পর্যন্ত ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষা দান করছেন। এভাবে লেখাপড়া শিখে পরবর্তী জীবনে গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীরা ভাল কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ ও যোগ্যতম মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না। এদের মধ্য থেকে দু'একজন ভাল ফলাফল অর্জন করলেও পরবর্তী জীবনে মর্যাদাকর

কর্মসংস্থানের সুযোগ পান না। সরকার ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার জন্য খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু করেন। ফলে দরিদ্র পরিবারের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য পরবর্তীতে সরকার খাদ্য দান কর্মসূচীর পরিবর্তে নগদ টাকায় ঐ বৃত্তিদান কর্মসূচী চালু করেছেন। তাছাড়া গ্রামের সরকারী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে পুরোপুরি সরকারী করণের লক্ষ্যে "২০১৩ সালের ১০ জানুয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন।" [১০]

সরকার ২০০৫ সাল নাগাদ দেশকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। এমতাবস্থায় প্রতিটি গ্রামে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণের কথা থাকলেও তা এখনও সম্ভব হয়নি। "২০১০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে সরকারী ও বেসরকারী মিলিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা উন্নীত হয় ৭৮,৬২৫টি তে।"[১১]

সারণী নং- ৪.৪: নিচে সারণীতে বাংলাদেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলো:

সাল	সরকারী	বেসরকারী	মোট
২০০১	৩৭,৬৭১	২৪,৬৬৭	৬২,৩৩৮
২০০৫	৩৭,৬৭২	২৪,৭২৫	৬২৩৯৭
২০১০	৪৫,৯৫৩	৩২,৬৭২	৭৮,৬২৫

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১২।

বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকারী অনুদান (Monthly Pay Order-MPO) ও ছাত্র/ছাত্রী হতে প্রাপ্ত ফি'র মাধ্যমে শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি প্রদেয় সাপেক্ষে সরকার এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে থাকেন। নিচে এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

প্রাথমিক বিদ্যালয় : সরকার প্রাথমিক শিক্ষাকে পুরোপুরি জাতীয়করণ করলেও এখনও বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে অসংখ্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ এ সুবিধা হতে বঞ্চিত। সরকারের অনুমতি নিয়ে এসকল বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কয়েক জন শিক্ষক গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীদের শিক্ষা দান করে আসলেও তারা অদ্যাবধি সরকার কর্তৃক কোন বেতন ভাতা পাচ্ছেন না। যার ফলে এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার গুণগত মান আশা ব্যঞ্জক নয়।

উচ্চ বিদ্যালয় : বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে এখন পর্যন্ত কোন সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় গ্রামের মানুষের সন্তানরা মাসিক বেতন প্রদানের বিনিময়ে বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় গুলোতে অধ্যয়নের সুযোগ পায়। সরকার Monthly Pay Order (MPO) এর মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষক/ কর্মচারীগণের বেতন ভাতাদি প্রদান করে থাকেন। শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে একটি ম্যানেজিং কমিটি এসব প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন পর্যবেক্ষণও শিক্ষক/কর্মচারীদের নিয়োগ দান করে থাকেন। এক্ষেত্রে কমিটি বেশীর ভাগ সদস্যই স্বজনপ্রীতি, দলীয়করণ ও মোটা অংকের (উৎকোচ) টাকার বিনিময়ে শিক্ষক/কর্মচারীগণের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান সম্মত শিক্ষকের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। যার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যত জীবনে তেমন মেধার বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হন না। দু'একটি ইউনিয়ন মিলে বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয় গুলো অবস্থিত। দরিদ্র ও মেধাবী ৪০ ভাগ ছাত্রী সরকার প্রদত্ত উপবৃত্তি কর্মসূচীর আওতায় বিনা বেতনে অধ্যয়নের সুবিধা ভোগ করলেও বাকী মেধাবী ও দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ও ছেলে শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে অবহেলিতই থেকে যায়।

উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ: একটি উপজেলায় দু'তিনটি উচ্চ বিদ্যালয় চোখে পড়ে। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর কার্যক্রম উচ্চ বিদ্যালয়ের মতোই একটি গভর্নিংবডি পরিচালনা করে থাকেন। কমিটি শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ ও লেখাপড়ান মান দেখভাল করেন। উচ্চ বিদ্যালয়ের সাথে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি উন্মুক্ত করে সরকার এ শিক্ষাদান কর্মসূচী পরিচালনা করছেন। শিক্ষক/কর্মচারীগণের সরকারী অংশের বেতন-ভাতা প্রদান উচ্চ বিদ্যালয় গুলোর মতোই। এ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান সমূহ থেকে তেমন মেধাবী ছাত্র/ছাত্রী বের হতে পারে না। সরকার এমন প্রতিষ্ঠানে ৪০ ভাগ নির্দিষ্ট মেধা সম্পূর্ণ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান ও বিনা বেতনে অধ্যয়নের ভর্তুকি দিয়ে থাকেন।

¯œাতক মহাবিদ্যালয় : কোন কোন জেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে কদাচিৎ একটি¯œাতক মহাবিদ্যালয় দেখা যায়। যাতে শিক্ষার মান খুবই নি¤œ। এসমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যারা শিক্ষা গ্রহণ করে¯œাতক ডিগ্রী অর্জন করেন, তাদের সে মেধা দ্বারা প্রতিযোগিতামূলক সরকারী চাকুরী সহ অন্য কোন ক্ষেত্রেই সাফল্য তেমন সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হন না। যা গ্রামীণ জীবনযাত্রার পথ প্রশস্ত করতে পারে।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হলো নিরক্ষরমুক্ত দেশ গড়া। সরকারী ও বেসরকারী সংস্থাগুলোর যৌথ উদ্যোগে এ শিক্ষা কর্মসূচী প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ধারায় যে সকল শিশু-কিশোর ও বয়স্ক জনগোষ্ঠী কোন কারণে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পায়নি বা নিরক্ষর রয়েছে, ঐ সকল শিশু ও জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে গোটা জাতিকে অক্ষর জ্ঞান সম্পূর্ণ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এ কর্মসূচীটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে গ্রাম গঞ্জে বয়স্ক শিক্ষার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, "১৯৯৫ সালে এ ক্ষেত্রে শিক্ষিতের হার ছিল ৪৭.৩ এবং ২০০৯ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৬২.৬৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।"[১২]

১৯৯৯ সালের আদম শুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী, "বাংলাদেশের শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৩২.৪০ ভাগ। ২০০৫ সাল নাগাদ বাংলাদেশের বয়স্ক শিক্ষার হার ৬২.৬৬ ভাগে উন্নীত হয়েছে। ২০১২ সালে এর হার ৮২ ভাগে উন্নীত হয়েছে।" [১৩]

ব্যক্তি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় : সাম্প্রতিক শহরে আদর্শে ব্যক্তি উদ্যোগে গ্রামে কিছু কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এতে গ্রামের ছেলেমেয়েদের মেধা ভিত্তিক শিক্ষা লাভের পথ সামান্য সুবিন্যস্ত হয়েছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলো হলো :

কিন্ডার গার্টেন : ব্যক্তি উদ্যোগে শহরের মান সম্পূর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম পর্যায়ে গ্রামের শিশুদের শিক্ষা দানের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণে সরকারের অনুমোদন থাকলেও আর্থিক দিক থেকে কোন সহযোগিতা নেই। গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীরা ইউনিয়ন পর্যায়ে বা গ্রামের কোন বাণিজ্যিক এলাকায় এ সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকেন। এ সকল প্রতিষ্ঠানে গ্রামের ধনী পরিবারের শিশু সন্তানরা মাসিক অধিক বেতন প্রদানের মাধ্যমে লেখা পড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

কোচিং সেন্টার : পাবলিক পরীক্ষায় গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীদের ভালো ফলাফলের প্রত্যাশা পূরণের নিশ্চয়তা দেয়ার জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। এক্ষেত্রে শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীরা বাড়ী ভাড়া নিয়ে ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে উচ্চ হারে ফি আদায় করে শিক্ষাদান করে থাকেন। বেশীর ভাগ কোচিং সেন্টার গুলোতে গ্রামের ধনী কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেয়ে থাকে।

ধর্মীয় শিক্ষা : গ্রামে যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় ও সাধারণ শিক্ষার সংমিশ্রণে এবং শুধু মাত্র অভিন্ন ধর্মীয় কারিকুলামে শিক্ষাপ্রদান করে থাকে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

বেসরকারী ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান : সরকার সাধারণ শিক্ষায় বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে যে যে পদ্ধতিতে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করে থাকেন, অনুরূপ সকল পদ্ধতি অনুসরণ করে সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার সংমিশ্রণে প্রতিষ্ঠিত এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোও পরিচালনা করে থাকেন। নিচে এ সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

স্বতন্ত্র্য এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা : সংমিশ্রিত বেসরকারী ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক স্তর হলো স্বতন্ত্র্য এবতেদায়ী মাদ্‌রাসা। এ শিক্ষা স্তর সাধারণ শিক্ষার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমতুল্য। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধা

সরকারের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রদান করা হয়। একটি ম্যানেজিং কমিটির মাধ্যমে এসকল প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হয়ে থাকে।

দাখিল মাদ্‌রাসা : সরকারের সাধারণ শিক্ষার বেসরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের সম মানের শিক্ষা এ সকল মাদ্‌রাসায় প্রদান করা হয়। সাধারণ ও ধর্মীয় শিক্ষার সমন্বয়ে এ প্রতিষ্ঠান গুলোতে শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষক/কর্মচারীদের নিয়োগ ও বেতন ভাতাদি সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সরকারী নীতিমালা মোতাবেক প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ মাদ্‌রাসা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে একটি পরিচালনা কমিটি এ সকল মাদ্‌রাসার শিক্ষক কর্মচারী নিয়োগ ও শিক্ষার মান পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধাবী ও দরিদ্র মেয়েদের জন্য সরকারের উপবৃত্তি কর্মসূচী চালু রয়েছে।

আলিম মাদ্‌রাসা : সাধারণ শিক্ষার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণির সমমান সম্পূর্ণ এ সকল ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলা, ইংরেজী সহ মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে শিক্ষাদান এবং ধর্মীয় শিক্ষার সংমিশ্রণে এ পর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত। বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিমালায় একটি ব্যবস্থাপনা কমিটি দ্বারা মাদ্‌রাসার শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগ ও প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয়ে থাকে। তাছাড়া বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নিয়মে শিক্ষক/কর্মচারীগণ সরকারী অংশের বেতন ভাতাদি পেয়ে থাকেন। শিক্ষক/কর্মচারী নিয়োগে নিরপেক্ষতা নিয়ে অনেকেই কমিটির কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করে থাকেন। যার ফলে গ্রামীণ এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মান সম্পূর্ণ শিক্ষক না থাকায় অধ্যয়নের মাধ্যমে মেধা সম্পন্ন ছাত্র/ছাত্রী বের হতে দেখা যায় না। যার ফলে এসব শিক্ষার্থীদের গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকারী চাকরী সহ অন্যান্য উৎপাদনমুখী কাজে অংশ গ্রহণ তেমন একটা সম্ভব হয় না।

ফাজিল মাদ্‌রাসা : সাধারণ ও মাদ্‌রাসার শিক্ষার সংমিশ্রিত এ স্তরের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার স্নাতক শ্রেণীর সমমান সম্পূর্ণ। তবে এ শ্রেণী উত্তীর্ণ হওয়ার পর সরকারের সর্ব মহলে ছাত্র/ছাত্রীরা চাকরী লাভের সুযোগ পান না। মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা এবং ক্ষেত্র বিশেষে ছাত্র/ছাত্রীদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ লাভের সুযোগ রয়েছে।

কামিল মাদ্‌রাসা : কামিল মাদ্‌রাসায় সাধারণ শিক্ষার ্লাতকোত্তর শ্রেণীর সমমানের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রদান করা হয়। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সার্টিফিকেট অর্জন করে ছাত্র/ছাত্রীরা মাদ্‌রাসার শিক্ষক ও ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি চাকুরীতে নিয়োগ লাভের সুযোগ পেয়ে থাকেন। সিভিল সাভিস সহ প্রতিযোগিতামূলক অন্যান্য পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে উচ্চ পদমর্যাদা সম্পূর্ণ সরকারী চাকরী লাভের সুযোগ এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রী অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য প্রযোজ্য নয়।

কওমী মাদ্‌রাসা: কওমী মাদ্‌রাসার শিক্ষা কাঠামো দু'টি ভাগে বিভক্ত যেমন: ১) কওমী প্রাথমিক শিক্ষা ও ২) কিতাবখানা । নিচে এ শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনা করা হলো:

কওমী প্রাথমিক শিক্ষা : কওমী প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দু'টি স্তর রয়েছে। যথা- ১) নূরানী/নাযেরা ও ২) হেফজুল কোরআন।

নূরানী/নাযেরা : নূরানী/নাযেরা শিক্ষায় কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শুদ্ধভাবে আরবী আক্ষরিক জ্ঞান শিক্ষা দেয়া হয়। সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ জীবন চলার মত সামান্য বাংলা, ইংরেজী ও গণিত ছাড়া সাধারণত: কোরআন ও হাদিসের আলোকেই এ শিক্ষা প্রদান করা হয়।

হেফজুল কোরআন : নাযেরা শিক্ষা শেষ হওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অনেকে কোরআন শরীফ মুখস্থ (হেফ্‌জ) করে প্রাথমিক শিক্ষা স্তর শেষ করে থাকে।

কিতাবখানা : কওমী উচ্চ শিক্ষার নাম কিতাবখানা। কিতাবখানায় আবার চারটি স্তর রয়েছে। যেমন: ১) মিজান ২) কাফিয়া ৩) মেশ্‌কাত ও ৪) দাওরা হাদিস।

মিজান : কওমী মাদ্‌রাসার এ স্তরটি সাধারণ শিক্ষার মাধ্যমিক সমমানের শিক্ষা ব্যবস্থার মত। তবে কোরআন এবং হাদিসের আলোকে এ শিক্ষা কাঠামো পরিচালিত।

কাফিয়া : উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের সমতূল্য বলে বিবেচিত কওমী কাফিয়া শিক্ষা স্তরটি প্রবর্তিত। কোরআন ও হাদিসের আলোকে এ শিক্ষা পদ্ধতি পরিচালিত।

মেশকাত : মেশকাত শিক্ষা ব্যবস্থাকে সাধারণ শিক্ষার‍্লাতক ডিগ্রীর সমপর্যায়ের শিক্ষা ব্যবস্থা বলে বিবেচিত হয়। সম্পূর্ণ কোরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্মীয় আদর্শে এ শিক্ষা কাঠামো পরিচালিত।

দাওরা হাদিস : এ শিক্ষা স্তরটি কাওমী মাদ্‌রাসার সাধারণ শিক্ষার স্নাতোকত্তোর শ্রেণীর সম মানের ল্লাতকোত্তর শ্রেণীতে যেমন একটি বিষয় নিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে অধ্যয়ন করতে হয় তেমনি কওমী মাদরাসায়ও দাওরা হাদিস শ্রেণীতে শুধু হাদিস শাস্ত্র নিয়ে একজন শিক্ষার্থীকে লেখাপড়া শিখে মাদ্রার সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে হয়।

ক্যাডেট মাদ্‌রাসা : সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে ধর্মীয় ও কিছুটা সাধারণ শিক্ষার সংমিশ্রণে কোন কোন উপজেলায় দু'একটি গ্রামে এ ধরণের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের কোন আর্থিক সহায়তা বা অনুদান প্রদান করা হয়না। ছাত্র/ছাত্রীদের কাছ থেকে আদায়কৃত অর্থে ক্যাডেট মাদ্‌রাসাগুলো পরিচালিত হয় এবং শিক্ষক/কর্মচারী গণের বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয়।

মক্তব : মক্তবগুলো এদেশের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সুতিকাগার বলা হয়। এ মক্তবকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে আজকের সাধারণ শিক্ষাসহ মাদ্‌রাসার উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা। বাংলাদেশে শত বছরের বা তারও অধিক সময় আগে থেকেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা চলে আসছে। তবে অধুনা নানামুখী আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হওয়ায় এ অতীত শিক্ষা ব্যবস্থার ঐতিহ্য প্রায় শেষ হওয়ার পথে। তবুও গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় কঁচি কাঁচা শিশুদের হাতি খড়ি হিসেবে দু'একটি এলাকায় এ শিক্ষা ব্যবস্থার অস্তিত্ব কিছুটা হলেও চলমান রয়েছে। গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েরা এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখা পড়া শিখে সামান্য জীবন চলার পথ এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা ছাড়া অন্য কোন পেশায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন না। ফলে গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা কোন ভূমিকা রাখতে পারেন না।

মসজিদ ও মন্দির ভিত্তিক নৈতিক শিক্ষা: সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও হিন্দু কল্যাণ ট্রাষ্টের মাধ্যমে মসজিদের ইমাম ও মন্দিরের পুরোহিত গণকে একটি নির্দিষ্ট পরিমান বেতন ভাতা দিয়ে গ্রামের শিশুদের প্রাক-ধর্মীয় নৈতিক শিক্ষা দেয়ার জন্য এ কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন।

জনস্বাস্থ্য : গ্রামের মানুষের সামাজিক অনুকূল অবকাঠামো শিক্ষার পাশাপাশি রয়েছে জনস্বাস্থ্য। মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে স্বাস্থ্যগত যোগ্যতার উপর। কিন্তু স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের এ মৌলিক উপাদানের কোনটাই বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের জন্য সহজ লভ্য নয়। স্বাস্থ্য রক্ষার মৌলিক উপাদান সুষম খাদ্য গ্রহণ, উপযুক্ত বাসস্থান, পরিচ্ছন্ন পরিবেশ এখনও গ্রামের মানুষের দোর গোড়ায় পৌঁছেনি। স্বাস্থ্যগত উন্নয়নের এসব উপাদান গুলো সম্পর্কে ধারণা গ্রামের মানুষের মধ্যে এখনো জাগ্রত হয়নি। এক্ষেত্রে গ্রামের ধনী মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ গ্রহণের উদাহরণ গোটা গ্রামের মানুষের জন্য প্রযোজ্য নয়। বাকী জনগোষ্ঠী আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল বলেই উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ ভোগ আবহমানকাল থেকেই ঘৃণিত হচ্ছে। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে শহরের মানুষের তুলনায় এ জনগোষ্ঠী অনেক পিছিয়ে থাকার কারণ, তারা ব্যাপক হারে স্বাস্থ্য হীনতায় ভোগ্‌ছে। নিচে এর কিছু উল্লেখযোগ্য দিক আলোকপাত করা হলো:

শারীরিক দুর্বলতা : গ্রামের অধিকাংশ মানুষ ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী থাকায় দৈহিক দিক দিয়ে তারা দুর্বল। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে পরিশ্রম করে উৎপাদন বাড়িয়ে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না।

সচেতনতার অভাব : গ্রামের অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী সম্পর্কে তাদের মোটেও ধারণা নেই। কি ধরণের খাবার গ্রহণ এবং কোন্ কোন্ খাবার পরিহার করলে সুস্থ থাকা যায় এ সম্পর্কে কোন সচেতনতা গ্রামের

সাধারণ মানুষের নেই। আবার কখনও একটি সাধারণ রোগে কোন পরিবার প্রধান সময় মত চিকিৎসা না করিয়ে দীর্ঘ সময়ে তা জটিল করে ফেলে। এমতাবস্থায় রোগ শয্যায় শুয়ে শুয়ে উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত না থেকে বরং সহায় সম্বল বিক্রি করে খেয়ে পরায় একটি পরিবারের জীবন চলার পথ চিরদিনের মত নি:শেষ হয়ে যায়।

দক্ষতার অভাব : কৃষকদের অনিশ্চিত স্বাস্থ্য সেবার কারণে দক্ষতার মাধ্যমে অধিক কাজ করে অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনে তারা সক্ষম না হওয়ায় জীবনযাত্রার গতি সচল না হয়ে স্থবির হয়ে পড়ছে। এক্ষেত্রে বিদেশী স্বাস্থ্যবান শ্রমিকরা দক্ষভাবে উৎপাদন কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে অধিক ফসল ফলিয়ে নিজেরা মানসম্মত জীবন যাপনে সক্ষম হলেও বাংলাদেশের শ্রমিকরা তুলনামূলকভাবে অনেক পিছিয়ে আছে। যা গ্রামোন্নয়নে কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেনা।

বাল্য বিবাহ : বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের মধ্যে বাল্য বিবাহ প্রথা বিদ্যমান থাকাই স্বাস্থ্যহীনতার অন্যতম কারণ। সরকারী হিসেব অনুযায়ী একজন ছেলে ২৫ বৎসর এবং একজন মেয়ে ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারেন। কিন্তু গ্রামের মানুষ একজন ছেলে মেয়েকে ১০-১২ বৎসর বয়সে বিয়ে দেয়ার ফলে অল্প বয়সে তারা জনক/জননী হয়ে স্বাস্থ্যহীন হয়ে পড়ে এবং বাকী জীবন ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে জীবনযাপন করতে থাকে। একজন কর্মঠ ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠে বেশী উৎপাদন করে পরিবারের আয় বর্ধনের ক্ষমতা এ সব ছেলেমেয়েদের থাকেনা। বিধায় তারা কাটমোল্লা মানে জীবনযাপনকরে।

দারিদ্র্যতা : গ্রামে বসবাসরত গরীব মানুষের পক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনসম্ভব হয় না। আর্থিক সংগতির অভাবে চিকিৎসা সেবা নিতে তারা একেবারে অপারগ থাকে। অভাব-অনটনের সংসারে উন্নয়নমূলক কোন কাজ করে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনয়ন তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদেরকে দারিদ্র্যতার সাথে সংগ্রাম করে জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

সরকারী উদ্যোগ : সরকারি উদ্যোগে বিদেশী অর্থে গ্রামে দরিদ্র গোষ্ঠীর শিশুদের মধ্যে টিকাদান কর্মসূচী সহ মা ও শিশু স্বাস্থ্য রক্ষার কিছু কিছু কর্মসূচী চালু থাকলেও বয়স্ক অন্যান্য লোকের ক্ষেত্রে তেমন কোন স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা নেই। সরকারী সেবা দানের জন্য বড় বড় হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ গুলো শুধু শহরে গড়ে উঠায় গ্রামের সাধারণ অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষের পক্ষে শহরে গিয়ে চিকিৎসার সুযোগ নেয়া সম্ভব হয় না। গ্রামে যে সকল সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় সরকারী উদ্যোগে গড়ে উঠেছে সে সব চিকিৎসালয়ে চিকিৎসার উপকরণ ও ডাক্তার দু'টোরই যথেষ্ট সংকট রয়েছে। ফলে উপযুক্ত চিকিৎসা সেবাদানের মত অবকাঠামো গ্রামে গড়ে না উঠায় বাধ্য হয়েই গ্রামের মানুষকে স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে নিুমাত্রায় জীবনযাপন করতে হয়। "২০১০-২০১১ সালে

স্বাস্থ্যখাতে বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছিল ৮১২৯ কোটি টাকা।”[১৪] এ টাকার কত অংশ গ্রামীণ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় হয়েছে সেটাই প্রশ্ন।

জন্মগত সমস্যা : গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মায়েরা গর্ভবতী হওয়ার পর শারীরিক চাহিদা অনুযায়ী এবং সন্তানের শরীর বর্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য গ্রহণের সুযোগ না পাওয়ায় অনেক সময় সন্তান নানা শারীরিক জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে থাকে। গ্রামের এসব পরিবারের সন্তান জন্ম গ্রহণ করে বিভিন্ন ধরণের জটিলতা নিয়ে। আধুনিক সামান্য চিকিৎসায় এসব রোগ নিরাময় হলেও পিতা মাতার আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুণ তারা সন্তানকে ঐ সমস্যায় বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা না করানোর ফলে সন্তান গুলো ঐসব সমস্যা নিয়েই অসুস্থ ভাবে বেড়ে উঠে। পরবর্তীতে তারা পরিবারের উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয় এবং সারা জীবনের জন্য নি জীবনযাত্রায় কালাতিপাত করে। যা গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সামিল।

আধুনিক চিকিৎসার উচ্চ ব্যয় : আধুনিক চিকিৎসায় ডাক্তারের উচ্চ পরামর্শ ফি এবং ঔষধের মূল্য বৃদ্ধি জনিত কারণে গ্রামের সাধারণ পরিবারের মানুষের পক্ষে ঐসব ব্যয় বহুল চিকিৎসার খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে স্বাভাবিক ভাবে তাদের দ্বারস্থ হতে হয় গ্রাম্য হাতুরে ডাক্তার, কবিরাজ ও পীর-ফকিরের পানি পড়া, ঝাড়-ফুঁকের উপর। এভাবে তারা সুস্থ না হওয়ায় অসুস্থতা নিয়েই কৃষি কাজ করে সামান্য উৎপাদন করে পরিবার পরিজন নিয়ে নি ভাবে জীবনযাপনকরতে বাধ্য হয়।

পুষ্টিহীনতা : গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারগুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী থাকায় একজন শিশুর যে পরিমান পুষ্টিকর খাবার প্রয়োজন হয় সে পরিমাণ ক্যালরি যুক্ত খাবারের চাহিদা মিটানো দরিদ্র পিতামাতার পক্ষে সম্ভব হয়না। ফলে শরীর গঠনের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান থেকে এ সব পরিবারের সন্তানরা বঞ্চিত হয়। অসুস্থতা নিয়ে রোগে শোকে এরা বর্ধিত হতে থাকে। পরবর্তীতে অধিক পরিশ্রম করে যে কোন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি করার সামর্থ্য তাদের নেই। পরিবারের উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে তাদের তেমন কোন ভূমিকা থাকে না। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক এক জরিপে দেখা গেছে,“দু’ বছরের কম বয়সে প্রায় ৫২% শিশু মারাত্মক ও মাঝারী মাত্রায় অপুষ্টিতে ভুগছে। জরিপে আরও জানা যায় প্রায় ৫০% নবজাতকের ওজন স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম।”[১৫]

সারণী নং- ৪.৫: নিচে সারণীতে ক্যালরি ভিত্তিক গ্রামীণ সচ্ছল, দারিদ্র্য ও চরম দারিদ্র্যদের খাদ্য গ্রহণ (%) আকারে দেখানো হলো:(বিভিন্ন খাদ্য হতে মাথাপিছু ক্যালরি গ্রহণের তুলনামূলক সারণী)

খাদ্য	খানা		খানা (%)		দরিদ্র থেকে স্বচ্ছলের বৃদ্ধি (%)	
	স্বচ্ছল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	দরিদ্র	স্বচ্ছল	দরিদ্র
চাল	১৫৩৩.২৯	১৩৯০.৯৯	১৬৬৩.৩৪	৯০.৭২	১০৮.১০	১৯.১৮
অন্যান্য খাদ্য শস্য	১৭৭.০২	৮২.৬৫	১৭১.৮৯	১০৩.১৮	৯৭.১০	(-)৫.৮৯
আলু	৪৪.৫৪	৪১.৬১	৪৭.২৩	৯৩.৪২	১০৬.০৪	১৩.৫১
শাক-সব্জি	৫৯.৪২	৫৯.৪২	৬৯.৭৫	৮১.১৭	১১৭.২২	৪৪.৪১
ডাল	৮৭.৫২	৮৭.৫২	১০৮.৬০	৭৩.৬৪	১২৪.০৮	৬৮.৫০
ভোজ্য তেল	৯৮.৫৪	৯৮.৫৪	১২৫.২২	৭০.৩৬	১২৭.০৭	৮০.৬১
দুধ ও দুগ্ধজাত খাদ্য	১৮.৬৫	১৮.৬৫	২৫.৯৯	৫৭.৪৮	১৩৮.৬৬	১৪১.৬০
মাংস	১৩.৪৮	১৩.৪৮	২০.৮৮	৩০.৭৯	১৫৫.০১	১৮৯.৫৫
মাছ	৬৮.০০	৬৮.০০	৯৮.৯২	৫০.২৩	১৪৫.৪৭	১৮৯.৫৮
ডিম	৭.৭০	৭.৭০	১০.৪৭	৬০.৬৮	১৩৫.৭৭	১২৩.৭২
ফল	১১.৩৬	৫.৭৯	১৬.৪৬	৫০.৯৭	১৪৪.৮৯	১৮৪.২৮
চিনি ও গুড়	৫৪.৩৬	২৬.১৫	৮০.১৪	৪৮.১১	৪৭.৪২	২০৬.৪৬
মসলা	৫৮.৭৬	৩৮.০৬	৭১.৫৪	৬৪.৭৪	১২১.৭৫	৮৭.৯৭
গড় ক্যালরি গ্রহণ	২২৩২.৬৩	১৯২২.১৮	২৫১০.২৪	৮৬.০৯	১১২.৪৩	৩০.৫৯
গড় হতে কম/বেশী	--	---	----	(-)১৩.৯	(+) ১২.৪৩	---

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরিবীক্ষণ প্রকল্প।

(দারিদ্র্য: মাথাপিছু দৈনিক ২১২২ কিলো ক্যালরির কম গ্রহণ)

কারিগরি জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ : কারিগরি জ্ঞান এবং জ্ঞানের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বিশ্বের মানুষ আজ সভ্য সমাজের উন্নত শিখরে আরোহণ করছে। এ দিক দিয়ে বাংলাদেশের শহরের মানুষ নানামুখী প্রযুক্তির সংস্পর্শে আসলেও গ্রামের মানুষ এখনও এ সংক্রান্ত ব্যাপারে অজ্ঞই রয়ে গেছে। "ইন্টারনেট, ফেসবুক, কম্পিউটারের ব্যবহার মানুষকে আজ অনেক উন্নত জীবনে পৌঁছে দিয়েছে।"[১৬]

গ্রামের মানুষ এসব প্রযুক্তির পুরোপুরি সুবিধা ভোগ করে অদ্যাবধি তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে না।

বাসস্থানের সুযোগ সুবিধা : গ্রামের কিছু ধনী পরিবার পাকা/আধাপাকা বাসস্থানের যথাযথ সুবিধা উপভোগ করলেও বাকী জনসাধারণ শন, খড়, কাঠ, বাঁশ এবং কিছু কিছু পরিবার টিনের তৈরী ঘরে বসবাস করেন। ঘরের চাল, দরজা, জানালা গুলো অনেক সময় ঝড়, তুফান বা প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। ফলে গ্রামের কোন কোন মানুষকে গাছের নিচে ভাসমান জীবনযাপন করতেও দেখা যায়। প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ এদেশের দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের জীবন যাপনের ধারা এখানে বেশী উল্লেখযোগ্য।

পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী : পরিবার কল্যাণ কর্মসূচী সম্পর্কে গ্রামের কাটমোল্লা জীবনযাত্রার মানুষ গুলোর তেমন ধারণা নেই। যাদের কিছুটা ধারণা আছে, তারাও ধর্মীয় অন্ধত্বের জন্য এ কর্মসূচী গ্রহণ করতে নারাজ। এ জন্য গ্রামের পরিবার গুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব অত্যধিক। সার্বিক দিক বিশ্লেষণে দেখা যায়, জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে খাবার-দাবার, পোশাক-পরিচ্ছদ, শিক্ষা-দীক্ষা সব দিক দিয়ে এসব পরিবার নিম্নমানে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়।

সাংস্কৃতিক চেতনা : সংস্কৃতি হলো মানুষের জীবন ধারার একটি পদ্ধতি।"মানুষের পোশাক পরিচ্ছদের ধরণ, খাদ্যাভাস, অর্থ ব্যবস্থা প্রভৃতি থেকে শুরু করে তাদের ঘর, বাড়ি, ভাষা, ধর্ম, রাজনীতি, বিশ্বাস ও উৎসব, আচার, অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্পর্কে যখন জ্ঞাত হওয়া যায়, তখন তাকেই সংস্কৃতি বলে।"[১৭]

বাংলাদেশের ৮০ ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। ধনী ও শহরের বড় লোকেদের মধ্যে প্রাচীন সাংস্কৃতিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে তারা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শে এসে উন্নত জীবনযাত্রার পথ বেছে নিয়েছেন। আর গ্রামের মানুষের সংস্কৃতি আদিকালের মত থাকায় তারা নিম্ন জীবনযাপন পদ্ধতিই অনুসরণ করে চলছে।

উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি : যে কোন সমাজেই নানা ধর্মের কম বেশী লোকজন বসবাস করে। সেখানে পারস্পারিক সৌহার্দ্যপূর্ণ চাল চলন বিদ্যমান না থাকলে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। মানুষ পারস্পারিক দ্বন্দে লিপ্ত হয়ে ধ্বংস যজ্ঞের পথ বেছে নেয়। গ্রামীণ সমাজ ব্যবস্থায় প্রায়ই আন্তঃধর্মীয় বিশৃংখলা সৃষ্টি হতে দেখা যায়। যা সমাজের উন্নয়নকে ব্যাহত করে অধঃপতন ডেকে আনে।

প্রতিকূল অবকাঠামো : যে সকল সামাজিক অবকাঠামো মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল এবং উদ্যম হীন করে তোলে সে গুলোকে প্রতিকূল অবকাঠামো বলে। যেমনঃ গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত যৌথ পরিবার প্রথা, উত্তরাধিকার আইন প্রভৃতি। সামাজিক, রাজনৈতিক ও আচার অনুষ্ঠান গ্রামীণ

অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপর বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে উন্নয়ন মূলক অবকাঠামো ব্যাহত করে মানুষের জীবনযাত্রাকে নিম্নমুখী করে ফেলে।

অর্থনৈতিক অবকাঠামো : গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর একটি অপরিহার্য উপাদান বা পূর্বশর্ত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন অবকাঠামো। যা মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। "অবকাঠামো উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে যখন গতিশীল করে এবং উন্নয়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখে, তখনই এ উন্নয়নের সমষ্টিকে অর্থনৈতিক অবকাঠামো বলে।"[১৮]

বাংলাদেশের গ্রামে বিশেষ করে অজ পাড়া গাঁ বা প্রত্যন্ত অঞ্চল (Remote Area) যাকে অর্থনীতির ভাষায় অবকাঠামো উন্নয়ন বলা হয়, তার পুরোপুরি হাওয়া এখনও বইছে না। কবে নাগাদ বইবে তার কোন নিশ্চয়তা (Guarantee) এখনও পাওয়া যাচ্ছে না। তবে একথা সত্য, জন প্রতিনিধিরা যে এ ক্ষেত্রে একেবারে কাজ করছেন না তা নয়। যতটুকু করছে তা গ্রামের মানুষের প্রত্যাশা সূচকের অনেক অনেক নীচে অবস্থান করছে। যা আসলে অবকাঠামোগত উন্নয়নে কোন ভুমিকাই রাখেনা। মোট কথা অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন বলতে রাস্তাঘাট, পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা, বাঁধ ও সেতু নির্মাণ কর্মসূচী, ডাক ও তার, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান এবং বিদ্যুৎ শক্তির ব্যবহারই বুঝানো হয়। অর্থনৈতিক অবকাঠামোকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়, যথাঃ ১) যাতায়াত ও পরিবহন ২) যোগাযোগ এবং ৩) বিদ্যুৎ শক্তি। নিচে গ্রামীণ যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ

যাতায়াত ও পরিবহন : গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যাতায়াত ও পরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন ছাড়া কোনই বিকল্প নেই। রাস্তা-ঘাট যে শুধু অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ তাই নয়, মানুষের চলাচলের প্রধান মাধ্যমও। যে গ্রামে রাস্তাঘাট যত বেশী সে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানও তত বেশী উন্নত। রাস্তা-ঘাট ব্যবহার করে কৃষকরা তাদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য পরিবহন করে অতি সহজে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চাহিদা মত আমদানী-রপ্তানী করতে পারে। এতে মানুষের জীবন পদ্ধতি স্বাভাবিক ও গতিশীল হয়।

গ্রামের যাতায়াত অবকাঠামো কোথাও সরকারী এবং কোথাও বা গ্রাম বাসীদের স্ব-উদ্যোগে গড়ে উঠেছে। আদিকাল থেকেই গ্রামের মানুষ জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য সংগ্রহের জন্য যাতায়াত করতো । মানুষ গ্রাম থেকে গ্রামে, গ্রাম থেকে শহর-বন্দরে, এমনকি এক দেশ থেকে অন্য দেশে একই জায়গা দিয়ে বার বার চলাচলের ফলে এমন মাধ্যমগুলোই পরবর্তীতে রাস্তা নামে পরিচিতি লাভ করে।

সভ্যতার সাথে সাথে মানুষ যাতায়াতের এসব মাধ্যমগুলো নিজেরাই সোজা ও প্রশস্ত করে জীবন চলার পথ কিছুটা হলেও সহজ সাধ্য করে তোলে। যে সকল গ্রামে স্থল ভাগে যাতায়াত সহজ ছিলনা অর্থ্যাৎ জলাভূমি এলাকা, সেখানে মানুষ কলা গাছের ভেলা, কুন্দা (তাল গাছের গর্ত করা বড় আকারের আস্ত তক্তা), এবং নৌকা বেয়ে যাতায়াত করতো । পরবর্তীতে বৃটিশ শাসকরা এ দেশে রেল পথ চালু করলে, কোন কোন গ্রামের মানুষ এ পথে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত ও মালামাল পরিবহন করতেন। নিচে গ্রামের মানুষের যাতায়াত অবকাঠামো গুলো পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

মেঠোপথ : বাংলাদেশের অজ পাড়া গাঁয়ে এখনও যাতায়াত ও পরিবহনের প্রধান মাধ্যম হলো গ্রাম্য মেঠা পথ। জনসাধারণ এসব পথ দিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী এক বাড়ী থেকে অন্য বাড়ী , দোকান পাট, সালিশ-দরবার, হাট-বাজার, খেলার মাঠ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গমন করে থাকেন। এমনকি এসব রাস্তা দিযে পায়ে হেঁটে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে গ্রামের মানুষ দূরের পাকা রাস্তা পর্যন্ত পৌছে শহরে গমন করে থাকে। কৃষক/শ্রমিকরা এ পথ ব্যবহার করেই কৃষি ক্ষেতে যাতায়াত এবং কৃষি পণ্য আনা নেয়া করে থাকে। অসুস্থ রোগীকে কাঠের তক্তায় শুইয়ে এ পথ বেয়েই মানুষ ডাক্তার, কবিরাজের সেবা পাওয়ার জন্য গন্তব্যে পৌঁছে থাকে।

কাঁচা সড়ক : গ্রাম থেকে গ্রাম ঘুরলে দেখা যায় দু'একটি কাঁচা সড়ক। আবার কোন কোন গ্রামে একটি কাঁচা সড়কও চোখে পড়ে না। কাঁচা সড়ক গ্রামের বড় হাট বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ কিংবা উপজেলার সাথে সংযোগ সাধন করেছে। কাঁচা সড়কে কোথাও কোথাও দু'একটি ভ্যান বা রিক্শা চলতে দেখা যায়। গ্রামের ধনীকৃষক, শহরে চাকুরীরত কোন লোক বা ব্যবসায়ীরা মালামাল আনা নেয়া এবং যাতায়াতের কাজে এসব রাস্তা ব্যবহার করেন। অনেক সময় বিবাহের নতুন বর কনে বহনের জন্য গ্রামের অশিক্ষিত নিরীহ মানুষ এ সকল বাহনকে বিলাস বহুল মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন।

পাকা সড়ক : জেলা শহর, উপজেলা পরিষদ এবং মাঝে মাঝে কোন কোন ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দু'একটি পাকা সড়ক গ্রামের দিকে বয়ে যেতে দেখা যায়। যে সকল রাস্তা দিয়ে গ্রামের মানুষ রিক্শা-ভ্যান, ঠেলাগাড়ী, পুরাতন টেম্পু-বাস ও ট্রাকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে গমন ও মালামাল বহন করে থাকে। এসব রাস্তা পাকা করণের পর যুগ যুগ অতিক্রান্ত হলেও মেরামতের অভাবে খানাখন্দে পরিণত হয়ে মানুষের যাতায়াতে অনুপযোগী হয়ে দুর্ভোগ বহুগুণে বাড়িয়ে থাকে।

রেলপথ: এক সময় স্থল ভাগে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম হিসেবে পরিচিত ছিল রেলপথ। এ পরিবহনটি চালু হওয়ার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, গ্রাম থেকে বৃটিশরা এদেশে কৃষকদের উৎপাদিত

কাঁচামাল তাদের নির্দিষ্ট একটি স্থানে আনা এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী গ্রামে পৌঁছে দিয়ে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যকে লাভ জনক করা। আর এ জন্যই এক জেলা থেকে অন্য জেলার সাথে সংযোগ রক্ষা করা হয়েছিল। যার ফলে রেল লাইনের আশ-পাশে এবং দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ মালামাল রেল স্টেশন গুলোতে পৌঁছাতে এবং নিজেদের প্রয়োজন মিটাতে শহরে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়। দেশের খুব কম যাত্রী এ পরিবহণে যাতায়াতের সুযোগ পায়। বর্তমানে এ পরিবহন অকার্যকর অবস্থায় পরিণত হয়েছে। নানা দুর্নীতি ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এ পরিবহন লাঠি হাতে একজন অক্ষম বৃদ্ধের পথ চলার অনুরূপ অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

নৌ-পথঃ বাংলাদেশের যে সকল এলাকায় জনগণের সড়ক বা রেলপথে চলাচলের কোন সুবিধা নেই, সে সকল এলাকায় এখনও মানুষ আদি কালের মতই নৌ-পথে যাতায়াত এবং পণ্য সামগ্রী আনা-নেয়া করে থাকেন। দেশের দক্ষিণ বঙ্গ সহ বিভিন্ন এলাকায় এখনও মানুষ দাড় টানা নৌকা, কুন্দা, ইঞ্জিন চালিত নৌকা (ট্রলার) ও লঞ্চের মাধ্যমে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে, হাট বাজারে, শহর বন্দরে যাতায়াত করেন। এ পথে মানুষ কৃষি পণ্য ও ব্যবসায়ী স্বার্থে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পণ্য আনা নেয়া করে থাকেন। এ পথে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় অনেক সময় এসকল পরিবহন গুলো ডুবে গিয়ে বা অন্য যে কোন কারণে দুর্ঘটনার শিকার হয়ে প্রতি বছর বহু নিরীহ মানুষ মৃত্যু বরণ করে থাকে।

বাংলাদেশে বর্ষাকালে প্রায় "২০,৯৫৮ কিলোমিটার এবং শুষ্ক মৌসুমে ৩,৮০০ কিলোমিটার নৌপথে যাতায়াতের সুযোগ রয়েছে।"[১৯] পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে খাল, বিল ও অন্যান্য জলাশয়, নদী-নালার নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় নৌপথে চলাচলের পরিমান দিন দিন কমে যাচ্ছে।

বাঁধ ও সেতু নির্মাণ : নদীমাতৃক বাংলাদেশের সড়ক ও রেলপথে যাতায়াতের বাধা নিরসনের জন্য অতীতের ন্যায় বর্তমানেও খাল-বিল, জলাশয়, নদী-নালার উপর বাঁশ ও কাঠের সেতু, কার্লভার্ট, ছোট বড় পাকা সেতু নির্মাণ করে জনগণের যাত্রা পথকে অনেকটা সহজসাধ্য করে তোলা হয়েছে। এক্ষেত্রে সরকার এক শহর থেকে অন্য শহরে যাতায়াতের রাস্তায় নদী-নালা ও জলাশয়ের উপর বাঁধ ও সেতু নির্মাণ কর্মসূচীটি বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

স্বাধীনতাত্তোর জলাশয়ে বাঁধ, কাঠের সেতু, কালভার্ট ও স্বল্পমাত্রায় পাকা সেতু নির্মাণ হওয়ায় মানুষের যাতায়াতের দুর্ভোগ কিছুটা হলেও কমেছে। তবে স্বল্প মাত্রায় এ অবকাঠামো উন্নয়নে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান আশানুরুপ ভাবে বৃদ্ধি পায়নি।

যোগাযোগ : যে কোন দেশের মানুষের উন্নয়নের অন্যতম মাধ্যম হলো অবকাঠামোগত যোগাযোগ। অর্থনীতির ভাষায় যোগাযোগ ব্যবস্থা বলতে যে সব মাধ্যমের সমষ্টিকে বোঝায় সেসব

মাধ্যম দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার কাজে সহায়তা করে থাকে। যেমন: ডাক বিভাগ, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বেতার, টেলিভিশন, ভূ-উপগ্রহ, টেলেক্স প্রভৃতি।

অর্থনীতির এ সংজ্ঞাটি বিশ্বব্যাপী কিছুটা হলেও গুরুত্ব হারিয়েছে। কারণ "ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি আধুনিক পদ্ধতি বিশ্ব যোগাযোগের তড়িৎ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।"[২০] দেশের শহর বন্দরের মানুষ এ সুবিধা ভোগ করলেও গ্রামের মানুষের হাতের কাছে এ মাধ্যমগুলো এখনও যথাযথ ভাবে পৌঁছতে পারেনি বিধায় তারা আদি দীর্ঘ মেয়াদী মাধ্যম গুলোই ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

বিদ্যুৎ শক্তি : মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গুলোর মতই বিদ্যুৎ শক্তি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। জীবন চলার পথে এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে বিদ্যু শক্তির উপযোগিতা নেই। দেশের অর্থনীতি যেহেতু পুরোপুরি কৃষিনির্ভও সেহেতু এ অবকাঠামো কৃষিকাজে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। কৃষি জমিতে সেচ, শস্য মাড়াই ও সংরক্ষণেও এ মাধ্যমের উপযোগিতা অনস্বীকার্য । কুটির শিল্প উন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহার খাটো করে দেখা যায় না। গ্রামীণ জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অন্যান্য ক্ষেত্রেও বিদ্যুতের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এ কারণে সরকার 'পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড' গঠন করেছেন। বোর্ড কর্তৃক সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ কৃষি কাজে ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করতে পারে স্বল্প সংখ্যক কৃষক। বাকী কৃষকরা কৃষি ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করতে বাধ্য হয়।

সুতরাং যুক্তিতর্ক দিয়ে উপস্থাপন করলে বলা যায়, যতদিন না গ্রামের বাকী কৃষকরা বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুবিধা ভোগ করতে পারবে, ততদিন গ্রামীণ সার্বিক অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্য মাত্রা বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকবে। তাই গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুতের ব্যবহার অবশ্যই অপরিহার্য।

জনসংখ্যার ঘনত্ব : বাংলাদেশের গ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত ব্যাপক যে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক সম্পদের চেয়ে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ অনেক বেশী। গ্রামীণ ব্যাপক জনগোষ্ঠীর সীমিত সম্পদে চাহিদা পূরণ না হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই মানুষকে কাটমোল্লা জীবনযাত্রার পথ বেছে নিতে হয়। গ্রামে সম্পদের অসম বন্টণ ব্যবস্থায় কিছু মানুষ উন্নতমানে জীবনযাপনকরলেও বাকীদের 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়।'

কাটমোল্লা জীবনযাত্রার মানুষ আবার নানা ভাবে শোষিত হচ্ছে, আর এক্ষত্রে কোন মহলই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান বাড়ানোর ব্যাপারে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছেন না। সেটা রাজনৈতিক নেতৃত্বই হউক বা গ্রামের ধনী কৃষক সমাজই হউক। উভয় সমাজই এ অসচেতন জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়কে কোণঠাসা করে রাখছেন। ধনী কৃষক বাদে অন্যান্য কৃষক পরিবারে

জনসংখ্যার ঘনত্ব অধিক। তারা শুধু পেটের ক্ষুধা নিবারণের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে। এটা এমন অবস্থা যে, 'ভিক্ষে নেয়ার চেয়ে কুকুর তাড়নাই বড় কথা।' "জনসংখ্যার ঘনত্বের কারণে প্রায় ৫০% গ্রামের মানুষ আয়োডিন জনিত সমস্যায় আক্রান্ত।"[২১]

গ্রামের পরিবারে জনসংখ্যার ঘনত্বের প্রভাব ও জীবনযাত্রার মান নিম্ন মুখী হওয়ার বিভিন্ন দিক নিচে আলোচনা করা হলো

উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত : গ্রামের যে সকল পরিবারে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেশী তা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। ঐ সকল পরিবার তাদের সন্তানদের শিক্ষিত করে সচেতন জনগোষ্ঠীতে পরিণত করতে সক্ষম হয় নয়। এর মূল কারণ, অর্থনৈতিক অস্বচ্ছলতা। এমন অসচেতন পরিবারের ছেলে মেয়েদের বিয়ে হয় অনুরূপ পরিবারে। নতুন দম্পতিরাও পূর্ব পুরুষদের আদর্শ অনুসরণ করে জন্মদান প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখে। ফলে এদের সন্তান গুলোও শিক্ষিত হয়ে ভাল মানুষ হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে গ্রামের অসচেতন দম্পতিদের জন্ম দানের ধারাবাহিক পদ্ধতি অব্যাহত থাকায় বেশীর ভাগ পরিবারে জনসংখ্যার ঘনত্ব কাম্য জনসংখ্যার চেয়ে বেশী এবং জীবনযাত্রার মান অনেক নিচে। পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য যে পরিমান উপার্জনের প্রয়োজন এ সকল পরিবার সে পরিমাণ উপার্জনে সক্ষম নয়। যার ফলে গ্রামোন্নয়নের পথ অনেকটা রুদ্ধ হয়ে আছে।

ধর্ম : পবিত্র ইসলাম ধর্মে উল্লেখ আছে, দারিদ্র্যতা মানুষকে কুফরীতে পরিণত করে। হাত পেতে কারও কাছ থেকে কিছু নেয়ার চেয়ে কারও হাতে কিছু দেয়াকে সমর্থন করেছে। কোন সক্ষম পুরুষ স্ত্রীর ভরণ-পোষণে অক্ষম হলে তাকে বিয়ে না করে রোজা রাখার জন্য বলা হয়েছে। এ কথায় স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে ইসলাম ধর্ম দারিদ্র্যতাকে দারুণ ভাবে তাচ্ছিল্য করেছে।

তাছাড়া সন্তান সন্ততিকে এল্‌ম (জ্ঞান) শিক্ষা দান ফরজ (অবশ্য পালনীয়) করার কথাও উল্লেখ রয়েছে। জ্ঞানী কখনও পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অমঙ্গল কামনা করতে পারেন না। অথচ গ্রামের কাট মোল্লারা পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে একমুখী ফতোয়া দিয়ে অধিক সন্তান জন্মদানে উৎসাহিত করেন। ইসলামের বিধান মোতাবেক তাদের (কাটমোল্লা) ফতোয়াও সমর্থন যোগ্য যদি সে জনসংখ্যা জ্ঞানবান (এল্‌ম ওয়ালা) হয়। আর তখনই একটি দেশের জনসংখ্যা শুধু অভিশাপই নয়, তা আশির্বাদও বটে (যদি তারা কর্মমুখী হয়)।

ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করলে সন্তান-সন্ততিকে জ্ঞানী, স্বাস্থ্যবান হিসেবে গড়ে তোলা পিতামাতার দায়িত্ব। এসব সন্তান পিতামাতা ও রাষ্ট্রের সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়। অসচেতন গ্রামের মানুষ সন্তান জন্ম দান করে ঠিকই, কিন্তু সন্তানকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে দায়িত্ব হীন। দরিদ্র পরিবারের অধিক সন্তান গুলো নিম্ন জীবনযাত্রায় লালিত পালিত

হয় এবং নিজেরাও অল্প বয়সে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সামর্থ্যের বাইরে সন্তান জন্মদান অব্যাহত রাখে। এহেন কর্ম স্বাভাবিক ভাবেই ইসলাম ধর্মের মৌল নীতির অপব্যখ্যার সামিল ।

পিতামাতার কাজের সাথী : গ্রামের অনেক অশিক্ষিত, অসচেতন দম্পতি মনে করে, তারা অধিক সন্তান জন্ম দিলে ছেলেরা কৃষি ক্ষেত্রে পিতার সাহায্যকারী হয়ে কাজ করে তার ক্লেশ-কষ্ট দূর করবে। অন্যদিকে মেয়ে সন্তানরা মাকে রান্না-বান্না, গৃহস্থালীর কাজে সহযোগিতা করে মায়ের কষ্ট লাঘব করবে। এ জন্যই এ সকল দম্পতি বেশী সন্তান জন্ম দিয়ে নিজেদের পরিবারকে ভারবাহী করে তোলে। পরবর্তীতে পিতামাতার অভাবে সংসারে সন্তান গুলো নিম্নমানের জীবনযাত্রায় বেড়ে উঠে অনুন্নত পরিবেশে জীবন অতিবাহিত করে থাকে। যার প্রভাব পুরো গ্রাম সমাজকে প্রভাবিত করে।

দ্বন্দ্ব প্রতিরোধের অংশীদার : বাংলাদেশের গ্রামে গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব লক্ষণীয়। দ্বন্দ্ব মোকাবেলা করার জন্য জনবলের দরকার। তাই প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর লোকদের বিরুদ্ধ লড়ার জন্য পিতামাতা অধিক সন্তান জন্ম দান করে লাঠিয়াল বাহিনী গড়ে তুলতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে উঠে। যার ফলে পরিবার গুলোতে জনসংখ্যার ঘনত্ব বেড়ে নিম্ন জীবনযাত্রায় সন্তানরা মানুষ হতে থাকে।

জন্মনিয়ন্ত্রণে অজ্ঞ : গ্রামের অধিকাংশ অজ্ঞ মানুষ পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন ধারণাই রাখেনা। এসব দম্পতি অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে পরিবারকে ভারসাম্য হীন করে তুলে। ফলে এদের ভবিষ্যৎ জীবন চলা দুর্বিষহ হয়ে উঠে। দারিদ্র্যতা এদের নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকে। যারা পরিরবার পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখে, তারা আর্থিক অভাব অনটনের কারণে পরিবার পরিকল্পনার উপকরণ ক্রয় করতে সক্ষম নয়। মোট কথা, গ্রামীণ এসব দম্পতির অনেকের পরিকল্পিত পরিবার গ্রহণের ইচ্ছা থাকলেও সাধ্য নেই।

আগে বিনামূল্যে সরকার জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিতরণ করলেও বর্তমানে এ কর্মসূচী বন্ধ রয়েছে। তাছাড়া এসব উপকরণের মূল্য বৃদ্ধির দরুণ গ্রামীণ অসচেতন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পক্ষে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে। এসব দম্পতির সন্তান সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে পরিবারের জীবনযাত্রার মানকে দুর্বল করে ফেলছে। "পরিবার পরিকল্পনায় প্রায় ৪২ ভাগ সক্ষম দম্পতি কোন ধরণের জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করে না। ৫৭.৫ ভাগ জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করলেও গ্রামে জন্ম নিয়ন্ত্রণ সামগ্রীর অপ্রতুলতা ও বিনামূল্যে সরকারী সেবা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এসব উপকরণ সংগ্রহ করাই মানুষের জন্য বড় সমস্যা।"[২২]

ছেলে বা মেয়ে সন্তানের আশা : গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন দম্পতি একটি ছেলে বা মেয়ে সন্তানের আশায় একের পর এক সন্তান জন্ম দিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়িয়ে পারিবারিক স্বচ্ছলতাকে

অক্ষমতায় পরিণত করে থাকে। ফলে পরিবারটি নিু জীবনযাত্রায় কালাতিপাত করতে বাধ্য হয়।

বহুবিবাহ : ইসলাম ধর্মে এক জন পুরুষের ক্ষেত্র বিশেষে ৪টি বিয়ের বিধান থাকলেও এ বিধানের ভুল অর্থহীন ব্যাখ্যা দিয়ে ফতোয়া জাহির করে গ্রামের অনেক স্বার্থপর পুরুষ একাধিক বিয়ে করে অধিক সন্তান জন্ম দিয়ে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়িয়ে থাকে। তাছাড়া গ্রামের অনেক দরিদ্র হীনমন্য পুরুষ পরিবার পরিজনের ভরণ পোষণে অক্ষম হয়ে পরিবার ত্যাগ করে অনত্র গমন করে আবার একটি বিয়ে করে সন্তান জন্ম দিতে থাকে। এভাবে একজন পুরুষ একের পর এক বিয়ে করে জনসংখ্যার ঘনত্ব বাড়িয়ে থাকে।

কৃষি জমিতে গৃহ নির্মাণ : গ্রামের একজন পিতামাতার অধিক সন্তান থাকায় কৃষি ফসলী জমিতে তাদের জন্য গৃহ নির্মাণ করে ছেলেদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে হয়। এভাবে একজন দম্পতির একাধিক ছেলে সন্তানকে কৃষি জমিতে পৃথক পৃথক আবাসন গড়ে তোলায় কৃষি ফসল উৎপাদনের জমি হ্রাস পায়। এভাবে ফসলি জমির পরিমান কমে যাওয়ায় পরিবারের ভরণ-পোষণ করতে যেয়ে একজন কৃষককে হিমশিম খেতে হয়। পর্যায়ক্রমে পরিবারটির জীবনযাত্রার মান কাটমোল্লা মুখী হয়ে পড়ে।

অবহেলিত নারী সমাজ : গ্রামীণ অশিক্ষিত, অসচেতন, নিরীহ, নারী সমাজ যুগ-যুগান্তর ব্যাপী অমর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। বাংলাদেশে গ্রামের পুরুষরা নারীদেরকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনা। তারা মনে করে নারীদের জন্ম হয়েছে শুধু পুরুষদের সেবা দান, সন্তান উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে। এর বাইরে তাদের কোন কাজ থাকতে পারে না। গায়ের জোরে তারা কম জোর নারীদের যত্রতত্র নির্যাতন এবং অবমূল্যায়ন করে। সমাজে বসবাসরত মানুষের অর্ধেক নারী। তাই অর্ধেক নারী সমাজকে উপেক্ষা করে কোন সমাজের মানুষ উন্নত জীবনযাপনকরতে পারে না। বাংলাদেশের নারী সমাজ যে সকল ক্ষেত্রে অবহেলিত এবং যে কারণে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান নিু সে সব বৈশিষ্ট্য নিচে আলোচনা করা হলো:

মেয়েদের অশিক্ষা : গ্রামীণ নারী সমাজ অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। এ সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলে উন্নত জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অভিভাবক মহল না নেয়ায় এরা অসচেতন অবস্থায় জীবনযাপনকরে। গ্রামের নারীদের উপর যে কোন ধরণের অবিচার করা হয়, তার প্রতিবাদ করার ক্ষমতা তারা রাখেনা। অধিকার কি জিনিষ তাও তাদের বোধগম্য নয়। মা, নানী, দাদীরা যেভাবে ঘর সংসার করছেন তারাও ঐ সকল পূর্ববর্তী নারীদের আদর্শ অনুসরণ করে জীবন পদ্ধতি বেছে নিতে বাধ্য হয়। যে সকল পরিবারে শিক্ষার আলো নেই, সে সকল

পরিবারের লোকেরা মেয়েদের শিক্ষিত করার মত কোন জ্ঞানই রাখে না। তাছাড়া গ্রামে হাতের নাগালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় দরিদ্র অভিভাবকের পক্ষে দূরের কোন প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের পাঠানো নিরাপদ মনে করে না। দু' একজন ছেলে শিশু বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করলেও মেয়েদের সে সুযোগ দানে অনেক ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়। তাদের ধারণা মেয়েদের রান্না বান্না, ঘর গুছানো ও স্বামীর সেবা করাই একমাত্র কাজ। এদের লেখাপড়া শিক্ষা করার কোন প্রয়োজন নেই। তাছাড়া শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেতন, পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়ার আর্থিক সংগতিও অনেক দরিদ্র কৃষক পরিবারে নেই।

সরকার গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য 'উপবৃত্তি' কর্মসূচী চালু করলেও এর উপযোগিতা ভোগ করে খুব কম সংখ্যক মেয়ে। এ স্বল্প সংখ্যক মেয়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করলেও সমাজে নেতৃত্ব দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। তাই স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামের নারীদের সমাজে কাটমোল্লা জীবনযাত্রায় দিনাতিপাত করতে হয়।

মেয়েদের বিবাহে স্বাধীনতা : গ্রামের মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা নেই। গুরুজনরা মেয়ের জন্য যে ছেলে পছন্দ করেন, তাকে সে ছেলেকেই বিয়ে করতে হয়। অভিভাবক গণ ছেলের ব্যাপারে মেয়ের সাথে কোন প্রকার শলা-পরামর্শ না করেই বিয়ের দিন ক্ষণ স্থির করে। এ সংক্রান্ত বিষয়ে মেয়ে কোন কিছু জানতে চাওয়া মানেই বেয়াদবির সামিল। পিতামাতা ও গুরুজনদের পছন্দ করা ছেলে যে রকমই হউক না কেন, তাকেই মেয়ের পছন্দ বলে স্বীকৃতি দিতে হয়। যদিও মনে প্রাণে মেয়ে ছেলেটিকে তার জীবন সঙ্গী হিসেবে যোগ্য মনে করেনা।

বাল্য বয়সে বিয়ে : বাংলাদেশ সরকারের আইন অনুযায়ী একজন মেয়ে ১৮ বছর বয়সে পা দিলে বিবাহের যথার্থ বয়সে উপনীত হয়। অথচ গ্রাম- গঞ্জে সরকারী আইনের কোন তোয়াক্কা না করে ১০ বৎসর বয়স থেকেই মেয়েদের বিয়ের পিঁড়িতে বসানো শুরু হয়। দরিদ্র পরিবারের পিতামাতা মেয়ের শারীরিক গঠনের কথা চিন্তা না করেই পারিবারিক দায় মুক্তির জন্য যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে বিয়ে দিয়ে চিন্তা মুক্ত হয়। এ ধরণের মেয়েরা অল্প বয়স থেকেই মা হতে শুরু করে। এভাবে এক একজন মেয়ে ক্ষেত্র বিশেষে ততোধিক সন্তান জন্ম দিয়ে থাকে। এ সব সন্তান গুলোকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার সঙ্গতি পিতামাতার না থাকায় তারা কাটমোল্লা জীবনযাত্রায় বাড়তে থাকে। যা গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

বয়স্ক লোকের সাথে বিয়ে: ১০-১২ বৎসর বয়সের দরিদ্র পরিবারের একজন মেয়েকে নানা প্রলোভন দেখিয়ে ৬০ বা তদোর্ধ বয়সের একজন বৃদ্ধের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করতে বাধ্য করা হয়। পিতামাতার দারিদ্র্যতা ও নিু জীবনযাত্রাই এর জন্য দায়ী।

বিবাহ বিচ্ছেদঃ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের কোন কারণে পান থেকে চুন খসতেই স্বামীরা তাদের তালাক দিয়ে থাকে। স্ত্রীরা স্বামীর ভরণ-পোষণের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল। মেয়েদের স্বাধীন ভাবে কোন আয়-উপার্জন করার সামর্থ্য না থাকাই এর মূল কারণ। হাট বাজারে গরু, ছাগল বিক্রির মতই স্বামীরা স্ত্রীদের তালাক দিয়ে থাকে। বিবাহ বিচ্ছেদ সংক্রান্ত সরকারী আইন সম্বন্ধে এ শ্রেণীর অসচেতন মেয়েদের কোন ধারণাই নেই। আইনের আশ্রয় নিয়ে স্বামীদের বিপক্ষে মোকদ্দমা করার আর্থিক সামর্থ্য এবং বিচার প্রার্থনা সম্পর্কেও গ্রামীণ মেয়েদের কোন সচেতনতা নেই। অনেক সময় মেয়েরা তালাকপ্রাপ্ত হলেও পরবর্তীতে স্বামীর পরিত্যক্ত সন্তানাদি নিয়ে তারা মানবেতর জীবনযাপনকরে থাকে। স্বামীর অনুকম্পার উপর নির্ভর করে একজন দরিদ্র নারীর ঘর সংসারের স্থায়ীত্ব।

যৌতুক প্রথার অভিশাপ : বাংগালী জাতির সংস্কৃতিগত ঐতিহ্য অনুযায়ী পিতামাতা নব দম্পতিকে কিছু কিছু উপহার সামগ্রী স্বেচ্ছায় প্রদান করে আত্মতৃপ্ত হন। এ প্রথা গরীব, ধনী সব পরিবারেই আবহমানকাল ধরে কিছু না কিছুটা প্রচলিত। এভাবে স্ব-প্রণোদিত হয়ে বর কে কনের পিতামাতার কিছু উপহার দেয়াকে যৌতুক বলে গণ্য হয় না। যৌতুক হলো, বর বা বরের পিতামাতার চাহিদা অনুসারে বিয়েতে মেয়ের পিতামাতাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পয়সা বা গহনা সামগ্রী যথাসময়ে বর পক্ষকে দিতে বাধ্য করা।

পরবর্তীতে কোন কারণে যথাসময়ে মেয়ের পিতামাতা দাবী পূরণে ব্যর্থ হলেই, মেয়ের উপর শুরু হয় নির্যাতন। নির্যাতনে মেয়েকে শারীরিক ভাবে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করা হয়। তাদের দাবীর শর্ত পূরণে মেয়েকে বাবার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। অনেক সময় নির্যাতনের মাধ্যমে মেয়েকে এমন ভাবে গুরুতর আঘাত করা হয় যে, শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করে থাকে। এহেন ঘৃণ্য অপরাধের জন্য সরকার ১৯৮০ সালে যৌতুক বিরোধী আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু গ্রামের অসচেতন নারীদের এব্যাপারে কোন ধারণাই নেই।

অধিক সন্তান জন্মদানঃ পুরুষের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে গ্রামের মেয়েদের সন্তান কম বেশী নেয়ার সিদ্ধান্তটি। এক্ষেত্রে কোন স্ত্রী স্বামীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার ক্ষমতা রাখেনা। এসব মেয়েরা প্রায় বছর বছর সন্তান জন্ম দেয়ায় তাদের জীবনী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। তারা নানা রোগ-শোকে ভোগে বিনা চিকিৎসায় অনেক সময় মৃত্যুবরণ করে। আমাদের দেশে "৩৫%-৫০% নবজাতক শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ণ বয়স অবস্থায় তা চলতে থাকে। মা ও

Dhaka University Institutional Repository

শিশুদের ৭০% রক্ত স্বল্পতায় ভোগছে এবং ভিটামিন এ' এর অভাবে ১% রাততকানা রোগে এবং আয়োডিনের অভাবে ঘ্যাগ রোগে ৪৭% নারী আক্রান্ত হচ্ছে।"[২৩]

শারীরিক নির্যাতন : পারিবারিক কোন সামান্য অপরাধের জন্য স্বামীরা স্ত্রীদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করে থাকে। পরিবারের অন্যান্য সকল দায় দায়িত্ব একজন নিরীহ নারীকেই বহন করতে হয়। গরীব পরিবারের সুন্দরী মেয়েরা কোন বখাটে ছেলের বিয়ের প্রস্তাবে সম্মত না হলে মুখে-শরীরে এসিড নিক্ষেপ করে চেহারা ঝল্‌সে দেয়া হয়।

চিকিৎসা সেবায় অবহেলা : পুষ্টিহীনতা ও অসুস্থতায় একজন গ্রামীণ নারী জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করলেও তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয় না। দেশে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা থাকলেও একজন দরিদ্র নারীর চিকিৎসার জন্য গ্রাম্য হাতুড়ে ডাক্তার ও কবিরাজের ঝাড়, ফুঁকই যথেষ্ট। এসব পরিবারের কোন নারী গর্ভবতী হলে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পথ্যের ব্যবস্থা করা হয় না। কাটমোল্লা জীবনযাত্রার পরিবারে একজন মেয়ে জন্মগ্রহণ করাই মানে কসাইখানায় পা রাখা। এ সমাজের মা ও শিশুরা প্রায়ই লৌহের অভাবজনিত রক্তস্বল্পতার শিকার হয়ে অনেক সময় মৃত্যুবরণ করে থাকে।

অকাল মৃত্যু : গ্রামের কাটমোল্লা নিু জীবনযাত্রার পরিবারে বেশীর ভাগ মেয়েদের মৃত্যু হয় সন্তান প্রসব কালীন সময়ে। তাছাড়া স্বামী ও স্বামীর পরিবারের লোকের উৎপীড়নেও গ্রামের কোন মেয়ে গলায় ফাঁস ও বিষ পানে আত্মহত্যা করে।

নারী শ্রম বৈষম্য : গ্রামীণ কৃষি বা অকৃষি খাতে শ্রম বিক্রি করতে যেয়ে একজন পুরুষ শ্রমিককে যে পরিমান পারিশ্রমিক দেয়া হয়, একজন নারী শ্রমিক যদিও একজন পুরুষের সমান কাজ করে, তবুও তাকে সমহারে পারিশ্রমিক দেয়া হয় না। নারী বলেই তাকে বৈষম্যের শিকার হতে হয়। পুরুষ ও মহিলাদের শ্রম বৈষম্য নিচের সারণীতে দেখানো হলো:

সারণী নং- ৪.৬ : গ্রামীণ শ্রমিকের কৃষি ও অকৃষি খাতে নারী পুরুষ শ্রম বৈষম্য দিবস (%) নিচের সারণীতে দেখানো হলো:

শ্রমশক্তি জরিপ	কৃষি পুরুষ	কৃষি মহিলা	অকৃষি পুরুষ	অকৃষি মহিলা
১৯৮৯	৬২.১	৯০.০	৩৭.৯	৯.৭
১৯৯০-৯১	৫৫.৮	৮৮.১	৪৪.২	১১.৯
১৯৯৫-৯৬	৫৪.৬	৭৮.৮	৪৫.৪	২১.২

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পকেট বই), ২০০৮,পৃ. ১১।

উপসংহার

বিদেশী পন্ডিত ব্যক্তি, বণিক, পর্যটক গণের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথম আধুনিক শিক্ষার আগমন ঘটেছে। বিশেষ করে ইংরেজ শাসকরা তাদের শাসন কার্য পরিচালনায় জনবল সৃষ্টির লক্ষ্যে এদেশে আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করে। শহর ভিত্তিক এ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা শহরের মানুষ ভোগ করলেও গ্রামের মানুষ ছিল অবহেলিত। এতে স্বাভাবিক ভাবে শহর এবং গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রায় বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। ফলশ্রুতিতে শহরের মানুষ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে উন্নত কর্ম পদ্ধতি গ্রহণ করে বিলাস বহুল ভাবে এবং গ্রামের মানুষ অনুন্নত ভাবে ক্লেশ-কষ্টে জীবনযাপনকরতে থাকে। এ অবস্থা আবহমানকাল যাবত চলে আসছে। অবশ্য পরবর্তীতে ইংরেজ শাসকরা গ্রাম-গঞ্জে কিছু প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কর্মসূচী চালু করলে গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা এ শিক্ষার সুবিধা ভোগ করে গ্রাম ও শহর মিলে উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বাকী দরিদ্র অসচেতন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সন্তানদের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের সাধ থাকলেও সাধ্য ছিলনা। আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ব্যয় ভার বহন করার সামর্থ্য না থাকায় গরীব পরিবারের ছেলেমেয়েরা শিক্ষার হাল বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনা। পেটের দায়ে তারা অল্প বয়সেই কর্মেরসংস্থানে বের হয়। তাই এদের জীবনযাত্রার মানে তেমন কোন বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয়না। এক কথায় কুলুর বলদের মত এদের জীবন মান আদ্যোন্ত একই ভাবে চল্ছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে গ্রামের কোন কোন পরিবারে স্বাধীনতা উত্তর কিছুটা হলেও উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করছে এবং মানুষের ক্রম জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটছে। গ্রামে স্বাস্থ্য, যাতায়াত, বিদ্যুৎ ও যোগাযোগ অবকাঠামোর যথেষ্ট উন্নয়ন সাধিত না হওয়ায চাহিদা মত মানুষের কাঙ্খিত জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছেনা। যতটুকু উন্নয়ন হয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। এ উন্নয়ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে তেমন কোন ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছেনা। তাছাড়া দুর্নীতির করাল গ্রাস গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, যা সর্বজন স্বীকৃত।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) Choudhury, Dr. Anower Ullah, Higher Secondary Sociology, Dhaka: Dr. Mohammad Abul Hasan, 2012, P. 119.

২) প্রাগুক্ত- পৃ, ১১৯।

৩) মুহাম্মদ, আনু, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ অর্থনীতি, মেহেরুন্নেছা মীরা, ২০০৬, পৃ, ১৮০।

৪) প্রাগুক্ত- পৃ, ১৭৭।

৫) রহমান, ড. আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়ণ কোন্ পথে, ঢাকাঃ এস.এম. আমিনুল ইসলাম মুকুল, ২০০৮, পৃ, ১৮৭।

৬) প্রাগুক্ত- পৃ, ১৮৯।

৭) Rahaman, Mustafizur, Higher Secondary Economics, Dhaka: A.F.M. Khalilur Rahman, 2012, P. 159.

৮) প্রাগুক্ত- পৃ, ১৯০।

৯) দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকাঃ ১০ জানুয়ারী- ২০১৩, পৃ, ১।

১০) ইসলাম, মোঃ নূরুল, বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচী, ঢাকাঃ মাহবুব আলম হিরণ, পূর্ণমুদ্রণ-২০১২, পৃ, ২৯২।

১১) প্রাগুক্ত- পৃ, ১৭৬।

১২) রহমান, ড. আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন্ পথে, প্রাগুক্ত- পৃ, ৮৭।

১৩) রহমান, মোস্তাফিজুর, উচ্চ মাধ্যমিক অর্থনীতি, প্রাগুক্ত- পৃ, ১২৪।

১৪) প্রাগুক্ত- পৃ, ১৭৬।

১৫) রহমান, ড. আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়ন কোন্ পথে, প্রাগুক্ত- পৃ, ১১১।

১৬) প্রাগুক্ত- পৃ, ৮৯।

১৭) প্রাগুক্ত- পৃ, ১১৪।

১৮) প্রাগুক্ত- পৃ, ১১৭।

১৯) প্রাগুক্ত- পৃ, ১১৮।

২০) প্রাগুক্ত- পৃ, ১২০।

২১) প্রাগুক্ত -পৃ, ১২১।

২২) প্রাগুক্ত- পৃ, ১২২।

২৩। প্রাগুক্ত পৃ, ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

এনজিওদের গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রম

পঞ্চম অধ্যায়

এনজিওদের গ্রামোন্নয়ন কার্যক্রম

সূচনা : পূর্বের অধ্যায় গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার স্তর বিন্যাস; যেমন: ধনী কৃষক, মধ্যবিত্ত কৃষক, প্রান্তিক কৃষক ও বর্গাচাষী, ভূমিহীন শ্রমিক, পেশাজীবি শ্রেণি যেমন: শিক্ষিত শ্রেণি, চাকরীজীবি শ্রেণি, ব্যবসায়ী শ্রেণি ও অন্যান্য শ্রেণি। অন্যান্য যেমন: অশিক্ষিত শ্রেণি; যথা: সৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী ও অসৎ পথে অর্থ উপার্জনকারী পেশাজীবি শ্রেণি। অবকাঠামোগত জীবনযাত্রা; যেমন: সামাজিক ও অর্থনৈতিক। সামাজিক; যথা: অনুকূল ও প্রতিকূল। অনুকূল যেমন: মানব সম্পদ উন্নয়ন, জসস্বাস্থ্য, কারিগরি জ্ঞান। প্রতিকূল যেমন: বাসস্থানের সুযোগ সুবিধা, পরিবার কল্যাণ, সাংস্কৃতিক চেতনা, উদার ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থনৈতিক অবকাঠামো; যেমন: যাতায়াত ও পরিবহন, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, জনসংখ্যার ঘনত্ব, অবহেলিত নারী সমাজ ইত্যাদি উপশিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায় আমরা এনজিও পরিচিতি, গ্রামোন্নয়নে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক এনজিও সম্পর্কে অবহিত হব। স্থানীয় যেমন: গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও আশা এবং আন্তর্জাতিক যেমন: কেয়ার ও ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবায়নের সার্বিক চিত্র এবং বেসরকারী সংস্থা গুলোর সফলতা, ব্যর্থতা, কর্মসূচীর বাস্তবতার কুফল ও সুফল ইত্যাদি উপশিরোনাম নিয়ে আলোচনা করা হলো:

এনজিও পরিচিতি : দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশ গুলোর আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিশ্বে বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) অত্যন্ত পরিচিতি নাম। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশে সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সরকারের এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর তালিকাভূক্ত এক হাজারের বেশী বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা তাদের কার্যক্রম বাস্তবানয় করে চলছে। “২০০৩ এর জুন পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে ১৭৯১টি এনজিওর পুঞ্জীভূত অনুমোদিত প্রকল্প ছিল ৯১৮৯টি।”[১] গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এসব বেসরকারী সংস্থা গুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বিদেশী টাকা ও তহবিল পুষ্ট সংস্থা সমূহ সমাজের পরিবর্তন ও উন্নয়নে নিয়োজিত বিধায় বেসরকারী সংস্থা (Non-Government Organization- NGO) নামে পরিচিত। “এনজিও প্রত্যয়টি প্রথম গ্রেট বৃটেন সহ অন্যান্য কয়েকটি ইংরেজী ভাষাভাষি দেশে ব্যবহৃত হয়।”[২] আভিধানিক অর্থে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নয়, এমন যে কোন সংস্থাই এনজিও। সত্তরের দশকে দরিদ্র ও অনুন্নত দেশ গুলোতে সাহায্য দানের নতুন কৌশল হিসেবে আমেরিকা বেসরকারী সংস্থা গঠন করে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৪৭ সালে সাবেক পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর পূর্ব পাকিস্তানের সৃষ্ট সমস্যা মোকাবেলায় জাতিসংঘের সহায়তায় জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের তত্ত্বাবধানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলোকে সহায়তা প্রদান করা হতো। ১৯৭০ সালে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতির শিকার দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে বিদেশী সাহায্য সংস্থার আগমন এবং ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশে যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের জন্য দেশীয় কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

বাংলাদেশে এনজিওদের গুরুত্ব এবং ফান্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষাপট হচ্ছে বাংলাদেশেকে সাহায্যদাতা গ্রুপের ১৯৮৫ সালের প্যারিস কনসোর্টিয়াম। 'Like Minded Group' কর্তৃক গ্রামীণ দরিদ্রদের প্রতিবেদন অনুসারে বাংলাদেশের গণ দরিদ্রের মূল কারণ সম্পদের উপর দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর অধিকারের অভাব। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুলোর অধিকতর ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্য সংগঠন যে সুপারিশ করেছে তা বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাংলাদেশের কম বেশী প্রায় প্রতিটি জেলায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক এনজিও গুলো গ্রামোন্নয়ন মূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে দেখা যায়।

জাতীয় বেসরকারী সংস্থাঃ জাতীয় ভাবে বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি নামীদামী বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) যেমনঃ গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও আশার কার্যক্রম নিচে ধারাবাহিক ভাবে উল্লেখ করা হলোঃ

গ্রামীণ ব্যাংক : বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র, দুঃস্থ ও ভূমিহীন পরিবারের উন্নয়নে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুছ এর উদ্যোগে ১৯৭৬ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটে জোবরা গ্রামে গ্রামীণ ব্যাংকের প্রকল্পটি চালু করা হয়। তিনি একে ক্ষুদ্র ঋণের (Micro Credit) মডেল হিসেবে চিহ্নিত করেন। তাঁর উদ্ভাবিত গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের প্রয়োজনে ঋণের মত গুরুতর চাহিদা পূরণে কার্যকর প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। ফলশ্রুতিতে ১৯৮৩ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ XLVI জারীর মাধ্যমে এটি একটি কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়।

গ্রামীণ ব্যাংক নামক প্রায়োগিক গবেষণার অনুকল্প ছিল æThe poor were Bankble. (the main hypothesis of Grameen Bank was that the poor were bankable)”[৩] ১৬টি নির্দেশনা সম্বলিত গ্রামীণ বিত্তহীনদের সংগঠিত করে ঋণের মাধ্যমে তাদের আয়, পুঁজি ও সম্পদ গঠনের উদ্দেশ্যে এ ব্যাংকের কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়। ১৮৬১টি শাখার মাধ্যমে ৬৪টি জেলার ৪৫৬টি উপজেলায় প্রায় ৫৭.৬৬ লক্ষ সদস্যের মধ্যে প্রায় ২৬৩৮৩.৭১ কোটি টাকা

ঋণ বিতরণ করা হয়েছ। এতে গ্রামীণ ব্যাংক ৫ লাখ দরিদ্রকে অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছলতা এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিচে গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মসূচীসমূহ আলোচনা করা হলো:-

ক্ষুদ্র ঋণ মডেল উদ্ভাবন : গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অত্যাবশ্যক প্রয়োজন হিসেবে ঋণকে চিহ্নিত করে সে চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ পদ্ধতি প্রয়োগ করে ব্যাংক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ (Micro Credit) মডেলটি আজ সরকারী সংস্থা সহ বিভিন্ন এনজিওরা ব্যাপক হারে প্রয়োগ করছে। এ ঋণের আওতা আজ বাংলাদেশের বাইরেও বিরাজমান। গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে এ ঋণ পদ্ধতি কার্যকর ও বাস্তবমুখী কর্মসূচী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দুঃস্থ নারী সমাজকে লক্ষ্যভূক্ত করা : গ্রামীণ পুরুষরা পারিবারিক সঞ্চয়ে যতটা দায়িত্বশীল তার চেয়ে বেশী দায়িত্বশীল নারীরা। সুতরাং এ ক্ষেত্রে অনুদান কর্মসূচীটি দুঃস্থ নারী সমাজকেই লক্ষ্যবস্তু হিসেবে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ঋণ প্রদানে প্রায় ষাট লাখ সদস্যের মধ্যে ৯৫ ভাগই দুঃস্থ নারী। তাই বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংকের একটি উল্লিখিত দিক হলো গ্রামীণ দুঃস্থ পরিবার উন্নয়নে নারী সমাজকে গুরুত্বারোপ করে প্রধান সুবিধাভোগী হিসেবে লক্ষ্যভূক্ত করা এবং দারিদ্র্য বিমোচন করে গ্রামান্নয়নে ভূমিকা রাখতে সহায়তা করা।

গ্রামীণ দরিদ্রদের ব্যাংক ধারণা সৃষ্টি : গ্রামীণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের ধারণা ব্যাংক বলতে বড় লোকদের টাকা পয়সার লেনদেনের ব্যাপার। সুতরাং ব্যাংকিং ধারণা নিয়ে তারা কখনও মাথা ঘামায় না। সরকারী ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য প্রয়োজন ভূমির। তাই অসহায় ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর কাছে ব্যাংকের ঋণ প্রাপ্যতা আকাশ কুসুম কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন মানুষের মধ্যে ঋণ প্রদান কর্মসূচী চালু করে তাদের অতীত বদ্ধমূল ধারণা পরিবর্তনে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ১৭ই এপ্রিল ২০০৪ সালে মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্সের সভায় গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মোহাম্মদ ইউনুছের উপাস্থাপিত তথ্য হতে জানা যায়, "১৯৮৩ সালে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পর হতে ৩৪ লাখ সদস্যকে ১,২২৫টি শাখার মাধ্যমে ২০ হাজার কোটি টাকার বেশী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।"[৪]

ব্যাংকিং সেবায় সমাজকর্ম : গ্রামীণ ব্যাংক ষোল নির্দেশনার মধ্যে ঋণ বিতরণ বিষয়টি নিহীত। তাই গ্রামীণ ব্যাংকের অন্যতম কর্মসূচী হলো গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য দরিদ্র শ্রেণির মানুষকে নিরক্ষরতামুক্ত, জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহিত করা। এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, "চট্টগ্রামের মীরসরাই গ্রামীণ ব্যাংকের একটি কেন্দ্রের চল্লিশ জন মহিলা সদস্যের মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনই স্থায়ী জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছে।"[৫]

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি : গ্রামীণ ব্যাংকের বিশেষ কর্মসূচী হলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে তাদের মধ্যে শক্তি সৃষ্টি করা। সামাজিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামবাসীদের সামাজিক পরিবর্তনে ব্যাপকভাবে কাজ করছে। ফলে ভূমিহীন মানুষ সম্পদশালী ও সুদখোর মহাজনদের বিপক্ষে সংগঠিত হয়ে প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ বাজার, দিঘী, চাষের জন্য ইজারা ইত্যাদিতে ধনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা জয়ী হয়েছে। এক্ষেত্রে কোন কোন গ্রামে সুদখোর মহাজন ও জোতদাররা তাদের শোষণ বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে।

দারিদ্র্য সম্প্রসারণ রোধ : গ্রামের সহায় সম্বলহীন দরিদ্র মানুষকে যেখানে কেহ একটি টাকা দিয়ে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেনা। দিন দিন গ্রামে দারিদ্র্যতা বিস্তার লাভ করতে থাকে, স্বল্প আয়ের মানুষ ভূমিহীন হতে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করায় দরিদ্র মানুষের হাতে পুঁজি আসতে থাকে। তারা এ পুঁজিকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগিয়ে পরিবারের আয় বাড়াতে সক্ষম হয়। দারিদ্র্যতার কষাঘাত প্রতিরোধ করে গ্রামীণ ব্যাংক পর্যায়ক্রমে গ্রামের মানুষকে সফলতার আলো দেখতে সক্ষম হচ্ছে।

শিক্ষিত শ্রেণির মানুষকে গ্রামমুখী করা : গ্রামের শিক্ষিত শ্রেণির মানুষ যারা গ্রামকে অবজ্ঞা করে চাকরী, ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য শহরে ভীড় জমায়, গ্রামীণ ব্যাংক সে সকল শিক্ষিত শ্রেণিকে গ্রামের প্রতি অনীহা রোধে কাজ করে যাচ্ছে। অপরদিকে শহরের কিছু শিক্ষিত যুবারা গ্রামমুখী হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকে চাকরী নিয়ে অনেক উচ্চ শিক্ষিত যুবক-যুবতী গ্রামে অবস্থান করছে। এসব শিক্ষিত সমাজ গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে দরিদ্রদের উন্নয়নে কাজ করছে। শিক্ষিত যুবাদের পারিপার্শ্বিকতার হাওয়া গ্রামে বইতে শুরু করায় মানুষের জীবন মান উন্নযনের ধারাও পরিবর্তিত হতে শুরু করছে।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি : গ্রামে বেকারদের আত্মকর্মসংস্থানের সমস্যা একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে গ্রামের দরিদ্র শিক্ষিত ও অশিক্ষিত শ্রেণির উভয়ই এ সমস্যার অভিশাপে অভিশপ্ত। গ্রামীণ ব্যাংক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে বেকারদের ঋণ দিয়ে উৎপাদনমুখী করে আত্মকর্মসংস্থানের পথ উন্মোচন করছে। এসব বেকার জনগোষ্ঠী গ্রামোন্নয়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখছে।

গৃহ নির্মাণ ঋণ: গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৮৭ সালে গৃহ নির্মাণ প্রকল্প নামে একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। গ্রামীণ ভূমিহীন অসহায় মানুষ যাদের পক্ষে গৃহ নির্মাণ করে বসবাস করার আর্থিক সংগতি নেই। রোদ-বৃষ্টি, শীত-গরমে অসহনীয় কষ্টে খড়-কুটো, লতা-পাতা দিয়ে ঘর তৈরী করে জীবনযাপনকরে। গ্রামীণ ব্যাংক এসব দুঃস্থ পরিবার গুলোকে সহজ শর্তে মাত্র ৮% সুদে কিস্তিতে ঋণ

পরিশোধের সুবিধা দিয়ে ঋণ প্রদান করে থাকে। "ডিসেম্বর ১৯৮৩ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক গৃহ নির্মাণ ঋণ হিসেবে ৭৮৬.৫২ কোটি টাকা বিতরণ করেছে। গৃহ ঋণে নির্মিত গৃহের সংখ্যা ৫,৫৮,৫৩২টি।"[৬] গৃহ নির্মাণে ঋণ দানে এ ব্যাংক দরিদ্র পরিবার গুলোকে স্বাচ্ছন্দে বসবাসের সুযোগ করে দিয়েছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহ ঋণ ইতিবাচক প্রভাব রাখছে।

ভিক্ষাবৃত্তি রোধে ভিক্ষুকদের ঋণ দান : বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় অন্যতম ব্যাধি হলো ভিক্ষাবৃত্তি। অনেক সক্ষম উপার্জনক্ষম দরিদ্র পুরুষ, মহিলা পেটের দায়ে ভিক্ষাবৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করে। ভিক্ষাবৃত্তি দারিদ্র্যের নেতিবাচক ফল। গ্রামীণ ব্যাংকের এ কর্মসূচিটিকে নব্য কর্মসূচী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বিনা সুদে জামানত বিহীন গ্রামের ভিক্ষুকদের মাঝে ঋণ দেয়া গ্রামীণ ব্যাংকের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ড. মুহাম্মদ ইউনুসের মতে, "ঋণপ্রাপ্ত ভিক্ষুকদের অর্ধেক যদি ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে তাহলেও সমাজে জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন আসবে। এপ্রিল ২০০4 পর্যন্ত সাত হাজারের উপর সক্ষম ভিক্ষুককে বিনা সুদে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।"[৭]

শিক্ষা ঋণের সুযোগ বৃদ্ধি: মেধাবী অথচ দারিদ্র্যতার কারণে গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়ের লেখাপড়া অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়, এমন পরিবারের সন্তানদের জন্য গ্রামীণ ব্যাংক শিক্ষা ঋণ দান কর্মসূচী চালু করেছে। মাত্র ৫.৫০% সুদে গ্রামের গরীব ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে উচ্চ শিক্ষা লাভের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক এ ঋণ দান প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করে দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের জীবনমান বিকাশে ব্যাংকটি গ্রমোন্নয়নে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে।

সামাজিক উন্নয়ন : গ্রামীণ ব্যাংক ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঋণ বিতরণ ছাড়াও কিছু সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। ব্যাংকের ষোল সিদ্ধান্ত মতে, ঋণ গ্রহণ কালে একজন গ্রহীতাকে কত গুলো অঙ্গীকার দিতে হয়; যা গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। পরিবার ছোট রাখা, সন্তানদের লেখাপড়া শেখানো, যৌতুক বিহীন বিবাহ, গর্ত করে পায়খানা করা, বিশুদ্ধ পানি পান, সব্জি চাষ করা, যৌথ উদ্যোগে সামাজিক কাজ করা ও পরিস্কার পরিচ্ছন্ন থাকা ইত্যাদি কর্ম পরিকল্পনা সমূহ বাস্তবায়নে গ্রামীণ ব্যাংক চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। "এতে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা ও পারিবারিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও উদ্যোগী হয়েছে।"[৮]

দল গঠন : গ্রামীণ ব্যাংকের পুরুষ ও মহিলা সদস্যরা আলাদা ভাবে ৫ জনের একটি দল গঠন করে এবং ৮টি দল নিয়ে একটি ফেডারেশন গড়ে তোলে। নির্বাচিত একজন কেন্দ্র প্রধান ও একজন ব্যাংক কর্মীর উপস্থিতিতে সাপ্তাহিক সভা পরিচালিত হয়। সভাতে ঋণের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং তা পাশ হয়। প্রস্তাব পাশ হলে, ব্যাংক কর্মী সদস্যদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকেন।

অন্যান্য কর্মসূচী : গ্রামীণ ব্যাংকের বিভিন্ন ধারার কর্মকান্ডের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্রদের আয় বৃদ্ধি পেয়ে তাদের জীবন মান তথা আর্থ-সামাজিক অবস্থার কিছুটা হলেও উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। "যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি ও উচ্চ শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে এ ব্যাংক কার্যক্রম গ্রহণ করে গড়ে তুলেছে গ্রামীণ ফোন, গ্রামীণ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গ্রামীণ বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।"[৯]

ব্র্যাক: ১৯৭০ সালে সাবেক পূর্ব পাকিস্তান শাসন আমলে দক্ষিণাঞ্চলে প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানুষের করুণ অবস্থা পর্যবেক্ষণ এবং ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ কালীন সময়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশী অসহায় শরনার্থীদের মাঝে বিভিন্ন উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ত্রাণ বিতরণ শেষে উদ্বৃত্ত অর্থ দ্বারা চার্টাড একাউটেন্ট জনাব ফজলে হোসেন আবেদ স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭২ সালে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি এ সংস্থাটিকে Bangladesh Rehabitation Assistance Committee নামে আখ্যায়িত করেন। যা পরবর্তীতে Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) নামে পরিচিতি লাভ করে। বর্তমানে পুরো নাম পরিবর্তন করে সংক্ষিপ্ত নাম রাখা হয়েছে ব্র্যাক।

ব্র্যাকের মূল স্লোগান Alleviation of Poverty and Empowerment of Poor. ব্র্যাক সনদে উল্লেখ আছে, æBRAC works with people whose lives are dominated by extreme poverty, illiteracy, disease and other handicaps. With multifacted development interventions, BRAC strives to bring with out positive change in the quality of the poor people of Bangladesh." [১০]
নিচে ব্র্যাকের কর্মসূচীসমূহ আলোচনা করা হলো:

অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Economic Development Programme-EDP): গ্রামের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উন্নত মর্যাদা ও স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা প্রদান করার জন্য ব্র্যাকের এ কর্মসূচীটি গৃহীত হয়েছে। ব্র্যাকের মাঠ কর্মীরা প্রতিনিয়ত মাঠে অবস্থান করে গ্রামের প্রতিটি দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক জীবন মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

সংগঠনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা (Institution Building Through Organization-IBTO) : কর্মসূচীটি গ্রহণ করার পেছনের কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়, ব্র্যাক যা বিশ্বাস করে তা হচ্ছে, "A common platform that is created and owned by the poor is a prerequisite through which the poor can make themselves

count in the development process."[১১] এ আদর্শ অনুসরণ করে ব্র্যাক গ্রামের ভূমিহীন ও দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটিয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর এতে জড়িত আছে চারটি কৌশল; যা নিম্নরূপঃ

গ্রাম প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা : হত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একত্রিত করে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন সাধন করা।

সেবা প্রদান : গ্রামের দরিদ্র মানুষ বিশেষ করে মহিলাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও বিনিয়োগ ব্যবস্থা গড়ে তোলে দলীয় ভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সেবা প্রদান করা।

সমাজ সম্মেলন : একই সংগঠনে গন্ডিবদ্ধ না থেকে সমাজের সকল শ্রেণির দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে মাঝে মাঝে তাদের সমাবেশ ঘটিয়ে উন্নয়ন সাধনের তালিম দেয়া।

জনখাত সমাবেশ : গ্রামের স্তরভিত্তিক মানুষকে সংগঠিত করে উন্নয়নের কৌশল অবলম্বন করা এ কার্যক্রমের অংশ বিশেষ।

উপরোক্ত কৌশল অবলম্বনে ব্র্যাক সারাদেশে প্রায় সোয়া লক্ষ গ্রাম সংগঠন গঠন করে প্রায় ৫ মিলিয়ন সদস্যকে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। কোন সংগঠনের সদস্যরা সপ্তাহে একবার, কোনটি আবার মাসে দু'বার, ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, আর্থ-সামাজিক, আইনগত, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যগত বিষয় নিয়ে আলোচনায় বসে থাকে।

সামাজিক সমাবেশ (Social Mobilization-SM) : গ্রামের দরিদ্র মহিলারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে তাদের প্রতি আবহমান কাল ধরে চলে আসা শোষণ, বৈষম্য, আইনগত অধিকার এবং সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনসমর্থন যোগিয়ে থাকে। ১৯৯৮ সালে ব্র্যাকের সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচী সম্প্রসারিত করা হয়। এতে গ্রাম সংগঠনের সদস্যদের ক্ষমতায়ন ঘটানোর ফোরাম হিসেবে বিষয়ভিত্তিক সভা, পল্লী সমাজ ও জনপ্রিয় থিয়েটারের মাধ্যমে পল্লী যৌতুক প্রথার কুফল তুলে ধরা হয়। নারীর প্রতি অন্যায়, বিবাহ বিচ্ছেদ, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ও অবিচার রোধে তাদের জন্য মানবাধিকার, আইনী শিক্ষা, আইনগত সহায়তা ও নেতৃবর্গের কর্মশালা অনুষ্ঠান করা হয়।

ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা কর্মসূচী (Micro Finance Programme-MFP) : আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগণকে ঋণ দানের ব্যবস্থা না থাকায় ব্র্যাক পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও এদের মধ্যে ক্ষমতায়নে ক্ষুদ্র ঋণ দান কর্মসূচীকে হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। "ঋণের সর্বোচ্চ সীমা ২০,০০০ টাকা এবং সার্ভিস চার্জ ১৫ শতাংশ।"[১২] ঋণ দানের খাত গুলো নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

সাধারণ ঋণ : এ ঋণ গ্রহণ করে গ্রহীতা পারিবারিক স্বচ্ছলতার জন্য যে কোন খাতে ব্যবহার করতে পারে।

খাত কর্মসূচী ঋণ : গ্রহীতা ঋণের টাকা কোন খাতে ব্যয় করে পারিবারিক স্বচ্ছলতা আনায়ন করবে, তা উল্লেখের মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়।

গৃহ নির্মাণ ঋণ : যেসকল হত দরিদ্র মানুষের ঘর নেই। শর্ত সাপেক্ষে তাদের জন্য শুধু গৃহ নির্মাণের জন্য এ ঋণ প্রদান করা হয়।

দুর্যোগকালীন ঋণ: দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্দশাগ্রস্থ গ্রামের দরিদ্র পরিবার গুলো জীবন চলার পথে যখন কোন উপায় থাকেনা, তখন এসব সহায় সম্বলহীন পরিবার গুলোকে জীবন বাঁচানোর জন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্র্যাক ঋণদান কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকে। তাছাড়া ব্র্যাকের ঋণদানের পাশাপাশি সঞ্চয় করার একটি পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। এতে তিনটি পদ্ধতিতে অর্থ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন: ক) প্রতি সপ্তাহে ২৫.০০ টাকা হারে ব্যক্তিগত সঞ্চয়, খ) ঋণ গ্রহীতাকে বাধ্যতামূলকভাবে ঋণের অর্থ ৫ শতাংশ হারে সঞ্চয় এবং গ) প্রয়োজন মুহুর্তে টাকা উত্তোলনের সুবিধা সাপেক্ষে সুদ বিহীন সঞ্চয়। তাছাড়া অপর একটি কার্যক্রমও ব্র্যাক নিয়ে থাকে তা হলো, কোন সদস্যের মৃত্যুজনিত কারণে পরিবারের নির্ভরশীলরা ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) টাকা মৃত্যু সুবিধা ভোগ করে, যার কোন 'প্রিমিয়াম' দিতে হয়না।

ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে সহায়তা (Micro Enterprise Assistance-MEA) : পুঁজির অভাবে যে সকল ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যবসা ধরে রাখতে পরছেন না, ব্র্যাক তাদের ঋণ ও কারিগরী সহয়তা দিয়ে থাকে। এমন একজন ব্যবসায়ীকে ১৫% সার্ভিস চার্জে ২,০০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের সুবিধা দেয়া হয়। এতে দেশের ৬৪টি জেলায় বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ব্যাপকভাবে সুবিধা ভোগ করছেন।

কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি কর্মসূচী (Employment and Income Generation programme- EIGP) : গ্রামের দরিদ্র পরিবারের যে সকল মানুষ আত্মকর্মসংস্থানের অভাবে দিশেহারা, জীবন চলার মত কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না বা দক্ষতার অভাবে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হচ্ছেনা। এসব পরিবাররের সদস্যদের হতাশা কাটিয়ে কর্মমুখী হবার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য ব্র্যাক এ ধরণের কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। ব্র্যাক মুরগী খামার, পশু সম্পদ, মৎস্য চাষ, সামাজিক বনায়ন, কৃষি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থ সহায়তা দিয়ে কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

সব্জি রপ্তানী কর্মসূচী : দরিদ্র কৃষকদের আধুনিক কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে তাদের জ্ঞান-দক্ষতা বৃদ্ধি করে সব্জি রপ্তানী কর্মসূচী গ্রহণে ব্র্যাককে উদ্যোগী হতে দেখা যায়। এ সংস্থার মাধ্যমে

কৃষকদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে অধিক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে। ব্র্যাকের কর্ম তৎপরতায় বাংলাদেশের সব্জি আজ বিশ্ব বাজারে সুনাম অর্জন করছে এবং এদেশের কৃষকরা সব্জি রপ্তানী করে বেশ লাভবান হচ্ছে। এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক ইউরোপের কিছু সংখ্যক দেশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সব্জি রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে সক্ষম হচ্ছে। "ব্র্যাক ২০০২ সালে ৬২১ টন টাট্‌কা সব্জি ও ৩৫০ টন গোল আলু রপ্তানী করে।"[১৩]

গ্রামীণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প (Rural Enterprise Building Project-REBP) : উদ্যোক্তা গড়ে তোলে ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৮৫ সালে প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়। এ প্রকল্পে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মহিলাদের আয় বৃদ্ধির জন্য তাদের বিভিন্ন ব্যবসায় উদ্যোগী করে তোলা হয়। কর্মসূচী গ্রহণের আগে যেসব মহিলা বেকার জীবনযাপনকরতো , আজ তারা বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে জড়িত করে সংসারের আয় বর্ধনে সক্ষম হচ্ছে। "কর্মসূচীর আওতায় মহিলা সদস্যদের মাধ্যমে ব্র্যাক ৯,৪১০টি রেষ্টুরেন্ট, ৩০,৬৭৫টি মুদি দোকান, ৫,৪৬৮টি লন্ড্রী, ১৩,৪১৮টি দর্জি দোকান এবং ৩,৬৩৭টি অন্যান্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার ব্যবস্থা হাতে নিয়েছে।"[১৪]

কর্মসূচী সমর্থন প্রতিষ্ঠান (Programme Support Enterprise-PSE) : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাকের প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত প্রতিষ্ঠান গুলোতে সদস্যদের দ্বারা একদিনের মুরগীর বাচ্চা, পোল্ট্রি খাদ্য, রেশম গুটির ডিম, লাব্রা ও সব্জি বীজ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। কর্মসূচীর আওতায় ৬টি পোল্ট্রি খামার, ৩টি পোল্ট্রি খাদ্য কারখানা, ২টি বীজ প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট, ১৫টি শস্য ও রীলিং কেন্দ্র, ১২টি মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারী এবং একটি পশু রোগ প্রতিরোধক কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

দারিদ্র্য হ্রাসের লক্ষ্যভূক্ত (Poverty Reduction Targeting-PRT) : ব্র্যাকের পাঁচটি লক্ষ্যভূক্ত যথা :- ১) ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ ২) সম্পদ স্থানান্তর ৩) সমাজ উন্নয়ন ৪) আবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা ও ৫) কার্যক্রম গবেষণা। এ বিষয় গুলো অগ্রবর্তী ও অতি দরিদ্র হ্রাসের উপশম হিসেবে ধরে নেয়া হয়। ২০০৬ সাল পর্যন্ত এ কর্মসূচীর আওতায় ৭০,০০০ অতি দরিদ্র পরিবারকে ব্র্যাক পরিকল্পনাভুক্ত করেছে।

অরক্ষিত দল উন্নয়নে আয় সৃষ্টি (Income Generalization for vulnerable Group Development- IGVGD) : গ্রামীণ সমাজে এমন দরিদ্র মহিলা রয়েছে যারা বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা, যাদের কোন জমি-জমা নেই, আয়ের কোন উৎস নেই এবং পরিবারে কর্মক্ষম কোন পুরুষ নেই। এসব হত দরিদ্র মহিলাদের জীবন মান উন্নয়নে ব্র্যাক বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে

কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকে। এমন মহিলাদের ব্র্যাক খাদ্য সাহায্য, প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা দিয়ে কর্মসংস্থান ও দীর্ঘ মেয়াদী আয় উপার্জনের ব্যবস্থা করে থাকে।

হাওর উন্নয়ন প্রকল্প (Fen Development Programme-FDP): বাংলাদেশের যে সব নিচু এলাাকায় জলাবদ্ধতার দরুণ কৃষি ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে এবং মানুষকে দারিদ্র্যতার সাথে যুদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে, ব্র্যাক ঐ সকল অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে প্রকল্পটি হাতে নিয়েছে। প্রকল্পটি হাতে নেয়ায় সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের জীবন মানে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ ও হবিগঞ্জের হাওর এলাকার স্বল্প ভূমি মালিক ও ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা স্বরুপ আথ-সামাজিক উন্নয়নে কর্মসূচীটি গ্রহণ করে ব্র্যাক নিত্য নৈমিত্তিক কাজ করে যাচ্ছে।

জনস্বাস্থ্য কর্মসূচী (Public Health Programme-PHP) : গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা হতে একেবারেই বঞ্চিত। গ্রামের অসচেতন দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য ব্র্যাক কত গুলো কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। নিচে কর্মসূচী সমূহ আলোচনা করা হলো:

অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবা (Essential Health Care-EHC) : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রত্যেকটি ব্র্যাক অঞ্চলের কার্যালয় সমূহে ৬০ হাজার মানুষের ১২ হাজার পরিবারকে আওতাভুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে গ্রামের ব্যাপক দরিদ্র জনগোষ্ঠী ব্র্যাকের অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা পেয়ে জীবন মান উন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হচ্ছে। বর্তমানে ১ লক্ষ স্বাস্থ্য সেবিকা নির্দিষ্ট এলাকার জনসমষ্টির স্বাস্থ্য ক্যাডার এবং ব্র্যাকের স্বাস্থ্য কর্মসূচীর অগ্রবর্তী কর্মী। এ কার্যক্রমে রয়েছে নিম্নলিখিত সেবা দান:

খাবার স্যালাইন কর্মসূচী (Oral Therapy Programme-OTP) : কর্মসূচীতে রয়েছে খাবার স্যালাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ এবং তৈরীকৃত স্যালাইন গ্রামের জন সাধারণের মধ্যে বিতরণ।

শিশু ও মাতৃ স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী (ঈযরষফ ধহফ গড়ঃযবৎ ঐবধষঃয ঈধৎব Programme-ঈগঐঈP) : এসব সেবাদানের মধ্যে রয়েছে ভিটামিন 'এ ক্যাপসুল' বিতরণ। এক্ষেত্রে অফিস বা গ্রামের নির্দিষ্ট স্থানে ক্যাম্প তৈরী করে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

পানি ও স্যানিটেশন কার্যক্রম (Water and Sanitation Programme-WSP) : ব্র্যাক গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশুদ্ধ পানি পানের জন্য টিউবওয়েল এবং স্বাস্থ্য সম্মতভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পায়খানা তৈরীর উপকরণ স্বল্প মূল্যে/বিনা মূল্যে বিতরণ করে স্বাস্থ্য সেবার নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে।

পরিবার পরিকল্পনা (Family Planning-FP): গ্রামের অসচেতন দরিদ্র জন গোষ্ঠীকে পরিকল্পিত পরিবার গঠন করার জন্য ব্র্যাকের স্বাস্থ্য সেবিকারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য সক্ষম দম্পতিদের পরামর্শ ও সংশ্লিষ্ট উপকরণাদি বিরতণ করে থাকে।

প্রজননে গর্ভবতী মায়ের পরিচর্যা (Procreation Care of Pregnant Mother-PCPM): গ্রামের একজন দরিদ্র মা যাতে নিরাপদে সন্তান জন্মদান, এম আর ও গর্ভপাতোত্তর পরিচর্যা পায় সে ব্যাপারে ব্র্যাক সর্বদা কর্মরত, সতর্ক ও পুষ্টিকর খাবার সরবরাহের মাধ্যমে সেবা দান করে থাকে।

সুবিধা ভিত্তিক সেবা (Facility Based Services-FBS) : এমন সেবা সুবিধার আওতায় রয়েছে নিম্নোক্ত কার্যক্রম। যেমন:

সুস্বাস্থ্য (Well Health-WH) : গ্রামাঞ্চলের নির্দিষ্ট স্থানে স্থানে স্থাপিত হয়েছে ব্র্যাকের সেবাদান ক্লিনিক। এসব ক্লিনিকে গ্রামের মানুষের সেবাদানের জন্য রয়েছে বহি: রোগী, আন্ত: রোগী সেবা সুবিধা, ল্যাবরেটরী সরঞ্জাম এবং প্রয়োজনীয় ঐষধপত্র।

শারীরিক অঙ্গ সংস্থাপন বাহুবার্ম কেন্দ্র (Brace Armd Limb Filling Centre-BALFC) : ২০০০ সালের জুলাই মাসে ব্র্যাক প্রথম এ কেন্দ্রটি স্থাপন করে। সংস্থাটি অসংখ্য হতদরিদ্র গ্রামের মানুষের অঙ্গহানির বাহুবার্মের ব্যবহারের সুযোগ সৃষ্টি করে অদ্যাবধি সেবা দিয়ে আসছে।

অংশীদারীত্ব মূলক কর্মসূচী (Partnership Programme-PP) : এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ও ব্র্যাকের অংশীদারীত্বে ৩টি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। নিচে এসব কর্মসূচী আলোচনা করা হলো:

পুষ্টি কর্মসূচী (Nutrition Programme -NP) : গ্রামীণ মানুষের পুষ্টিহীন খাবারের অভাব জনিত কুফল সম্পর্কে ব্র্যাক দরিদ্র জনসাধারণকে পুষ্টির কার্যকারিতা সম্পর্কে সচেতন করে থাকে।

যক্ষা নিয়ন্ত্রণ (Tuberculosis Control-TC) : নিরাময়যোগ্য যক্ষা রোগে যাতে অকালে কেহ মৃত্যু বরণ না করে, তার জন্য সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক যৌথভাবে রোগীদের মাঝে ঔষধ বিতরণ করে থাকে।

টিকাদান কর্মসূচী (Vaccination Programme- VP) : ছয়টি মারাত্মক রোগের হাত থেকে শিশুদের নিরাপদ রাখার জন্য টিকাদান কর্মসূচীতে সরকারের সাথে ব্র্যাকও কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

পাইলট কর্মসূচী ও অন্যান্য স্বাস্থ্য উদ্যোগ (Pilot Programme and Other Health Initiatives-PPOHI) : ব্র্যাক উপরোক্ত স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম ছাড়াও অনেক গুলো পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ এইচআইভি/এইডস্ কর্মসূচী, ম্যালেরিয়া মোকাবেলা, আর্সেনিক মোকাবেলা প্রকল্প, ছেলে মেয়েদের বয়:সন্ধিকাল বিকাশ সহায়তা, নবজাতক রক্ষা প্রকল্প ইত্যাদি।

শিক্ষা (Education) : ব্র্যাকের অন্যান্য কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম প্রধান কর্মসূচী হচ্ছে শিক্ষা। নিচে ব্র্যাকের শিক্ষা কার্যক্রম উল্লেখ করা হলোঃ

স্কুল পুষ্টি কর্মসূচী (School Nutrition Programme-SNP) : ২০১২ সাল থেকে ব্র্যাক ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলায় হবিরবাড়ী ও ভালুকা ইউনিয়নের ১৩টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রায় ২,০০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে দুপুরের খাবারের কর্মসূচী চালু করে দরিদ্র পরিবারের শিশুদের ঝড়ে পড়া রোধ ও শিক্ষার মান বাড়াতে সক্ষম হয়েছ। "চাল, ডাল, শাক-সব্জি, তেল ও মসলা যোগে রান্না করে সুস্বাদু খিচুড়ী বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করে পুষ্টির ঘাটতি পূরণ সম্ভব হচ্ছে।"[১৫]

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা (Non -Formal Primary Education-NFPE) : ১৯৮৫ সালে মানিকগঞ্জের কয়েকটি গ্রামে পরীক্ষামূলক ভাবে ২২টি স্কুল চালু করে এ শিক্ষা কর্মসূচীর ভিত্তি রচনা করা হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ১২ লক্ষ শিশু এ শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা ৭০ ভাগই মেয়ে। নবম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ৩৩,৫৫১জন শিক্ষক এ সব বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করছেন এবং এঁদের ৯৭ ভাগই মহিলা। "১৯৮৭ সাল থেকে আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় থেকে ঝড়ে পড়া ১১-১৪ বৎসর বয়সের কিশোর কিশোরীরাও তিন বৎসরের কার্যক্রমে ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।"[১৬]

প্রাথমিক শিক্ষাত্তোর মৌলিক ও অব্যাহত শিক্ষা কর্মসূচী (Post Primary Basic and Continuing Education Programme-PPBCEP) : কর্মসূচীর মাধ্যমে সংগঠিত নেটওয়ার্ক সুবিধায় গ্রামের মানুষের মধ্যে ব্র্যাক শিক্ষাত্তোর তৎপরতা অব্যাহত রাখছে। এতে গ্রামীণ লাইব্রেরী, ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী, গণকেন্দ্র পাঠাগারের জন্য আইটি সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হয়। "২০০২ সাল পর্যন্ত ৭০০টি গ্রামীণ লাইব্রেরী,

৩৫ টি ভ্রাম্যমান লাইব্রেরী, ৫৯৭ জনকে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ২২টি বিদ্যালয়ে ফোকাস-দল আলোচনা ও ওয়ার্কসপের ব্যবস্থা করা হয়েছে।"[১৭]

কিশোর কিশোরী বিকাশ কেন্দ্র (Adolesvent Development Programme-ADP) : কিশোর বয়সী ছেলে মেয়েদের জীবন সম্পর্কিত উন্নয়ন সহায়তা করাই এ কর্মসূচীর উল্লেখযোগ্য দিক। "এতে রয়েছে বালিকাদের জন্য আপন, বালকদের জন্য আপন অর্থনৈতিক জীবন দক্ষতা প্রকল্প ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ।"[১৮]

বাংলাদেশ সরকার অংশায়িত ইউনিট (Government of Bangladesh Partnership Unit- GBPU) : ব্র্যাক ২০১২ সালে সরকারেরর সাথে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য এ ইউনিটটি চালু করে। এর দু'টি অংশ লক্ষ্য করা যায়, যথাঃ 'Primary Initaitive in Maintaining Education' এবং 'Community School.' প্রথম প্রকল্পে মান সম্মত শিক্ষা এবং দ্বিতীয়টিতে বিদ্যালয়সমূহে সুবিধা সম্পূরক শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়।

উপজাতীয় শিশুদের শিক্ষাদান (Education for the Indigenous Children-EIC) : শিক্ষার মাধ্যমে উপজাতীয় শিশুদের মানোন্নয়নে এ কর্মসূচীটি চালু করা হয়। ব্র্যাকের উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ে এসব শিশুদের উত্তম শিক্ষাদান পদ্ধতির কৌশল প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় (Formal School-FS) : এ কর্মসূচীর আওতায় ব্র্যাক ১৯৯৯ সালে ১১টি আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে। এসব বিদ্যালয় সমূহে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার উত্তম শিক্ষা দান কৌশল অবলম্বনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

সমর্থনমূলক কর্মসূচী (Support Programme-SP) : ব্র্যাক উপরোক্ত কর্মসূচীর সমর্থন যোগাতে কিছু সমর্থনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা নীচে আলোচনা করা হলোঃ

প্রশিক্ষণ বিভাগ (Training Division-TD) : ব্র্যাকের নিজস্ব কর্মসূচী সমূহ সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিতে কর্মরত ব্যক্তি বর্গকে প্রশিক্ষণ প্রদানে এ বিভাগ সদা কর্মরত রয়েছে।

বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব (Global Partnership-GP) : ব্র্যাক বিশ্বের বিভিন্ন দেশে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করার জন্য এ কর্মসূচীটি সম্প্রসারণ করে কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে যুদ্ধ বিধ্বস্ত আফগানিস্তানে পুনর্বাসন ও উন্নয়ন সহায়তা দানে ব্র্যাক একাগ্রচিত্তে কাজ করে যাচ্ছে।

গবেষণা ও মূল্যায়ন বিভাগ (Resarch and Evaluation Division-RED) : ব্র্যাকের নিজের এবং অন্যান্য এনজিওদের যথার্থতা মূল্যানয় সহ গ্রামোন্নয়নের নতুন নতুন কৌশল ও

মডেল উন্নয়নে নিয়মিত গবেষণামূলক কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে "গণকেন্দ্র" নামক একটি মাসিক পত্রিকা মুখপত্র হিসেবে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।

বিশেষ কর্মসূচী (Special Programme-SP) : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্র্যাক মানবাধিকার ও সালিশী ইউনিট, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, রাস্তাঘাটে নিরাপত্তা, বাণিজ্যিক উদ্যোগ, আড়ং, ব্র্যাক ব্যাংক ও ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেশপ্রেমের সমুজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিকা: "প্রশিক্ষণ, শিক্ষা ও কাজ তিনটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ প্রশিকা।"[১৯] গ্রামীণ দরিদ্রদের উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে ১৯৭৬ সালে এ সংস্থাটি জন্ম লাভ করে। সংস্থার প্রাথমিক সদস্য সংখ্যা ২৮,২০,৮০৫ জন যার মধ্যে মহিলা ১৭,০৪,৩৫৭ জন। এ সংস্থার মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা ১,১৯,৩৪,১৭৫জন। বর্তমানে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে গ্রামীণ মানুষের কল্যাণার্থে সংস্থাটি কাজ করে যাচ্ছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আর্থিকভাবে স্ব-নির্ভর করে আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে দীক্ষা দান কর্মসূচী নিয়ে জীবনযাত্রার পরিবর্তন সাধন করাই এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে প্রশিকার মুখ্য কর্মসূচীগুলো নিম্নরূপ:

জনগণের সংগঠন তৈরী (People's Organisation Building-POB) : দরিদ্র জনগণকে প্রাথমিকভাবে সংগঠিত করে দল গঠন করা হয়। পরবর্তীতে সংগঠিত দলকে নিয়ে গঠন করা হয় ফেডারেশন (Federation)। একটি প্রাথমিক দলে ২০-২৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয় একটি সমিতি। সমিতির একজন কর্মী দলীয় সংহতি অর্জনের লক্ষ্যে অন্যান্য সদস্যকে সহায়তা করার মাধ্যমে প্রশিকার সেবামূলক যাবতীয় কর্মসূচীর প্রদত্ত সুযোগ সুবিধাভোগ করে থাকেন। ২০০১ সালের জুলাই থেকে ২০০২ সালের জুন পর্যন্ত ২,১৪৩টি গ্রামে ২০,৫৪৩টি প্রাথমিক দল গঠন করা হয়।

মানব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ (Human Development Training-HDT:) : প্রশিকা সংস্থাটি "প্রশিকা মানবিক উন্নয়ন" সংস্থা নামে পরিচিত। সংস্থাটির ধারণা গ্রামীণ অসচেতন মানব গোষ্ঠীকে দারিদ্র্যতা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ করে উন্নয়নের সহযোগী হিসেবে সচেতন মানব গোষ্ঠীতে রূপান্তর সম্ভব। প্রশিকা সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে নেতৃত্ব, ব্যবস্থাপনা ও বৃত্তিমূলক দক্ষতা অর্জনে সংগঠনের জন্য উপযোগী করে দল ভিত্তিক, গ্রাম ভিত্তিক ও কেন্দ্রীয়ভাবে প্রশিক্ষণ কোর্সের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

ব্যবহারিক দক্ষতা উন্নয়ন (Practical Skill Development- PSD) : প্রশিকার সকল দল সদস্যকে বিভিন্ন ভাবে উন্নয়নমুখী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে কর্মক্ষম করে গড়ে তোলা

Dhaka University Institutional Repository

হয়। এতে প্রশিকার কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণার্থীরা নিজেদের দক্ষ করে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়।

সার্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচী (Universal Education Programme-UEP) : শিক্ষা যেহেতু মানব উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার, সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে দারিদ্র্যতা থেকে বেরিয়ে এসে ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করতে প্রশিকা কাজ করে যাচ্ছে। সার্বজনীন শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতামুক্ত সমাজ গঠনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রশিকা এ কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

উন্নয়ন নীতি বিশ্লেষণ ও এডভোকেসী ইনষ্টিটিউট (Institute Development Policy Analysis and Advocacy-IDPAA) : এ কর্মসূচীতে তিনটি বিভাগ রয়েছে। যেমন: ১) নীতি গবেষণা বিভাগ (Policy of Research Division-PRD) ২) নীতি শিক্ষা বিভাগ (Policy of Education Division-PED) ৩) নীতি যোগাযোগ বিভাগ (Policy of Communication Division- PCD)। প্রত্যেকটি বিভাগেই দারিদ্র্যতা দূরীকরণের জন্য সামগ্রিক নীতি ও পরিবেশ সৃষ্টিতে সুশৃঙ্খল এডভোকেসী হস্তক্ষেপ করা হয়।

কর্মসংস্থান ও আয় সৃষ্টি (Employment and Income Generation-EIG) : নতুন ঋণ যোগান দিয়ে আয় সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে সম্মানজনক অবস্থানে অধিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রশিকা বাজার সহায়তা, কারিগরি সমর্থন ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ সুবিধা দিয়ে আসছে। আত্মনির্ভরশীল হয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্যও প্রশিকা প্রচুর ঋণ সুবিধার ব্যবস্থা করে থাকে।

পরিবেশমূলক কৃষি কর্মসূচী (Environmental Agriculture Programme-EAP) : কৃষিতে যে সকল রাসায়নিক সার, কীটনাশক ঔষধ ব্যবহারে প্রতিবেশগত ক্ষতি সাধিত হয়, প্রশিকা ঐ সকল নেতিবাচক ফসল উৎপাদনশীল উপকরণ ব্যবহার না করার জন্য জনগণকে উৎসাহিত করে থাকে। প্রশিকা কৃষকদের স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন মূলক সমতা ভিত্তিক ও জৈব বহুমুখীতায় বিকল্প ব্যবস্থা প্রবর্তন করছে।

পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী (Livestock Development Programme-LDP) : প্রশিকা পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী মাধ্যমে কৃষকদের স্বল্প ব্যয়ে ও স্বল্প সময়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথ প্রদর্শণ করছে। সংস্থাটি উচ্চ প্রতিদান পাওয়ার এবং উন্নয়ন কর্মসূচী দলের সদস্যদের কাছে এটি জনপ্রিয় করে তুলার জন্য পশু সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী হাতে নিয়েছে।

মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প (Fisheries Development Project- FDP) : গ্রামের দরিদ্র জেলে শ্রেণি ও মৎস্য খামার চাষীদের সরকারী ও ব্যক্তিগত পানি সম্পদকে ব্যবহার করে তাদের

উন্নয়ন কৌশল সৃষ্টির জন্য প্রশিকা এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছে। প্রশিকার ঋণ দানের মাধ্যমে কর্মসূচীর সজীবতা দিন দিন সম্প্রসারিত হচ্ছে।

সামাজিক বনায়ন কর্মসূচী (Social Forestry Programme-SFP) : ব্যক্তিগত ও প্রশিকার মালিকানাধীন ভূমিতে চুক্তি ভিত্তিক ভাবে গাছপালা লাগানোর জন্য গ্রামের জনগণকে এ প্রতিষ্ঠানটি উৎসাহ প্রদান করছে। একদিকে গ্রামের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক আয় বৃদ্ধি অন্যদিকে প্রতিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় প্রশিকা কর্মসূচীটি গ্রহণ করছে।

গুটি পোকা চাষ উন্নয়ন কর্মসূচী (Sericulture Developmen Programme-SDP) : একটি আকর্ষণীয় ও সফল কর্মসূচী হিসেবে এ প্রকল্পটি দলের সদস্যদের মধ্যে আয় বর্ধনের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। অন্যদিকে দেশে সিল্ক ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটছে।

সেচ ও ভূমিকর্ষণ প্রযুক্তি সেবা কর্মসূচী (Irrigation and Tilling Technology Service Programme-ITTSP) : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে প্রশিকা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীদের অব্যবহৃত ও উদ্বৃত্ত পানি ব্যবহার করে ভূমিকর্ষণের উপকরণাদির মালিক হতে সহায়তা করে। এগুলোর ব্যবহারের মাধ্যমে প্রশিকা তাদের আয় বৃদ্ধির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী (Agricuture Development Programme-ADP) : প্রতিশ্রুতিশীল, পরিবেশ বান্তব ও আয় সৃষ্টি মূলক তৎপরতা হিসেবে প্রশিকা কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এটি কম পুঁজি বিনিয়োগ ও অধিক উৎপাদন প্রাপ্তির সাথে জড়িত।

গৃহায়ন কর্মসূচী (Housing Programme-HP) : দরিদ্র বিশেষত মহিলাদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ ও আয় বৃদ্ধিতে সক্ষম এমন ধরণের সাশ্রয়ী ব্যয় সামগ্রী, স্থায়ীত্বশীল ও পরিবেশ বান্ধব মূলক বিকল্প প্রযুক্তিতে প্রশিকা গৃহায়ন কর্মসূচী চালু করেছে।

স্বাস্থ্য অবকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচী (Health Infrastructure Building Programme-HIBP) : প্রশিকা নিরাপদ পানি পানের সু-ব্যবস্থা করে গ্রামের দরিদ্র মানুষের উদরাময় সহ বিভিন্ন রোগের প্রাদুর্ভাব কমাতে এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে কিছুটা হলেও সক্ষম হয়েছে।

ক্ষুদ্র ব্যবসায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন কর্মসূচী (Small Enterpries Economic Development Programme-SEEDP): প্রশিকা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ছোট খাট ব্যবসায় পুঁজি খাটানোর সুযোগ দিয়ে তাদের আয় বর্ধনের পথ সম্প্রসারণ করে উন্নয়নে সহায়তা করছে।

সাংস্কৃতিক কর্মসূচী (Cultural Programme-CP) : গ্রামীণ সামাজিক অবস্থার সার্বিক চিত্র তুলে ধরে তাদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য গান, খেলাধূলা, নৃত্য ইত্যাদি পরিবেশন করে প্রশিকা গ্রামীণ সংস্কৃতির বাস্তবতার দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে।

আশা : বাংলাদেশের যে সকল বেসরকারী সংস্থা গ্রামের মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে ভূমিকা রাখছে আশা তাদের মধ্যে অন্যতম। এর পুরো নাম Association for Social Advancement (ASA). ২০০১ সাল থেকে এর নাম পরিবর্তন করে শুধু 'ASA' রাখা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে কয়েকজন উন্নয়ন কর্মীর উদ্যোগে তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্রদের সংগঠন গড়ে তুলতে এ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯৯ সেশনে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের (Economic and Social Council) সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আশা জাতিসংঘের "Spcial Consultative Status"[২০] লাভ করেছে। নিচে দারিদ্র্য বিমোচন করে গ্রামোন্নয়নে আশার গৃহীত কর্মসূচীসমূহ আলোচনা করা হলোঃ

সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচী : গ্রামীণ বিদ্যমান সামাজিক পরিবেশে নানা দিক দিয়ে শাসন-শোষণ, আর্থ-সামাজিক অত্যাচার উৎপীড়নে অতিষ্ট অসচেতন মানুষকে সচেতন গোষ্ঠীতে পরিণত করার জন্য আশা এ কর্মসূচীটি শুরু করে। নিজেদের অধিকার নিয়ে আইনগত সচেতনতা, ভূমিতে অধিকার খুঁজে পাওয়া, অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, স্থানীয় এলিটদের চ্যালেঞ্জ প্রদান, সঠিক মজুরি, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হয়ে অধিকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে আশা অসচেতন গ্রামীণ জনগণের মধ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী : ২০১১ সালের ফেব্রুয়ারী মাস থেকে আশা প্রাথমিক শিক্ষা শক্তিশালী করণের লক্ষ্যে দরিদ্র শিক্ষার্থীদের ঝড়ে পড়া রোধ এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করে। "২০১২ সালে ৫৭টি জেলায় ৮৮৭ টি শিক্ষা কেন্দ্রে ২২,৯১০ জন শিক্ষার্থী এবং ২০১৩ সালে ১,৮০০টি শিক্ষা কেন্দ্রে ৪৫,০০০ জন শিক্ষার্থী অধ্যয়নের সুযোগ পায়। তাছাড়া ২০১৫ সালের মধ্যে ভবিষ্যত পরিকল্পনায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৪টি জেলার কোন কোন গ্রামে ৪,৫০০টি শিক্ষা কেন্দ্র চালু করে মান সম্মত শিক্ষা প্রদানের জন্য কর্মসূচীর লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ।"[২১]

স্বাস্থ্য সচেতন কর্মসূচী : আশা দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত সদস্যদের জন্য অনেক গুলো স্বাস্থ্য সচেতনতা মূলক কার্যক্রম শুরু করেছে। প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও তার পরিবারের সদস্যদের অভ্যাসগত পরিবর্তন ও প্রতিরোধযোগ্য রোগ বালাই বিষয়ক তথ্য প্রদান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানোই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। ৯ জুন ২০১২ দেশ ব্যাপী আশার ১৪,৫০০জন কর্মী ৮,৪০,০০০জন সদস্যদের মাঝে সচেতনতা মূলক বিভিন্নমুখী স্বাস্থ্যসেবা প্রদান

করে কর্মসূচীটিকে সার্থক করে তুলেছে। ভবিষ্যতে এ কর্মসূচীর আওতায় আরও বেশী মানুষকে সেবা প্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। "আশা কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক গণস্বাস্থ্য পত্রিকাটি জনগণকে সচতেন করার ব্যাপারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে লিখে যাচ্ছে।"[২২]

চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচী : এ কর্মসূচীতে আশা সংস্থায় কর্মরত দরিদ্র সদস্যদের মাঝে কেহ মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হলে তার চিকিৎসা খরচ সংস্থা বহন করে অসুস্থকে সুস্থ করে তোলার দায়িত্ব পালন করে থাকে। "২০১২ সালে ১৩ জুন ঝিনাইদহে ফজলুর রহমান নামক এক কর্মচারী ব্রেইন স্ট্রোকে আক্রান্ত হলে সংস্থা তার চিকিৎসা খরচ বাবদ ৪৪,০০০ টাকা প্রদান করেছে।"[২৩]

পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন (ওয়াশ) কর্মসূচী : জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ শিকার বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের কয়েকটি জেলার ক্ষতিগ্রস্থ অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পানি, স্যানিটেশন ও হাইজিন পরিস্থিতি উন্নয়নে সহায়তা দেয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশে আশা এ্যালায়েন্স কাজ করে যাচ্ছে। এ এ্যালায়েন্সে ৯টি সংস্থা রয়েছে। "এইচপি, বাসা, ওয়াটার এইড, উত্তরণ, শ্লোভ, ডরপ, এওসেড, জেজেএস এবং প্র্যাকটিক্যাল এ্যাকশন।"[২৪]

ক্ষুদ্র ঋণ দান কর্মসূচী : গ্রামীণ দারিদ্র্য বিমোচনে আশার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আশা নানাবিধ কার্যক্রম নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও পরে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচীকে একক গুরুত্ব দিয়ে পুনর্গঠিত করা হয়েছে। ১৯৯০ সালের দিকে এ সংস্থা গ্রামীণ ক্ষুদ্র ঋণ সার্ভিসকে অনুসরণ করে ঋণ দান প্রকল্প শুরু করে। পরে আশা তার সদস্যদেরকে দলীয় দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত করে স্বেচ্ছামূলক অধ্যায় সন্নিবেশিত করে নমনীয় ক্ষুদ্র ঋণ মডেলের প্রসার ঘটায়। গ্রামের দরিদ্র পরিবারের মহিলারা আশা থেকে ঋণ নিয়ে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হয়। তারা কিস্তি ভেদে ৪-৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে উন্নয়নের ছোয়া পায়।

এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (এডিবি) আশা মডেলকে 'ফোর্ড মোটর মডেল' এর সঙ্গে তুলনা করেছে। "২০০১ সালে ৩,০০০টি ব্রাঞ্চ স্থাপন করে বর্তমানে ৫৫ লাখ গ্রাহককে সেবা দিয়ে আশা ৩০ ভাগ মার্কেটের অংশীদার লাভ করেছে। তাছাড়া ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে আশা ৪৫ লক্ষ ঋণ গ্রহীতার মাঝে প্রায় ১০,১৬০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করেছিল।"[২৫]

সারণী-৫.১: আশার বৎসর ভিত্তিক ঋণ বিতরণ (১৯৯৫-২০০১) নিচে সারণীতে (মিলিয়ন টাকা) হিসেবে দেখানো হলো:

১৯৯৫	১৯৯৬	১৯৯৭	১৯৯৮	১৯৯৯	২০০০	২০০১
১০৩১.৩৬	১৮২৩.০৮	২৯৭.৯৫	৪৩২৮.১০	৬৬১৯.৩৩	৭৭৮২.৩৪	৯৯৬৬.৬৫

উৎস: নিউ ভিশন, আশা সংকলন, ঢাকা: ২০১০, পৃ, ৮ ।

তাছাড়া বেসরকারী সংস্থা আশা ২০১২ সালে বাংলাদেশে সর্ব পর্যায়ে কী পরিমান ঋণ বিতরণ করেছে তার বাস্তবতার একটি হিসাব নিচে উল্লেখ করা হলো:

সারণী- ৫.২: নিচের সারণীতে এক নজরে আশার ঋণ কর্ম পরিকল্পনা জুন-২০১২ পর্যন্ত দেখানো হলো:

১)	আশা কর্মভুক্ত মোট ব্রাঞ্চের সংখ্যা			৩,১২৭টি
২)	আশা কর্মভুক্ত মোট গ্রামের সংখ্যা			৬৮,১০৬টি
৩)	আশা কর্মভুক্ত মোট থানা/উপজেলার সংখ্যা			৪১১টি
৪)	আশা কর্মভুক্ত মোট জেলার সংখ্যা			৬৪টি
৫)	মোট সক্রিয় দলের সংখ্যা			২,৩৫,৩২৯টি
৬)	মোট সক্রিয় সদস্য সংখ্যা	ঃ প্রাথমিক ঃ বিশেষ	ঃ ৯৫.৬৫% ঃ ৪.৩৫% মোট ঃ	৪,৭৩৯,৫৬৩ জন ২,১৫,৫৫১ জন ৪৯,৫৫,১১৪ জন
৭)	দীর্ঘমেয়াদী সঞ্চয় (এলটিএস)			১৯,৬৫,০৭৬ টি
৮)	মোট সঞ্চয় স্থিতির পরিমাণ (মাস শেষে)	ঃ প্রাথমিক ঃ বিশেষ ঃ এলটি এস	৪৯.২১% ৭.৭১% ৪৩.০৮% মোট ঃ	৭৩৩,৬৩,২৮,৩৭৮ টাকা ১১৪,৯০,২০,০৩৩ টাকা ৬৪২,১৬,৮৪,৩৭৪ টাকা ১৪৯০,৭০,৩২,৭৮৫ টাকা
৯)	নিরাপত্তা তহবিল	ঃ পলিসি গ্রহীতা		৪৯,২৩,১৪৫ জন
১০)	মোট নিরাপত্তা তহবিল (মাস শেষে)			৪৩২,৪১,৮৩,৯৬৮ টাকা
১১)	মোট সক্রিয় ঋণ গ্রহীতা	ঃ প্রাথমিক ঃ বিশেষ ঃ সোলার	৯৫.১১% ৪.৮৭% ০.০২% মোট ঃ	৪২,০৮,৬২৮ জন ২,১৫,৫৫১ জন ৯৫১ জন ৪৪,২৫,১২৬ জন
১২)	মোট ঋণ স্থিতি (সার্ভিস চার্জ সহ) মোট পুঞ্জিভুত ঋণ বিতরণ মোট পুঞ্জিভুত ঋণ আদায়			৬০৬৭,১৫,১৬,৬৬৭ টাকা ৬২৬৭০,৬৩,৮৩,৩৫৫টাকা ৫৬৬৭৩,৪৮,৬৬,৬৬৮টাকা
১৩)	ঋণ আদায়ের হার			৯৯.৬৭%
১৪)	পোর্টফোলিও এ্যাট রিস্ক (%) প্রতিদিনের			২.১৮%
১৫)	মোট কর্মী সংখ্যা (পুরুষ-১৮,৭৫৬ এবং মহিলা ২.৫০৭)			২১,২৬৩ জন

উৎস: নিউ ভিশন, আশা সংকলন, ঢাকা: ২০১২, পৃ, ১৬।

তৃণমূল পর্যায়ে দল গঠন : তৃণমূল পর্যায়ে (Grassroot Level) দল গঠন করে উন্নয়ন নিশ্চিত করণের কর্ম কৌশল আশা গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের নিয়ে সংস্থাটি তৃণমূল পর্যায়ে দল গঠনের কৌশল অবলম্বন করে। মহিলাদের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট স্থানে আশার ঋণ গ্রহণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়। দলের কোন সদস্য কিস্তির টাকা দিতে ব্যর্থ হলে অন্য

সদস্যরা তার উপর চাপ প্রয়োগ করে। এভাবে প্রতিটি দলের সদস্যকে কিস্তির টাকা দেয়ার জন্য সদা প্রস্তুত থাকতে হয়।

এগ্রিবিজনেস প্রোগ্রাম : আশার এ কর্মসূচীটির লক্ষ্য হলো গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি ভিত্তিক ব্যবসা পরিচালনার জন্য ঋণ প্রদান করা। ২০০১ সালের ডিসেম্বর মাসে এ প্রকল্পটি হাতে নেয়া হয়েছে এবং প্রকল্পের কাজ ২০০৬ সালে প্রথম পর্যায়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায় ২০১২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হয়। প্রকল্পের আওতায় ছয়টি জেলা যথা- ঢাকা, গাজীপুর, ফরিদপুর, পাবনা, মানিকগঞ্জ এবং পঞ্চগড় জেলার দরিদ্র কৃষকদের ৬টি ব্রাঞ্চের মাধ্যমে ১০৬ জনকে শস্য উৎপাদন, দুগ্ধ খামার, মোরগ-মুরগীর খামার, ব্রয়লার খামার, গরু মোটা তাজাকরণ এবং মাছ চাষের ব্যবসার উপর ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

বীমাদাবী পরিশোধ : আশা সংস্থায় চাকুরীরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং তাদের পরিবারের কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে বীমা দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করা এ সংস্থার অন্যতম কর্মসূচী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এ যাবত দেশের বিভিন্ন জায়গায় মৃত্যুবরণ কারীদের মধ্যে সংস্থাটি বীমার দাবীকৃত অর্থ পরিশোধ করেছে।

অন্যান্য : এছাড়া আশা মাদকাসক্তি ও আবহাওয়া পরিবর্তন জনিত কারণে পরিবেশ সংরক্ষণোত্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে সেগুলো বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা : বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ত্রাণ ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে জাতীয় বেসরকারী সংস্থার পাশাপাশি কিছু কিছু বেসরকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে। এমন দু'টো আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা হলো, কেয়ার ও ওয়ার্ল্ড ভিশন। নিচে সংস্থা দু'টো কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

কেয়ার : এ আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাটি বিশ্বব্যাপী উন্নয়নশীল দেশ সমূহে দরিদ্র মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়নে কেয়ারের কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো :

গ্রামীণ অবকাঠামো কর্মসূচী (Rural Infarstructure Programme-RIP) : বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকেই কোন না কোন ভাবে খাদ্য সংকটে পড়ে পুষ্টিহীনতার শিকার হয়। গ্রামের শিশুরাই এ ক্ষেত্রে বেশি সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে ক্ষুধা মুক্ত দেশ গড়ার কাজে কেয়ার সদা সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। কেয়ার গ্রামীণ এলাকার অধিক দরিদ্র জন সাধারণের কর্মের বিনিময়ে খাবার দিয়ে অর্থনৈতিকভাবে পুনর্বাসনে সহায়তা করছে। এক্ষেত্রে

তাদের পরিবারের উন্নয়নের পাশাপাশি গ্রামের রাস্তাঘাটগুলো পুন:নির্মাণ এবং রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

সমন্বিত খাদ্য উন্নয়ন কর্মসূচী (Ingregrated Food for Development Programme-IFDP) : কেয়ারের অন্যতম কর্মসূচী বাংলাদেশের চলমান দারিদ্র্যতা দূর করে প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের বাধা উতরিয়ে সুষ্ঠূ পরিকল্পনা ও পরিবেশ সম্মতভাবে গ্রামীণ জমির অবকাঠামো সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে কেয়ার বাংলাদেশ সমন্বিত উন্নয়নের জন্য খাদ্য কর্মসূচী নামে একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। যার উদ্দেশ্য হলো অভাবগ্রস্থ গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে তাদের সেবার মানোন্নয়ন ও সুবিধা বৃদ্ধি হাতের কাছে নিয়ে আসা।

পরীক্ষামূলক বন্যা নিয়ন্ত্রণ পাইলট কর্মসূচী (Flood Proofing Pilot Project-FPPP) : এ কর্মসূচীর আওতায় বন্যার কবল থেকে গৃহস্থালীর জমি রক্ষা করে কম খরচে গ্রামীণ জনগণের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং বন্যার ক্ষতিকর প্রভাব কমিয়ে আনা। বাংলাদেশে প্রায় প্রতি বছর বন্যার নিষ্ঠুর ছোবলের হাত থেকে মানুষকে পুনর্বাসনের জন্যই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

পল্লী রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী (Rural Maintainance Programme-RMP) : "গ্রামের মাটির রাস্তা-ঘাট রক্ষণা-বেক্ষণের লক্ষ্যে প্রতি বছর শ্রম নির্ভর প্রায় ৬০,০০০ হাজার দঃস্থ মহিলা এ প্রকল্পের অধীনে কাজ করে যাচ্ছে।"[২৬] কর্মসূচির আওতায় গ্রামের মানুষের যাতায়াত সহজসাধ্য হয়ে আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে এবং বেকার দুঃস্থ মহিলাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়ে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। কেয়ার ইউনিয়ন পরিষদের সমন্বয়ে এ কর্মসূচীটি পরিচালনা করছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ইউনিট (Disaster Management Unit-DMU) : ১৯৯৩ সালে কেয়ার দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা মোকাবেলার জন্য USID এর অর্থ সহযোগিতায় এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকার ও অন্যান্য এনজিও কেয়ারকে সামগ্রিক ভাবে শক্তিশালী করণের জন্য এ কর্মসূচীটির সাথে সময়োপযোগী কাজ করে যাচ্ছে।

স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিভাগ (Health and Population Sector-HPS) : গ্রামের মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্যগত অবস্থার উন্নয়নে এবং তাদের জীবনে পরিচর্যার পরিবর্তন আনাই কর্মসূচীর মূললক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে পানির অপ্রতুলতা, জনসংখ্যার ঘনত্ব, পুষ্টির অভাব দূরীকরণে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্যই কেয়ার প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে।

বেসরকারী সংস্থায় পরিবার পরিকল্পনা সেবা কর্মসূচী (Non-Government Family Planning Services Programme-NGFPSP) : বাংলাদেশের খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেট বিভাগের এমন কিছু এলাকা রয়েছে যেখানে পিছিয়ে পড়া গ্রামীণ জনগণের পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণ সম্পর্কে তেমন ধারণা নেই। কেয়ার এ জনগোষ্ঠীকে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা জাগ্রত করার লক্ষ্যে 'এনজিও এসপি' নামে একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এতে অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাকেও উৎসাহিত করা হয়েছে।

শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়ন স্বায়ীত্ব উদ্যোগ কর্মসূচী (Child Health Initiative for Lasting Development:-CHILD) : "১৯৯১ সালে সরকার যখন গ্রামের শিশুদের সামাজিক পরিবেশে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করে তখন থেকে কেয়ার সিলেট বিভাগের ১১টি উপজেলায় ৪ বৎসর মেয়াদী Child-1 নামে এবং ১৯৯৫ সালে Child-2 নামে ৩টি উপজেলায় কর্মসূচীটি গ্রহণ করে।"[২৭] কর্মসূচীর আওতায় সংস্থাটি ৬ বছরের নীচে শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

স্যানিটেশন এবং পারিবারিক শিক্ষা সম্পদ (Sanitation and Family Education Resource-SFER) : স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ পানি পান, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা থাকার শিক্ষা দান ইত্যাদি সমস্যা সমাধানের জন্য কেয়ার এ প্রকল্পটি হাতে নিয়ে যথোপযুক্ত সাফল্যের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করছে। এরই মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগে বেশ কয়েকটি এনজিও কেয়ারের সহযোগী হিসেবে উল্লেখিত কার্যসম্পাদানে গ্রামীণ জনগনকে উৎসাহিত করছে।

নারী উন্নয়ন কর্মসূচী (Women Developmen Programme-WDP): এ কর্মসূচীর মাধ্যমে কেয়ার গ্রামের দরিদ্র নারী সমাজের উন্নয়ন ঘটিয়ে সুন্দর পরিবার গঠনের প্রত্যয় ব্যক্ত করে। পরিবারের প্রতিটি সদস্যদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা উন্নয়নের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নে নারী সমাজের ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দিয়ে গ্রামোন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। "বর্তমানে এ প্রকল্পটি রাজশাহী, দিনাজপুর, নীলফামারী এবং গাইবান্ধা জেলার ৮টি উপজেলার ১৯৬ টি গ্রামে মহিলাদের উন্নয়নে কাজ করছে।"[২৮]

এইচআইভি/এইড্স বন্ধে জ্ঞান ও প্রশিক্ষণের উদ্যোগ (Stopping HIV/AIDS through Knowledge and Training Instiative-SHAKTI) : এইচআইভি/এইডস্ নামক সংক্রমনের হাত থেকে বাঁচার জন্য এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে বিস্তারিত শিক্ষা দানের মাধ্যমে বাস্তব সম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সর্বমহলে ব্যাপক প্রচারনা চালানোই এ কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য। SHAKTI প্রকল্পটি টাঙ্গাইল জেলায় সর্ব প্রথম কর্মসূচী শুরু

করে এবং অন্যান্য এনজিও এর সহায়তায় বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় সর্বত্র কার্যক্রম অব্যাহত রাখছে।

প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি ও অংশীদারীত্ব সেক্টর (Institutional Strengthening and Partnering Sector-ISPS): গ্রামীণ জনগণের স্বার্থে স্থানীয় এনজিও এবং স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন দফতরের শক্তি বৃদ্ধিতে কেয়ার সহযোগিতা করছে। এ দক্ষতার মান বাড়াতে মৌলিক প্রশিক্ষণ, কারিগরী সহায়তার মাধ্যমে প্রকল্প ও আর্থিক পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন করা কেয়ারের কর্মসূচীভুক্ত। এনজিও কর্মকর্তাদের দক্ষ করে গড়ে তোলাও এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য।

কৃষি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ কর্মসূচী (Agriculture and Natural Resources Programme -ANRP) : কৃষির মাধ্যমে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা এবং এর লক্ষ্য অর্জনে ব্যবহৃত কৃষি উপকরণের মানোন্নয়ন ও লাভ তোলে এনে তাদের উৎপাদিত সম্পদের মাধ্যমে ছোট খামার তৈরী করে আয় বৃদ্ধিকরণ এ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট বিষয় বলে বিবেচিত।

কমিউনিটির উদ্যোগ (ভিডিসির ইসিসিডি স্কুল স্থাপন) : শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশ (ইসিসিডি) কেন্দ্র সৌহার্দ্যের কর্মসূচীর আওতায় ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের স্কুল পূর্ব প্রস্তুতিমূলক উন্নয়ন এ্যাপ্রোচ। যেখানে একটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, সামাজিক এবং মনস্তাত্বিক পূর্ণতা বিকাশে সহায়তা করা হয়ে থাকে। প্রথাগত ভাবে এ বয়সী শিশুদের যে সকল বিষয় শিখনে গুরুত্বারোপ করা হয় না, সে সকল বিষয়ে শিশুদের বন্ধুসুলভ পরিবেশে শিখনের মাধ্যমে তাদেরকে পরিবর্তনের চেষ্টাই ইসিসিডির কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ (World Vision Bangladesh-WVB) : আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে বাংলাদেশে কর্মরত ওয়াল্ড ভিশন একটি অন্যতম সংগঠন। ১৯৫০ সালে বিশ্বে অনাথ শিশুদের সেবা দানের মধ্যে দিয়ে এ সংস্থাটির যাত্রা শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে ওয়ার্ল্ড ভিশন উন্নয়নশীল দেশ সমুহে দরিদ্র জনগণের সামাজিক উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রমে জড়িত হয়ে পড়ে। ১৯৭০ সালে এ দেশের দক্ষিণাঞ্চলে উপকূলীয় এলাকায় সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে দুর্গত জণগণের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের মাধ্যমে সংস্থাটি সেবা কর্ম শুরু করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালীন ভারতে শরনার্থী ক্যাম্পে এবং ১৯৭২ সালে যুদ্ধোত্তর সময়ে বাংলাদেশের অসহায় জনগণের পাশে কাজ করে ওয়ার্ল্ড ভিশন পরিচিত হয়ে উঠে। নিচে ওয়ার্ল্ড ভিশনের কর্মসূচী সমূহ আলোচনা করা হলো :

শিশু পরিচর্যামূলক কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর আওতায় ওয়ার্ল্ড ভিশন গ্রামীণ দরিদ্র শিশুদের খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং তাদের পিতামাতার আয় উপার্জনে সাহায্য প্রদান করে থাকে। ১৯৭৫ সালে

এ সংস্থা ৫,০০০ শিশুকে বিভিন্নভাবে সহায়তা করেছে এবং বর্তমানে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১,০৪,০০০ জনে।

লিঙ্গ সমতায় সহায়তা : উন্নয়নে নারী পুরুষের সম অংশগ্রহণের গুরুত্ব বিবেচনা করে ওয়ার্ল্ড ভিশন এলাকাভিত্তিক বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এতে গ্রামীণ অসহায় নারীদের ঋণ সুবিধা, সঞ্চয়, ব্যবস্থাপনা এবং নেতৃত্ব বিষয়ে উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৩ সাল থেকে ৪১৫টি দল গঠন করে ৮,২২৫ জন মহিলাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এ কর্মসূচী যাত্রা শুরু করে।

শিক্ষামূলক কর্মসূচী : 'রূপান্তরিত উন্নয়নে শিক্ষা' আন্দোলনের ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ভিশন শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারের কাটমোল্লা লিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা : ওয়ার্ল্ড ভিশন শিক্ষা সহায়তার আওতায় গ্রামের বিভিন্ন এলাকার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদানসহ শিশু অধিকার কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি সহায়তা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে আর্থিক সহায়তা : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়ন যেমনঃ নতুন ভবন নির্মাণ, পুরাতন ভবনের সংস্কার সহ শিক্ষা উপকরণ প্রদানে সহায়তা করা হয়ে থাকে। ২০০৩ সালে ৩১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নতুন ভবন নির্মাণ, ১০১টি স্কুলের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ৭২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণাদি বিতরণ করা হয়েছে।

প্রাক-শৈশব শিক্ষা কর্মসূচী: ওয়ার্ল্ড ভিশন তার কর্মসূচীভুক্ত গ্রাম এলাকায় ৪-৬ বছর বয়সী শিশুদের জন্য এ কার্যক্রম চালু করেছে। এর আওতায় বিগত বছরে ১৭টি এলাকায় ৯,০০০ শিশু স্কুল পূর্ব শিক্ষা লাভের সুযোগ পায়।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা : গ্রামের যে সকল ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে গিয়ে অধ্যয়নের সুযোগ পায় না বা অনেকে ঝড়ে পড়ে তাদেরকে এবং বয়স্কদের জন্য কার্যকরী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক সংযোগ, এডভোকেসি করাই এ কর্মসূচীর মূল লক্ষ্য।

স্বাস্থ্য কর্মসূচী : প্রতিষেধক ও নিরাময়মূলক স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে ওয়ার্ল্ড ভিশন যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে তা নিম্নরুপঃ

প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা : অনুর্ধ্ব ৫ বছর বয়সী শিশুদের ৬টি সংক্রামক রোগ এবং মহিলাদের টিটেনাস থেকে রক্ষার জন্য এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে বিগত বছরে প্রায় সোয়া লক্ষ শিশু ও মহিলাকে স্বাস্থ্যগত সেবা দান করা হয়েছে।

নিবারণমূলক স্বাস্থ্য সেবা : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ভিশনের স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামের দরিদ্র পরিবারের শিশুদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ঔষধপত্রের মাধ্যমে চিকিৎসা সহায়তা দিয়ে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

এইচআইভি/এইডস্ : এ ব্যাধিটি বিশ্বব্যাপী দারুণভাবে আতংক সৃষ্টি করেছে। মরণব্যাধি এ রোগটি থেকে বাংলাদেশও মুক্ত নয়। সুতরাং এ সমস্যার মোকাবেলায় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কয়েকটি এলাকায় প্রতিরোধকমূলক বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকাগুলো হলো- কক্সবাজার, খুলনা ও মংলা। প্রকল্পের নাম 'জীবন আলো '।

কৃষি কার্যক্রম : বাংলাদেশের কৃষক সমাজকে সহায়তা করার জন্য ওয়ার্ল্ড ভিশন বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- কৃষি উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, কৃষি পণ্য প্রদর্শন, অ-খামার কেন্দ্র উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং কৃষি উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি। ২০০৩ সালে এ কর্মসূচীর আওতায় সংস্থাটি ১৫,৬০২ জন কৃষকের মধ্যে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বীজ, চারা, সার, পশু খাদ্য ও অন্যান্য উপকরণাদি বিতরণ করেছে।

খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করণ উদ্যোগ : সরকার ও USAID এর অর্থানুকূল্যে ২০০০-২০০৫ সাল পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিক কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে ১৬টি এলাকায় দুঃস্থ, পুষ্টিহীন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিতদের মধ্যে খাদ্য, কৃষি উপকরণ সহায়তা, জনসচতনতা, ত্রাণ ব্যবস্থাপনা ও অবকাঠামো উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়।

ঘুর্ণিয়মান ঋণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ওয়ার্ল্ড ভিশন গ্রামীণ দরিদ্র পরিবার গুলোর মধ্যে কৃষি উৎপাদন, কৃষি উপকরণ, মৎস্য চাষ, স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ, ভূমি পুনরুদ্ধার, পশু পালন, মুরগী খামার, নার্সারী, ক্ষুদ্র ব্যবসা, পরিবহন ও বৃত্তিমূলক খাতে ঋণসুবিধা দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত এ খাতে ১৫,৬০,০০,০০০ টাকা ঋণ হিসেবে বিতরণ করতে দেখা যায়।

দুর্যোগ মোকাবেলার প্রস্তুতি ও ত্রাণ : বাংলাদেশের বন্যা, ঘুর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস সহ বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত রক্ষা পাওয়ার পূর্ব প্রস্তুতির জন্য সংস্থাটি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবীদের প্রস্তুত রাখে এবং দুর্যোগ উত্তর ত্রাণ যেমন- খাদ্য সহ নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্য সামগ্রী বিপন্নদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে।

কিশোর অপরাধী প্রকল্প : বাংলাদেশ অবসর প্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তাদের সমিতির মাধ্যমে পরিচালিত কিশোর অপরাধ সংশোধন প্রকল্পে ওয়ার্ল্ড ভিশন সহায়তা দিয়ে থাকে। কর্মসূচীর আওতায় এ পর্যন্ত ১০,০০০ পুলিশ কর্মকর্তা সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও শিশু অধিকার বিষয়ে আলোচনায় অংশ নিয়েছেন। ৬,০০০ কিশোর অপরাধী সমাজকল্যাণ কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে উপকৃত হয়েছে। অপরাধীদের জন্য এডভোকেসি, সচেতনতা, উদ্বুদ্ধকরণ এবং স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা হচ্ছে।

বেসরকারী সংস্থার সফলতা : বাংলাদেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নে বেসরকারী সংস্থাসমূহ যে সকল ক্ষেত্রে কর্মসূচী গ্রহণ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে নিচে তা আলোচনা করা হলোঃ

দুর্যোগ মোকাবেলা : ১৯৮৮ ও ১৯৯৮ সালে ভয়াবহ বন্যা সহ দক্ষিণাঞ্চলের প্রতিটি প্রাকৃতিক দূর্যোগে সরকারের পাশাপাশি বেসরকারী সংস্থার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাকে জাতি সবসময় শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

দারিদ্র্য দূরীকরণ : এনজিও গুলো গ্রামীণ ভূমিহীন নি:সহায় জনগোষ্ঠীকে দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে অর্থনৈতিকভাবে পথ দেখিয়ে কিছুটা হলেও বাংলাদেশের দারিদ্র্যতা বিমোচনে সহায়ক হয়েছে। এক্ষেত্রে দরিদ্রদের মধ্যে দল গঠন, পুঁজি সংগ্রহ করে দারিদ্র্যতা বিমোচনের কৌশল অবলম্বন করাই তাদের অন্যতম সফলতা। যেমনঃ গাভী, ছাগল, তাঁত, রিক্শা, ট্রলার, নৌকা ক্রয় সহ বিভিন্ন ধরণের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরীতে পুঁজি সরবরাহ করে দরিদ্র মানুষকে উপার্জনক্ষম করে তোলতে এনজিওগুলো অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছে।

প্রতিকার ও পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম : বেসরকারী সংস্থা সমূহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে অদ্যাবধি স্বাস্থ্য সেবা ও বিভিন্ন পুনর্বাসনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সব সময়ই এ দেশে গ্রামের অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে।

জনসংখ্যা সমস্যা সমাধান : গ্রামের অসচেতন দরিদ্র মানুষের মধ্যে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ রোধে এনজিওরা পরিবার পরিরকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করে জনসংখ্যা হ্রাসে অবদান রেখেছে।

পরিশেষে আলোচনায় দেখা যায় যে, এনজিওগুলো সরকারের স্বীকৃতি বা নিয়ন্ত্রণে থেকেই এদেশে গ্রামের দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সার্বিক কার্যক্রম পরিরচালনা করে যাচ্ছে।

বেসরকারী সংস্থা ব্যর্থতা : বেসরকারী সংস্থা গুলোর যেমন কিছু সফলতা রয়েছে তেমনি কিছু ব্যর্থতাও রয়েছে। নিচে এনজিওদের প্রণীত কর্মসূচী সমূহের ব্যর্থতা আলোচনা করা হলো :

পুঁজির অভাব : এনজিওদের নিজস্ব কোন পুঁজি নেই। পুঁজি সংগ্রহ করতে তারা নামেমাত্র কিছু কিছু সেবামূলক কাজ দেখিয়ে তার সুবাদে সরকার বা বিভিন্ন বিদেশী দাতা সংস্থার কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়িয়ে থাকে।

দক্ষ কর্মীর অভাব : বেসরকারী সংস্থা সমূহে দক্ষ জনবলের অভাব থাকার ফলে প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মসূচী সঠিক ভাবে মূল্যায়ন ও অনুসরণে ব্যর্থতায় পর্যবষিত হচ্ছে।

স্বেচ্ছাচারিতা : বেসরকারী সংস্থায় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এক দিকে স্বেচ্ছাচারিতা, অন্যদিকে মোটা অংকের টাকা ও সম্পদ আত্মসাৎ করে সদা নিজস্ব স্বার্থোদ্বারে ব্যতিব্যস্ত থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবমুখী কর্মসূচীর অভাব : অধিকাংশ এনজিও যেহেতু সরকারী ও বিদেশী সাহায্য সংস্থার অর্থ প্রাপ্তির আশায় প্রহর গুণে, সেক্ষেত্রে নিজস্ব বাস্তবতামুখী কোন পদক্ষেপ নিতে তারা সর্বদা ব্যর্থ হয়।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের অভাব : বেশীর ভাগ এনজিওর মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল বিরাজমান থাকায় তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হয়।

সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব : বেসরকারী সংস্থা গুলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক গড়ে উঠায় তাদের মধ্যে সহযোগিতা ও সমন্বয়ের অভাব লক্ষ্য করা যায়।

সনাতন ধ্যান ধারণা : এনজিও গুলো মূলতঃ প্রাচীন ধ্যান ধারণার উপর ভর করে তাদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে। বিশেষ ভাবে অতীত মানবতা, মানব প্রেম এবং ধর্মীয় অনুপ্রেরণাকে কেন্দ্র করে সেবা প্রদান করাকেই মূল লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করে থাকে।

রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিল : বেসরকারী সংস্থা সমূহ জন সেবার উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আসলে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির চিন্তায় বেশী ব্যস্ত থাকে।

মৌল মানবিক চাহিদা উপেক্ষা : সরকারী সাহায্য ও অনুদানের আশায় এনজিওরা গবেষণা জরিপ ও কর্মসূচীর নীল নক্শা প্রণয়ন করে মৌল মানবিক চাহিদার সঠিক তথ্য উদ্ঘাটন করতে ব্যর্থ হয়।

এনজিওদের কর্মসূচীর বাস্তবতা (Feasibility of the NGO's Programme-FNP) : বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়নের নামে বেসরকারী সংস্থা সমূহের গৃহীত কর্মসূচীর মাঠ পর্যায়ে পর্যবেক্ষণে যেসব অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত হয় তার কিছু বাস্তব কুফল ও সুফল নিচে পর্যালোচনা করা হলো :

কুফল : এনজিও তৎপরতায় গ্রামের মানুষের জন্য যে সকল ক্ষেত্রে কুফল বয়ে আনে তার বাস্তবতা নিচে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো :

ঋণ গ্রহীতাদের মানসিক চাপ : বেসরকারী সংস্থা সমূহ হতে ঋণ গ্রহণ করে গ্রামের মানুষ দিন দিন মানসিক পীড়ায় ভোগে। এদের মধ্যে চিন্তায় কারও কারও রাতে ঘুম হারাম হয়ে যায়। তাদের একটা ধারণাই সব সময় মনে দাগ কাটতে থাকে, তা হলো ঋণের কিস্তির টাকা কোন্ দিন শোধ হবে? গ্রামীণ অসহায় দুঃস্থ পরিবারগুলো সহজ সরল। তারা ঋণের টাকার দায় মুক্তির দিন গুণতে থাকে। তারা এও চিন্তা করে কোন কারণে গৃহীত টাকা যদি অপব্যবহার হয়ে যায়, তবে কীভাবে এ টাকা পরিশোধ করবে? তাই ঋণ গ্রহণের পর থেকে পদে পদে তাদের হিসেব কষে চলতে হয় এবং মানসিক পীড়ায় ভোগতে হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঋণের স্বল্পপুঁজি : বর্তমান দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্বগতির বাজারে বেসরকারী সংস্থা প্রদেয় ২-৪ হাজার টাকার ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ে লাভজনক উৎপাদনমুখী কিছু করা গ্রহীতাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অনেকের ধারণা যাতায়াত এবং পরিবারের আনুসাঙ্গিক খরচ মেটাতেই ঋণের টাকা শেষ হয়ে যায়।

অলস জীবন: ঋণের টাকা উত্তোলন করে গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন, কান্ডজ্ঞানহীন কোন কোন মানুষ কষ্টকর কাজ না করে অলসভাবে বসে ঋণের টাকা খরচ করে পরিরবার পরিজনের ভরণ পোষণ করে থাকে। পরবর্তীতে এসব মানুষকে ঋণের কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ।

অপ্রতুল ঋণ প্রাপ্তি : গ্রামের অসহায় ভূমিহীন সকল পরিবারের ঋণ প্রাপ্যতা সহজ সাধ্য হয়ে উঠেনা। মাত্র গুটি কয়েক পরিবার ঋণ প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করে। বাকী পরিবার গুলো দরিদ্র্যতার সাথে জীবন যুদ্ধে সংগ্রাম করেই বেঁচে থাকে। বর্তমান বাংলাদেশে ৬০ ভাগ ভূমিহীন দরিদ্র পরিবার গ্রামে বাস করে। অথচ ঋণ প্রাপ্যতার সুযোগ হয় মাত্র ২০-২৫ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর।

কঠিন শর্ত : ঋণ গ্রহণের কঠিন শর্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হয়ে গ্রামের হত দরিদ্র মানুষকে ঋণ গ্রহণ করতে হয়। প্রতিটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অবশ্য অবশ্যই কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে হয়।

সুদ বাণিজ্য : বেসরকারী ক্ষুদ্র ঋণ দানকারী সংস্থা গুলো কোন নির্দিষ্ট গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করে সামান্য পুঁজি নিয়ে সুদের মাধ্যমে কিস্তিতে টাকা লগ্নী শুরু করে। কয়েক বছরের মধ্যে সংস্থা সমূহ বড় আকারের মূলধন অর্জন করতে সক্ষম হয়। গ্রামের দুঃস্থ মানুষের ঘাম ঝড়া কষ্টের পয়সা সুদ বাবদ আদায় করে তারা (সংস্থা) এসব অর্থের মালিক হয়ে থাকে। সুতরাং গরীব মানুষের কাছে টাকা লগ্নী পদ্ধতিকে এক ধরণের শোষণ বলে ধরে নেয়া যায়।

কোন কোন বিশেষজ্ঞ এনজিও কর্মীদের ঋণের কিস্তির টাকা আদায়ের ভূমিকাকে কাবুলীওয়ালার সাথে তুলনা করেছেন। বেসরকারী সংস্থার কর্মীরা কড়ায় গন্ডায় হিসেব করে দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে সুদাসলে কিস্তির টাকা আদায় করে। সুতরাং বেসরকারী সংস্থা গুলো ঋণদানের এ পদ্ধতিটি নি:সন্দেহে সুদ বাণিজ্য বলে অভিহিত করা যায়।

উৎপীড়ন : ঋণ গ্রহণকারী কোন পরিবার নির্দিষ্ট সময়ে কোন কারণে কিস্তির টাকা যোগাড় করতে না পারলে সংশিষ্ট সংস্থার কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কর্তৃক উৎপীড়নের শিকার হয়। জরীপে দেখা যায়, ঋণ গ্রহীতা দৈবচক্রে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উৎপীড়নের শিকার হতে হয়। এসময় তারা (কর্মচারী) ঋণ গ্রহীতাকে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহারে নানাভাবে গালাগালি করে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

কখনও কখনও কোন ঋণ গ্রহীতাকে শারীরিকভাবেও নির্যাতন করা হয়। এমনকি কিস্তির টাকা পরিশোধ না করা পর্যন্ত এনজিও কর্মীদের ঋণ গ্রহীতার বাড়ীতে বসে থাকতেও দেখা যায়।

ঋণ দানে বৈষম্য : প্রতিটি বেসরকারী সংস্থার ঋণ দান পদ্ধতিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। এক্ষেত্রে গ্রামের পুরুষের চেয়ে মহিলাদের বেশি অগ্রাধিকার দেয়া হয়। ঋণের মাত্র ৫ ভাগ দেয়া হয় পুরুষদের, বাকী ৯৫ ভাগই মহিলাদের প্রদান করা হয়।গ্রামীণ রক্ষণশীল দরিদ্র মহিলারা ঋণের টাকা সঠিক পদ্ধতিতে ব্যবহার করতে যেয়ে হিমশিম খায়। ফলে সাধারণভাবেই পুরুষদের সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। কারণ গ্রামের পুরুষদের তুলনায় মহিলারা বেশী অসচেতন।

দারিদ্র্যতা বিমোচনে ব্যর্থতা : গ্রামীণ দারিদ্র্যতা বিমোচনে বেসরকারী সংস্থা গুলোর উন্নয়ন সাগরে শিশির বিন্দুর মতই। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তারা স্লোগান তুল্‌ছে যে, গ্রামে দারিদ্র্যতা বিমোচন সম্ভব হয়েছে। কিন্তু গ্রাম গুলো সরে জমিনে পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, এখনও বহু দরিদ্র নারী-পুরুষ ক্ষুধার জ্বালায় হন্যে হয়ে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া এখনও গ্রামীণ অনেক দরিদ্র জনগোষ্ঠী পর্যাপ্ত শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন অবকাঠামোগত সেবা ভোগের সুবিধা থেকে বঞ্চিত রয়েছে। অভাবের তাড়নায় মানুষ গ্রাম থেকে শহরে পাড়ি জমাচ্ছে।

ঋণ পরিশোধে নি:স্ব : গ্রামের অনেক দরিদ্র পরিবার বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে ঋণের টাকা সঠিক ব্যবহার না করে অপব্যবহারের দরুণ কিস্তির টাকা পরিশোধ করতে যেয়ে সহায় সম্বল যা থাকে তা বিক্রি করে একেবারে নি:স্ব হয়ে পড়ে।

অপচয় প্রবণতা : সহায় সম্বলহীন গ্রামের বহু মানুষ এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে অভাবের সংসারের নানা প্রয়োজন মেটাতে খরচ করে ফেলে। যেমন; খাবার ও পোশাক ক্রয়, আত্মীয়ের আপ্যায়ন সহ বহুমুখী কাজে তারা এ টাকা ব্যয় করে। ফলে অপচয় প্রবণ হয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যে গৃহীত ঋণ ব্যবহৃত না হয়ে লক্ষ্যচ্যুত হয়ে পড়ে।

গৃহত্যাগ : এনজিওদের ঋণের টাকা পরিশোধ করার ভয়ে অনেক দরিদ্র পরিবার বাপ দাদার স্মৃতি বিজড়িত ভিটে-বাড়ী ছেড়ে রাতের অন্ধকারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে পালিয়ে অনত্র গমন করে।

পুষ্টিহীনতা : বেসরকারী সংস্থার ঋণের কিস্তির টাকা শোধ করতে যেয়ে অনেক দু:স্থ পরিবার অর্ধাহারে, অনাহারে দিন কাটায়। গাভীর দুধ, বাগানের ফল, ক্ষেতের শাক-সব্‌জি, হাঁস মুরগীর ডিম ও মাংস ঋণ গ্রহীতা নিজে না খেয়ে, তা বিক্রি করে কিস্তির টাকা যোগিয়ে থাকে। ফলে এসব পরিবারের সদস্যরা পুষ্টিকর খাবার না পেয়ে পুষ্টিহীনতা নিয়ে জীবনযাপনকরে।

অনাড়ম্বর আচার অনুষ্ঠান : এনজিওর ঋণ গ্রহণকারী পরিবার অত্যন্ত সাদাসিদে ভাবে উৎসব পার্বন উদ্‌যাপন করে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান যেমন- ঈদ, পূজা সহ অন্যান্য অনুষ্ঠানাদিতে এসব পরিবারের ছেলেমেয়েদের সাধারণ খাবার দেয়া হয়, নতুন পোশাক পরিচ্ছেদ কিনে দিতে পিতামাতা সক্ষম হয় না। কারণ, কিস্তির টাকার দায় পরিশোধ করতে যেয়ে তাদের ঐ অনুষ্ঠানে বাড়তি খরচ করা সম্ভব হয়না।

শিক্ষা সুযোগ হ্রাস : বেসরকারী সংস্থা থেকে ঋণ গ্রহণকারী গ্রামের একজন অশিক্ষিত পিতামাতা তাদের সন্তানদের স্কুলে না পাঠিয়ে কিস্তি পরিশোধের টাকা যোগাতে অন্যের বাড়ীতে শ্রম বিক্রি করিয়ে টাকা উপার্জনের ব্যবস্থা করে। ফলে এ জনগোষ্ঠীর সন্তানদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে গ্রামে অশিক্ষিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে।

এনজিও কার্যক্রমের সুফল : বেসরকারী সংস্থা সমূহের সংস্পর্শে এসে গ্রামের মানুষ যে সকল ক্ষেত্রে সুফল পাচ্ছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

এনজিওদের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা দান কর্মসূচী : বেসরকারী সংস্থা গুলোর শিক্ষা কর্মসূচী নি:সন্দেহে একটি মহতী উদ্যোগ। কর্মসূচীতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষায় প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। ঝড়ে পড়া ছাত্র/ছাত্রীরা প্রাথমিক পর্যায়ে এ শিক্ষার সুযোগ পেয়ে থাকে। অশিক্ষিত বয়স্করাও এমন শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবন চলার জন্য সামান্য লেখা পড়া শিখে কিছুটা হলেও আলোর জগত দেখতে পায়। এতে তারা নিজের প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন কাজ চালাতে পারে। তবে এ কথা সত্য, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী একটি গ্রামের কয়েক হাজার মানুষের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটাতে না পারলেও, এনজিওরা শিক্ষা সম্প্রসারণে যে ভূমিকা পালন করছে তা গ্রামোন্নয়নের জন্য কিছুটা হলেও অবদান রাখছে।

স্বাস্থ্য : বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, পুষ্টি, টিকাদান, এইডস্ বিস্তার রোধ, ম্যালেরিয়া মোকাবেলা, পরিরবার পরিকল্পনা, প্রজনন ও গর্ভবর্তীর পরিচর্যা, খাবার স্যালাইন, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য রক্ষা, শারীরিক অঙ্গ সংস্থাপন বাহুবার্ম, আর্সেনিক দুষণ রোধ সহ বিভিন্ন রোগের সেবা দানে বেসরকারী সংস্থা সমূহ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তাতে গ্রামীণ অজপাড়া গাঁয়ের অসচেতন জনগোষ্ঠীকে তারা অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছে। গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারী সংস্থা গুলোর যে কোন কার্যক্রমের চেয়ে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্মসূচী সামান্য হলেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

যাতায়াত : বেসরকারী সংস্থা গ্রামীণ প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিছু কিছু কাঁচা, পাকা সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার করে থাকে। কেয়ার সহ কয়েকটি এনজিও দুঃস্থ মহিলাদের এসব কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে

নিয়োগ দিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের যাতায়াতকে সহজ করে একস্থান থেকে অন্য স্থানে চলাচলের পথ সুগম করে থাকে।

দরিদ্র নারীদের সচেতনতা : গ্রামীণ গরীব মহিলারা আগে যেখানে স্বামীর ভাত রান্না করা ও সন্তান লালন পালনে ব্যস্ত থাকত, বেসরকারী সংস্থা গুলোর সংস্পর্শে এসে তাদের এ ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। তারা বেসরকারী সংস্থার সাথে বহু মাত্রিক কাজে জড়িত হয়ে নিজেরা কোন না কোন কর্মে সম্পৃক্ত হয়ে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। নারীর ক্ষমতায়নে পুরুষ শাসিত সমাজের প্রতিবাদ করে অধিকার সচেতন হয়েছে। ফলে নারী নির্যাতন হ্রাস পেয়েছে। নারীরা বিভিন্ন কাজে উৎপাদন বৃদ্ধি করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছে। স্বামী স্ত্রীর যৌথ আয়ে তারা সুখী পরিবার গঠন করতে সক্ষম হচ্ছে। তাদের ছেলেমেয়েরা লেখা পড়া শিখে মানুষ হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে। স্বাস্থ্য সহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে তাদের সচেতনতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অসামাজিক কার্যক্রম ও বেকারত্বের অবসান : যে সকল মানুষ আগে অসামাজিক কর্মকান্ডে জড়িত ছিল, তারাও কর্মমুখী হয়ে খারাপ পথ থেকে সরে এসে উন্নয়নমূলক কাজে অংশ নিচ্ছে। বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে যেয়ে গ্রামের দরিদ্র বেকার নারী পুরুষ বহু মাত্রিক কর্মে নিয়োজিত হয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়নে অবদান রাখছে। বেকাররা এনজিও থেকে ঋণ নিয়ে তা ভিন্ন ভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে দিন রাত পরিশ্রম করছে।

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি : বেসরকারী সংস্থার উদ্যোগে গ্রামে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নত বীজ, সবুজ সার, রোগ-বালাই হ্রাস সহ কৃষিক্ষেত্রে প্রদর্শনী চালু করে গ্রামের কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল উদ্ভাবনে এনজিওরা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। ফলে কৃষি ব্যবস্থাপনায় আধুনিক কৃষি উপকরণ ব্যবহার করে কৃষকরা সচেতন হয়ে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে।

উপসংহার

এনজিওদের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের যে পরিমান ভাগ্যের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তার চেয়ে বেশী লাভবান হয়েছে সংস্থা গুলো। মানুষের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করে সুদ আদায়ের মাধ্যমে এনজিও গুলো অনেক বেশী মুনাফা অর্জন করছে। এ পদ্ধতি ব্যবসায়িক স্বার্থোদ্ধার ছাড়া কিছুই নয়। কোন কারণে কোন ঋণ গ্রস্থ পরিবার কিস্তি পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারীদেরকে ঋণ গ্রহীতার উপর জোর জুলুম এবং ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করতে দেখা যায় এবং তারা কারও কারও বাড়ীর ব্যবহৃত আসবাবপত্র নিয়ে আসে। কেহ ঋণের কিস্তি পরিশোধের ভয়ে আত্মহত্যাও করে থাকে।

আর একথা শতভাগ সত্য না হলেও বলা যায়, গ্রামের মানুষ এনজিওদের সহায়তায় দারিদ্র্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে পর্যায়ক্রমে আত্মনির্ভরশীলতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হয়েছে। যে পরিবার অনাহারে জীবনযাপনকরতো , তারা আজ তিন বেলা ভাত খেতে পারছে। বেকারদের অলস জীবনের পরিবর্তে কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যাচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, আত্ম কর্মসংস্থান অনেকটা হাতের নাগালে চলে এসেছে। এনজিও সহায়তার পূর্বে যে সকল ভূমিহীন পরিবারকে একটি টাকা ধার দিয়ে কেহ বিশ্বাস করতো না, সেখানে বেসরকারী সংস্থা গুলো বিনা জামানতে টাকা ঋণ দিয়ে কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করে অবহেলিত গ্রামীণ সমাজের মানুষের অন্ধকার দূর করতে সক্ষম হয়েছে। বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) গুলোর গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ক্ষুদ্র ঋণের প্রবর্তন করে সংস্থাগুলো গ্রামের ভূমিহীন, অসহায় মানুষের পুঁজি সংগ্রহ করে তাদের জীবন যাপনের পথকে সহজ করে দিয়েছে। গ্রামের ভূমিহীন দরিদ্র মানুষের মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচী চালু করার মডেল স্বরূপ গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউনুস ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কারে ভুষিত হয়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মহিমান্বিত করেছেন। ব্র্যাক, প্রশিকা, আশার মত এনজিওগুলো গ্রামোন্নয়নে বহুমাত্রিক কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে সারা বিশ্বে সমাদৃত হয়েছে। এনজিও'র কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেয়ে বাংলাদেশের বাইরেও তা বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মানের এনজিও কেয়ার ও ওয়ার্ল্ড ভিশন এদেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ করে গ্রামোন্নয়নে কিছুটা হলেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থায় দায়িত্ব পালন করে এনজিওদের অনেকে বিভিন্ন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে গ্রামের দরিদ্র মানুষেরও অনাহার থেকে আহারের ব্যবস্থা হয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে গ্রামের

হত দরিদ্র মানুষের উন্নয়নের তুলনায় এনজিওদের স্বার্থ রক্ষায় শতভাগ প্রাধান্য পেয়েছে। এসব এনজিও জিরো থেকে হিরোতে পরিণত হয়েছে।

এনজিওদের আসল কার্যক্রম ঋণ দান প্রসঙ্গে ড. আর. এম. দেবনাথ বলেন, "এক সময় এলাকাভিত্তিক উন্নয়নে সরকারী ব্যাংকগুলোকে জড়িত করা হয়েছিল। ছিল একটা জেলার জন্য 'লিড ব্যাংকের' ব্যবস্থা। এখন জোর দিয়ে আর এ কথা শুনিনা। মনে হয়, গ্রামের ঋণ চাহিদা মেটানোর দায়িত্ব এনজিও'দের হাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এ কাজটি যে কোন উপকারে আসছেনা তা বলাই বাহুল্য।"[২৯]

তথ্য পঞ্জী (References)

১) রহমান, মোঃ আতিকুর, বাংলাদেশে এনজিও এবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ, ঢাকা: অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ, ১১।

২) প্রাগুক্ত পৃ, ২।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১১৬।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১২০।

৫) প্রাগুক্ত পৃ, ১২১।

৬) প্রাগুক্ত পৃ, ১২২।

৭) প্রাগুক্ত পৃ, ১২৩।

৮) শওকতুজ্জামান, সৈয়দ, বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ, ঢাকা: তাসলিমা পাবলিকেশন্স, ২০০৮, পৃ, ১৯১ ।

৯) প্রাগুক্ত পৃ, ১৮৮।

১০) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭৭।

১১) প্রাগুক্ত পৃ, ১৮০।

১২) প্রাগুক্ত পৃ, ১৮০।

১৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১৮২।

১৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১৮২।

১৫) সালেহ, আসিফ, সেতু, ঢাকা: ব্র্যাক পাবলিকেশন্স, (২৭ বর্ষ সংখ্যা), ২০১২, পৃ, ৬।

১৬) প্রাগুক্ত পৃ, ৪।

১৭) প্রাগুক্ত পৃ, ৫।

১৮) প্রাগুক্ত পৃ, ৭।

১৯) মিঁয়া, মুহাম্মদ সেলিম ও হোসেন, মুহাম্মদ মোশারফ, বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও, ঢাকা: তারিক উল্লাহ তরুণ, ২০১০, পৃ, ৪৫।

২০) কামাল, মোঃ মুস্তাফা, নিউ ভিশন, ঢাকা: আশা পাবলিকেশন, ২০১২, পৃ, ৩।

২১) প্রাগুক্ত পৃ, ৫।

২২) প্রাগুক্ত পৃ, ২।

২৩) প্রাগুক্ত পৃ, ৮।

২৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১০।

২৫) প্রাগুক্ত পৃ, ৯।

২৬) খান, ফাহিম, কেয়ার বার্তা, (সৌহার্দ্য, ভলিউম-১, সংখ্যা-২), ঢাকা: ত্রৈমাসিক প্রকাশনা, ২০১২, পৃ, ৩।

২৭) প্রাগুক্ত পৃ, ৫।

২৮) প্রাগুক্ত পৃ, ৬।

২৯) দেবনাথ, ড. আর. এম. অর্থনীতির কড়চা, ঢাকা: অশোক কুমার নন্দী, ২০১১, পৃ, ২৬০-৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়

সরকারের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী

ভূমিকা : পূর্ববর্তী অধ্যায় এনজিও পরিচিতি, গ্রামোন্নয়নে বিভিন্ন স্থানীয় এনজিও যেমন : গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও আশা এবং আন্তর্জাতিক যেমন :কেয়ার ও ওয়ার্ল্ড ভিশন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবায়নের বিভিন্ন চিত্র, বেসরকারী সংস্থা গুলোর সফলতা, ব্যর্থতা, কর্মসূচী বাস্তবতার কুফল, সুফল ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী যেমন : ভূমিকা, সরকারী কর্মসূচীর পরিচিতি, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন. বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথা: মানব সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা, যাতায়াত, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ, খাদ্য, বাসস্থান, অন্যান্য অবকাঠামো, যুব সমাজ, নারী সমাজ, সমাজকল্যাণ উন্নয়নমূলক ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতা নিয়ে আলোচনা করা হবে। নিচে কর্মসূচী সমূহের বিস্তারিত বিবরণ প্রদত্ত হলো :

সরকারী কর্মসূচীর পরিচিতি : বিশ্ব ব্যাপী রাষ্ট্র সমূহ জনকল্যাণ মূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণকে সেবা দান করে মর্যাদার আসনে সমাসীন হয়েছে। "ইংল্যান্ড বা যুক্তরাজ্য ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর স্যার উইলিয়াম বিভারিজের সুপারিশমালা (কর্মসূচী) বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাসে কল্যাণ রাষ্ট্রের এক উজ্জ্বল আদর্শে পরিণত হয়।"[১] পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডের সুপারিশমালা বাস্তবায়নের আদর্শ (Model) অনুসরণ করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চল, অস্ট্রেলিয়া ছাড়াও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমূহ উন্নয়নের কৌশল হিসেবে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মহানবী (সা.) মদিনা সনদের মাধ্যমে পৃথক পৃথক কর্মসূচী সংযোজন করেন। "এরূপ ধারণার সর্বপ্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ৬২২ সালে সাম্য (Equality), স্বাধীনতা (Liberty) ও সামাজিক ন্যায় বিচার (Justics) নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে।"[২] মহানবী (সা.) এর আদর্শ অনুসরণ করে খোলাফায়ে রাশেদীনের শাসন আমলেও ভিন্ন ভিন্ন নীতিমালা সম্প্রসারিত হয়।

তৎকালীন বিশ্ব শাসন ব্যবস্থায় আরও যে সকল কর্মসূচী ও মতবাদ পরিলক্ষিত হয় তা হলো, "এলিজাবেদীয় দরিদ্র আইন (১৬০১), শিল্প বিপ্লব (১৭৭০-১৮৮৫), ২য় বিশ্বযুদ্ধ, উদারনীতিবাদ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, সমাজতন্ত্র, গনতন্ত্র।"[৩] এসব মতবাদ বিকাশ কল্যাণরাষ্ট্র তথা জনকল্যাণ কর্মসূচীর বিবর্তনের উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক। উপরোক্ত কর্মসূচীর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্বের ধনী-দরিদ্র রাষ্ট্র সমূহ জন সেবার্থে নির্দিষ্ট খাতে প্রকল্প গ্রহণ করে সফলতার মুখ দেখতে পায়। বাংলাদেশে নির্দিষ্ট

খাতে কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয় তৎকালীন পাকিস্তান শাসন আমলের প্রথমার্ধেই। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশও তার জন্মলগ্নের পর থেকেই বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। নিচে বাংলাদেশ সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী সমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচী : কৃষি ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। জনমনে একটি স্লোগান বিরাজমান তা হলো, 'কৃষক বাঁচলে, দেশ বাঁচবে।' এ কথাটি কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি নির্ভর বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়নের জন্য নিপাতনে সিদ্ধ। কৃষির উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সরকার কৃষি ক্ষেত্রে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তা নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো:

উন্নত জাতের বীজ সরবরাহ কর্মসূচী : কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ হিসেবে বিবেচিত হলো উন্নত বীজ। দেশের অশিক্ষিত কৃষক সমাজ সনাতন পদ্ধতিতে বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে চাষাবাদ করে পরিশ্রমের তুলনায় কাঙ্খিত ফসল ঘরে তুলতে পারে না। নিজেদের মেধা-প্রজ্ঞা দিয়ে উন্নত বীজ উৎপাদনের কৌশল সম্পর্কে তাদের ধারণা না থাকায়, সরকার কৃষি সংশ্লিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে উন্নত বীজ সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করেছেন। কর্মসূচীর আওতায় "২০১০-১১ অর্থ বছরে বাংলাদেশ কৃষি কর্পোরেশন এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে যথাক্রমে সরকার ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৫০ এবং ৮৪ হাজার ৮৩৮ মেট্রিকটন উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া বীজ সংরক্ষণের জন্য বীজ গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৪০ হাজার মেট্রিক টন থেকে ১ লক্ষ মেট্রিকটনে উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। একই অর্থ বছরে ১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে হাইব্রীড ধানের চাষ এবং ১০ লাখ হেক্টর লবণাক্ত জমিতে ৫০ শতাংশে লবণাক্ত প্রতিরোধক ব্রী-৪৭ ধান আবাদের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।"[৪]

সার সরবরাহ কর্মসূচী : ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির অন্যতম উপকরণ হলো সার। গ্রামের কৃষকরা আর্থিক দৈন্যতার কারণে জমিতে মান সম্মত সার প্রয়োগ করে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম নয়। এহেন অবস্থা বিবেচনায় এনে সরকার কৃষকদের মধ্যে সার সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। সরকার ২০১০-১১ অর্থ বছরে রাসায়নিক সারের মূল্য কৃষকের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রাখার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন। এছাড়া প্রাকৃতিক সারের ব্যবহার কৃষকদের মধ্যে জনপ্রিয় করে তোলার লক্ষ্যে সারা দেশে ৯৭ লক্ষ কৃষক পরিবারের মাঝে বসতভিটার চারদিকে জৈব, সবুজ সার ও জীবাষ্ম সারের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অপর একটি কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

কৃষি ভর্তুকি প্রদান কর্মসূচী : কৃষি পণ্যের উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করার জন্য সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরের বাজেটে সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমে ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখে তা কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকি প্রদান করেছেন। অবশ্য পরবর্তীতে এ ভর্তুকির পরিমান বেড়ে ৪ হাজার ৯৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়। ২০১০-১১ অর্থ বৎসরেও কৃষিখাতে ভর্তুকি বাবদ ৪ হাজার কোটি টাকার সুবিধা প্রদান করা হয়।

কৃষি উপকরণ কার্ড বিতরণ কর্মসূচী : কৃষিতে সরকারের অন্যতম সাফল্য হলো এ কর্মসূচীর আওতায় ১ কোটি ৮২ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ। কার্ডের মাধ্যমে ২০০৯-১০ অর্থ বৎসরে বোরো মৌসুমে সারাদেশে প্রায় ৯২ লক্ষ বোরো চাষীকে ডিজেল ক্রয়ে সহায়তা বাবদ ৭৫০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রাপ্রতার জন্য মাত্র ১০ টাকার বিনিময়ে কৃষক গণ ব্যাংকে একাউন্ট খুলতে সক্ষম হন। এ কার্ডের মাধ্যমে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে কৃষি উপকরণ সরাসরি কৃষকের হাতে পৌঁছনোর ব্যবস্থা করা হয়।

মৃত্তিকা গুণাগুণ পরীক্ষা কর্মসূচী : মৃত্তিকা জরিপের মাধ্যমে মাটির গুণাগুণ পরীক্ষা, ভূমি সম্পদ চিহ্নিত করণ এবং উৎপাদন সক্ষমতা অনুযায়ী সঠিক ভাবে ফসল উৎপাদনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের আওতায় কৃষকদের মাঝে ভূমিতে সার ব্যবহারের সুপারিশ সহায়িকা, পাহাড়ী মাটির ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লবণাক্ত মাটির ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রযুক্তি কৃষকদের কাছে প্রদান করা হয়েছে।

পানি সেচ ও নিষ্কাশন কর্মসূচী : দেশের দক্ষিনাঞ্চলে ভূ-উপরস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, হাওর এলাকার পানি নিষ্কাশন করে জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বাজেটে ৪২৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছিলেন। এসব কাজ করার জন্য ৩৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৬৬টি কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাজ এগিয়ে চলছে এবং ২০১১-১২ অর্থ বাজেটে এ খাতে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

কৃষি ঋণ বিতরণ কর্মসূচী : ২০০৯-১০ অর্থ বছরে সরকারী, বেসরকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে মোট ১১ হাজার ৫১২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়। যা গত অর্থ বছরের তুলনায় ১৬ শতাংশ বেশি ছিল। তাছাড়া ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ কর্মসূচীর মাধ্যমে ১২ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি গবেষণা কর্মসূচী : কৃষি গবেষণার মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও উন্নত উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য ২০০৯-১০ অর্থ বছরের বাজেটে ১৮৫ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়।

এ অর্থ উন্নত জাতের বিশেষ করে লবণাক্ত ও বন্যার পানি সহনশীল জাতের ধান উদ্ভাবনসহ কৃষি গবেষণা কার্যক্রমে ব্যয় করা হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে গঠিত কৃষি গবেষনা ফান্ড বর্তমানে চলমান রয়েছে। এ ফান্ডের আকার ৪১২ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। শস্য বহুমুখী করণের (Crop Diversification) মাধ্যমে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা (Productivity) বৃদ্ধির লক্ষ্যে এন্ডাওমেন্টে এ ফান্ডের বরাদ্দকৃত অর্থ সদ্ব্যবহারের জন্য গবেষণা প্রস্তাব আহবান করা হয়।

কৃষি বীমা কর্মসূচী : দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারী কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দূর্যোগে বিনষ্ট হওয়ার কারণে, তাদেরকে শস্য মূল্য সহায়তার জন্য সরকার এ কৃষি বীমা কর্মসূচী চালু করেছেন।

জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন কর্মসূচী : কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও এ খাতের সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য জাতীয় কৃষিনীতি, কৃষি সম্প্রসারণ নীতি, বীজনীতি, সমন্বিত সার বিতরণ নীতিমালা এবং সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। ১৯৯৯ সালের জাতীয় কৃষি নীতি যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করে 'জাতীয় কৃষি নীতি ২০১০' প্রণয়ণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

খাস ভূমি বন্দোবস্ত কর্মসূচী : ২০০৯ সালে বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ক্ষমতায় আরোহণের পর সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ২২ হাজার ২৬১টি ভূমি হীন পরিবারের মধ্যে ১০ হাজার ২২৭ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করেছেন। যা দারিদ্র্যতা নিরসনের পাশাপাশি কৃষিক্ষেত্রে মোট উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তাছাড়া ২০১০-১১ অর্থ বছরে সারা দেশে আরও ৩৪ হাজার ৫৩২ টি ভূমি হীন পরিবারের মধ্যে ৫ হাজার ৫৩৪ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়।

পচিঁশ বিঘা কৃষি জমির খাজনা মওকুফ কর্মসূচী : স্বাধীনতাত্তোর সরকার ক্ষমতায় এসে উপনিবেশিক শাসন আমলে গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবারগুলোকে করের বোঝা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য পঁচিশ বিঘা পর্যন্ত কৃষি ভূমির খাজনা মওকুফ করা হয়। ফলে দীর্ঘদিনের খাজনা পরিশোধের অভিশাপ থেকে এ দেশের দরিদ্র কৃষকরা মুক্তি লাভ করে।

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন: গ্রামীণ মৎস ও প্রাণী সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকারের গৃহীত কর্মসূচী সমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

প্রোটিনের চাহিদা পূরণ কর্মসূচী : দেশের মানুষের প্রোটিনের চাহিদাপূরণ অন্যদিকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনে সরকার এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন। সরকারের নির্বাচনী ইশ্তেহার অনুযায়ী 'জাল যার, জলা তার' নীতি বাক্যে বিশ্বাসী হয়ে সরকারী জলমহাল ব্যবস্থাপনা

নীতিমালা ২০০৯ প্রণয়ন করেছেন। এ কর্মসুচীর আওতায় দরিদ্র জেলে গোষ্ঠী কিছুটা হলেও সুফল ভোগ করতে পারছে। ২০১১-১২ অর্থ বছরে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ বিভাগে ৮৬১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল।

জাটকা নিধন প্রতিরোধ কর্মসূচী : বাংলাদেশের জাতীয় মাছ ইলিশের বিশ্বব্যাপী ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই এটি সংরক্ষণের জন্য জাটকা (পোনা) ইলিশ মাছ ধরা থেকে জেলেদের নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে সরকার কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন।

চিংড়ি উৎপাদন কর্মসূচী : চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য সরকার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ ছাড়া চিংড়ি মাছ উৎপাদনের ফলে পরিবেশ বিপর্যয়ের বিষয়টি সঠিকভাবে যাতে কাটিয়ে উঠা যায়, সে দিকটিও সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে।

খামারীদের সহায়তা প্রদান কর্মসূচী : সরকার মাংস ও দুধের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গ্রামীণ খামারীদের প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদানের জন্য এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন। প্রাণী সম্পদ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সিমেন উৎপাদন, প্রুভেণ ষাঁড় উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম এবং ভ্রুণ স্থানান্তর প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে গবাদি পশুর জেনেটিক বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন ও সংকর জাতের পশু সংখ্যা বৃদ্ধি এ কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত।

গবাদি পশুর টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধি প্রকল্প : সরকারের ২০১০-১১ অর্থ বছরে গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদনের লক্ষ্য মাত্রা ছিল ৪১ কোটি ৬৩ লক্ষ ডোজ। টিকা উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকীকরণ ও গবেষণা সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। যার ফলে, খামারীরা স্বল্প মূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য হ্যাচারী সহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন খামার গড়ে তোলতে সক্ষম হয়েছেন।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে যে সকল অবকাঠামো সমচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হলো, মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা), স্বাস্থ্য, যাতায়াত ও খাদ্য নিরাপত্তা অবকাঠামো। নিচে এ সব কর্মসূচী সমূহ ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো:

মানব সম্পদ উন্নয়ন (শিক্ষা)কর্মসূচী : সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ দেশের অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি। এ কারণে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং এ খাতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ৩৯ হাজার ৩৯০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখেন। অবশ্য পরবর্তীতে সরকার এ প্রস্তাবের (কর্মসূচীর) দাবীকৃত অর্থ পুরোটা বরাদ্দ না দিয়ে কাট-ছাট করে বরাদ্দ দিয়েছেন। নিচে মানবসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীসমূহ আলোচনা করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন কর্মসূচী : সরকার শিক্ষাকে দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়নের প্রধান কৌশল হিসেবে ২৪টি লক্ষ্য নিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনে শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ণ কর্মসূচী গ্রহণ করেন। সরকার দিন বদলের ইশ্‌তেহার রূপকল্প ২০২১ এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে শিক্ষানীতি প্রণয়ণের এ কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। ধাপে ধাপে এ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে সরকার অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার কার্যক্রম শুরু করেছেন।

শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ সাধন কর্মসূচী : গ্রামীণ মানব গোষ্ঠীর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে সরকারের কর্মসূচী সমূহ নিম্নরূপঃ

বিনা মূল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী : বর্তমান সরকার পূর্ববর্তী সরকারের বিনামুল্যে বই বিতরণ কর্মসূচী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে উন্নীত করে শিক্ষার গুণগত উৎকর্ষ সাধনে সক্ষম হয়েছেন। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ২০১০ সালে জানুয়ারী মাস থেকে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, এবতেদায়ী, দাখিল ও কারিগরি স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ শুরু করেন। যার উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রামের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ কর্মসূচী : সরকার গ্রামের মেয়েদের শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছেন। ফলশ্রুতিতে ছেলেদের সাথে মেয়েরা শিক্ষা ক্ষেত্রে সমান তালে এগিয়ে চলছেন। বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫৩:৪৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সরকারের প্রত্যাশা এক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হবে; যা গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প : সরকার গ্রামের হত দরিদ্র পরিবারের মেয়েদের শিক্ষিত করে পুরুষের পাশাপাশি নারীদেরকেও মানব সম্পদে রূপান্তরের লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতক পর্যায়ে মেয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প চালু করেছেন। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার অদ্যাবদি ৪৩ লক্ষ ৩৮ হাজার মেয়ে শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদান করে যাচ্ছেন।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২ কার্যক্রম : দেশের সর্বত্র সৃজনশীল প্রতিভা খুঁজে বের করার জন্য সরকার সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা-২০১২ গ্রহণ করেছেন। ২০১৩ সাল থেকে সরকারের এ সফল কর্মসূচীর বাস্তবায়ন এগিয়ে চলছে।

শিক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচী : শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষার বৈষম্য কমিয়ে আনতে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় নেই এমন ৩০৬টি উপজেলায় একটি উচ্চ বিদ্যালয়কে মডেল (Model)

উচ্চ বিদ্যালয়ে রূপান্তর করা হয়েছে এবং ১৬৪টি মডেল (Model) উচ্চ বিদ্যালয়ের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ সহ অন্যান্য কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব. স্থাপন কর্মসূচী : সরকার এ কর্মসূচীর অধীনে ৭টি বিভাগে উপজেলা পর্যায়ে মোট ১ হাজার ২০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব. স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচীর আওতায় উপজেলা পর্যায়ের উপরোল্লিখিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোতে কম্পিউটার ল্যাব. স্থাপনের কাজ শেষ হয়েছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ও কারিগরী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে সরকারের এ কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে।

মাদ্‌রাসা শিক্ষা সংস্কার কর্মসূচী : গ্রামে সরকারী আর্থিক অনুদানে বেসরকারী পর্যায়ে যে সকল মাদ্‌রাসা পরিচালিত হয়, সে সকল মাদ্‌রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা যুগোপযোগী ও আধুনিক শিক্ষার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার এ সংস্কার কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এক্ষেত্রে ম্‌রাসায় বিজ্ঞান, কম্পিউটার শিক্ষা সুবিধা সহ ইংরেজী শিক্ষার সম্প্রসারিত কার্যক্রম পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভুক্ত করে শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যাতে এ শিক্ষা লাভ করে মাদ্‌রাসার শিক্ষার্থীরাও মানব সম্পদে পরিণত হতে পারে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক শিক্ষা কর্মসূচী : সরকার গ্রামের ছেলেমেয়েদের ধর্মীয় শিক্ষায় উৎসাহিত করে ধর্মীয় ও নৈতিক জ্ঞান লাভের জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে এ শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেন। মসজিদে মুসলমান ও মন্দিরে হিন্দু ছেলেমেয়েরা এমন শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। সরকারী অর্থ সাহায্যে শিক্ষকগণ এসকল শিক্ষা প্রষ্ঠিানে পাঠ দান করছেন।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী : সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারীত্বে প্রাথমিক সহ ১৫+ থেকে ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অক্ষর জ্ঞান হীন মানুষকে স্বাক্ষরতাসহ সাধারণ ভাবে জীবন চলার জন্য এ কর্মসূচীটি হাতে নেয়া হয়। বর্তমান সরকার ও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থার অর্থানুকূল্যে সারা দেশে গ্রামে-গঞ্জে এ শিক্ষা কর্মসূচী চালু রয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী : ২০০৮ সালে সরকার প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রকল্পটি চালু করেন। প্রতিবন্ধী কারা তা বুঝতে সাধারণত দুর্বলতা (Impariment), অক্ষমতাকে (Handicap) সমার্থক শব্দ হিসেবে বুঝানো হয়েছে। এমন বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রী যাদের পরিবারের উপার্জন ক্ষমতা ৩৬,০০০/- টাকার উর্ধ্বে নয়, তাদেরকে এ উপবৃত্তির আওতাভুক্ত করা হয়েছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসেব অনুযায়ী মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ১০ ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধী। বর্তমানে বিশ্বে দেড় কোটিরও বেশি প্রতিবন্ধী মানুষ রয়েছে। বাংলাদেশেও নানাভাবে শিশুরা

প্রতিবন্ধীত্ব বরণ করছে। গ্রামে প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা শহরের তুলণায় অনেক বেশী। এসব শিশু নানা ভাবে অবহেলার শিকার এবং সমাজের বোঝা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। বাংলাদেশের সংবিধানে সকল নাগরিকের শিক্ষা লাভের সুযোগ একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত। "সংবিধানের ১৫,১৭,২০,২৯ অনুচ্ছেদে"[৫] অন্যান্য নাগরিকের ন্যায় প্রতিবন্ধী মানুষকেও সমান সুযোগও অধিকার প্রদানের কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই প্রতিবন্ধী শিশুদের বোঝা না ভেবে সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সরকার এ শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী : মানব সম্পদ বির্নিমাণে হাতে খড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ সকল বিদ্যালয়ই Morning Shows the day প্রবাদ বাক্যটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়েই একজন মানব শিশুর ভবিষ্যত মানব সম্পদ গড়া নির্ভর করে। তাই সরকার এ স্তরের শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে জাতীয়করণ করেছেন। নিচে গ্রামের প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণের জন্য সরকার যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা আলোচনা করা হলো।

প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের অর্থ প্রদান কর্মসূচী : গ্রামের দরিদ্র কৃষক পরিবার যারা দিন আনে দিন খায়, এমন পরিবারের সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য সরকার নগদ অর্থ প্রদান প্রকল্প চালু করেছেন। শিক্ষার সুযোগ থেকে ঝড়ে পড়া রোধ করতে সরকার প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের কর্মসূচীটি অব্যাহত রেখেছেন।

ফিডিং কর্মসূচী : গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহে ভর্তির হার শতভাগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে সরকার গ্রামের কিছু কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দুপুরে খাবার প্রদান কর্মসূচী চালু করেছেন। যাতে গরীব পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে শিক্ষার হার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে পারে।

প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচী (পিইডিপি-৩) : এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ৫৮ হাজার ৩৫৯ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (পিইডিপি-৩) বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছেন। সরকার এ কর্মসূচীর অধীনে ৪৭ হাজার ৬৮০জন নতুন প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কোটা ভিত্তিক নারী শিক্ষক নিয়োগ কর্মসূচী : নারী কর্মসংস্থান নিশ্চিত করে গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর লক্ষ্যে একজন নূন্যতম যোগ্যতা সম্পন্ন নারী শিক্ষক নিয়োগ দানের জন্য সরকার কোটা পদ্ধতি চালু করেছেন। এ কর্মসূচীতে মাত্র দ্বিতীয় বিভাগে এস.এস.সি/সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগ করে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সরকার সহায়ক ভূমিকা পালন করছেন।

প্রাথমিক সমাপনী পাবলিক পরীক্ষা কর্মসূচী : সরকার সারা দেশে অভিন্ন পদ্ধতিতে প্রাথমিক সমাপনী পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান শুরু করেছেন। এতে প্রাথমিক পর্যায়েই একজন শিশুর মেধা যাচাই শুরু হয়। যার লক্ষ্য শিক্ষার মান বৃদ্ধি করে মেধাবী জাতি সৃষ্টির পথ উন্মোচন করা।

নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা প্রকল্প : সরকার এ প্রকল্পের আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছর থেকে দেশের বিভিন্ন অংশ যেখানে প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই, সে সকল এলাকায় নতুন করে ১ হাজার ৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ৭৮০টি বিদ্যালয় নির্মাণের কাজ সমাপ্তির পথে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ১২টি পিটিআই প্রশিক্ষণকেন্দ্র স্থাপনের কর্মসূচী প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সার্বজনীন সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণ কর্মসূচী : দেশের গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্রই সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষাকে সরকারী সার্বজনীন শিক্ষার আওতাভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৩ সালের ১০ জানুয়ারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রাথমিক পর্যায়ের সকল সাধারণ শিক্ষাকে জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। বর্তমানে বাংলাদেশে ৭৮ হাজারের বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২ লক্ষ ৮০ হাজার শিক্ষক/শিক্ষিকা শিক্ষাদানে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং - ৬.১: নিচে সারণীতে সরকারের প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী দেয়া হলো:

প্রাথমকি ও গণশিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

• বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	৮২,২১৮
সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (জিপিএস)	:	৩৭,৬৭২
নন-রেজি: বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	৯৬৬
পরিক্ষণ বিদ্যালয়	:	৫৪
কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়	:	২,৯৮৭
এনজিও বিদ্যালয়	:	৪০৮ } ১৬,০৫৪
এবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	৬,৭২৬ }
উচ্চ মাদ্রাসা সংলগ্ন এবতেদায়ী মাদ্রাসা	:	৮,৯২০ }
উচ্চ বিদ্যালয় সংলগ্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	১,১৩৯
• শিক্ষকের সংখ্যা (সর্বমোট)	:	৩,৬৫,৯২৫
পুরুষ	:	২,১২,৯৭৪ জন (৫৮.২%)
মহিলা	:	১,৫২,৯৫১ জন (৪১.৮%)
• শিক্ষকের সংখ্যা (জিপিএস)	:	১,৮২,৮৯৯
পুরুষ	:	৮৬,৪৪৬ জন (৪৭.৩%)
মহিলা	:	৯৬,৪৫৩ জন (৫২.৭%)
• ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা	:	১,৬০,০১,৬০৫
ছাত্র	:	৭৯,১৯,৮৩৭ জন (৪৯.৫%)
ছাত্রী	:	৮০,৮১,৭৬৮ জন (৫০.৫%)
• শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত (জিপিএস, আরএনজিপিএস ও কমিউনিটি)	:	১:৫০
• স্থুল ভর্তির হার (জিইআর)	:	৯৭.৬%
• নীট ভর্তির হার (এনইআর)	:	৯০.৮%
• সাক্ষরতার হার	:	৫৩%
• বাৎসরিক সংযোগ ঘন্টা, ১ম-২য় শ্রেণি	:	৮৬৩ ঘন্টা
৩য়-৫ম শ্রেণি	:	১,৫৩৭ ঘন্টা
• স্কুল সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণের হার (২০০৮)	:	৯১.৭৭%
• রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক)-		
প্রকল্পের কেন্দ্র সংখ্যা	:	১৪,৮৯৪
রস্ক শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	৪,৯১,১৬৬ জন
• শিশু কল্যাণ ট্রাস্ট (এসকেটি) বিদ্যালয়ের সংখ্যা	:	৭৩
(এসকেটি) শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	১৬,০০১ জন
• উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কেন্দ্রের সংখ্যা	:	৭,৭০০
পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্প	:	১,০৫৪
হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প	:	৬,৬,৪৬
• উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষা-কেন্দ্রের শিক্ষার্থী সংখ্যা	:	২,২৯,৭৮০
পিএলসিইএইচডি-২ প্রকল্প	:	৬৩,৭৮০
হার্ড-টু-রীচ প্রকল্প	:	১,৬৬,০০০
• ২০০৯-২০১০ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ	:	২,৮২৮ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা।
প্রকল্প সংখ্যা	:	৯টি
• ২০০৯-২০১০ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন বরাদ্দ	:	৩,৭৫৫ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা।

উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ২০১২।

স্বাস্থ্য সেবা : গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবায় সরকার নিম্নরূপ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন:

টিকাদান কর্মসূচী : বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় টিকাদান কর্মসূচীটি গুরুত্ব সহকারে পরিচালনা করে আসছে। তবে এর আগে স্বাধীনতা পূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর কালে বিচ্ছিন্ন ভাবে কিছু কিছু রোগের টিকা দান কর্মসূচী অব্যাহত ছিল। বর্তমানে প্রতিটি ইউনিয়নকে ৩টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়। প্রতিটি ওয়ার্ডকে আবার ৮টি সাব ব্লকে ভাগ করা হয়। প্রতি ব্লকে স্বাস্থ্য কর্মীরা ৩ দিন করে মাসে মোট ২৪ দিন টিকা দান স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। টিকাদান কর্মসূচী জোরদার করায় ২০০৯ সালে ৫ বছরের নীচে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি লাখে ৩১৩ তে এবং ২০১১ সালে তা ৫৩ তে নেমে আসে। ফলশ্রুতিতে এ কর্মসূচীর সাফল্য হিসেবে এশিয়ায় শ্রীলংকার পরেই দ্বিতীয় স্থানে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী এ কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য ২০০৯ ও ২০১২ সালে ইউনিসেফের পুরস্কারে ভূষিত হন। উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তার মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এ কর্মসূচীটি পরিচালনা করে আসছেন।

যক্ষা-কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী : এক সময় জনসাধারণের মধ্যে একটি বদ্ধমূল ধারণা বিরাজমান ছিল, যার হয় যক্ষা তার নেই রক্ষা। গত শতাব্দীর শেষের দিকে বিশ্বে চমক সৃষ্টি করে এ রোগ নিরাময়ের ঔষধ আবিস্কার হয়। বাংলাদেশ সরকার কিছুটা দেরীতে হলেও ঐ শতাব্দীর শেষ দিকে বিনামূল্যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মাধ্যমে গ্রামীণ যক্ষারোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে এ কর্মসূচীর আওতায় সার্বজনীনভাবে ঔষধ বিতরণ শুরু করেন। তাছাড়া কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যেও বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করে সরকার গ্রামের জনগণের প্রতি সহায়তার হাত প্রসারিত করেছেন।

প্রজনন স্বাস্থ্য কর্মসূচী : সরকারের এ কর্মসূচীটি দু'টি ভাগে বিভক্ত যথা ১) নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচী ও ২) মাতৃসেবা কর্মসূচী। নিচে কর্মসূচীর কার্যক্রম আলোচনা করা হলো।

নিরাপদ মাতৃত্ব কর্মসূচী : আগে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশে মাতৃস্বাস্থ্য ও নবজাতকের মৃত্যু হার অনেক বেশি থাকলেও বর্তমানে মাতৃ মৃত্যুহার প্রতি লাখে ২৯০ জন ও নবজাতকের মৃত্যু হার প্রতি হাজারে ৩৭ জনে নেমে এসেছে। সহস্রাব্দের লক্ষ্য মাত্রা (এমডিজি) অনুযায়ী মাতৃ মৃত্যু হার ৪ ভাগের ৩ ভাগ কমিয়ে প্রতি লাখে ১৪৩ জনে এবং নবজাতকের মৃত্যু হার ৩ ভাগের ২ ভাগ কমিয়ে প্রতি হাজারে ২১ জনে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৫ সালের মধ্যে সরকার এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশে ১৯৯৮ সালে থেকে 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস' পালন শুরু হয়। এর প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করণে পুরুষের অংশগ্রহণ।' ২০০৯ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস পালন করি,সুস্থ

Dhaka University Institutional Repository

সবল জাতি গড়ি' এবং ২০১০ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল 'প্রতিটি গর্ভই ঝুকিপূর্ণ, তাই দক্ষ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করুন।' বর্তমানে সরকার মাতৃত্বসেবা নিশ্চিতকরণ ও সহস্রাব্দের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস ২৮শে মে উদযাপনের নিমিত্তে প্রজ্ঞাপন জারী করেন। বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১২ সালে মা ও শিশু স্বাস্থ্য সেবায় ইউনিসেফের পুরস্কারে ভূষিত হন।

গর্ভকালীন সময়ে শতকরা ১৫ ভাগ মহিলা গর্ভকালীন জটিলতার সম্মুখীন হয় যা মাতৃ মৃত্যুর জন্য বহুলাংশে দায়ী। মাতৃত্ব ও শিশুসেবা বিশেষ করে জরুরী প্রসূতিসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সেবা প্রদানে সকল স্তরে বিশেষ কর্মসূচী চালু করেছেন। যেমন: গ্রামীণ কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পর্যায়ে গর্ভকালীন সেবা নিশ্চিত করতে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

মাতৃ সেবা কর্মসূচী: এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের গরীব গর্ভবতী মায়েদের গর্ভকালীন জরুরী প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করার জন্য ৫৩টি উপজেলায় ভাউচার স্কীম চালু করা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান সমূহে নিয়মিত সহযোগিতা প্রদান ছাড়াও দেশের ৮টি উপজেলায় বাংলাদেশ সরকার, জাতিসংঘ ও বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় জরুরী প্রসূতি সেবা ও নবজাতক সেবা (এমএনএইচ এবং এমএনসিএইচ) নিশ্চিত করার জন্য বিশেষ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং আরও ৬টি জেলায় এ কর্মসূচী সম্প্রসারিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।তাছাড়া   বাড়ীতে নিরাপদ প্রসব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ভিত্তিক এসবিএ প্রশিক্ষণ কর্মসূচী চালু রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫,২০০ জন মাঠকর্মী প্রশিক্ষণ শেষে কমিউনিটিতে প্রসূতি সেবা প্রদান করছে এবং গর্ভকালীন জটিলতাসমূহ চিহ্নিত করে হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হচ্ছে।

পরিশেষে সরকার ও বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা কমিউনিটিতে মান সম্মত সেবা বৃদ্ধির জন্য সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা সেবা নিশ্চিত করা এবং জন সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনপ্রতিনিধি, পরিবারের সদস্য বৃন্দ এবং সমাজের সচেতন ব্যক্তি বর্গের অংশ গ্রহণ ও সহযোগিতার মাধ্যমেই এ কর্মসূচীর সফলতা অর্জন সম্ভব।

কমিউনিটি ক্লিনিক : ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ মানুষের দ্বার প্রান্তে চিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য প্রকল্পটি হাতে নিয়েছেন। প্রতি ৬ হাজার গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর চিকিৎসাসেবা প্রদানের জন্য একটি করে কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৩,৫০০টি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১০,৫০০টি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ হয়েছে। প্রতি চার মাস পর পর ক্লিনিকগুলোতে সরকারী খরচে পরিমাণমত ঔষধ বিতরণ করা হয়। প্রতিদিন ৭০-৮০ জন

Dhaka University Institutional Repository

রোগী একজন চিকিৎসা সেবকের মাধ্যমে চিকিৎসা লাভের সুযোগ পান। এখানে যে সকল বিষয় স্বাস্থ্য সেবার অগ্রাধিকার দেয়া হয় তা হলো, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সংক্রান্ত পরামর্শ ও উপকরণ প্রাপ্তি এবং টিকাদান কর্মসূচী। একটি কমিটির সহযোগিতায় ক্লিনিকটি পরিচালিত হয়। কমিটিতে আগে ০৯-১৩ জন সদস্য থাকলেও বর্তমানে এটি সম্প্রসারণ করে ১৭ সদস্যে উন্নীত করা হয়। কমিটির একজন সভাপতি ও বাকীরা বিভিন্ন পদে থেকে দায়িত্ব পালন করছেন। সাধারণত আগে জমিদাতা সভাপতির দায়িত্ব পালন করতেন, এখন সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত ওয়ার্ড মেম্বার বা সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার এ দায়িত্ব পালন করছেন। প্রথম প্রকল্পটি হাতে নেয়ার পর সরকার পরিবর্তনের ফলে পরবর্তী সরকার এ কর্মসূচীটি একেবারে বন্ধ করে দেন। পুনরায় সরকার পরিবর্তনের ফলে পূর্বের সরকার আবার ক্ষমতায় আসলে এ কর্মসূচীটি প্রাণ ফিরে পায় এবং বর্তমানে বাকী ক্লিনিক গুলোর নির্মাণের কাজ শুরু করায় সেবাদান অব্যাহত রয়েছে। সরকারের পরিকল্পনায় বর্তমানে সরকারী হাসপাতালগুলোর মত একই মর্যাদায় কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে সেবা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

জাতীয় পুষ্টি কার্যক্রম: এ কার্যক্রমের আওতায় গ্রামের মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি সেবা প্রদান করার নিমিত্তে প্রায় ৪৬ হাজার কর্মকর্তা/ কর্মচারী সার্বক্ষণিক জনগণকে স্বাস্থ্য রক্ষা এবং সুস্থ থাকার জন্য পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করে তুলছেন। সুস্থ মানুষ মানেই সুস্থ জাতি। আর সুস্থ জাতি মানেই উন্নত দেশ। এ লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে জণগনের সংস্পর্শে এসে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কাজ করে যাচ্ছেন। এ কর্মসূচীর আরও একটি আশাবাদী দিক হলো, গ্রামের যুবক যুবতীদের কর্মসংস্থানের পথ সৃষ্টি করা। যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের আওতায় প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে লোকের কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে।

ইন্টারনেট হেল্‌থ কর্মসূচী : সরকার এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের মানুষের স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদানের জন্য ই-হেল্‌থ কর্মসূচী চালু করেছেন। এতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জেলা শহরের হাসপাতাল ও উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার জন্য সরকার কর্মসূচীটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাভূক্ত করেছেন। বর্তমানে ৪৮২টি উপজেলা হাসপাতালে জনগণের স্বাস্থ্য সেবা পাওয়ার সুবিধা চলমান রয়েছে।

নন্‌-কমিউনিকেবল ডিজিজ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম (Non–Communicable Diseases Controle Programme-NCDCP) : বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ এলাকার জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে Non–Communicable রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। নিচে এ ধরণের কর্মসূচী সমূহ উল্লেখ করা হলো :

আর্সেনিক নিরাময় কর্মসূচী : ১৯৯৩ সালে চাঁপাই নবাবগঞ্জে নলকূপের পানিতে গ্রহণ যোগ্যের চেয়ে অধিক মাত্রায় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৯৯৪ সালে জেলার ৮জন আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করা হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশের ৬২টি জেলায় ৩০% নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের দূষণ পাওয়া যায়। বিভিন্ন জেলায় এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পেতে থাকলে, সরকার রোগটিকে গুরুতর স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এ কর্মসূচীর আওতায়, "স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ২০১১ সালের জুন পর্যন্ত ৫৬,৭৫৮ জন আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্ত করেছিলেন।"[৬] সাধারণত বাংলাদেশের গ্রামের ৯৭% মানুষ নলকূপের পানি পান করে থাকেন। দেশের স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মীদের রোগটির বিস্তৃতি, প্যাথজেনিসিস ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক কোন ধারণা ছিল না। ফলশ্রুতিতে রোগীর সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়তেই থাকে।

অবস্থাদৃষ্টে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রোগ নির্ণয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও দক্ষতার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রোগটি স্থায়ী ভাবে নিরাময়ের জন্য কর্মসূচীটি গ্রহণ করে। এ রোগের উপসর্গ গুলো হলো শরীরিক দুর্বলতা, অবশ ভাব, দীর্ঘ স্থায়ী কাশি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। তাছাড়া শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষত বুকে ও পিঠে অসংখ্য ছোট ছোট কালচে বাদামী বা তিলের ন্যায় কালো দাগ সহ পায়ের তালুতে একই সাথে অসংখ্য মিহি দানা বা চামড়া শক্ত ও খস্‌খসে হয়ে যায়। এ থেকে জটিল রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

নিপা ভাইরাস প্রতিরোধ কর্মসূচী : বাংলাদেশের খেজুরের রস ও রস থেকে তৈরীকৃত গুড় একটি সুস্বাদু খাবার এবং সারাদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাদুরের লালা খেজুরের রসে সংক্রমিত হয়ে নিপা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ায় গ্রাম গঞ্জ সহ দেশের সর্বত্র মানুষের মাঝে ব্যাপক ভাকে আতংকের সৃষ্টি হয়েছে। এ ভাইরাসের আতংক রোধ এবং নিরাময় রোগ প্রতিরোধ করার জন্য সরকার টিকা দান কর্মসূচী গ্রহণ করে জনগণের মধ্যে স্বস্তি ফিরিয়ে এনেছেন। নিপা নামক স্থানে এ রোগের ভাইরাসের প্রথম সন্ধান পাওয়া যায় বলে এর নামকরণ নিপা ভাইরাস হয়েছে। উল্লেখ্য এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত বাংলাদেশে বেশ কয়েকজন মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে।

বার্ড-ফ্লু প্রতিরোধ কর্মসূচী : বিগত কয়েক বছর যাবত বাংলাদেশে বাড-ফ্লু এর সন্ধান পাওয়া গেলেও বিশ্বে ভাইরাসটি আবিস্কার হয় ১৯১৯ সালে। তখন ৫ কোটি গৃহপালিত হাঁস মুরগি এ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। ১৯৩৯ সালে মারা যায় ৭০ লক্ষ গৃহপালিত হাঁস মুরগী। বর্তমানে এ ভাইরাসের আক্রান্ত বাংলাদেশে প্রায়ই শত শত পোল্ট্রী ফার্মে হাজার হাজার মুরগী মারা যাচ্ছে। এতে সাধারণ খামার মালিকদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। সরকার এ ভয়াবহ অবস্থা রোধ করার

Dhaka University Institutional Repository

জন্য এবং জনগণকে এ সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ও পোল্ট্রি মুরগীর মৃত্যু হ্রাসকল্পে টিকাদান কর্মসূচী চালু করেছেন।

যাতায়াত : গ্রামীণ অবকাঠামোগুলোর মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ হলো যাতায়াত। গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান উৎসগুলো হলো সড়ক পথ, রেলপথ এবং পানি পথ। নিচে পর্যায়ক্রমে যাতায়াত ব্যবস্থার বিভিন্ন উৎসগুলো আলোচনা করা হলো :

সড়ক পথ : সড়ক পথকে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের সহজ মাধ্যম হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ ব্যাপারে সরকারের গৃহীত কর্মসূচী গুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

সড়ক পথ উন্নয়ন কর্মসূচী : শহরের সাথে সংযোগ রক্ষা, মালামাল বহন ও কৃষিক্ষেত্রে যাতায়াতে গ্রামের মানুষ কাঁচা-পাকা সড়কগুলো ব্যবহার করে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩ হাজার ৬২০ কিলোমিটার সড়ক পথ উন্নয়নের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। এছাড়াও ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১৮ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সড়কের পাশে বনায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন।

সড়ক পথ মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী : গ্রামীণ সড়ক পথ গুলো মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণে কর্মসূচীর আওতায় সরকার ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯ হাজার ২৩০ কিলোমিটার সড়ক মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ করে গ্রামের মানুষের যাতায়াতকে সহজ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাছাড়া ১৬ হাজার ৫০০ কিলোমিটার সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।

নতুন সড়ক নির্মাণ কর্মসূচী : সরকার গ্রামে জনসংখ্যার ঘনত্বের কথা বিবেচনা করে বাড়তি সড়ক নির্মাণের জন্য নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগ ৩ হাজার ৯০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ করে গ্রামীণ জনগণের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করতে সফলকাম হয়েছেন।

ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ কর্মসূচী : নদী মাতৃক বাংলাদেশের যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় হলো খাল, বিল, নদী সহ বিভিন্ন জলাশয় অতিক্রম করা। সরকার এ সমস্যাকে চিহ্নিত করে গ্রামের মানুষের যাতায়াতের লক্ষ্যে বিভিন্ন জলাশয়ের উপর ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৮৪ হাজার ৫২ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট উন্নয়নের কাজ সম্পন্ন হয়। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আরও ১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৮৭ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে।

পাকা সড়ক সম্প্রসারণ ও পুন:সংস্কার কর্মসূচী : বর্তমান সরকার ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার কিছু দিনের মধ্যে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ পাকা সড়কের সম্প্রসারণ ও পুন:সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। একটি হলো ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম মহাসড়ক এবং প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ মহাসড়কের সম্প্রসারণ ও পুন:সংস্কার কর্মসূচী।

গ্রামীণ রাস্তায় ছোট ছোট ১২মি. দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ প্রকল্প : স্বাধীনতাত্তোর ১৯৭৫-৭৬ সালে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় ইউএসএআই ডি (USAID) এর পি-এল ৪৮০ টাইটেল-২ গ্রমীণ কাঁচা রাস্তা উন্নয়ন কাজ শুরু করে। প্রয়োজনীয় সেতু কালভার্ট না থাকায় অতি বৃষ্টিতে এসব রাস্তা ভেঙ্গে যাওয়ায় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জন না হওয়ায়, ১৯৮২ সালে সীমিত আকারে গ্রামীণ সড়কে কেয়ার বাংলাদেশ সরকারের তত্ত্বাবধানে ৪০ ফুট (অনুর্ধ ১২মিটার) দৈর্ঘ্য পর্যন্ত সেতু/কালভার্ট নির্মাণ কাজ শুরু করে। ১৯৯৩ সালে ইউএসএআইডি এর কর্মসূচী শেষ হলে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৪ সাল থেকে জুন ২০০৯ সাল পর্যন্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩টি প্রকল্প গ্রহণ করেন। ৫৯.১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রথম প্রকল্পে ১৯৯৪-৯৯ মেয়াদে ২৭৪টি উপজেলায় ১২৫৪টি সেতু/কালভার্ট (৭৫০মিটার), ২৩৯.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় ১৯৯৯-২০০৬ মেয়াদে ৪৪৫টি উপজেলায় ২১৩৮টি সেতু/কালভার্ট (১৮২৪৫ মিটার) এবং ১৮৭.৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে তৃতীয় প্রকল্পের আওতায় ২০০৫-২০০৯ মেয়াদে ৪৬৬টি উপজেলায় ১৫৬ টি সেতু/কালভার্ট নির্মাণের কাজ শেষ করে। মোট ১১,৬১৭ মিটার সেতু, কালর্ভাট নির্মাণের ফলে খাল, বিল, জলাশয়ে জমে থাকা পানি প্রবাহের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং অতিবৃষ্টিতে জমা পানি দ্রুত নির্দিষ্ট স্থানে প্রবাহিত হয়ে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়। এতে প্রকল্পের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ায় ২০০৯ সালের জুন হতে ২০১২ সালের জুন মেয়াদে আরও ৩১৪.৬৭৫০ কোটি টাকায় ১৬১৫টি সেতু কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। "তাছাড়া ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পটিতে সমতল ভূমিতে ৪৫৯টি উপজেলা অন্তর্ভূক্ত এবং এর মোট প্রকল্প ব্যয় ৬৯৫ কোটি টাকা, প্রকল্পটি ১জুলাই/ ২০১২তে শুরু হয়ে ৩০ জুন /২০১৫তে শেষ হবে।"[৭]

রেলপথ উন্নয়ন কমসূচী : গ্রামের মানুষের সবচেয়ে সহজ লভ্য যাতায়াতের মাধ্যম হলো রেলপথ। এ পথে মানুষ প্রয়োজনে শহর-বন্দরে যাতায়াতসহ কৃষি পণ্য সামগ্রী এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমদানী- রপ্তানীতে করে থাকে। "সরকার ২০১০-১১ অর্থ বছরে রেলপথ উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ৩ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছেন। যার উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ৩ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৮৬ কিলোমিটার রেলপথের সংস্কার সাধন।"[৮] রেল পথ উন্নয়নের জন্য দু'টি কর্মসূচীকে সরকার গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন তা হলো নিম্নরূপ:

অগ্রাধিকার ভিত্তিক যাতায়াত কর্মসূচী : বৃটিশ শাসন আমলে চালু হওয়া ঐতিহ্যবাহী এ যাতায়াত ব্যবস্থা নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে করুণ অবস্থায় পরিণত হয়েছে। রেলওয়ে

যাতায়াত ব্যবস্থার প্রাণ সঞ্চারের জন্য সরকার যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে রেলপথকে আলাদা করে অন্য মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। রেলওয়ের মাষ্টার প্ল্যান এর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৯২৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩১টি প্রকল্পের কার্যক্রম সরকারের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে।

রেল সেবা সম্প্রসারণ কর্মসূচী : সরকার এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ৩০টি নতুন ট্রেন চালু এবং ১৬টি পুন:রেল যাতায়াত সার্ভিস চালু করেছেন। পাশাপাশি নতুন রেল লাইন নির্মাণও পুন:নির্মাণে প্রকল্প গ্রহণ করেছেন।

পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচী : বাংলাদেশের কৃষি ফসল উৎপাদন এমনকি প্রাণী বেঁচে থাকার প্রধান উপকরণ হলো পানি। যার অপর নাম জীবন। তাই পানি সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছেন। নিচে সরকারের গৃহীত পানিসম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীগুলো আলোচনা করা হলো।

পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহার কর্মসূচী : কৃষি নির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে পানিসম্পদ সংরক্ষণ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা অপরিহার্য। বর্তমান সরকার নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী পানি সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নদী খনন, পানি ধারণ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, লবণাক্ততা রোধে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন।

গড়াই নদী পুনরুদ্ধার ও খনন কাজ কর্মসূচী : দেশের কুষ্টিয়া অঞ্চলের কৃষকদের কৃষি কাজে প্রয়োজনীয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে সরকার কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে দ্রুততম সময়ে ৯৪২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৪ বছর মেয়াদী গড়াই নদী পুনরুদ্ধার ও খনন কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে।

বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কর্মসূচী : নদী ভাঙ্গনের হাত থেকে দেশের ভূ-খন্ড রক্ষা, ছোট বড় শহর, ঐতিহাসিক স্থাপনা এবং কৃষি ভূমি রক্ষার জন্য ২০১০-১১ অর্থ বছরে ২৭০ কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, ২ হাজার ৫২০ কিলোমিটার মেরামত, ১ হাজার ৬০০টি বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ ও মেরামত, ৪০ কিলোমিটার নতুন নদীর তীর সংরক্ষণ এবং ৭৫ কিলোমিটার বাঁধ মেরামত কাজের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকায় বেড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ১৮ হাজার হেক্টর ভূমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রায় ১১ হাজার ৫৫ হেক্টর জমিতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ১৬ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে দেশের ১৫ হাজার হেক্টর এলাকায় সরকার সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা

Dhaka University Institutional Repository

করছেন। সেচের জন্য ২৫ হাজার কিলোমিটার খাল খনন, ৩৭০মিটার পুন:খনন, ২০টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ৭০টি অবকাঠামো পুন:নির্মাণ ও ৩টি রাবার ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছে।

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে পানি উন্নয়ন পরিকল্পনা : বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের ১৯টি জেলা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যার শিকার। এ প্রেক্ষিতে উপকূলীয় অঞ্চলে সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে লবণাক্ততার ঝুঁকিপূর্ণ বর্তমান ২৬.৩৭ লক্ষ হেক্টর এলাকার মধ্যে প্রায় ১২ লক্ষ ৪০ হাজার হেক্টর জমি রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এভাবে প্রতিবছর অতিরিক্ত ২০ হাজার হেক্টর এলাকাকে লবণাক্ততা মুক্ত করার ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

পাহাড়ী ঢল ও ঢেউ রক্ষা কর্মসূচী : দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকার জনগণ অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় দারিদ্র্য পীড়িত। আগাম পাহাড়ী ঢলে এসব এলাকার ফসল প্রায়ই বিনষ্ট হয়। ঢল ও ঢেউয়ের আঘাত থেকে ফসল এবং ভূমি রক্ষার জন্য জলাভূমির অতীত এবং বর্তমান অবস্থা মূল্যায়ন করে লাগসই ও টেকসই প্রয়োগিক ব্যবস্থাপনার সমন্বিত কর্মসূচী সরকার হাতে নিয়েছেন।

সমন্বিত নদী ড্রেজিং কর্মসূচী : নদী মাতৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াতের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো নৌ-পথ। দেশে এমনও গ্রাম রয়েছে যেখানে সড়ক পথে যাতায়াতের কোন সুবিধা নেই। কিন্তু প্রয়োজনীয় ড্রেজিং এর অভাবে ঐ সকল এলাকা সহ দেশের নদী, নালা, খাল এবং অনুরূপ কোন জলাশয় নাব্যতা হারিয়ে বর্তমানে ভরাট হয়ে মরুভূমির রূপ নিতে যাচ্ছে। সরকার এ দিকটি লক্ষ্য রেখে সমন্বিত নদী ড্রেজিং কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। এ কর্মসূচীর আওতায় দেশর বিভিন্ন সমুদ্র বন্দর সহ অভ্যন্তরীণ নদী গুলোর ড্রেজিং কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

অন্যান্য অবকাঠামো: গ্রামোন্নয়নে অন্যান্য অবকাঠামো গুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

স্যানিটেশন উন্নয়ন কর্মসূচী : সবার জন্য স্যানিটেশন সরকারের একটি অগ্রাধিকার ভিত্তক কর্মসূচী। স্যানিটেশনে গ্রামের সকল মানুষের স্বাস্থ্য ও জীবনযাত্রার মানের সঙ্গে স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিষয়টি ওৎপ্রোত ভাবে জড়িত। “সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫ লক্ষ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে ১ লক্ষ ৯ হাজার সেট স্যানিটারি ল্যাট্রিন উৎপাদন করে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে স্থাপন করেছেন।”[৯] যা হত দরিদ্র গ্রামের মানুষকে স্যানিটেশনে অভ্যস্ত হয়ে নানা প্রকার রোগ বালাইয়ের হাত থেকে রক্ষা করছে।

নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ প্রকল্প : বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছিলেন। এ যাবত সরকার গ্রামাঞ্চলে ৪১ হাজার ৮৫০টি নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির উৎস নির্মাণ করেছেন।

জন্ম নিবন্ধীকরণ কর্মসূচী : সরকার এ কর্মসূচীর আওতায় ২০১০ সালের মধ্যে জন্ম নিবন্ধীকরণের লক্ষ্য মাত্রা শত ভাগে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন। ১৬টি নাগরিক সুবিধা পেতে জন্ম নিবন্ধীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গ্রামীণ জনবসতি স্থাপন কর্মসূচী : জনসংখ্যানুপাতে বাংলাদেশে কৃষি জমির স্বল্পতা এবং একই সঙ্গে উৎপাদন ক্ষমতা বিবেচনা করে সরকার জমি ব্যবহারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনগণকে সচেতন করার লক্ষ্যে এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেন। গ্রামীণ এলাকায় নানা স্থাপনা জমির অপচয় সাধন করে। সেজন্য প্রয়োজন জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পরিকল্পিত জনবসতি গড়ে তোলা। তাছাড়া গ্রামীণ এলাকায় বিভিন্ন সেবা সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করে এরই চারপাশে জনবসতি গড়ে তোলার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ কর্মসূচী : স্থানীয় সরকারের সর্ব নিম্ন স্তর হলো ইউনিয়ন পরিষদ। যে পরিষদের কাছে সার্বক্ষণিক গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন, নিরীহ জনগণকে দ্বারস্থ হতে হয়। অথচ বাংলাদেশের ইউনিয়ন পরিষদ গুলোর ভৌত অবকাঠামো মধ্যে সেই মান্ধাতার আমলের ১টি টিনের ঘর এখনও লক্ষ্য করা যায়। তাই সরকার গ্রামীণ জনগণের এ প্রতিষ্ঠানটির ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে নজর দেন। "কর্মসূচীর আওতায় ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৭২২টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হয়।"[১০]

গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন কর্মসূচী : গ্রামের মানুষের ব্যবসা বাণিজ্য ও কেনা বেচার প্রধান মাধ্যম হলো গ্রামীণ হাট-বাজার। প্রাচীন কাল থেকে চলে আসা এসব হাট বাজারের কোন সংস্কার না হওয়ায় ঝড়, বৃষ্টি, রোদের মধ্যে মানুষকে কষ্ট করে হাট-বাজারের কাজ সম্পন্ন করতে হয়। "সরকার গ্রামের মানুষের কষ্ট লাঘবে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে দেশের বিভিন্ন গ্রামীণ জনপদে ৯৭৯টি হাট-বাজার উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছেন।"[১১]

উপকূলীয় এলাকায় ভূমিহীন পুনর্বাসন : উপকূলীয় এলাকায় জেগে উঠা চর অবৈধ দখলমুক্ত করে সরকারী ব্যবস্থাপনায় ১১ হাজার ২৯৮টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে ১৫ হাজার ৩০৯ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। আরও ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমিতে ৯ হাজার ৫৮৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করার ব্যবস্থা হাতে নেয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি উপকূলীয় আড়ি বাঁধ নির্মাণ করে ২০ হাজার হেক্টর জমি পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এখানে ১৬ হাজার পরিবারকে পুনর্বাসন করা সম্ভব হবে।

বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে ৯৮টি পয়েন্টে ৩ দিনের আগাম বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের ব্যবস্থা রয়েছে। এটিকে ৭ দিনে উন্নীত করার পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের অভিযোজন (Climate Change Adaptation) এবং দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমনের (Disaster Risk reduction) লক্ষ্যে উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততার পূর্বাভাস ও বেসিন উন্নয়নের কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন।

আপদ কালীন আশ্রয় কেন্দ্র কর্মসূচী : প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন : ঘুর্ণিঝড়, সুনামী, সিডর, আইলা, লাইলার মত প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে অসহায় দরিদ্র মানুষ যাদের মজবুত ঘরবাড়ী নেই তাদের দ্রুত গতিতে সরকারী আশ্রয় কেন্দ্রে পুনর্বাসন এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত। এ সকল আশ্রয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পর থেকে উপকূলীয় এলাকায় ব্যাপক জনগোষ্ঠী দুর্যোগের ভয়াবহ ছোবল থেকে রক্ষা পাচ্ছেন এবং জান মালের নিরাপত্তা অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে সরকার অতিরিক্ত ২০টি ঘুর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করে উপকূলীয় এলাকার জনগণকে আশার আলো দেখিয়েছেন।

পল্লী বিদ্যুতায়ন কর্মসূচী : পল্লী অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রামীণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটানোর জন্য সরকার কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎতের চাহিদা ও মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতার সাথে তাল মিলিয়ে ২০০৯ সালে এক বছরে বিদ্যুতায়িত গ্রামের পরিমান ২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭ শতাংশে, মোট সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৮১ লক্ষে এবং বিতরণ লাইনের পরিমান ৩ হাজার ৫০০ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২ লক্ষ ২১ হাজার ৮৩৩ কিলোমিটারে পৌঁছেছে। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড সারা দেশে প্রায় ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামের মানুষের সেবাদানের জন্য সরকার ব্যাপক ভাবে প্রস্তুতি গ্রহণ করছেন; যা এ কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।

খাদ্য অবকাঠামো কর্মসূচী : খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ ও National Food Policy Plan of Action বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেছেন। নিচে এ সংক্রান্ত কর্মসূচী গুলো আলোচনা করা হলো:

খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী : খাদ্য শস্যের মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে রেখে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা সরকারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকার গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে ১২ লক্ষ ফেয়ার প্রাইস কার্ড

বিতরণ করেছেন। এছাড়াও সরকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেছে, তা নিম্নরূপ:

সাময়িক বেকারত্ব মোচন তহবিল : প্রান্তিক দরিদ্রদের কর্মসংস্থানের জন্য ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে বরাদ্দ রাখা হয় ৫০০ মিলিয়ন টাকা। বাস্তবায়নকারী সংস্থা এলজিইডি, পানিসম্পদ ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং অর্থের উৎস হচ্ছে বাংলাদেশ সরকার।

আপদকালীন মজুদ কর্মসূচী : ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সরকারের খাদ্য গুদাম গুলোতে প্রায় ১৪ লক্ষ ৭৬ হাজার ১১৫ মেট্রিকটন খাদ্যশস্য মজুদ করা হয়েছিল। বর্তমান সময় পর্যন্ত খাদ্য গুদাম গুলোতে সরকার আরোও ২ লক্ষ ৪০ হাজার মেট্রিকটন খাদ্য শস্য সংরক্ষণের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এ মজুদ আপদকালীন সময়ের জন্য সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। তাছাড়াও সরকার আপদকালীন সময়ে খোলা বাজারে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে ন্যায্যমূল্যে চাল বিক্রি করে খাদ্য শস্যের চাহিদা মিটিয়ে থাকেন।

ভিজিএফ কর্মসূচী (Vulnerable Group Feeding Programme-VGFP) : বিভিন্ন দুর্যোগের শিকার গ্রামের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে খাদ্য সাহায্যের জন্য সরকারী তহবিল থেকে এ সহযোগিতা প্রদান করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে সরকার এ খাতে বরাদ্দ রাখেন ০.১৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন খাদ্য শস্য এবং ২৪৯০ মিলিয়ন টাকা। প্রতিবছর উপকারভোগী লোকের সংখ্যা ছিল ২,৪০,০০০ জন।

জি-আর কর্মসূচী (Gratutious Relief Programme-GRP) : এ কর্মসূচীর আওতায় সরকার ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে ০.০৪৬ মেট্রিকটন খাদ্য শস্য এবং ১০৬০ মিলিয়ন টাকা বরাদ্দ রেখেছিলেন।

ভিজিডি কর্মসূচী (Vulnerable Group Development Programme-VGDP) : সরকারী ও বেসরকারী অংশীদারীত্বে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে খাদ্য নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ, ঋণ দান ও সঞ্চয় ছাড়াও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ও পুষ্টি সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ৫ লক্ষ দরিদ্র উপকারভোগী মহিলাকে এ কর্মসূচীর আওতায় এনে সহায়তা করা হয়। এর জন্য প্রত্যেক মহিলাকে প্রতিমাসে ৩০ কেজি গম প্রদান করা হয়।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টি-আর খাদ্যশস্য/নগদটাকা) কর্মসূচী (Rural Infrastructure Maintainance Programme-RIMP) : এ কর্মসূচীটি সাধারণত গ্রামীণ হত দরিদ্র মানুষকে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে শর্ত উল্লেখ্য, খাদ্য শস্য/নগদ অর্থ খয়রাতি হিসেবে বিতরণ না করে, জনহিতকর কাজের বিনিময়ে দরিদ্র

শ্রমিকদের মাঝে বিতরণ করা হয়ে থাকে। শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মত বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার এ কর্মসূচীর আওতায় রয়েছে।

"বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ, জনকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠান মেরামত/উন্নয়ন, স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ সহ জনস্বাস্থ্য এবং পরিবেশ উন্নয়নকল্পে জনহিতকর কার্য সম্পাদন, গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার্থে বাঁশ ও কাঠের সাঁকো নির্মাণ, মজা পুকুর সংস্কার, বর্ষণের ফলে রাস্তার মাটি সরে বা ধসে যাওয়া রোধে পাকা দেয়াল নির্মাণ, পাবলিক/প্রাইভেট/এনজিওদের মাধ্যমে অংশীদারীত্বমূলক জনকল্যাণকর প্রকল্প গ্রহণ, জলোচ্ছ্বাস/বন্যা/ঘুর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ, ব্রীজ-কালভার্ট মেরামত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ, সরকারী জায়গা সংরক্ষণে পাকা পিলার নির্মাণ, জলাশয়ের পাড় বরাবর খাঁচা স্থাপন ও বৃক্ষ রোপন সহ অনুরূপ বহুবিধ কার্য সম্পাদনে সরকার কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন।"[১২]

গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা-খাদ্যশস্য/নগদ টাকা) কর্মসূচী Rural Infrastructure Repair Programme-RIRP) : গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের দুর্যোগ ঝুকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত অভিযোজনে সামাজিক ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করণের সহায়তার জন্য গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দরিদ্র জনগনের আয় বৃদ্ধি, দেশের সর্বত্র খাদ্য সরবরাহের ভারসাম্য আনয়ন এবং দারিদ্র্যতা বিমোচনে ইতিবাচক প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন।

কর্মসূচীর আওতায় যে সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয় তা হলো, পুকুর/খালখনন/পুন:খনন, রাস্তানির্মাণ/পুন:নির্মাণ, বাঁধ নির্মাণ/পুন:নির্মাণ, জলাশয়ের জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য নালা সেচ নালা খনন/পুন: খনন, বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাট, বর্ষণের ফলে রাস্তার মাটি ধুয়ে/সরে যাওয়া বা ভবিষ্যতে যাতে না যেতে পারে এমন রাস্তার পাশে প্রয়োজন মত পাকা দেয়াল নির্মাণ, ইটের রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ, সরকারী সম্পদ রক্ষার্থে পাড় বরাবর সীমানার খুঁটি স্থাপন, জলাশয়ের কিনার রক্ষার্থে পাড় বরাবর লোহার/তারের খাঁচা স্থাপন সহ বৃক্ষ রোপন প্রভৃতি। "প্রতি হাজার ঘনমিটার কাজের বিনিময়ে শ্রমিকদের (পুরুষ/মহিলা) মজুরী বাবদ ৮ কেজি খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এ জন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয় ০.৩৯৩ মিলিনয় মেট্রিকটন খাদ্য শস্য এবং ৩৭৩৯ মিলিয়ন টাকা এবং উপকারভোগী লোকের সংখ্যা ১০ লক্ষ জন।"[১৩]

সরকারী ঋণদান কর্মসূচী : গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বহুমুখী উৎপাদন বৃদ্ধি করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার পুঁজি সরবরাহ করে থাকেন। সরকারের ব্যাংক ও অন্যান্য অর্থ লগ্নীকারী

প্রতিষ্ঠান সরকারী নির্দেশ মোতাবেক গ্রামের জনসাধারণের মাঝে ঋণ বিতরণে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। নিচে গৃহীত কর্মসূচী সমূহ আলোচনা করা হলো :

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি কর্মসূচী : কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য সরকারী ব্যাংক গুলো পুঁজি সরবরাহ করে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য এ কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছে। ধান, পাট, ইক্ষু, আলু, বেগুন, করলা, ঢেঁড়শসহ নানা প্রকার শস্য ও শাক সব্জি উৎপাদন এবং গৃহপালিত পশু পাখি পালন করে নানাবিধ পদ্ধতিতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সরকারের ঋণ দান কর্মসূচীর অন্যতম লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে একজন কৃষককে তার পণ্য উৎপাদিত পরিকল্পনার উপর ৫ হাজার থেকে শুরু করে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। অবশ্য এ ঋণ নেয়ার জন্য একজন কৃষককে ৫০ শতাংশ বা তদোর্ধ জমি থাকতে হবে। এক বছর বা বিশেষ বিবেচনায় ততোধিক সময়ে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সীমা নির্ধারিত থাকে। ঋণ গ্রহণের সময় জমি, নির্ভেজাল বৈধ কাগজপত্র ব্যাংকে বন্ধক রাখতে হয়। ঋণ পরিশোধ সাপেক্ষে কাগজপত্র ফেরত দেয়া হয়।

শিল্পজাত জিনিষ তৈরিতে ঋণ দান : গ্রামের দরিদ্র পরিবারের অনেকের তেমন কৃষি জমি না থাকায়, তারা ছোট খাট জিনিষ তৈরি করে তা বিক্রির মাধ্যমে পরিবারের লোক জনদের ভরণ পোষণ করে থাকে। অনেক সময় কেহ কেহ পুঁজির অভাবে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে পারেন না। এমন ব্যবসায়ীদের পুঁজি সরবরাহ করে তাকে স্বচ্ছল ভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য সরকার এ কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। এমন ব্যবসায়ীদের মধ্যে রয়েছে আসবাব পত্র তৈরী কারক কাঠ মিস্ত্রি, ইট, বালু, সিমেন্ট ও রড দিয়ে পাকা পিলার তৈরী কারক রাজমিস্ত্রি, চায়ের দোকানদার, রিক্‌শা-ভ্যান তৈরীকারক, কামার, কুমার, দর্জি ইত্যাদি পেশায় নিয়োজিত ব্যবসায়ী। যাদের বয়ষ ১৮-৪৫ বৎসর এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন কোন ব্যাংকের শর্ত মোতাবেক ৫ম শ্রেণি এবং নিট মাসিক আয় ১০ হাজার টাকা। এমন ব্যবসায়ীরা ১ বৎসরে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের শর্তে ১০ হাজার টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ পেয়ে থাকে।

চাকুরীজীবিদের ঋণ দান কর্মসূচী : কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের একজন সরকারী বা বেসরকারী চাকুরীজীবি যিনি কোন ব্যাংক থেকে মাসিক বেতন ভাতাদি উত্তোলন করেন, সে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট একাউন্ট থেকে মাসিক নির্দিষ্ট পরিমান কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকার নামা দিয়ে, ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। তবে ঋণ গ্রহণকালে ব্যাংক ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তির উপর একটি শর্তারোপ করে থাকে। শর্তটি হলো, কোন কারণে ঋণ গ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা তার মৃত্যু হলে তার সমতুল্য একজন চাকুরীজীবিকে সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে যার একাউন্ট নম্বর আছে, তাকে এমন নিশ্চয়তা

দিতে হবে যে, ঋণ গ্রহণকারী ব্যক্তি ঋণের টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে বা পরিশোধ না করলে তার সংশ্লিষ্ট একাউন্ট থেকে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবেন। কোন ব্যাংক এমন একজন চাকুরীজীবিকে ৫০ হাজার টাকা থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে ব্যাংক বিশেষে আলাদা নিয়ম পরিলক্ষিত হয়।

মৎস্য চাষে ঋণ দান কর্মসূচী : সরকার দেশে মৎস্য চাষের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখতে গ্রামের মানুষকে পুঁজি সরবরাহ করার জন্য কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। মৎস্য ঋণ গ্রহণ কালে একজন গ্রহীতাকে ৫০ শতাংশ থেকে তদোর্ধ পরিমান খননকৃত পুকুর থাকতে হবে। তবে পুকুর না থাকলেও নিজস্ব জমিতে পুকুর খনন করে মাছ চাষ প্রকল্পগ্রহণ করতে পারেন। তাছাড়া ঋণ গ্রহীতা বর্ষাকালে যে সকল ভূমি পানিতে তলিয়ে যায় এমন জলাশয় লিজ নিয়ে এবং লিজকৃত জমির বৈধ কাগজপত্র ব্যাংকে জমা রেখে ঋণ উত্তোলন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ভূমির পরিমাণ অনুযায়ী একজন ঋণ গ্রহীতা ৫০,০০০/- টাকা থেকে ১/২ কোটি টাকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার তফসিলী ব্যাংক থেকে ঋণ উত্তোলন করতে পারেন। তবে এমন ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাংক গুলোর মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোন ব্যাংকের কিস্তি পরিশোধের সময় ১ বছর আবার কোন ব্যাংক গ্রাহককে ৪ বছর পর্যন্ত কিস্তির মাধ্যমে ঋণের টাকা পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে।

গরু মোটা-তাজা করণ কর্মসূচী : সরকার এ কর্মসূচীর আওতায় একজন কৃষকের গরু পালনের মত প্রয়োজনীয় চারণভূমি থাকলে, তাকে গরু ক্রয় করে মোটা-তাজা করণের মাধ্যমে সাংসারিক আয় বৃদ্ধির জন্য ঋণসহায়তা প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহীতা একদিকে গরু মোটা-তাজা করণ করে আর্থিক ভাবে লাভবান হবেন অন্যদিকে গ্রামোন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারবেন। একজন কৃষককে ৭০ হাজার টাকা থেকে ৩ কোটি টাকা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট এলাকার সরকারী কোন তফসিলী ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে। ১ থেকে ৩ বৎসরের মধ্যে কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করার বিধান রয়েছে।

পোল্ট্রি উন্নয়ন কর্মসূচী : মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণে দেশী মোরগ-মুরগি যথেষ্ট পরিমান না থাকায় পোল্ট্রি মুরগি পালন করে দেশে মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণে এবং বেকারদের স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য সরকার পোল্ট্রি খামারিদের বিভিন্ন সরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। খামারের সংশ্লিষ্ট এলাকায় অবস্থিত ব্যাংক খামারের ধরণ বুঝে ৩০ হাজার টাকা থেকে ১ কোটি টাকা পর্যন্ত কিস্তিতে ঋণ পরিশোধের সুবিধা দিয়ে ১ বছর থেকে তদোর্ধ সময় পর্যন্ত শর্ত সাপেক্ষে ঋণ প্রদান করে থাকে।

অন্যান্য ঋণ : অন্যান্য খাতে সরকারী ব্যাংকের ঋণ প্রদানের কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে রেশম চাষ, হাঁস পালন, তাঁত শিল্প সহ বিভিন্ন প্রকার গ্রামোন্নয়ন মূলক খাত। এ কর্মসূচীতে ২০ হাজার টাকা থেকে তদোর্ধ পরিমাণ টাকা ব্যাংক বা সরকারের ঋণ দানকারী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঋণপ্রদান করে থাকে। ১ বৎসর থেকে তদোর্ধ সময়ের মধ্যে কিস্তির মাধ্যমে গ্রাহককে ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

আশ্রায়ন কর্মসূচী : ভূমিহীন অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ জীবন ধারণের সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৯ সালে প্রথম বারের মত এ মহতী কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন। সরকারী খাস জমিতে এসব আবাসন ব্যারাক (ছাউনি) গড়ে উঠেছে। একটি ব্যারাকে ১০টি পরিবার বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আশ্রায়নের লোকদের রুজি রোজগারের জন্য একটি পরিবারের দু'জন অথবা একজন সদস্যকে সর্বোচ্চ ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ দান পদ্ধতিটি পরিচালনা ও সমিতির রেজিষ্ট্রেশন প্রদান করেন সরকারের উপজেলা সমবায় অফিসার। রিকশা-ভ্যান, সেলাই মেশিন, হাঁস মুরগী পালন, মৎস চাষ, চা দোকান, মুদি দোকান, ফেরিওয়ালা, গ্রামীণ হাট বাজারে চলমান ছোট খাটো ব্যবসা সহ বিভিন্ন ভাবে আয় বর্ধন করে পরিবারের অন্ন সংস্থানের জন্য এ ঋণ প্রদান করা হয় । এদের জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে মাঝে মাঝে দীক্ষা দান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে সভাপতি এবং সহকারী কমিশনার ভূমিকে সম্পাদক করে উপজেলার অন্যান্য সরকারী অফিসের প্রধান কর্মকর্তা এবং আশ্রায়ন সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে সদস্য করে আশ্রায়ন সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাছাড়া নিজেদের আভ্যন্তরীণ বিষয়াদি দেখভালের জন্যও আশ্রায়নে বসবাসরত লোকদের মধ্যে থেকেও ৬, ৯ ও ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটিও গঠন করা হয়। "আশ্রায়নে মসজিদ, গোরস্থানের ব্যবস্থা এবং ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিক্ষা দানের জন্য বিদ্যালয়ে পাঠানো অথবা পার্শ্ববর্তী এলাকায় বিদ্যালয় না থাকলে সরকার সংশ্লিষ্ট আশ্রায়নেই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ছেলে মেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করে থাকেন। অনেক সময় আশ্রায়নে নির্মিত অডিটরিয়ামেও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয়।"[১৪]

একটি বাড়ী একটি খামার কর্মসূচী : মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গঠিত বর্তমান সরকারকর্তৃক ঘোষিত দিন বদলের সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের অগ্রাধিকারভুক্ত নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে দাদ্রি্য বিমোচন অন্যতম। নির্বাচনী ইশ্তেহার এবং রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০১২ সালের মধ্যে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ২০১৫ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনাসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার বিষয়ে

Dhaka University Institutional Repository

সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ অঙ্গীকারের আলোকে বর্তমান সরকার স্থানীয় সম্পদ ও মানবশক্তি সত্ত্বাকে সর্বোত্তম কাজে লাগিয়ে জীবিকায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়িকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করতে প্রণোদনা দিয়ে যাচ্ছেন। সে প্রেক্ষিতে সরকার প্রাথমিক ভাবে দেশের প্রতিটি গ্রামে ৬০ থেকে ১০০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম সংগঠনকে স্বতন্ত্র অর্থনৈতিক ইউনিট হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য প্রকল্পের আওতাধীন সকল সুফলভোগীদের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে উঠোন বৈঠককে জীবন নির্বাহের নিমিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ হাজারো গ্রামের সমষ্টি। এসব গ্রামের জীব বৈচিত্র্য এবং ইকোসিস্টেম অত্যন্ত সমৃদ্ধ এবং উৎপাদন সহায়ক। উর্বরভূমি এবং প্রাণ চাঞ্চল্যে ভরা, এসব গ্রামে অনেক দরিদ্র মানুষ সহ গ্রামীণ পরিশ্রমী মানুষের বসবাস। পরিশ্রমী এসব মানুষের মাধ্যমে, উর্বর বাংলাদেশের সকল গ্রামের সকল বাড়ীতে খামার সৃষ্টি করে উৎপাদন অনেকগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব। শিক্ষা, চাকুরী, ব্যবসা, স্বাস্থ্য ও অন্যান্য কারণে নগরায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরায়নের ফলে Absentee Land Owner দের সংখ্যা বাড়ছে। তাদের ভূমি ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন এবং সংরক্ষণের নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য এবং প্রতি বাড়িকে খামারে রূপান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজন গ্রাম সংগঠন, প্রয়োজন গ্রামের মানুষের চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সম্পদ তথা পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা গ্রহণ। সঞ্চয় বৃদ্ধি এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশ গ্রহণ বৃদ্ধি এবং তা ক্রমান্বয়ে টেকসই করার ব্যবস্থা গ্রহণ। উৎপাদনের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণের পাশাপাশি বিপনন ব্যবস্থা, উৎপাদিত পণ্য সংরক্ষণ ও মজুদ করণ সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা মাঠ পর্যায়ে সৃষ্টি ও তা টেকসই করার প্রয়াসেই একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। "সরকার স্থানীয় সম্পদ, সময় ও মানব শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার তথা জীবিকায়নের মাধ্যমে প্রতিটি বাড়ীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করতে বদ্ধপরিকর।"[১৫]

যুব উন্নয়ন : যে কোন দেশের উন্নয়নের কাজে যুব সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রামীণ যুবকদের জন্য যে সকল কর্মসূচী ঘোষনা করেছেন, তা কাটমোল্লা রূপ :

যুব প্রশিক্ষণ ও আত্ম কর্মসংস্থান কর্মসূচী : এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৪৬৫টি উপজেলায় গ্রামীণ যুবকদের পোশাক তৈরী, বাটিক প্রিন্টিং, মৎস চাষ, দপ্তর বিজ্ঞান, সাঁট মুদ্রাক্ষরিক ও উল নিটিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ নিয়ে যুবকরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্ম তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। সুবিধা ভোগীদের ঋণ আদায়ের হার ৭৮.২৪%।

Dhaka University Institutional Repository

সারণী নং- ৬.২ : নিচে সারণীতে যুব প্রশিক্ষণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচীর আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম দেখানো হলো :

মোট প্রকল্প ব্যয়	৩৭২৫১,০৯ লক্ষ টাকা
মোট যুব ঋণ মুলধনের পরিমাণ	১১৫১১.৫৮ লক্ষ টাকা
জুন ২০০৭ পর্যন্ত মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	৩৩৮৪৫.৯৫ লক্ষ টাকা
জুন ২০০৭ পর্যন্ত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	৪৭০২.০৮ লক্ষ টাকা
২০০৭-০৮ অর্থ বছরে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	৩৬০০০.০০ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা (১৯৯০-২০০৩)	১১৪৮৩৬৮ জন
জুন ২০০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	১৬২২০১৫ জন
জুন ২০০৭ পর্যন্ত ইজারা প্রদত্ত খাস বদ্ধ জলাশয়ের সংখ্যা	১২০৮৩টি
জুন ২০০৭ পর্যন্ত ইজারা প্রদত্ত খাস বদ্ধ জলাশয় থেকে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ	৩৩৮১.২২ লক্ষ টাকা

উৎসঃ মোঃ নূরুল ইসলাম,বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচি সমূহ, ২০১২, পৃ,২৫৫-৫৬।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে বেকার যুবক ও যুবতীদের গবাদি পশু, হাঁস-মুরগী পালন ও মৎসচাষ বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলা কৌশল শেখানোর জন্য জুন ২০০৭ পর্যন্ত মোট ১,৭২,৮৫৫ জন বেকার যুবক যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রশিক্ষিত যুবাদের উপকরণ সরবরাহ প্রকল্প : এ প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষিত যুবাদের উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে উন্নত জাতের রোগ মুক্ত ১ দিনের মুরগীর বাচ্চা উৎপাদন করে (ঢাকার অদূরে সাভারে একটি পোল্ট্রি হ্যাচারী থেকে) তাদের মাঝে সুলভমূল্যে বিক্রি করা হচ্ছে। “হ্যাচারি হতে মোট রাজস্ব আয় ২১.৪০ লক্ষ টাকা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে।”[১৬]

স্বাস্থ্য সচেতনতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচী : কিশোর কিশোরীদের মাঝে প্রজনন,স্বাস্থ্য, এইচআইভি/এইড্স ও জেন্ডার বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করে জীবন দক্ষতা ও জীবিকার উপায় বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে, তাদেরকে সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে, ‘ইউএনপিএ’ এর আর্থিক সহায়তায় সিলেট ও কক্সবাজার জেলার ১৮টি উপজেলায় ৫০টি যুব ক্লাবের মাধ্যমে কর্মসূচীটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ইমপেক্ট কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের বেকার যুবক/যুবতীদের গবাদি পশু, হাঁস-মুরগীর বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস ও বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা। অন্যদিকে তারা পারিবারিক মাঝারি ও বড় আকারের মুরগি ও গরুর খামার স্থাপনের মাধ্যমে বায়োগ্যাস সহ বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন করে জ্বালানী ও বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে। “পারিবারিকভাবে ১৮,৭৫০টি খামার সংরক্ষণ, প্রতিবছর ৫,০০০ টন মাংস, দৈনিক ৩০,০০০ লিটার দুধ, দৈনিক ৫০,০০০ ঘনফুট গ্যাস এবং প্রতিবছর ৫,০০,০০০ টন জৈব সার উৎপাদিত হবে।

এছাড়া পারিবারিক মুরগির খামার হতে প্রতি বছর ১,২০,০০০টি ডিম পাওয়া যাবে। এসকল কর্মকান্ডের ফলে ৪,৪১০ জন বেকার যুবক/যুবমহিলার কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হবে।"[১৭]

পরিবার ভিত্তিক কর্মসংস্থান কর্মসূচী : গ্রামীণ ভূমিহীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্যতা হ্রাসে সরকার দেশের ৮২টি উপজেলায় এ কর্মসূচী চালু করেছেন। কর্মসূচীর আওতায় "প্রতি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা ৫ জন। গ্রুপের প্রতি সদস্যকে প্রাথমিক পর্যায়ে সর্বোচ্চ ৭,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান এবং পর্যায়ক্রমে ১১,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণপ্রদান করা হয়।"[১৮] প্রতি সপ্তাহে কিস্তিতে ১ বছরে ঋণ পরিশোধের সুযোগ রয়েছে। ঋণ আদায়ের হার ৯৪.২১%। গ্রামীণ বেকার যুবাদের দারিদ্র্য বিমোচনে এটি একটি সফল কর্মসূচী।

অননুমোদিত প্রকল্প : সরকার অননুমোদিত যে সকল প্রকল্পে যুবাদের আত্মকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয় সেগুলো হলো :

১) পোষাক তৈরী প্রশিক্ষণ ও বাটিক প্রিন্টিং কার্যক্রম সম্প্রসারণ প্রকল্প।

২) নতুন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন।

৩) পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ প্রকল্প।

৪) বরিশাল আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।

৫) শিক্ষিত যুবকদের জন্য কমিউনিকেটিভ ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রকল্প ।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা : যুবাদের কল্যাণার্থে সরকার ভবিষ্যতে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করবেন সেগুলো হলো:

১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে কর্মকান্ডভিত্তিক গঠনমূলক সম্পর্ক জোরদার করণ প্রকল্প।

২) যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প।

৩) ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ জোরদার করণ প্রকল্প।

৪) উপজেলা পর্যায়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি প্রকল্প।

৫) আত্মকর্মী যুবাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বিভাগীয় শহর গুলোতে প্রদর্শনী বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প।

সমাপ্ত কর্মসূচীসমূহ: সরকার কর্তৃক যুবাদের জন্য গৃহীত কর্মসূচীসমূহের যে সকল কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে সেগুলো হলো:

১) এ্যাডভোকেসি অন রিপ্রোডাক্টিভ হেল্‌থ এন্ড জেন্ডার ইস্যু ক্লাবস্।

২) উপজেলা সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান প্রকল্প।

৩) যুবা মহিলাদের প্রশিক্ষণ সুবিধার উন্নয়ন প্রকল্প।

৪) প্রো-এ্যাকটিভ ইনভল্মেন্ট অব রুরাল ইয়ুথ পার্টিসিপেটরি ডেভেলমেন্ট প্রকল্প।

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী : বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর নির্বাচনী ই্শ্তেহার অনুযায়ী দেশে গ্রামীণ প্রতিটি পরিবার থেকে একজন করে লোককে কর্মসংস্থনের সুযোগ সৃষ্টি করার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ "৬ মার্চ, ২০১০ সালে গোপালগঞ্জ জেলার বেকার যুবক যুবতীদের প্রথম কর্মসূচীর আওতায় এনে কর্মসংস্থানের কার্যক্রম শুরু করেন।"[১৯] এ কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য হলো, দেশের বেকার যুব সমাজকে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করা এবং জাতি গঠনে তাদের ভূমিকা নিশ্চিত করা। ফলশ্রুতিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন কাল ধরা হয়েছিল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩ পর্যন্ত। প্রাথমিকভাবে কয়েক হাজার বেকার যুবক/যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে অস্থায়ী ভিত্তিতে কর্মে নিয়োগ দান করা হয়েছে।

গ্রামীণ নারী উন্নয়ন কার্যক্রম : সারাবিশ্বে এমনকি বাংলাদেশের শহরের নারীরা যখন পুরুষের পাশাপাশি অধিকার সচেতন হয়ে নানামুখী উন্নয়ন কর্মে অবদান রাখছেন, সেখানে বাংলাদেশের গ্রামীণ অধিকার অসচেতন নারীরা মান্ধাতার আমলের ধারায় মানবেতর জীবনযাপনকরছে। বাংলাদেশের সংবিধানে নারী পুরুষের সম অধিকারের কথা উল্লেখ থাকলেও তা এখনও গ্রামীণ নারী গোষ্ঠীর মধ্যে পুরোপুরি পরিলক্ষিত হয়নি। আশির দশকের পর থেকে অদ্যাবধি সরকার নারী উন্নয়ন বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নের কথা বললেও তা আংশিক সম্পূর্ণ হলেও পুরোপুরি বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। গ্রামীণ নারী উন্নয়নের জন্য সরকার গৃহীত কর্মসূচী গুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

মহিলাদের কৃষি ভিত্তিক কর্মসূচী : গ্রামের মানুষের জীবন ধারণের প্রধান উৎস হচ্ছে কৃষি। আর জনসংখ্যার অর্ধেক হচ্ছে নারী। তাই কৃষির মাধ্যমে নারী সমাজকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে সরকার কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। "কর্মসূচীর আওতায় মহিলাদের অংশ গ্রহণে হালকা কৃষি কাজ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশু পালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা হয়।"[২০]

কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক কর্মসূচী : বাংলাদেশে সরকার গ্রামীণ মহিলাদের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক কাজে সম্পৃক্ত করণে বিভিন্নভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, যেমন- প্রশিক্ষণ, ঋণ দান, বিনিয়োগ কেন্দ্র, চাকুরীতে মহিলা কোটা সংরক্ষণ, কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য।

সমাজ সেবা : সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তর নারী উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

মাতৃকেন্দ্র প্রকল্প : বর্তমানে বাংলাদেশে ৩১৮টি উপজেলায় গ্রামীণ মহিলাদের সমন্বয়ে এ কার্যক্রম চলে আসছে। ইতোমধ্যে ১২,৯৫৬টি মাতৃকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। নিচে এ প্রকল্পের কার্যক্রম আলোচনা করা হলো :

শিক্ষামূলক কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের দুঃস্থ অসহায় মহিলাদের বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিবারের আয় বর্ধনে বিশেষ করে ফল-মূল ও শাক-সব্জি চাষে উদ্বুদ্ধ করা হয়।

ঋণ দান প্রকল্প : দরিদ্র মহিলাদের ঋণ দানের আওতায় এনে স্বাবলম্বী জীবনের দ্বার উন্মোচন করাই এ কর্মসূচীর লক্ষ্য। এ ঋণ গ্রহণে বিনিয়োগ ও স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে গ্রামের মহিলারা বিশেষ ভূমিকা রাখছে। যা তাদের উন্নত জীবনের দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে। ঋণ আদায়ের হার ৯৩%।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী : কর্মসূচীর আওতায় মহিলারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে তাদের মধ্যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ বোধ জাগ্রত হয়েছে। তারা এতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০০১-০৫ সাল পর্যন্ত ১,১৮,৩৫৬ জন মহিলা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন।

সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা কর্মসূচী : সুবিধা বঞ্চিত মহিলা ও তাদের সন্তানদের সক্ষমতা তৈরী এবং দারিদ্র্য বিমোচনে টেকসই জীবনের লক্ষ্যে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক প্রতিবন্ধী নারী ও তাদের শিশু সন্তানদের সেবা দানে এ কর্মসূচী কাজ করে যাচ্ছে।

অন্যান্য : তাছাড়া কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতা প্রদান করা হয়। "দলীয় সঞ্চয়, স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি ব্যবস্থাপনা, জনকল্যাণ, মা ও শিশু যত্ন, সামাজিক বনায়ন প্রভৃতির মাধ্যমে গ্রামীণ মহিলারা আর্থ-সামাজিক ও জাতীয় উন্নয়নে ব্যাপক অবদান রেখে যাচ্ছে।"[২১]

উপবৃত্তি কর্মসূচী : গ্রামীণ নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সরকার কর্মসূচীটি গ্রহণ করেছেন। যা কাটমোল্লা রূপ:

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী : ১৯৯৩-৯৪ অর্থ বছরে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য কর্মসূচীটি গৃহীত হয়। ২০০১-০২ অর্থ বছর থেকে দেশের ১,২৫৫টি ইউনিয়নের ১৮,২৬২টি প্রতিষ্ঠান প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

মাধ্যমিক ছাত্রী উপবৃত্তি : প্রকল্পের আওতায় নারী শিক্ষা সম্প্রসারণ, নারীদের ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে তাদের অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৩ সাল থেকে ৪৬০টি উপজেলায় ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত অধ্যয়নরত ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান শুরু হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের সামাজিক উন্নয়নমূলক অন্যান্য সুবিধা : এ পর্যায়ে মেয়েদের স্কুল গমনের হার বৃদ্ধি ও বাল্য বিয়ে নিরোধকল্পে কর্মসূচীটি হাতে নেয়া হয়। "এ কর্মসূচীর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বালিকাদের ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ৩০০/-, ৭ম শ্রেণিতে ৩৬০/-, ৮ম শ্রেণিতে ৪২০/-, ৯ম ও ১০ম শ্রেণিতে ৭২০/- টাকা বৃত্তি ও বিনামূল্যে পড়াশোনা, পরীক্ষা ফি ও বই ভাতা দেয়া হবে।"[২২] এ জন্য প্রতিবছর সুবিধাভোগী হচ্ছে ৪ মিলিয়ন মেয়ে শিক্ষার্থী। ২০০৫-০৬ অর্থ বছরে এ খাতে ছাত্রীদের জন্য বরাদ্দ ছিল ৮৩৫.৮ মিলিয়ন টাকা।

উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রীদের উপবৃত্তি কর্মসূচী : উচ্চ মাধ্যমিকের মানবিক ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় একজন সাধারণ ছাত্রী প্রতি মাসে ১১০ টাকা ও বই কেনাবাবদ বছরে ১২০০ টাকা। বিজ্ঞান বিভাগের একজন ছাত্রী প্রতিমাসে ১১০ টাকা ও বই কেনাবাবদ বছরে ২১০০ টাকা উপবৃত্তি পেয়ে থাকেন। দেশের ৪,১০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকার এ ভর্তুকি প্রদান করছেন।

স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি কর্মসূচী : স্নাতক পর্যায়ে ছাত্রীদের মাসিক ২৫০ টাকা হারে এবং সম্মান পর্যায়ে প্রতি বছর আরো ১০,০০০ ছাত্রীকে মেধার ভিত্তিতে ২০০ টাকা করে উপবৃত্তি প্রদানের কর্মসূচী বর্তমান সরকার শুরু করেছেন।

দুঃস্থ মহিলা ভাতা কর্মসূচী : গ্রামীণ বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ১৯৯৯-২০০০ অর্থ বছর থেকে সরকার ভাতা প্রদান কর্মসূচী চালু করেছেন। "৪,৪৭৯টি ইউনিয়নে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে মাসিক ভাতার পরিমাণ জনপ্রতি ২২০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৭.৫ লাখে উন্নীত করা হয়।"[২৩]

মাতৃমঙ্গল ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র : সরকারী হাসপাতালের ন্যায় ইউনিয়ন পর্যায়ের সাব-সেন্টারে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, প্রসূতির জন্য পৃথক শয্যা, মা ও শিশুর চিকিৎসা ব্যবস্থা সরকারের কর্মসূচীর আওতাভুক্ত।

মহিলা পরিদপ্তরের কর্মসূচী : এ কর্মসূচীতে গ্রামীণ মহিলাদের কৃষি উন্নয়ন, কর্মসংস্থান, জনসংখ্যা কার্যক্রম, বৃত্তি মূলক প্রশিক্ষণ, দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন, আইনী সহায়তা প্রভৃতির মাধ্যমে মহিলা পরিদপ্তর দারিদ্র্যতা দূরীকরণে সহায়তা দিয়ে আসছে।

যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ : সমাজে অবহেলিত ও নির্যাতিত নারী সমাজের অধিকার ও কল্যাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যে সব আইন প্রণীত হয়েছে সে গুলোর মধ্যে যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ অন্যতম।

নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ : সমাজের নারীদের নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা, ন্যায় বিচার কায়েম করা, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক তথা বিভিন্ন ধরণের নির্যাতন প্রতিরোধ কল্পে "নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ প্রণীত হয়।

পারিবারিক আদালত ১৯৮৫ : পারিবারিক জীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা, সুখী দম্পত্তি ও সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ প্রণীত হয়। দাম্পত্য জীবনে অধিকার সংরক্ষণ ও সন্তান সন্ততিদের অভিভাবকত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ আইনের ভূমিকা অনন্য।

নারী ও শিশু নির্যাতন আইন ১৯৯৫ : এ আইনের আওতায় ক্রমবর্ধমান নারী ও শিশু নির্যাতন, নারী ও শিশু পাচার, মুক্তিপণ আদায় প্রতিরোধের লক্ষ্যে সরকার ১৯৯৫ সালে নারী ও শিশু নির্যাতন (বিশেষ বিধান) আইন প্রণয়ন করেন।

নিচে রেখাচিত্রে এক নজরে নারী উন্নয়নের বিভিন্ন মেশিনারিজ দেখানো হলো:

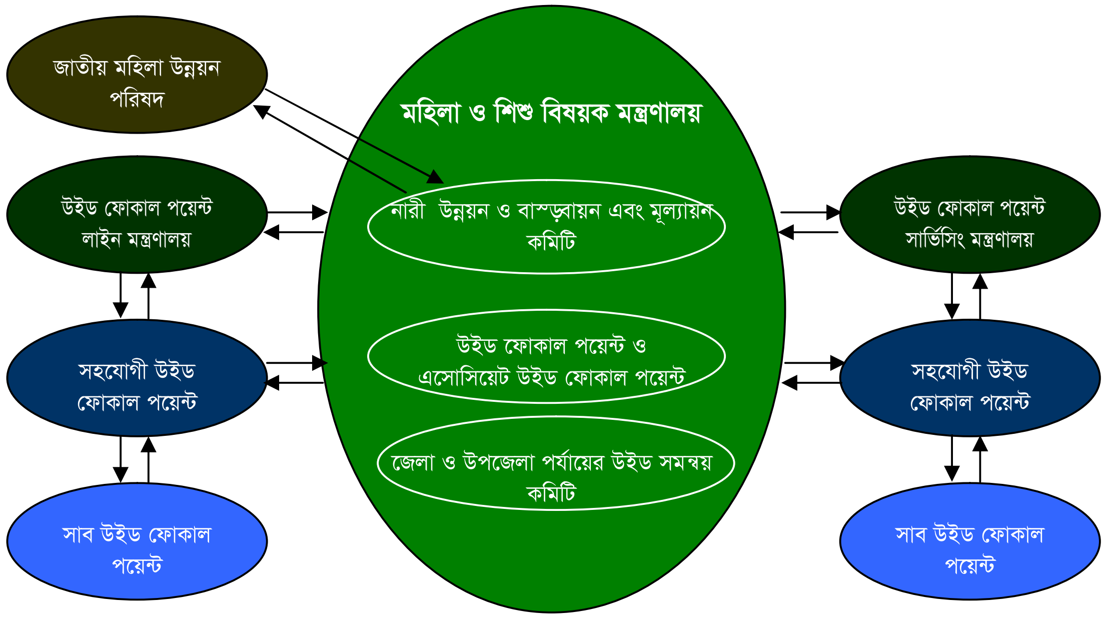

চিত্র নং ৬.১

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাই সমাজ ও রাষ্ট্রের উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ ও অধিকার নিশ্চিতকল্পে ১৯৯৭ সালে সরকার নারী উন্নয়নে উপরোল্লিখিত উন্নয়নকৌশলটি গ্রহণ করেছেন।

অন্যান্য সমাজ সেবা : সরকার গ্রামের মানুষের কল্যাণার্থে সমাজকল্যাণমূলক গ্রামোন্নয়নের যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করেন, তা নিতে আলোচনা করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা সুবিধা কর্মসূচী : ১৯৫৪ সালে সাবেক পাকিস্তান সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজ সেবা বিভাগ মেডিকেল কলেজে এ সেবা দান কর্মসূচী চালু করেন এবং পর্যায়ক্রমে তা বিভিন্ন সরকারী হাসপাতালে সম্প্রসারিত হতে থাকে। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার গ্রামীণ হত-দরিদ্র মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৭৫ সাল থেকে এর বাস্তব প্রয়োগ শুরু করে কর্মসূচী গ্রহণ করেন এবং জনবল নিয়োগ করেন। দেশের ৮৭ ভাগ লোক দরিদ্র সীমার নীচে বসবাস করায় তারা নিত্যদিনের মৌল মানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। এসব মানুষ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত ঔষধ, পথ্য সহ প্রয়োজনীয় চাহিদা যোগানে ব্যর্থ হয়ে তিলে তিলে অকালে মৃত্যুবরণ করছে। নিরক্ষর, দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর এটা মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। তাছাড়া গ্রাম থেকে যে সব রোগী শহরে আসেন তারা হাসপাতালের পরিবেশ, নিয়ম কানুন না বুঝে ও দালালদের খপ্পরে পড়ে সর্বস্ব হারিয়ে বিনা চিকিৎসায় আবার গ্রামে ফিরে যান। প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগে আঘাত প্রাপ্ত, মহামারীতে আক্রান্ত ব্যাধি বিস্তার গ্রাম গুলোতে ব্যাপক আকার ধারণ করে। চিকিৎসা সেবা নিতে ভীত গ্রামের অসচেতন জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে রোগ নিরাময়ে এ বিভাগ সদা জাগ্রত থেকে সরকারী সহায়তা দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

ভবঘুরে সেবা দান কর্মসূচী : সারাদেশে বর্তমানে ৬টি ভবঘুরে সেবা দান সদন আছে। তার মধ্যে ৫টি ঢাকায় এবং ১টি ময়মনসিংহে অবস্থিত। সরকার সমাজ সেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে এ সব কেন্দ্রে ভিখারীদের থাকা খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন। তাদেরকে ধর্মীয় ও অন্যান্য নৈতিক শিক্ষা দেয়া হয়। সবল দেহী ভিখারীদের তাঁত বোনা, দঁড়ি পাকানো, বই বাঁধানো, চুল কাটা, কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি এ সব সদনের মাধ্যমে ২,৫৩০ জন ভবঘুরেকে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। সদন গুলোতে ৪০০ জন ভবঘুরে থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। "১৯৮৫ সালের ২৬শে মে উড়িচরে ঘুর্ণিঝড়ের প্রচন্ড আঘাতে কয়েকজন ছেলে পিতামাতা হারালে তাদের কে ঢাকার শ্যামলীতে এসওএস শিশু পল্লীতে ভর্তি করা হয়।"[২৪]

"রংপুর জেলার দহগ্রাম ও আংগুরপোতা ছিটমহলে হৃদরোগে আক্রান্ত একজন মেয়ে রোগীকে সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ চিকিৎসার জন্য হেলিকপ্টারে করে ঢাকায় নিয়ে আসেন এবং সুস্থ হয়ে সে নিজ গ্রামে ফিরে যায়, (দৈনিক খবর, ১৯৮৬)।"[২৫]

শিশু আলয় কর্মসূচী : পাকিস্তান শাসন আমলে ১৯৬২ সালে সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিত্যক্ত, এতিম ও রুগ্ন শিশু সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ঢাকায় সর্ব প্রথম ২৫ আসন বিশিষ্ট একটি শিশু আলয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। স্বাধীনতাত্তোর ১৯৮০-৮১ সালে রাজশাহী ও চট্টগ্রামে আরও ১টি করে মোট ৩টি শিশু আলয়ে ২২৫টি শিশু রাখার ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। সরকারী খরচে সমাজ সেবা বিভাগ এসব শিশুদের খাওয়া-দাওয়া, চিকিৎসা ও শিক্ষাদান, শারীরিক ও মানসিক বিকাশ, খেলাধূলা, গান বাজনা সহ বিভিন্ন চিত্ত বিনোদনমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে।

সরকারী এতিমখানা কর্মসূচী : সরকার পরিচালিত দেশের ৭৮টি এতিমখানায় বিভিন্ন গ্রাম-গঞ্জ থেকে আগত এতিম শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত লালন পালনের ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েদের অধিকাংশই বিয়ের মাধ্যমে পুনর্বাসিত করা হয়। আর ছেলেদের পুনর্বাসিত করা হয় আত্মনিয়োগের মাধ্যমে কিছু টাকা পয়সা ও অন্যান্য সরঞ্জাম দিয়ে। বর্তমানে উপজেলা ও জেলা শহরে এতিমখানা গুলোতে প্রায় ৯,৫০০ জন এতিম শিশু সরকারের আর্থিক সহযোগিতা পেয়ে লালিত পালিত হচ্ছে।

মূক ও বধির বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কর্মসূচী : এ কর্মসূচীর আওতায় বিশেষ পদ্ধতিতে মূক ও বধির বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানো হয়। তাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ এবং চিত্ত বিনোদনমূলক সুযোগ সুবিধা দেয়া হয়ে থাকে। সরকারের সমাজসেবা দপ্তর এ কর্মসূচীর মাধ্যমে দেশের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আগত সহ ৭টি বিদ্যালয়ে ৪২০ জন মূক ও বধির ছেলেমেয়েকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে।

অন্ধদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচী : দেশের অন্ধ লোকদের বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য সরকারের সমাজ সেবা দপ্তর একটি প্রকল্প চালু করেছে। বিভিন্ন কলকারখানা, শিল্প কারখানা এবং অফিস আদালতে লাভজনক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্ধদের পুনর্বাসনের কাজে এ প্রকল্প সাহায্য করে থাকে। এ কর্মসূচীর আওতায় অদ্যাবধি ২৫ জন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্ধকে বিভিন্ন কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠানে চাকুরী দেয়া হয়েছে।

অক্ষম ও বিকলাঙ্গ শ্রমিকদের পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী : বাংলাদেশ সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় দেশের অক্ষম ও বিকলাঙ্গ শ্রমিকদের পুনর্বাসনের জন্য প্রথম কর্মসূচীটি গ্রহণ করা হয়। শ্রমিকরা শিল্পকারখানাসহ অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উৎপাদনমুখী কাজ করতে যেয়ে অনেক সময় দুর্ঘটনায় অকালে হাত, পা, বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ হারিয়ে চিরদিনের জন্য বিকলাঙ্গ ও অক্ষম হয়ে পড়ে। এ ছাড়াও বাংলাদেশের মত জনসংখ্যাধিক্য একটি দেশ যাতায়াতের সময় অনেক শ্রমিকরা অনুরূপ পরিস্থিতির শিকার হয়ে চিরজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ করে। অক্ষম, বিকলাঙ্গ দরিদ্র শ্রমিক শ্রেণির কল্যাণার্থে সরকার তাদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, মূলধন, ঋণদান প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করে উৎপাদনের সাথে জড়িত করার লক্ষ্যেই কর্মসূচীটি হাতে নিয়েয়েছে।

বয়স্ক ভাতা প্রদান কর্মসূচী : বাংলাদেশের সকল উপজেলার সকল ইউনিয়নে ৮,৮৭৯ জন, প্রতিটি ওয়ার্ডে ১০জন সর্বাধিক ৬৫ বছর বয়স্ক ও দুঃস্থ ব্যক্তিকে ১৯৯৭-৯৮ সাল থেকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। "২০০৭-০৮ অর্থ বৎসর থেকে বয়স্ক ভাতার পরিমান প্রতিমাসে প্রতিজনকে ২২০ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ১৭ লাখে উন্নীত করা হয়। অবশ্য ১০ জনের মধ্যে ৫ জন মহিলা।"[২৬]

সারণী নং- ৬.৩: নিচে সারণীতে সরকারের বয়স্ক ভাতা খাতে বরাদ্দ ও উপকারভোগীর সংখ্যা দেখানো হলো:

বছর	আর্থিক বরাদ্দ (টাকা)	উপকৃতের সংখ্যা
২০০১..০২	৪৯,৯২,০০,০০০	৪,১৫,১৭০ জন (জন প্রতি মাসিক ০ টাকা হারে)
২০০২-০৩	৪৯,৯২,০০,০০০	৫,০০,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ১২০ টাকা হারে)
২০০৩-০৪	১৮০,০০,০০,০০০	১০,০০,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ১৫০ টাকা হারে)
২০০৪-০৫	২৬০,৩৭,০০,০০০	১৩,১৫,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ১৬৫ টাকা হারে)
২০০৫-০৬	৩২৪,০০,০০,০০০	১৫,০০,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ১৮০ টাকা হারে)
২০০৬-০৭	৩২৪,০০,০০,০০০	১৬,০০,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে)
২০০৭-০৮	৪০৪,০০,০০,০০০	১৭,০০,০০০ জন (জন প্রতি মাসিক ২২০ টাকা হারে)

উৎস: মো: নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচীসমূহ, পৃ,১৪৩।

গৃহায়ন কর্মসূচী : গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠী যারা গৃহের অভাবে শীত-বৃষ্টিতে অতি কষ্টে জীবনযাপনকরে, তাদের গৃহ নির্মাণের সহায়তা দেয়ার জন্য সরকার এ কর্মসূচীটি চালু করেছেন। গৃহহীন দরিদ্রদের জন্য গৃহায়ন তহবিল গঠন করে বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ রাখা হয়। ৫০ কোটি টাকার একটি তহবিল গঠন করে সরকার ২০০৪-০৫ সাল পর্যন্ত ৩২,৬৬৩টি গৃহ নির্মাণ করে ১,৬৩,৩১৫ জন গৃহহীনকে সুবিধা ভোগের নিশ্চয়তা প্রদান করেছে।

সামাজিক বীমা কর্মসূচী : শ্রমিক/কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের জন্য সামাজিক বীমা এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী। এ কর্মসূচীতে দেশের প্রচলিত আইন ও প্রতিষ্ঠানের নিয়ম অনুসারে সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি নিজে ও তার পরিবারের সদস্যরা সামাজিক নিরাপত্তা লাভ করে থাকে।

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা কর্মসূচী : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭ ও ৩১ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত আছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধান স্বীকৃত এ অধিকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার ২০০০ সালে আর্থিক ভাবে অস্বচ্ছল, সহায় সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারণে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ, এমন বিচার প্রার্থীকে আইনগত সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনগত সহায়তা প্রদান আইন-২০০০ প্রণয়ন করেন। এ আইনের অধীনে জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান নামে একটি সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সংস্থাটির মাধ্যমে সরকার অসমর্থ বিচার প্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদান করছেন। সরকারের এ কর্মসূচীর অংশ হিসেবে "২০০৯ সালে ৯ হাজার ২৪১ জন বিচার প্রার্থীকে সরকারী খরচে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং আইনগত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ৩ হাজার ১৮০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।"[২৭]

ভূমি জটিলতা নিরসন আইন : ভূমি সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষ সব সময় হয়রানির শিকার হয়। এ লক্ষ্যকে স্থির করে সরকার ভূমি জটিলতা নিরসন আইন কর্মসূচীটি গ্রহণ করেন। ২০০৯ সালে সরকার ভূমি রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সহজী করণ, এ প্রক্রিয়ায় ব্যয়িত সময় ও ব্যয় হ্রাস এবং সকল প্রকার ওডি একই পে-অর্ডারের মাধ্যমে জমা প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছেন। তাছাড়া ভূমি রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে মূল্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে। ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে দেশের সকল নাগরিকদের ভূমি অফিসে গিয়ে কাঙ্খিত সেবা দ্রুত প্রাপ্তি নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৩০ দিনের মধ্যে নামজারী সম্পন্ন করণ, স্বল্প কর গ্রহণ এবং রেকর্ড রুম থেকে সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য জেলা প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার ভূমি বরাবর অনুশাসন জারী করে তদারকি জোরদারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ : দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনা এবং গ্রামের মানুষকে পেশাগত ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্তে সরকার ''বঙ্গবন্ধু দারিদ্র বিমোচন ও পল্লী উন্নয়ন একাডেমী আইন ২০১২ প্রণয়ন করেছেন।"[২৮] পল্লীর জনসাধারণ যাতে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বল্প মূল্যে নগদ ক্রয় করতে পারেন, সে উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার সারা দেশে ১২৮টি সমবায় বাজার স্থাপন করেছেন। এতে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের গুণগত মান বজায় রাখার সাথে সাথে কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম ছড়িয়ে দেয়ার সক্রিয় বিবেচনা সরকারের রয়েছে।

সবশেষে, সরকারের সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে মহান জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন কালে অর্থ মন্ত্রি জনাব এ. এম. এ. মুহিদ বলেন,

"গত তিনটি বাজেটের মত এবারও আমরা দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলের দিকে না তাকিয়ে নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী আঞ্চলিক সমতা, উন্নত অবকাঠামো এবং গুণগত ব্যয়ের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বার্ষিক কর্মসূচীতে মানব সম্পদ (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ২৫.৫ শতাংশ, সার্বিক কৃষি খাতে (কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, পানি সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) ২৯.৯ শতাংশ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানী খাতে ১৭.৩ শতাংশ এবং যোগাযোগ (সড়ক, রেল সেতু এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য) খাতে ১৪.৮ শতাংশ বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে।"[২৯]

উপসংহার

বাংলাদেশ একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিশেষ ক্ষেত্র বাছাই করে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পাদানের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করে থাকেন। বিশ্বের উন্নত ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্র সমূহ কর্মসূচী বাস্তবায়নে একই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। বাংলাদেশ সরকার স্বাধীনতা উত্তর গ্রমোন্নয়ন সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দীর্ঘ মেয়াদী পাঁচশালা, দ্বি-শালা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন । পরবর্তীতে স্বল্প মেয়াদী কর্মসূচী গ্রহণ করে জন কল্যাণার্থে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গ্রামোন্নয়নে মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কৃষি, বিভিন্ন প্রকার অবকাঠামোগত ও জনকল্যাণকর উন্নয়ন কর্মসূচী ।

উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর গ্রমোন্নয়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচীর বেশীর ভাগই দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে নানা প্রতিকূলতার শিকার হয়ে বাস্তব রুপ ধারণ করতে হিমশিম খেয়েছে। কোন কোন কর্মসূচীর অর্থ আত্মসাতের ফলে কার্যক্রম চির দিনের মত পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে, কোনটার আংশিক কার্যক্রম সম্পন্ন হবার পর দীর্ঘ দিন ঐ অবস্থাই পড়ে আছে, কোনটার কার্যক্রম সম্পন্ন হলেও তার আয়ুস্কাল ক্ষণ স্থায়ী হয়েছে। কর্মসূচী গুলো সম্পাদানকারী ও তদারকারী গণ যেন সষ্যের ভিতর ভূত। তবে ঢালাও ভাবে এ কথা বলা যাবে না যে, সকল কর্মসূচী সম্পাদানের বাস্তবতা একই রকম। গ্রামোন্নয়নের জন্য গৃহীত দু' একটি কর্মসূচী আলোর মুখ দেখতে পেরেছে বলেই শত ভাগ না হউক, কিছুটা হলেও উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। যার মাধ্যমে গ্রামে ক্ষেত্র বিশেষে উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন প্রায় অর্ধ শতাব্দীর দ্বার প্রান্তে উপনীত। এ দীর্ঘ দিনের বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায়, গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীগুলো যাত্রা পথে বৈঠা হাতে মাঝির পাল তোলা নৌকা যেমন মৃদু-মন্দ বাতাসে মন্থর গতিতে এগিয়ে চলে, ঠিক তেমন ভাবেই এগিয়ে চলছে।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) ইসলাম, মোঃ নূরুল, বাংলাদেশ সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমুহ, ঢাকাঃ প্রকাশক, মাহবুব আলম হিরণ, ২০০৮, পৃ, ১।

২) প্রাগুক্ত পৃ, ১।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১।

৪) বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকাঃ (অর্থ বছর ২০১০-১১), ২০১০, পৃ, ১২।

৫) হাওলাদার,এম. এ. হাই, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসূচী, ঢাকাঃ সমাজকল্যণ মন্ত্রণালয়, ২০০৮, পৃ, ১, ২।

৬) উল্যাহ, ডাঃ এ. কে. এম. জাফর, আর্সেনিক রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউল, ঢাকাঃ কনভেনশনাল এনসিডি প্রোগ্রাম, পুন:মুদ্রণ জুলাই,২০১২, পৃ, ১।

৭) ওয়াজেদ, মোহাম্মদ আবদুল, গ্রামীণ রাস্তা নির্মাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিপত্র, ঢাকাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১২ পৃ, ১।

৮) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকাঃ (অর্থ বছর ২০১২-১৩), ২০১২, পৃ, ২৮।

৯) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকাঃ (অর্থ বছর ২০১০-১১), ২০১০, পৃ, ১২।

১০) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট, (অর্থ বছর ২০১২-১৩), প্রাগুক্ত পৃ, ২৮।

১১) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় বাজেট, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকাঃ (অর্থ বছর ২০১২-১৩), ২০১২, পৃ, ১২।

১২) হক, মোঃ ফজলুল, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ঢাকাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৩, পৃ, ২, ৩।

১৩) কবীর, মোঃ আহসান, গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার, ঢাকাঃ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১৩, পৃ, ১, ২।

১৪) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকাঃ (অর্থ বছর ২০১২-১৩), ২০১২, পৃ, ২৮।

১৫) ইসলাম, মোঃ সফিকুল, গ্রাম উন্নয়ন প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী সংখ্যা, কুমিল্লাঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কোটবাড়ী; ২০১৩, পৃ, ৮।

১৬) ইসলাম, মোঃ নূরুল, বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহ, প্রাগুক্ত পৃ, ২৫৭।

১৭) প্রাগুক্ত পৃ, ২৬০।

১৮) প্রাগুক্ত পৃ, ২৬১।

১৯) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: (অর্থ বছর ২০১০-১১), ২০১০, পৃ, ১২।

২০) ইসলাম, মোঃ নূরুল, বাংলাদেশের সমাজকল্যাণ কর্মসূচিসমূহ, প্রাগুক্ত পৃ, ২৯০।

২১) প্রাগুক্ত পৃ, ২৯১।

২২) প্রাগুক্ত পৃ, ২৯২।

২৩) প্রাগুক্ত পৃ, ২৯৩

২৪) Alam, A.B.M. Jahangir, The Bangladesh Observer, Dhaka:1985, P. 8.

২৫) ইসলাম, মাজহারুল, দৈনিক খবর, ঢাকা: ১৯৮৬, পৃ, ১।

২৬) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা: (অর্থ বছর ২০০৭-০৮), ২০০৭, পৃ, ১।

২৭) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: (অর্থ বছর ২০০৯-১০), ২০০৯, পৃ, ১২।

২৮) বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা: (অর্থ বছর ২০১২-১৩), ২০১২, পৃ, ২৮।

২৯) মুহিদ, এ, এম. এ. দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকা, ঢাকা: বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থ বাজেট, (অর্থ বছর ২০১২-২০১৩), ২০১২, পৃ, ২৮।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামোন্নয়নে মনীষীদের অবদান

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

গ্রামোন্নয়নে মনীষীদের অবদান

সূচনা : পূর্বের অধ্যায় সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক বিভিন্ন কর্মসূচী যেমনঃ ভূমিকা, সরকারী কর্মসূচীর পরিচিতি, কৃষি উন্নয়ন, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ, বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন যথা: মানব সম্পদ, স্বাস্থ্য সেবা, যাতায়াত, পানি সম্পদ, বিদ্যুৎ, খাদ্য, বাসস্থান, অন্যান্য অবকাঠামো, যুব সমাজ, নারী সমাজ, সমাজকল্যাণ উন্নয়নমূলক ও প্রন্তিক জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ইত্যাদি উপশিরোনামে আলোকপাত করা হয়েছে। চলমান অধ্যায় বিভিন্ন মনীষী যেমনঃ ড. আখতার হামিদ খান (কুমিল্লা মডেলের উদ্ভাবক), তোফায়েল আহমেদ, আব্দুল বায়েস, ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার, এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন, আবদুল্লাহ-আল-মামুন, গাজী সালেহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড) কর্তৃক গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ইতি-অন্ত আলোচনা করা হবে।

অবহেলিত গ্রামীণ মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে আজীবন কাজ করেছেন অনেক জ্ঞানী-গুণী মনীষী। তাঁদের চিন্তা চেতনায় এ ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে, যতদিন গ্রাম অধ্যুষিত মানব গোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়ন না হবে, ততদিন দেশের উন্নয় সম্ভব নয়। তাই মানব দরদী মনীষীগণ গ্রাম বাংলার জনবসতির সাথে নিজেদের একাকার করে দিয়ে তাদের সংস্পর্শে এসে গ্রামোন্নয়নের হিতকর কলা কৌশল গ্রহণ করে, তা বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হয়েছেন। হতভাগ্য এ জন সমাজের মানুষকে তাঁরা ঘৃণার চোখে না দেখে সম্মানের পাত্র হিসাবে মূল্যায়ন করেছেন। তাদের (গ্রামবাসী) জীবন চলার দুর্গম পথ সব সময়ই এসব মনীষীদের অন্তরের অন্তঃস্থলে আঘাত করেছে। ব্যথিত অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁরা গ্রামীণ মানুষগুলোর দুঃখ-যাতনা উপলব্ধি করে তাদের জীবনযাত্রা সহজ ও মানোন্নয়ন ঘটানোর চেষ্টা চালিয়েছেন যুগ-যুগান্তর ব্যাপী। অশিক্ষিত, অসচেতন এ সমাজের মানুষকে আলোর পথ দেখানো ছিল অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। এক্ষেত্রে তাঁরা হোঁচট খেয়েছেন বার বার। কিন্তু অভিযাত্রা বন্ধ না করে শৃঙ্গ বিজয়ের প্রত্যয় বুকে ধারণ করে এগিয়ে চলেছেন অবিরাম গতিতে। সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ, এমনকি অনেকে পদ মর্যাদাকে বিসর্জন দিয়ে গ্রামোন্নয়নমূলক যথোপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নে ব্যাপৃত থেকেছেন প্রতিটি মুহূর্তে। গ্রামোন্নয়নে যাঁরা অবদান রেখেছেন এমন কিছু মহৎ ব্যক্তির গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতার অংশ বিশেষ নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

ড. আখতার হামিদ খান : গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের শেষাংশে এ দেশের গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন যে মনীষী, তিনি হলেন, ড. আখতার হামিদ

খান। তাঁর চিন্তা চেতনায় যে বিষয়টি সক্রিয় ছিল তা হলো, গ্রামোন্নয়ন ঘটিয়ে দরিদ্র মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। ১৯৫৯ সালে তিনি কুমিল্লার কোটবাড়িতে পল্লী উন্নয়ন একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে এদেশের গ্রামের মানুষের দু:খ দুর্দশা দূর করতে সচেষ্ট হন। সরকারের উচ্চ পদ মর্যাদাবান 'ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (আইসিএস)' চাকুরী ইস্তফা দিয়ে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের জন্য নিজের জীবন বিলিয়ে দেন। এক্ষেত্রে তাঁর আগমনকে এ দেশের মানুষ দুনিয়া বিনাশ অবধি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবেন। তাঁর জীবনও দর্শন অধ্যয়নে আমরা দেখতে পাই, পল্লী উন্নয়নের জন্য যে সকল কর্মসূচী উদ্ভাবিত হয়ে বাস্তবতার স্বাক্ষর রাখছে তা হলো, তাঁর কুমিল্লা গ্রামোন্নয়ন মডেল। নিচে তাঁর এ মডেলের বিস্তারিত পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো :

গ্রামীণ প্রশাসনের মডেল-থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র : গ্রাম প্রশাসনের মডেলের কথা বলতে গিয়ে ড. আখতার হামিদ বলেন, "প্রথমে এবং সবচেয়ে দ্রুত যে মডেল উদ্ভাবন করা হয় তা ছিল বিকেন্দ্রীকৃত ও সমন্বিত গ্রাম প্রশাসন সংক্রান্ত। উপনিবেশিক কাল থেকে আমরা যে মডেল উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম তা ছিল অপর্যাপ্ত ও অকার্যকর। অনেক দিক দিয়েই এ ছিল একটি দুর্বল পদ্ধতি। আমরা এর স্থলে স্বল্প পরিসর জায়গায় যথেষ্ট সমন্বয় দিয়ে বিভিন্ন সেবামূলক কাজ সহ একটি মডেল উপস্থাপন করলাম। আমি এই মডেলের বিস্তৃত বর্ণনা দিতে চাই না পিছনের সামান্য একটা পশ্চাদ্‌ভূমি ছাড়া, যার নাম আমরা দিয়েছিলাম থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র। বৃটিশরা একটা কার্যকর প্রতীকের সাহায্যে গ্রাম এলাকায় তাদের উপস্থিতি জাহির করতো । এর নাম ছিল পুলিশ স্টেশন। এই পুলিশ স্টেশনই ছিল সে এলাকার সবচেয়ে বড় বিল্ডিং বা ভবন। অস্ত্রধারী পুলিশকে সেখানে স্থায়ীভাবে দাঁড় করিয়ে দেয়া হয় এবং পুলিশ জানত সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে চায়। সরকারের পরবর্তী প্রতীক ছিল রাজস্ব আদায়ের অফিস বা কাচারি। একে বলা হত জমির রাজস্ব আদায়ের জন্য জমিদারের নিজেদের অফিস। এই দু'টি প্রতীক আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পাই। এখন আমাদের সরকার বলছে, এগুলো এখন প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। এ চায় গ্রামের উন্নয়ন। এ জন্যে নতুন প্রতীক গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তার নাম হতে হবে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র। আগের পুলিশ স্টেশনের বিল্ডিং এর চেয়ে বড় বিল্ডিং হতে হবে, অনেক বড়। তবে এর অবস্থান হতে হবে পুলিশ স্টেশনের কাছে। উদ্দেশ্য, এটি পুলিশ স্টেশনের ছায়ায় থাকবে। আকৃতিগত এবং প্রশাসনিক দু' ভাবেই একে বড় হতে হবে। যেন প্রতিটি ডিপার্টমেন্ট একই বিল্ডিংএ তার একজন অফিসারকে প্রতিনিধি হিসাবে বসাতে পারে এবং সকল অফিসার একত্রিত হয়ে সম্মিলিত ভাবে কাজ করতে পারে। উপনিবেশিক যুগে মাত্র দু'টি ডিপার্টমেন্ট গ্রামে পৌঁছেছিল। এরা ছিল পুলিশ এবং অন্যেরা ছিল রাজস্ব আদায়কারী ট্যাক্স কালেক্টর। কিন্তু আমরা বললাম উন্নয়নে প্রশাসনকেও নিয়ে আসুন,

জেলা মহকুমা থেকে নিচে, আরও নিচে। বাংলাদেশে এক একটি জেলার আয়তন প্রায় তিন হাজার বর্গমাইল এবং এ ছিল প্রশাসনের আসল কেন্দ্রবিন্দু। সাব ডিভিশন বা সাব ডিষ্ট্রিক বা মহকুমার আয়তন প্রায় আট নয় শ' বর্গমাইল। আমরা ১০০ বর্গমাইল জায়গা নিয়ে এক একটি পুলিশ স্টেশন গঠনের প্রস্তাব করলাম। এ হবে একটি ইউনিট, এখানে প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট তার প্রতিনিধি বসাবে। এই ছিল আমাদের প্রথম মডেল। এ পদ্ধতি সারা প্রদেশে ছড়িয়ে দেয়া হয়। এক বৎসরের মধ্যে ৪০০টি থানার সব গুলোতে থানা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে যা পেয়েছিলাম, আমার মনে হয়, সে তুলনায় এ ছিল এক বিরাট পদক্ষেপ।"[১]

স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ : স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণে জনাব খান বলেন, "দ্বিতীয় মডেল যা আমরা উপস্থাপন করেছিলাম তা ছিল স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে সাধারণ প্রশাসনের সহিত এর সমন্বয় ও সংযোগ স্থাপনে দেশের মানুষের একটা সাধারণ চিন্তা ভাবনা ছিল। স্থানীয় সরকার ইউনিটকে অনেকটা উঁচু করতে হবে। জেলা কাউন্সিল আর পঞ্চায়তকে নিচু করতে হবে। কিন্তু এতে মধ্যবর্তী সংযোগস্থলকে করা হবে উপেক্ষা। আমরা সেজন্যে মধ্যবর্তী সংযোগের প্রস্তাব করলাম। সেটা যে খুব একটা নতুন পরিবর্তন বা মৌলিক চিন্তা হবে, তা নয়। কারণ ভারতে তখন থেকেই প্রতিটি ব্লকেই একটা করে স্থানীয় সরকার আছে। যার আয়তন কম বেশী আমাদের থানার সমান। আমরা ভাগ্যবান ছিলাম এজন্যে যে, একাডেমীর ইনস্ট্রাক্টরদের দলে ছিলেন অর্থনীতিবিদ্, পরিসংখ্যাণবিদ্, জন প্রশাসক, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, গ্রামীণ সমাজতত্ত্ববিদ্ এবং মনস্তত্ত্ববিদ্। এঁরা সবাই একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতেন। আমাদের ৪০০ বর্গমাইল জায়গায় ২৫০টি গ্রাম ছিল। আমরা এখানে জমির মালিকানা পদ্ধতি, সামাজিক অবস্থা, স্থানীয় সরকার, কৃষি সম্প্রসারণ সংক্রান্ত কর্মকান্ড ইত্যাদি নিয়ে প্রচন্ড শক্তিতে গবেষণা কাজ শুরু করি। পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিতে আমরা দেখতে শুরু করি সমস্যা গুলো আসলে কী ? আমরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে তদন্ত করে দেখতে পাই, এলাকা গুলো মোটামুটি ভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রাথমিক সমস্যা হল, পানি নিস্কাশন, সেচের দূরবস্থা এবং রাস্তা-ঘাটের অভাব ইত্যাদি জনিত কারণে অনেক ক্ষতি হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞগণ বুঝতেই পারেননি যে, প্রায় গ্রামে পানি নিস্কাশন ব্যবস্থা পুনর্গঠন করতে হবে, মেরামত করতে হবে। পানি নিস্কাশন সমস্যা খারাপ হয়েছে কারণ লাগোয়া জমি গুলো অতীতে চাষ করা হয়নি, এখন হচ্ছে। এ ছাড়া, এটা এমন কোন কাজ ছিলনা যে, একেবারে করে ফেলা যাবে। শুধু যে পানি নিস্কাশন বিরাট প্রচেষ্টার মাধ্যমে করতে হবে, এমন নয়। খননের মতো বার্ষিক মেরামতও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাস্তা ও সেচের অবস্থাও ছিল একই রকম। আমরা এভাবে জনগণের সহিত যতই কথা বললাম, তদন্তমূলক গবেষণা চালালাম, ততই রাস্তা-ঘাট, পানি নিস্কাশন ও সেচ ইত্যাদির অবকাঠামো তৈরীর ব্যাপারটি প্রাথমিক সমস্যা হতে

বেরিয়ে এল। আমরা দৃশ্যপটে গ্রামবাসী, জনগণ, সরকারী ডিপার্টমেন্ট এবং পরিকল্পনাবিদ্‌দের মধ্যে পরিস্কার পার্থক্য দেখতে পেলাম। দ্বিতীয় দলে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা ভূমি উন্নয়নের কাজকে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা বলে মনে করতেন না। শুধু আমরা যখন জনগণের চক্ষু দিয়ে চেয়ে দেখলাম, তখন তাকে প্রাথমিক সমস্যা বলেই দেখলাম। এছাড়া, আর একটি সমস্যা পরিচ্ছন্নরূপে বেরিয়ে আসে। সে ছিল বেকারত্বের সমস্যা। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে জমির আকৃতি ছোট হয়ে যাচ্ছিল। ইতিমধ্যেই পরিবার পিছু জমির পরিমাণ এসে দাঁড়িয়েছিল দু' একরেরও কম। শুধু তাই নয়, যথেষ্ট সংখ্যক লোক একেবারেই ভূমিহীন হয়ে পড়েছিল। তাদেরকে কৃষি শ্রমিক হিসেবে উপার্জনের উপর বেঁচে থাকতে হতো। কৃষি শ্রমিকদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক অবস্থা ছিল এ মৌসুমে তাদের অভাব ঘটত। জমির সেচ দেয়া হতো না বিধায় মৌসুমের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কৃষি সংক্রান্ত কাজ সীমাবদ্ধ হয়ে থাকত। ডিসেম্বর থেকে মে পর্যন্ত বাংলাদেশে শুকনা মৌসুম, এ সময়ে অতি সামান্যই কৃষি কাজ হয়ে থাকে। হাজার হাজার গ্রামবাসী কৃষি শ্রমের উপর নির্ভর করছিল। ফলে ব্যাপারটি এক বিরাট সমস্যার আকার ধারণ করে। এ ছিল এমন এক সমস্যা যার পরিধি কেবল বাড়তেই থাকে। ১৯৬০ এ আমরা একে মূল সমস্যা বলে চিহ্নিত করি। কিন্তু সরকার পর্যায়ে একে তখনও একটি একপেশে সমস্যা বলে বিবেচনা করা হচ্ছিল। তারা মনে মনে ভাবতেন, এ সম্বন্ধে একটা কিছু করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখলাম, সাধারণ বেকারত্ব বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য একটি গুরুতর সমস্যা। অনতিবিলম্বে এর সমাধান করতে হবে।"[২]

পল্লী পূর্ত কর্মসূীচর মডেল: আখতার হামিদ খান কুমিল্লা মডেলে পল্লী পূর্ত সম্পর্কে যা বলেছেন তা হলো, "আমরা দু'টি সমস্যাকে একত্র করে নিলাম। প্রথম সমস্যাটি ছিল, রাস্তাঘাট তৈরী, খাল খনন, বেড়ি বাঁধ উত্তোলন ইত্যাদির প্রচন্ড প্রয়োজনীয়তা। দ্বিতীয়টি ছিল, শুকনা মৌসুমে হাজার হাজার লোকের অলস ভাবে বসে থাকা। দু'টিকে এক করে কেন কাজে অগ্রসর হওয়া যাবে না ? আমরা স্টাডির পর স্টাডি করে যেতে লাগলাম। অবশেষে সমাধানের পথে দিগন্তে আলোর রশ্মি দেখা দিল। ১৯৬০ এ আমরা চীনে কী হচ্ছে তা দেখার জন্য স্টাডি করছিলাম। সে ছিল তাদের বিরাট এক উত্থানের সময় এবং এ ব্যাপারে চলছিল প্রচুর প্রচার প্রচারণা। শুধু পশ্চিমা মাধ্যমেই নয়, চীনাদের কাছ থেকেও আমরা তথ্য পাচ্ছিলাম। ভারতের সঙ্গে তখন চীনের খুব গাঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিলনা। পাকিস্তানের সঙ্গে সখ্যতা ছিল। সেজন্য এ সব তথ্য পেতে কোন বাধা নিষেধ ছিল না। আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়, গ্রাম উন্নয়নে যে অগ্রাধিকার দিতে হবে চীনারা তা বুঝতে পেরেছে। আরও প্রতীয়মান হলো, কৃষির উন্নতি করতে হলে আমাদিগকে প্রথম অবকাঠামো তৈরী করতে হবে এবং জমি রক্ষা করতে হবে। আমরা সেজন্য সর্বত্র পূর্ত কর্মসূচী সংগঠন করতে লাগলাম। চীনারা

সর্বান্তঃকরণেই বুঝতে পেরেছিল, জনগণকে অলস ভাবে বসিয়ে রাখলে চলবে না। তাদেরকে অবশ্যই কোনো না কোনো কাজে নিয়োগ করতে হবে। আমরা তখন পূর্ত কনসেপ্ট বা মানুষকে কাজে লাগানোর ধারণা ধার করলাম। কিন্তু তার জন্য আমাদিগকে নিজস্ব সাংগঠনিক কাঠামো তৈরী করতে হবে। এ ব্যাপারে আমার অভিজ্ঞতাই আমার জন্য সহায়ক হয়েছিল। আমি যখন তরুণ অফিসার ছিলাম তখন আমাকে গ্রাম এলাকায় কাজ করতে হত। তখন দেখেছি প্রায় প্রতি বৎসর আমাদিগকে বন্যা অথবা অনাবৃষ্টির সমস্যা মোকাবিলা করতে হয়। সরকারকে তখন বাধ্য হয়ে কিছু না কিছু করতে হয়, মানুষের দূরবস্থা দূর করার জন্য। তাদের অর্থনীতিকে পুনর্বাসিত করার জন্য। বাংলার ভয়ঙ্কর শস্য হানির পর কৃষকের অবস্থা এমন হয় যে, তাদেরকে সরকারের সাহায্য নিয়ে পায়ের উপর দাঁড়াতে হয়। এ সকল অবস্থা সামাল দেয়ার জন্য আমাদের সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে যেত। বলা বাহুল্য, এই অভিজ্ঞতা আমাকে পূর্ত কর্মসূচীর মডেল সৃষ্টি করতে সাহায্য করে। পূর্ত কর্মসূচীকে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করা হয়। জনগণের মতামত অনুসারে খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কাজ গুলো করতে হয় সেগুলো ছিল রাস্তাঘাট তৈরিকরণ, খাল খনন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ কার্য। কেন এ অতি গুরুত্বপূর্ণ কাজটা করার দায়িত্ব স্থানীয় কাউন্সিলকে দেয়া হবে না, এর সাহায্যে জীবনী শক্তি অর্জন করার জন্য? নতুন প্রশাসনিক কাঠামোর জন্য প্রয়োজন হয় খুব উঁচু মানের বিকেন্দ্রীকরণ এবং এটা গ্রাম এলাকায় সরকারের পুরানো ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে যেত। পুরানো ঐতিহ্য এ রূপ ছিল, যদি গ্রামে কিছু করতে হয় বা তা নিয়ন্ত্রণ করতে হয়, সেটা করতে হবে টেস্ট ওয়ার্ক বা রিলিফ ওয়ার্কের মতো। অথবা যদি কাজটা হয় কিছুটা স্থায়ী ধরণের তাহলে তা ইঞ্জিনিয়ার ও তাঁর কন্ট্রাক্টরগণ করবেন। আমাদের মডেল ডেপুটি কমিশনার নয়, সহকর্মী গণ নয়, কন্ট্রাক্টর গণ নয়, করবেন স্থানীয় কাউন্সিল। বিস্তৃত আলোচনায় যেতে আমার সময় নেই। এ হলো আমরা যে সকল অগ্রাধিকার আবিস্কার করেছিলাম সেগুলোর সূচনা। আর এ হলো অগ্রাধিকার অনুসারে কাজ করার উদ্দেশ্যে প্রশাসনিক কাঠামো উন্নয়নের প্রচেষ্টা। স্থানীয় সরকার পূর্ত কর্মসূচীর সম্মিলিত মডেল সৃষ্টি করেছিল কাজের সুযোগ এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য। সৌভাগ্যজনক অবস্থায় এটি ৪০০টি থানায় ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল এবং সবাই তা গ্রহণ করেছিল। এ ছিল আমাদের জন্য খুব ব্যস্ত সময়। কিন্তু সহসা আমাদিগকে মাত্র ছয় সপ্তাহের মধ্যে ৪০০ জন অফিসারকে প্রশিক্ষণ দিতে বলা হয়। সে প্রশিক্ষণে ৪০০ জন অফিসারকে একেবারে একটা বড় সভা ডেকে দেয়া সম্ভব ছিলনা। আমরা সেজন্য তাদেরকে ছোট ছোট গ্রুপে প্রশিক্ষণ দেই। আমরা এই সকল অফিসারকে লিখিত নক্শা দেয়ার উদ্দেশ্যে ম্যানুয়াল লিখি, ইনস্ট্রাকশন সিট লিখি, এ ছিল করণীয়। এ ছিল জনগণকে সংগঠিত

করার উপায় এবং এ ছিল কিরূপে হিসেব রাখতে হয় তার উপায় সমূহ। সারা প্রদেশে আমাদের এ মডেল দ্বি-গুণ ও ত্রি-গুণিত আকারে ছড়িয়ে দেয়া হয়।”[৩]

একটি নতুন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মডেল : নতুন সম্প্রসারণ পদ্ধতির মডেল উদ্ভাবন সম্পর্কে আখতার হামিদ খানের ভাষ্য হলো এরূপ, “আমরা কৃষি সম্প্রসারণের নতুন কনসেপ্ট বা ধারণার উদ্ভাবন করি। তখন দু'টি মাত্র মডেল প্রচলিত ছিল। আমাদের মডেলটি ‘ল্যান্ড গ্র্যান্ট’ কলেজ থেকে ধার করে আনা হয়। এ মডেলটি ছিল বিশেষজ্ঞ ও গ্রামবাসীদের মধ্যেকার সংযোগ, প্রদর্শনী সমূহ ও পরিব্যাপ্তকারী নেতা বাছাই। অন্যটি ছিল কম্যুউনিটি ডেভেলপমেন্ট মডেল। এ মডেলটি গ্রাম পর্যায়ের বহুমুখী কর্মীদেরকে কাজে প্রবৃত্ত করতো । তারা আশা করতো যে, প্রত্যেক ডিপার্টমেন্ট তাদের কর্মীদের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান গ্রামবাসীদের মধ্যে বিতরণ করবে। কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যুব ক্লাব, কম্যুউনিটি অর্গানাইজেশন এবং অন্যান্য কাজের তত্ত্বাবধান করবে। ১৯৫৯ এ যে মৌলিক উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল, যা কম্যুউনিটি ডেভেলপমেন্ট প্রচেষ্টা নিয়ে গর্ব করতো , তা বাস্পাকারে উড়ে গিয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, কম্যুউনিটি ডেভেলপমেন্টের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীরা গ্রামের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকদিগকে দেখে না। তাদের অধিকাংশ কাজই গ্রামের অপেক্ষাকৃত ধনী ও সমৃদ্ধশালী পরিবার গুলোর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে। সাধারণ ভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে তারা অকার্যকর। যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিজ্ঞানীগণ একটি বিখ্যাত রিপোর্ট প্রদান করেন। রিপোর্টটি সংকলিত করে ‘ফোর্ড ফাউন্ডেশন’। রিপোর্টে তারা বলেন, কম্যুউনিটি ডেভেলপমেন্টের গ্রাম পর্যায়ের কর্মীদেরকে অবশ্যই কৃষি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। তারা শস্য উৎপাদনের জন্য ভালো এজেন্ট নন। বিশেষজ্ঞ কৃষি সম্প্রসারণকারীগণ তাঁদের কাজের ভার গ্রহণ করবেন। ১৯৫৯ এ আমরা বিভিন্ন মতামতের জন্য দ্বিধা দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যাই। আমাদের চারদিকে ছড়িয়ে দেয়ার পদ্ধতি সংক্রান্ত গবেষণা আমাদিগকে নতুন একটি মডেল উদ্ভাবন করতে সাহায্য করে দেয়। অধিকন্তু থানা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে গ্রামের খুব কাছে নিয়ে আসা যায়। যদি ১০০ বর্গমাইল এলাকার কেন্দ্রটিকে একেবারে মাঝখানে দেয়া হয়, তাহলে কোন গ্রামই কেন্দ্র থেকে ৫ ও ৭ মাইলের বেশী দূরত্বে হবে না। দ্বিতীয়ত: গ্রামবাসীকে বিভিন্ন ভাবে সংগঠিত করা হয়। তাদেরকে তাদের নিজেদের প্রতিনিধি বাছাই করতে বলা হয়। এই নেতাদেরকে নিয়ে আসা হয় কেন্দ্রে। বিশেষজ্ঞরা তাদেরকে ঠিক ঠিক ক্লাস রুমর পরিবেশে এনে প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। আমরা বিস্ময়ের সহিত লক্ষ্য করলাম, যদিও আমাদের পক্ষে কোন প্রকার বিস্ময় বোধ করা ঠিক ছিল না, তবুও সে যাই হোক, এর ফল ছিল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রামের নেতারা নিয়মিত ভাবে এলো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে ক্লাসে বসল, বিশেষজ্ঞদের কথা শুনল, এ সকল ব্যাপারে বিরাট ঘটনার সূত্রপাত ঘটল। এ ছাড়া যখন তারা একত্র হতো তখন একে অপরকে লিখা তুলনা করে দেখত। এক

Dhaka University Institutional Repository

কথায়, সাপ্তাহিক কনফারেন্স গুলো তাদেরকে তাদের নিজস্ব বুদ্ধির পরিমন্ডল ও সামাজিক নিঃসঙ্গতা থেকে টেনে বাইরে নিয়ে এল। তাদের মনে সৃষ্টিশীল মনোবল গড়ে তুলল। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান আমরা আবিস্কার করেছিলাম। তা ছিল, কৃষির উন্নতি যে সকল জিনিষের উপর নির্ভর করে, সেগুলোর জন্য কিছুটা সম্মিলিত এবং একক প্রচেষ্টার প্রয়োজন হতো। মাত্র কয়েকটা ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি গ্রহণ অতি সাধারণ ব্যক্তি উদ্যোগ ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। ছোট ছোট জোতে সেচ কার্যের ব্যাপারটি উদাহরণ হিসেবে ধরুণ। একজন সেচ কাজ শুরু করেছে এবং অন্যেরা তাকে অনুসরণ করছে, এমন প্রশ্ন এখানে ছিল না। যদি সেচকার্য প্রবর্তিত করতে হতো। আমাদের কাছে এমন টেক্‌নোলজি ছিলনা, যা দিয়ে প্রতি দু' একর জমির মালিকের জন্য একটা করে ছোট পাম্প মেশিনের ব্যবস্থা করা যায়। সেচ ছাড়াও অন্যান্য ব্যাপারেও সম্মিলিত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করতে হত। সেজন্য আমরা যদি ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য কৃষির উন্নতি প্রথমে চাইতাম, তাহলে তাদেরকে বিভিন্ন গ্রুপে সংগঠিত করতো াম। প্রত্যেক গ্রুপকে সাপ্তাহিক সভা এর শৃঙ্খলা গ্রহণ করতে হতো। তাদের প্রতিনিধি কেন্দ্রে গিয়ে যা শিখেছে, তা তাদের নিকট থেকে শিখতে হতো বা সকলের সম্মিলিত আয়োজনের সময় যা তারা শিখেছে; তা থেকে শিখতে হতো। পদ্ধতিটা ছিল চাকার গতি সঞ্চালনের মতো। এই মডেলের ভিতর গ্রুপের প্রতিনিধি, গ্রুপের সাপ্তাহিক সভা, কেন্দ্রে সাপ্তাহিক প্রশিক্ষণ ক্লাস, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ সরবরাহ ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। দলের প্রতিনিধিদেরকে শুরুতে যে প্রশিক্ষণ দেয়া হতো তা নয়, তাদেরকে ঋণ শোধ করার জন্য পুঁজি, কৃষি সার, যন্ত্রপাতি কেন্দ্র থেকে দেয়া হতো। এগুলো কোনভাবেই মৌলিক ধারণা ছিলনা। কিন্তু বাস্তবায়ন, একত্রকরণ ও সমন্বিত করণ ইত্যাদি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি গ্রাম উন্নয়নের যে কোনো রচনা বা ম্যানুয়াল হাতে নিয়ে দেখুন। দেখবেন, সবই এতে আছে। কিন্তু বাইরে মাঠ পর্যায়ে গিয়ে দেখবেন, উদ্দেশ্য ও উপলব্ধির মধ্যে বিরাজ করছে বিরাট এক ফাঁক। আমাদের কৃষি সম্প্রসারণের মডেল বিতর্কিতই রয়ে যায়। সবশেষে একে প্রত্যাখ্যান করা হয়। অবশ্য এ কম্যুউনিটি ডেভেলপমেন্ট ১৯৬০ খৃষ্টাব্দেই মৃতরূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশনের রিপোর্টের প্রভাব এবং অলৌকিক কিছু প্রত্যাশার জন্য আমাদের মডেল, যার ভিত্তি ছিল গ্রামীণ দল, সাপ্তাহিক সভা, প্রশিক্ষণের শৃঙ্খলা, মডেল কৃষক ও বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ ইত্যাদি অবহিত করা। মনে হয়েছিল, কৃষি উৎপাদন আরও দ্রুততর ও সহজে বাড়ানো যাবে সম্প্রসারণ এজেন্ট ও প্যাকেজ কর্মসূচীর মাধ্যমে।"[৪]

দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায়ের মডেল : দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় মডেল বা কর্মসূচী সম্পর্কে জনাব আখতার হামিদ খানের মন্তব্য এমন, "এরপর আমরা সমবায় মডেলের উদ্ভাবন ঘটালাম। কর্মসূচীটি পুরোপুরি ভাবে কুমিল্লা কর্মসূচী নামে সবার কাছে দ্রুত পরিচিতি লাভ করে। যদিও এটি ছিল আমাদের

Dhaka University Institutional Repository

কাছে পরস্পরে সম্পর্কযুক্ত কয়েকটি কর্মসূচীর একটি । অবশ্য এটি গুরুত্বহীন ছিল না। ইতিমধ্যে আমাদের গবেষণায় ধরা পড়েছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানে রায়তি স্বত্ত্ব বা জমি ভোগ দখল করার স্বত্ত্বে বিপ্লব ঘটে। ইতিপূর্বে যে গ্রামীণ অভিজাত শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। জমিদার শ্রেণী যাদেরকে বড় ভূস্বামী বলা হতো, তারাও চলে গেছেন। যদিও গ্রামের সমাজ জীবনে তখনও একটি ধনী শোষক শ্রেণী রয়ে গিয়েছিল। এখন গ্রামের ক্ষুদ্র কৃষকেরা গ্রামের শতকরা ৮০ ভাগ জমির মালিক এবং তাদের অধিকাংশরই জমি ৫ একরের নিচে। এই ছিল ছোট ছোট মালিকদের স্থায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠার উপাদান। কারণ তাদের অধিকাংশই ছিল ক্ষুদ্র এবং অধিকাংশ জমির মালিক। তারা ছিল প্রাথমিক উৎপাদনকারী। কারণ তারা শুধু তাদের নিজেদের জমিই চাষ করতো না, বড় বড় মালিকের জমি পত্তন নিয়েও চাষ করতো । ১৯৬৫ এর পূর্ব পর্যন্ত এ রকম পত্তন দেয়া বড় বড় মালিকদের পক্ষে লাভজনকই ছিল। ছোট ছোট মালিকদের তখন চাষের গরু ও হালের লাঙ্গল এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ছিল। পত্তন নেয়ার বদলে সে ভাল অর্থ কড়ি পেত। কিন্তু ক্ষুদ্র কৃষকদের পুঁজির খুব অভাব ছিল। এ সুযোগে গ্রামের সুদখোর মহাজনেরা তাদেরকে অতি উচ্চ সুদের হারে পুঁজি দিত। ব্যবসা বাণিজ্যে যে বিরাজমান অবস্থা ছিল, তার দ্বারাও ক্ষদ্র কৃষকেরা কষ্ট ভোগ করতো । ব্যবসায় বাণিজ্য ও মহাজনী কারবার দু'টিই মানুষকে যা অনুন্নত করে এমন পদ্ধতি। এগুলো কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ করতো । এ কথা খুব পরিস্কার ছিল যে, কৃষকদেরকে আরও অধিক উৎপাদনশীল হতে হবে এবং তাদেরকে উন্নত কারিগরি বিদ্যা অর্জন করতে হবে। কিন্তু তাদের প্রথম প্রতিবন্ধকতামূলক উপাদান ছিল জমি উন্নত করা। জমি উন্নত করা না গেলে নতুন কারিগরি বিদ্যাও প্রয়োগ করা যেত না। দ্বিতীয় প্রতিবন্ধকতামূলক উপাদান ছিল, সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ীরা। যারা তাদের আয়ের একটা বড় অংশ কেড়ে নিত। শেষোক্ত দু'টি প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতির নক্শা করা হয়, ঠিক যেভাবে প্রথমটা দূর করার জন্য পূর্ত কর্মসূচীর নক্শা করা হয়। সমবায় আমাদের দেশে নতুন কিছু ছিল না । কিন্তু সেগুলোর অধিকাংশই খুব খারাপ অবস্থায় ছিল, ক্ষুদ্র কৃষকদের এতে কোন সাহায্যে আসছিল না। কিন্তু সে সব সত্ত্বেও আমাদের কাঠামোর ভিতরে সমবায় খুবই প্রয়োজনীয় হতে পেরেছিল। আপনাদের স্মরণ রাখা উচিত, আমাদের সরকার কোন সমাজতান্ত্রিক সরকার ছিল না এবং আমাদের একাডেমীও কোন বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ছিল না। এ ছিল রক্ষণশীল সরকারের অধীনে একটি অধীনস্থ ডিপার্টমেন্ট বা বিভাগ মাত্র। প্রস্তুতকৃত কাঠামোর ভিতরে, আমরা ভাবলাম, ক্ষুদ্র কৃষকদেরকে সেবাদান করা সম্ভব দ্বি-স্তর বিশিষ্ট সমবায় প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। আরও ভাবলাম, থানা কেন্দ্রের পাশাপাশি সমবায় ফেডারেশনে রেখে পুঁজি, ব্যাংকিং তত্ত্বাবধান ও প্রশিক্ষণ একত্র করা যাবে এবং

প্রতি গ্রামে কৃষকদের সমবায়ে যাতায়াত করা সহজ করা যাবে। গ্রামের সমিতিগুলোর সদস্যগণ যারা কাছাকাছি থাকেন তারা পরস্পরকে সাহায্য ও বিশ্বাস করতে শিখবেন। এ ছিল সেই রাইফেইসেন প্রিন্সিপাল বা নীতি, পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করা ও পরস্পরকে সাহায্য এবং বিশ্বাস করা। সমবায় প্রতিষ্ঠা ছিল আমাদের কঠিনতম কাজ। ক্ষুদ্র কৃষকেরা যারা সুদখোর মহাজন ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা শোষিত হচ্ছিল, তাদের মধ্যে এই ধারণা ইতিমধ্যেই জড়িত হয়েছিল। এরা ট্রেড ইউনিয়ন ও উৎপাদনকারীদের ইউনিয়নের উপর জোর দিচ্ছিল। বলছিল, তাদের নতুন সমবায় পদ্ধতি সেকেলে পদ্ধতি থেকে বেরিয়ে আসছে। স্ব-শাসিত প্রতিষ্ঠান সমূহের একটি প্রতিবন্ধকতা ছিল তাদের প্রতি সরকারের পিতৃসুলভ মনোভাব। সে মনোভাবের মধ্যে ছিল ক্ষুদ্র কৃষকদের কিছু দিয়ে সাহায্য করা। যেন, সরকার তাদের কাছে ঈশ্বর বনে গেছেন। অভ্যাসটা আমাদের জনসাধারণের মনেও বদ্ধমুল হয়ে গিয়েছিল। দুর্ভাগ্যবশত: সরকারী অফিসারগণ অনুমান করেন যে, তারা সত্যিই ঈশ্বরের মতো। এর জন্য কোনো যুক্তিযুক্ততা ছিল না। স্ব-শাসনের জন্য প্রয়োজন ছিল মিতব্যয়িতা ও নিজেদের অর্থ ব্যাংকে রাখার অভ্যাস গড়ে তোলার। ব্যাংকে সঞ্চয় না করে একটি পুঁজি পদ্ধতি গড়ে তোলার জন্য অনেক পিতৃমূলক প্রচেষ্টা নেয়া হয়। যদিও তা ছিল নিবুর্দ্ধিতা। পুঁজি দেয়া হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেছে কৃষকদের দিক থেকে কোন সঞ্চয় হয়নি। এ ধরণের পদ্ধতি ভেঙ্গে পড়া ছিল সময়ের প্রশ্নমাত্র। তবে অপ্রত্যাশিত হলেও আমরা দেখেছিলাম, আমাদের এলাকার কৃষকদের নতুন কোনো অভ্যাস গড়ে তোলা। নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের জন্য যথেষ্ট বুদ্ধিমান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পূর্ত কর্মসূচী, রাস্তা তৈরী, খাল খনন, সেচ এবং গ্রামীণ গ্রুপ গঠনের পর দেখা গেল নতুন পদ্ধতি খুব দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও কৃষি বিশেষজ্ঞ গণ আমাদিগকে দোষ দিচ্ছিলেন এই বলে যে, আমাদের গতি খুব ধীর এবং আমরা কচ্ছপের মতো ধীর গতিতে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছি। তদ্সত্ত্বেও কিন্তু পাঁচ বৎসরের মধ্যে আমরা কুমিল্লা থানাকে দেশের অন্য যে কোন থানার চেয়ে উৎপাদনে আগে নিয়ে গেলাম।”[৫]

অন্যান্য মডেল : কুমিল্লা মডেলের অন্যান্য দিক সম্পর্কে জনাব খানের প্রাসঙ্গিক ধারণা ছিল এরুপ, “এসব ছাড়া আমরা অকৃষি সমবায় যেমন: রিক্শাওয়ালা, কারিগর ইত্যাদিদের জন্যও সমবায়ের মডেল তৈরি করি। আমরা অশিক্ষিত ও রক্ষণশীল মুসলমান জনসংখ্যা যেখানে নারীরা পর্দার অন্তরালে থেকে স্বতন্ত্র জীবনযাপনকরে, তাদের জন্যও একটি পরিবার পরিকল্পনার মডেল তৈরী করি। সমবায় ছাড়া গ্রামের দাই, ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় নেতা, ইমাম ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্যও একটি মডেল তৈরী করি। উদ্দেশ্য তাদেরকেও প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি এবং গ্রামের স্কুলের ছাত্রদের

মধ্যে কৃষি কাজ ও কৃষি শিল্পের প্রতি যে ঝোঁক সৃষ্টি করা হচ্ছিল, তার সঙ্গে একীভূত করে নেয়া। সব মিলিয়ে আমরা এক ডজন মডেল তৈরী করে ফেলি।"[৬]

ড. আখতার হামিদ খানের উদ্ভাবিত উল্লিখিত মডেল গুলো অনুসরণ করে গ্রামের মানুষ বিশেষ করে কৃষক সমাজ কৃষি ক্ষেত্রে অতীত কৃষি উৎপাদনের চেয়ে কাঙ্খিত ফসল বাড়াতে সক্ষম হয়। যা পরবর্তীতে গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভাবে ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়।

তোফায়েল আহমেদ : প্রতিভাবান লেখক তোফায়েল আহমেদ আজীবন গ্রামীণ দরিদ্র গণ মানুষের কল্যাণার্থে কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবতা নিয়ে বহু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ "সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী" এ গবেষণায় তথ্য-উপাত্ত যোগান দিয়ে ব্যাপক ভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছেন। প্রায় পঞ্চশ বৎসর যাবত বাংলাদেশের যে দলই সরকার গঠন করেছেন সে দলই গ্রামোন্নয়নের চেয়ে শহর উন্নয়ননে বেশী অগ্রাধিকার দিয়েছেন। নানা উন্নয়নমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নও করছেন। এ বইয়ে উল্লিখিত বিষয় সমূহ তিনি সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। গ্রামীণ কর্মসূচী গুলোর করুণ অবস্থা এবং দুর্নীতিবাজদের কর্মসূচী থেকে অর্থ লুটপাটের মহোৎসবের বাস্তব কাহিনীর ব্যাপক তথ্য ভিত্তিক লেখাই এক্ষেত্রে গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে বহু মাত্রিক দিক নির্দেশনা দিয়েছে। পাশাপাশি গ্রামোন্নয়ন যে একেবারেই অবহেলিত তাও তিনি অস্বীকার করেছেন না। তবে এ উন্নয়ন গ্রামের জনসংখ্যানুপাতে খুবই নগণ্য। তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিমত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, "নগরায়ন দ্রুততার সাথে প্রসারিত হলেও বাংলাদেশ এখনও মুলত কতগুলো গ্রামের সমষ্টি। এ দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন আরও বহুদিন। তাই ঐ গ্রাম সমূহের উপর উন্নয়নের প্রায় সর্ম্পূণাংশ না হলেও বহুলাংশে নির্ভরশীল থাকবে। অতীতের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টাও জাতীয় পরিকল্পনা সমুহে গ্রামোন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়নে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে আসছে এবং ঐ ধারা এখনও অব্যাহত আছে। পঞ্চাশের দশককে ভিত্তি করে একবিংশ শতকের বর্তমান সময় পর্যন্ত এদেশে তথা এদেশের গ্রামাঞ্চলে উন্নয়ন প্রচেষ্টার অগ্রগতির ধারাক্রমকে বিশ্লেষণে দেখা যাবে তা হয়তো একটি সরল রেখা ধরে এগোয়নি। বিভিন্ন কর্মসূচীর প্রভাবে হোক অথবা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের অনুসংগী হয়েই হোক, গ্রামাঞ্চলে সামগ্রিকভাবে উন্নয়নের পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট অনেকটা গুণগত পরিবর্তন সাধিক হয়েছে। তবে সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর জন্য নতুন কোন কর্মসূচী নয়। কুমিল্লা পদ্ধতির মূল দর্শন নিজস্ব ব্যবস্থাপনা ও নিজস্ব সম্পদে বলীয়ান গ্রাম পর্যায়ে শক্তিশালী গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি ও তার যথাযথ বিকাশ সাধন। সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী কুমিল্লার সে পুরোনো দর্শনের সময়োপযোগী সংস্করণ মাত্র, কুমিল্লা পদ্ধতির গ্রাম পর্যায়ের মূল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পুন:স্থাপনের

প্রচেষ্টা হিসেবেও দেখা যেতে পারে। ৭০ এর দশক পর্যন্ত এদেশে কুমিল্লা উদ্ভাবিত বিভিন্ন কর্মসূচীই সরকারের একমাত্র কর্মসূচী হিসেবে চালু ছিল এবং এর মাঝামাঝি থেকে বিচ্ছিন্ন ভাবে নতুন নতুন কর্মসূচী চালু করা হয়। আশির দশকে অনেক পরিবর্তনের মধ্যে যে গুণগত পরিবর্তনটি পল্লী উন্নয়ন প্রক্রিয়ার নতুন প্রজন্মের সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, তা হচ্ছে সংগঠন ও কর্মসূচীর অবাধ বিস্তার, সম্পদের বিভিন্নমুখী প্রবাহ এবং ক্ষেত্র বিশেষে মাঠ পর্যায়ের বহু সংগঠনের অর্থহীন প্রতিযোগিতা। সরকারের উন্নয়ন দর্শন ও কর্ম-কৌশলে অস্পষ্টতার কারণে চালু কর্মসূচী গুলো অনেক ক্ষেত্রে গতি ও দিক নির্দেশনা হারিয়ে ফেলেছে।”[৭]

আবদুল বায়েস : শিক্ষাবিদ্ আবদুল বায়েস বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক উন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে অংশ নিয়ে সরকারের সহযোগী হিসেবে কাজ করে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। শিক্ষা ব্যবস্থাপনার সাথে সাথে তিনি গ্রামের কৃষি উন্নয়ন কর্মকান্ড নিয়ে কিছু গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কৃষির অতীত ও বর্তমান প্রেক্ষাপট তাঁর রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। অদূর অতীত থেকে বর্তমান বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনার কিছু কিছু দিক নির্দেশনা উস্থাপনে তিনি সক্ষম হয়েছেন। কৃষির উপর নির্ভরশীল গ্রামের দরিদ্র মানুষের জীবন মান নিয়ে তিনি কর্ম পদ্ধতি উদ্ভাবনের কথা তাঁর কোন কোন গ্রন্থে সুন্দর ভাবে তুলে ধরছেন । তাঁর গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবতা ভিত্তিক একটি লেখার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত হলো :

“The first major drive for a public policy in Agriculture in Bangladesh came in the early 1960s. through the establishment of the Agricultural Commission. The main impetus was to from active policies in order to increase production of the Agricultural sector, in particular, establishing public contrct of both procurement and distribution of modern agricultural inputs, enqancing involvement in irrigation and the like (Mujeri and Abdulla 1994). The East Pakistan Agriculture Development Corporation later known as the Bangladesh Agricultural Development Corporation (BADC). Since independence was formed in 1963 at the recommendation of the commission. The BADC was responsible for the procurement and distribution of inputs, e.g, fertilizers, small scale irrigation equipment, seeds, pesticides and the like BADC in course of time, soon developed in to a vast organization and virtually held

a monopoly position over the Agricultural input market. However, it had to act at as per the pricing and related policies of the Government. Inspite of this monopoly position in the distribution of Agricultural inputs, unfortunately various programmes have not turned out to be satisfactory."[8]

ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার : গবেষক ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদারের চিন্তা চেতনায় সব সময় যে জিনিষটি কাজ করতো তা হলো গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে সরকার, বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠন কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচী গুলোর যথাযথ বাস্তবতার তথ্য যোগান। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে যেয়ে গ্রামের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়িয়েছেন বছর পর বছর ধরে। গ্রামে দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়ার পিছনের কারণ উল্লেখ করতে যেয়ে তিনি হতাশার কথা জানিয়ে কর্মসূচী তদারকারীগণকে চিহ্নিত করেছেন। তদারককারী ব্যক্তিগণ কর্মসূচীর কার্যক্রম দেখভালে ব্যাপক অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ ও অর্থ আত্মসাৎ করে থাকেন। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন দীর্ঘ সময় অতিক্রম করলেও গ্রামের মানুষ এর সফলতার মুখ দেখতে পারছেনা।

গবেষকের লেখা কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমী থেকে প্রাপ্ত একটি journal এ গ্রামোন্নয়ন বিষয়ক কর্মসূচী ও বাস্তবতায় দারিদ্র্য বিমোচন না হওয়ার কথা উল্লেখ আছে এভাবে, "গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রকল্প গুলো দেখাশুনা ও পর্যবেক্ষণের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সেগুলো ফলপ্রসূ হয়নি। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উৎপাদন অধিকার বৃদ্ধির সাথে তাদের ক্ষমতায়ন সচেতনতায়নের উদ্দেশ্যে সরকার মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে প্রত্যক্ষ কিছু কর্মসূচী যেমনঃ নিরাপত্তা বেষ্টনী, পল্লী অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ঋণ ও বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও সরকার ভিজিএফ, ভিজিডি, টি-আর, বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা প্রভৃতি সামাজিক নিরাপত্তা মূলক প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। দ্রব্যমূল্যের উধ্বগতি রোধে খোলাবাজারে চাল, গম ও আটা বিক্রি, সরকারী কর্মচারীদের জন্য প্রাইস দোকান ইত্যাদি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। সরকার কৃষকদের জন্য মাত্র ১০ টাকার ব্যাংক একাউন্ট খোলার মাধ্যমে কৃষিতে ভর্তুকি, কৃষি ঋণ বিতরণ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারের গৃহীত এসব কর্মসূচী বেশীরভাগ বাস্তবায়নকারী সংগঠন হলো ইউনিয়ন পরিষদ। কিন্তু ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রমে সুশাসন না থাকায় এসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন হলেও দারিদ্র্য বিমোচন টেকসই হচ্ছে না।"[৯]

এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন : এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন লেখক দ্বয় বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের উপর দীর্ঘ দিন যাবত কাজ করে আসছেন। এনজিও সংগঠন কীভাবে গ্রামোন্নয়নে কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে সে সকল দিক গুলো বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। একেবারে গোড়ার দিক থেকে অদ্যাবদি এনজিও সংগঠনের কর্ম পদ্ধতির উন্নয়ন/অনুন্নয় বিষয়ে তাঁরা আলোকপাত করতে চেষ্টা করেছেন। যে সকল পন্ডিত ব্যক্তি এনজিও কর্মকান্ডে অংশ করে গ্রামের দরিদ্র মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তনে নিজেদেও সম্পৃক্ত করেছেন সে সকল ব্যক্তি বর্গের কৃতিত্ব নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

সরকার গ্রামোন্নয়নের শপথ নিয়ে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন প্রতিনিয়ত, সেখানে এনজিও গুলো পুঁজিহীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প চালু করে কিস্তির মাধ্যমে অল্প অল্প করে ঋণের টাকা পরিশোধের সুযোগ করে দিয়ে ঐসব বুভুক্ষ দরিদ্র মানুষকে খাদ্য সংগ্রহের সন্ধান দিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে গ্রামের হত দরিদ্র মানুষকে সংগঠিত করে নিজেরাই পরস্পরের সহযোগী হয়ে প্রতিষ্ঠানটি দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন। ক্ষুদ্র ঋণ দানের পাশাপাশি অন্ধকারে নিমজ্জিত গ্রামীণ অশিক্ষিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে শিক্ষার আলো প্রজ্বলনে তারা স্থানে স্থানে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছেন।

গবেষকদ্বয় Rural Development Programme and the Role of Ngos in Bangladesh নামক একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে সরকারের পাশাপাশি এনজিওদের গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবতার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করতে যেয়ে বলেন, “Many studies and authorities have defined rural development in different ways. Rural development aims at improvement of the quality of life of the rural people especially those who are of various categories. Rural development encompasses the whole range of activities related to the improvement of the following:

a) Environment i.e. land, water and air,

b) Physical infrastructure such as roads, waterway, irrigation channels, embankment, housing, sanitation energy etc;

c) People i.e. the education and training, health, population control etc;

d) Economic, i.e. the hole range of economic activities such as agriculture, fishery, livestock, horticulture, trade and commerce, banking, rural industries etc. and

e) Welfare activities such as relief, recreation, culture, old age security etc.

To achieve improvment of the above mentioned activities different stregies were followed since several dcades. Strategies in British period were rural reconstruction from government side and a few private initiatives such as Rabindranath tagore's Sriniketan. Besides a few outstanding civilians went out of their way and implemented many innovative programmes. Mention may be made of the constructive works of F.L. Brayan, G.S. Dutta, I.I.M. Nurunnabi Chowdhury, H.M. Ishaque etc. During the Bangladesh period, a major thrust for rural development has been made by the Non-Government Organizations (NGOs). But the contribution of NGOs in the development of Bangladesh has become a controversial issue. Judgement concerning their performance varies between two extremist there are those who believe the endeavour of NGOs. as repetitious and their activities largely insignificant. However, others consider NGOs. as completent and essential agents in the transaction of national development. Many development professionals and policy makers acknowledge that NGOs. are proficient to carry on benefits to the poor who are almost always ignored by the government programmes due to their disproportionate programme plaining and top down implementation procedure (ANGOCT:1984). The greater achivement of NGOs is considered to be in evolving organisations of the poor and associating them in development activities."[10]

আব্দুল্লাহ আল-মামুন : গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তনবতা নিয়ে লেখক দীর্ঘদিন যাবত গবেষণা কর্ম চালিয়ে আসছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঠকর্মী হিসেবে গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়িয়েছেন দিন, মাস, বছরব্যাপী। তিনি মানুষের জীবনযাত্রা স্বচক্ষে অবলোকন করে

তার দৃশ্যপট নিজের লেখনীতে উপস্থাপন করে গ্রামোন্নয়নের বাস্তবতা তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁর গবেষণা মূলক প্রবন্ধ 'The journl of Rural Development' এ একটি লেখার অংশ বিশেষ যেভাবে অবতারিত হয়েছে তাহলো, "Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), has been conducting socio-economic research since its inception. Research findings are used both as training meterials in the Academy and as information materials in the Ministries, Plaining Commission and by policy makers for drawing up development programmes. BARD has undertaken pilot projects to evolve rural development models. The academy is continuously searching out new models of rural development. Comprehensive Village Development Programme (CVDP), Small Farmer's Development Programme (SEDP), and Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project (WEINIP) are the new experimental projects of BARD. The last one is still running exclusively for women. Here it is noted the WEINIP is directly involved for nutritional improvement of rural society training such as nutrition education, health and sanitation, immunization, primary health care, reproductive health, safe motherhood and other related training have been given to the women activists through the rural cooperative society. They disseminate their knowledge through the weekly meeting to other villagers who are directly involved to the programme in the same village. Meanwhile credit support has been given to the villagers regarding income generating activities, such as cattle rearing, poultry farming, small scale business etc. Which ultimately improve their capital and income."[11]

গাজী সালেহ উদ্দিন: লেখক গাজী সালেহ উদ্দিন গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তাঁর লেখায় হরেক রকম কর্মপদ্ধতির কিছু মতামত এখানে অবতারণা করেছেন। তিনি অবহেলিত গ্রামীণ জনপদের মানুষের জীবনযাত্রা নিজে প্রত্যক্ষ করে তাঁর লেখায় পল্লী উন্নয়নে সরকারী বেসরকারী সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কর্মকান্ড উদ্ভাবনে সচেষ্ট হয়েছেন। এর মাধ্যমে তিনি সেসব পরিকল্পনার সবক

যথাযথভাবে বয়ান করেছেন। তিনি গ্রামের কম আয়ের মানুষের জীবন মান উন্নয়ন সাধনের কথা বলতে গিয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন পল্লী উন্নয়নের । আর এ স্তরের অশিক্ষিত, অসতেন মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি কিছু কিছু কর্মসূচীর গ্রহণ করে তা ব্যাপক ভাবে সম্প্রসারণের মাধ্যমে সুখী সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন প্রতিনিয়ত। গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত তাঁর কিছু লেখা নিচে ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো:

"গ্রামের মানুষের জীবিকা নির্বাহের প্রধান উৎস কৃষি। এ খাতে কাঙ্খিত উন্নয়ন না হওয়ায় গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছেনা এবং গ্রামের মানুষের অভাব অনটনও দূর হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে তিনি যথোপযুক্ত ভূমির স্বত্বাধিকার ও সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। বিভিন্ন শাসকের শাসনামলে গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের বিষয়টি বার বারই ছিল উপেক্ষিত। বরং তাদেরকে শোষণ করা হয়েছে আবহমানকাল ধরেই। তাছাড়া জনসংখ্যার ঘনত্ব আমাদের গ্রামীণ জীবন ব্যবস্থাকে একেবারে মেরুদন্ডহীন করে ফেলছে। এহেন কর্মকান্ড সম্পর্কে লেখক বলেন, "গ্রামীণ উন্নয়নের সাথে ভূমিস্বত্ব এবং ভূমি সংস্কার অত্যন্ত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি উন্নতি ছাড়া বাংলাদেশের গ্রামীণ উন্নয়ন ভাবা যায় না। এই কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন সময়ে সরকার বা রাষ্ট্র নায়করা চেষ্টা করে গেছেন এবং এখনও চেষ্টা করছেন। মুঘল, বৃটিশ, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ আমলেও কৃষি উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। তবে এ পদক্ষেপ গুলোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ভিন্নতা রয়েছে। এই সব উন্নয়ন আমাদের গ্রামীণ সমাজে বা আমাদের উন্নয়নে কতটুকু প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছে তা আলোচনার বিষয়। বিশেষ করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের সমাজ ব্যবস্থার আমল পরিবর্তন সাধিত করেছে। জমির মালিকানা ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৃটিশ পদ্ধতি হঠাৎ করে আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় চাপিয়ে দেয়ার ফলে স্বভাবতই কাঠামোগত পরিবর্তন আমাদের কৃষি ব্যবস্থায় হয়েছে। যা সমাজ ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। পাকিস্তান আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত লোপ পেলেও মূলতঃ সেই কাঠামোর কোন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে কিনা তা আমাদের দেখার বিষয়। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারেনি। ভূমি উর্বর হওয়া সত্বেও একর প্রতি ফলন খুব কম, পক্ষান্তরে জনসংখ্যা দ্রুত হারে বাড়ছে। এই জনসংখ্যা সীমিত রাখার কর্মসূচী সরকার গ্রহণ করেছে জন্ম নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।"[১২]

পল্লী উন্নয়নের বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক অবস্থা পর্যলোচনা করতে যেয়ে লেখক তাঁর লেখায় উল্লেখ করেন, "গ্রামীণ উন্নয়ন বা পল্লী উন্নয়ন বলতে অনেকে মনে করেন পল্লী অঞ্চলে কম আয়ের লোকদের জীবন ধারনের মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং সেই প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার উদ্যোগকে পল্লী উন্নয়ন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এই সংজ্ঞায় কৃষি উন্নয়নকে পল্লী উন্নয়নের সমার্থক হিসেবে দেখা

হয়নি, সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন এখানে স্বীকৃত, তবে পল্লীর সব শ্রেণির জন্য নয়। অনেকে বলেছেন যে পল্লী উন্নয়ন পৃথক কোন ব্যাপার নয়। সকল সরকারী বেসরকারী সংস্থা নিজ নিজ কর্মসূচী যেমন: কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি বাস্তবায়িত করলেই পল্লীর প্রাপ্যতা স্বতঃস্ফুর্ত ভাবেই মিলে যাবে। জাতীয় পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনায় এই স্বয়ংক্রিয় প্রতিফলনই পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নের রুপ নিবে। এইসব সংজ্ঞায় কোনটাতেই স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষমতা বলয়ের উল্লেখ করা হয়নি। পল্লী উন্নয়নের ব্যাপারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী অথবা কোন নীতি তারা অবলম্বন করবে তার কোন বিশ্লেষণ নেই। সব সংজ্ঞাতেই বহিরাগত 'পরিবর্তনকামী' মাঠকর্মীর ভূমিকাকে বড় করে দেখা হয়েছে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানীগণ অর্থনীতিবিদ্গণের মত এরকম সীমিত গন্ডিতে দেখেন না। সমাজবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে গ্রামীণ কাঠামোগত উন্নয়নই হচ্ছে গ্রামীণ উন্নয়ন। অর্থাৎ শুধুমাত্রই খাদ্য উৎপাদন বাড়ালেই গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়। তার সাথে সাথে গ্রামের যে সব সংগঠন আছে তার মৌলক কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন।"[১৩]

বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতা : বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী (বার্ড)-কুমিল্লা, গ্রামের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে প্রতিবছরই সরকার, বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তির গৃহীত উন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতার উপর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পাশাপাশি নিজেরাও কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। এ বছরও সংস্থাটি কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করছে। নিচে একাডেমীর কর্মসূচী ও বাস্তবতার একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ আলোকপাত করা হলো :

"One of the basic and most unique features of the Academy's programme is to design and conduct experimental project in its Laboratory Area as well as other parts of Bangladesh to test new ideas and concepts with the objective of evolving suitable institutional models and programmes for rural development. Such project experimentation is also known as Action Research (AR) A series development of several viable models which were replicated all over the country. The examples of these may be cited as the Thana Training and Development Centre (TTDC), Rural Works Programme (RWP), Thana Irrigation Programme (TIP), and Two-tied co-oparatives. This Institutional models and the modus operandi of these programmes were developed by the Academy

through continued experimentation in its Laboratory Area over a specific period of time. When these were accepted by the Government as national programmes, the Academy took up the responsibility of imparting training of the field implementers and conducting evaluations on request from implementing agencies and departments. Further more, after the acceptance of a model evolved by the Academy, its experimental work does not end, rather it continues to evolve innovative ideas and revise and refine the existing models in the process of nation implementation."[14]

সংশ্লিষ্ট অধ্যায় গ্রামোন্নয়ন বিষয়ে আলোচনায় বলা যায়, স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন অদ্যাবধি আশানুরূপ ভাবে অর্জিত হয়নি। যা কিছু হয়েছে, তার পিছনে সরকারের পাশাপাশি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই রয়েছে বিভিন্ন মনীষীর অবদান। আমরা যদি রূপক অর্থে গ্রান্নেয়নের কর্মসূচী ও বাস্তবতার দিকটি আলোচনা করি তাহলে এভাবেই বলতে পারি:

প্রাকৃতিক মহা দুর্যোগের সময় বিপন্ন মানুষের সাহায্যার্থে ঐ এলাকার কোন মানুষ এগিয়ে আসেনি বরং প্রত্যেকেই নিজেদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকেন। দুর্দশাগ্রস্থ ঐসব মানুষের সেবার্থে এগিয়ে আসেন সমাজহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠন । এদের মধ্যে কেহ খাদ্য, কেহ পানীয় কেহ বা ঔষধপত্র নিয়ে উপদ্রুত এলাকায় দ্রুত কর্ম তৎপরতা শুরু করেন। তাদের প্রত্যাশা থাকে যাতে একটি মানুষও সেবার অভাবে মৃত্যুবরণ না করে। নিজেরা খেয়ে না খেয়ে জীবনে ক্লেশ- কষ্ট সহ্য করে দুর্গত মানুষের সেবার্থে নানাভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা অবিরাম গতিতে বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখেন। ফলশ্রুতিতে বিপন্ন মানুষ গুলো যখন স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে শুরু করে, তখন সেবকদের এহেন মহানুভব কাজের জন্য হৃদয় প্রফুল্লিত হয়ে উঠে। এতে তাদের চাওয়া পাওয়ার কোন বায়না থাকে না।

উপসংহার

গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারী কর্মকর্তা সাহেবরা মহা দুর্যোগের মত আবির্ভূত হয়ে কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথ বাস্তবায়ন না করে রাঘব বোয়ালের ন্যায় গ্রাস করে ভাগ্যাহত গ্রামীণ জনগণকে দুর্ভোগে ফেলে নিষ্পেষণ করছে আবহমানকাল ধরে। এমতাবস্থায় দুর্ভাগা মানুষের সেবা দানে বিভিন্ন কর্মসূচী নিয়ে তা বাস্তবায়নে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী এগিয়ে এসেছেন কিছু কিছু মনীষী। বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন যতটুকু হয়েছে, তা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে ঐসব মনীষীদের আত্মত্যাগের কারণেই। দুর্যোগগ্রস্থ গ্রামের মানুষের উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ গ্রহণকারী সেবক মনীষীদেরও ধারণা শহর উন্নয়নের মত গ্রামোন্নয়ন হয়ে প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সাধিত হবে। একটি মানুষও যেন উন্নয়নের সংস্পর্শ থেকে দূরে না থাকে। আমরা এসব মনীষীদের গ্রামোন্নয়নে তাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও লেখনীতে এমনই নিদর্শন দেখতে পাই।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) খান, ড. আখতার হামিদ, কুমিল্লা মডেল , কুমিল্লাঃ বার্ড-কোটবাড়ী (কুমিল্লা); ১৯৫৯, পৃ, ২, ৩ ।

২) প্রাগুক্ত পৃ, ৩।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ৪।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ৫, ৬।

৫) প্রাগুক্ত পৃ, ৬, ৭।

৬) প্রাগুক্ত পৃ, ৭।

৭) আহমদ, তোফায়েল, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী, কুমিল্লাঃ মহাপরিচালক; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, ২০১০, পৃ. ১।

৮) Bayes, Abdul, Bangladesh at 25 (An Analytical Discourse on Development), Dhaka: The University Press limited, 2007, P. 16,17.

৯) কাশেম, ড. এম, আবুল, পল্লী উন্নয়ন (বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর বার্ষিক জার্নাল, ১৪তম সংখ্যা), বার্ড, কোটবাড়ী, কুমিল্লাঃ মহাপরিচাল; বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমী কুমিল্লা, ২০১০. পৃ. ১, ৩।

১০) Haq, M. Nurul and Hussain, Shirin, Rural Development Programmes and the Role of NGOs. in Bangladesh, Comilla: BARD Publication, Kotbari; 2010, P. 469-470.

১১) Mamun,_Abdullah AL, The Journal of Rural Development, Vol.37. No.1, P.P. 99-123, Comilla: BARD-Comilla, 2010, p. 100.

১২) উদ্দিন,গাজী সালেহ, বাংলাদেশে ভূমিস্বত্ব,ভূমি সংস্কার ও গ্রামীণ উন্নয়ন, ঢাকাঃ ডানা প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ, ৬৮,৬৯।

১৩) প্রাগুক্ত পৃ, ৬৯,৭০।

১৪) Experimental Project of BARD, Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), Comilla: Kotbari, 2011, P. 1, 2.

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বাস্তবতা

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের রাজনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বাস্তবতা

উপক্রমণিকা : পূর্বের অধ্যায়ে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবতায় অবদান রেখেছেন এমন কিছু মনীষীর লেখা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন : সূচনা, ড. আখতার হামিদ খান, তোফায়েল আহমেদ, আবদুল বায়েস, ড. এম. আবুল কাশেম মজুমদার, এম. নূরুল হক ও শিরিন হোসাইন, আবদুল্লাহ আল-মামুন, গাজী সালেহ উদ্দিন এবং বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর গৃহীত কর্মসূচী ও বাস্তবতা। সংশ্লিষ্ট অধ্যায় উপক্রমণিকা, গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা, নেতিবাচক বাস্তবতা যেমন : কৃষি, মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ; বিভিন্ন অবকাঠামোমূলক উন্নয়ন যথা : শিক্ষা. স্বাস্থ্য, যাতায়াত; ঋণদান, নারী সমাজ, সমাজ সেবামূলক অবস্থা ইত্যাদি। গ্রামোন্নয়নমূলক ইতিবাচক দিকগুলো; যথাঃ কৃষি, প্রাণী সম্পদ; অবকাঠামো উন্নয়ন যেমন : শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যাতায়াত, আবাসন, ক্ষুধার্ত মানুষের খাদ্য সংস্থানে প্রকল্প গ্রহণ উপশিরোনামে সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবতার দৃশ্যপট নিচে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হলো :

গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা : গ্রামোন্নয়নের পেছনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ কর্মসূচীর বাস্তবতার দু'টি দিক উদ্ঘাটিত হয়। যথাঃ ১) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর নেতিবাচক বাস্তবতা এবং ২) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ইতিবাচক বাস্তবতা।

নেতিবাচক বাস্তবতা : নিচে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর নেতিবাচক বাস্তবতাগুলো আলোচনা করা হলো :

কৃষি উন্নয়ন সংক্রান্ত : গ্রামের জনসংখ্যার মোট ৮০ ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি কার্যের উপর নির্ভরশীল। গ্রামের ব্যাপক জন গোষ্ঠীর জীবন ধারণের একমাত্র অবলম্বন কৃষি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও কৌশল ব্যবহৃত না হওয়ায় উপনিবেশিক শাসন থেকে শুরু করে স্বাধীনাতাত্তোর অদ্যাবধি পুরোপরিভাবে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হয়নি। এ খাতে সরকারের সহযোগিতা বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়ন সাধনে গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন নগণ্য বললেও অত্যুক্তি হবেনা। পুঁজির অভাবে কৃষকরা কৃষিক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও উন্নয়ন কৌশল ব্যবহার করতে সক্ষম না হওয়ায় গ্রামোন্নয়নের এ মুখ্য খাতটি মান্ধাতার আমলের মতই চলে আসছে। গত ১০.০৮.১০ইং তারিখে æThe Daily Star" পত্রিকায় একজন গবেষকের কৃষিতে অবহেলার একটি বাস্তব তথ্যভিত্তিক গবেষণামূলক লেখা এখানে উদ্ধৃত করা হলো: [১]

Dhaka University Institutional Repository

Neglected Farmers

Sohel Rana

Nearly 80% of the people in our Country directly or indriectly depend on agriculture for their livelihood. But it is a metter of great regret that our farmers are neglected in every aspect of their lives. They do not get fertilisers, insecticides and electricity timely. Even they do not get proper price of their produced crops. They are the backbone of our economy and play an important role for the development to the country. But they are deprived of basic needs. Many MPs deliver their speeches in the implement for the sake of the farmers, but their fate does not change. The government has started a new education allowance scheme for the government employee's childern. This allowance scheme would help them to continue their children's education. To change the fate of the farmers the government should ensure:

i) Fertilisers, insecticides and electricity.
ii) Proper price for crops.
iii) Free education for the farmer's children.
iv) Special credit schemes.

চিত্র নং- ৮.১

Dhaka University Institutional Repository

উপরের চিত্রে গবেষকের লেখার বাস্তবতা বিশ্লেষণ করলে এটাই প্রমাণিত হয়, বর্তমান সভ্য জগতে সারা বিশ্বে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন সাধিত হলেও বাংলাদেশের একজন দরিদ্র কৃষক হাল টানার দু'খানা গরু ও একটি কাঠের লাঙ্গল কৃষি ফসল উৎপাদনে প্রাচীন পদ্ধতিই ব্যবহার করে চলছে। এ কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। কৃষি এখনও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধুনিক যুগেও প্রযুক্তিগত পরিপূর্ণ জীবন ফিরে পায়নি।

নিচে বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়নের কিছু কিছু নেতিবাচক বাস্তবতা তুলে ধরা হলো :

সরকারের বীজ সরবরাহ : কৃষকদের ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ হলো উন্নত বীজ। উন্নত বীজ উৎপাদনের মেধা আমাদের দেশের অশিক্ষিত কৃষকদের নেই। মান্ধাতার আমলের প্রচলিত ধারাই তারা বীজ সংগ্রহ করে। নিম্নমানের বীজ দিয়ে তারা ফসল উৎপাদন করে থাকে। ফলে জনসংখ্যার তুলনায় ফসল উৎপাদন আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাওয়ায় কৃষকদের মধ্যে খাদ্য সংকট লেগেই থাকে। সরকারের সরবরাহকৃত বীজ অত্যন্ত অপ্রতুল এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সরকারী নীতিমালা ভঙ্গ করে অতি উচ্চমূল্যে বীজ বিক্রি করায় সাধারণ দরিদ্র কৃষকদের পক্ষে বীজ সরবরাহ করে কৃষি ফলন বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

গত ০৯/১২/১০ইং মৌলভী বাজার জেলায় সরকারী বিক্রয় কেন্দ্রে 'বোরো বীজ পাচ্ছেন না কৃষকরা' শিরোনামে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার লেখা থেকে জানা যায়, "১৫ নভেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত কৃষকদের বীজতলা তৈরী ও বীজ বপনের উত্তম সময়। কাজেই বীজ সংগ্রহের লক্ষ্যে তারা সরকারী বিএডিসির অফিসে দৌঁড় ঝাপ পেরে কোন বীজ পাননি। বিভিন্ন উৎস থেকে জানা যায়, সরকার নির্ধারিত মূল্য ২২ টাকার বীজ কৃষকরা বাজার থেকে ৫০/৬০ টাকা দরে ক্রয় করছে।"[২]

উপনেবেশিক শাসন আমল থেকে সরকার এদেশের কৃষকদের উন্নত বীজ প্রাপ্তির মাধ্যমে অধিক ফসল উৎপাদন করে জীবন মান উন্নয়নের জন্য বীজাগার নির্মাণ কর্মসূচী হাতে নিয়েছিলেন। অথচ বর্তমানে নানা আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এসব বীজাগারগুলো পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে।

চিত্র নং- ৮.২

উপরের চিত্রে বরগুণা জেলার প্রত্যন্ত গ্রামে পরিত্যক্ত এমন একটি বীজাগারের বাস্তবতা দেখানো হলো। বাংলাদেশের গ্রামে গঞ্জে যত্রতত্র সরকারী বীজাগার (Seeds Store) গুলো অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। যদিও এদেশের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের বীজ সংকট উত্তরণ, সহজ লভ্যতা ও সংরক্ষণ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক হিসেবে সরকার বীজাগার নির্মাণ কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন।

কৃষি ভর্তুকি কর্মসূচীর বাস্তবতা : দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'বাঘায় কৃষি উপকরণ কার্ড ও ডিজেলের ভর্তুকি তালিকায় অনিয়মের অভিযোগ' শিরোনামে ০৯.০৪.১০ ইং তারিখের খবর থেকে জানা যায়, "রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কৃষি উপকরণ কার্ড ও ডিজেলের ভর্তুকি দেয়ার তালিকা তৈরীতে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। বাঘা উপজেলায় ২৬ হাজার ৮৬৭ জন কৃষক রয়েছে। এর মধ্যে বোরো আবাদের তালিকাভুক্ত ৩ হাজার ৭৪৬ জনের নামে কৃষিউপকরণ কার্ড তৈরী করা হয়েছে। যারা প্রত্যেকেই ডিজেলের ভর্তুকি পাবেন। এদের মধ্যে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। শ্রেণি অনুসারে দশমিক শূণ্য ৫ একর থেকে দশমিক ৪৯ একর পর্যন্ত জমির মালিককে প্রান্তিক কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, দশমিক ৫০ একর থেকে ২.৪৯ একর পর্যন্ত ক্ষুদ্র এবং ২.৫০ একর থেকে ৭.৫০ একর জমির মালিককে মাঝারি কৃষক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভর্তুকির জন্য ক্ষুদ্র প্রান্তিক কৃষকরা ৮০০ টাকা করে এবং মাঝারি কৃষকরা পাবেন ১০০০ টাকা।

আবার অনেকে এও অভিযোগ করেছেন সরকারের কৃষি ভর্তুকির ৮০০ টাকা উঠাতে গিয়ে তাদের যাতায়াত করতে করতে ৬০০ টাকা খরচ হয়ে গেছে। এ তালিকায় অনিয়মের মাধ্যমে এক হাজারেরও বেশী নাম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে। এর পিছনে রয়েছে প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতৃত্বের প্রভাব।"[৩]

পানি সেচ ও নিস্কাশন কর্মসূচীর বাস্তবতা : সরকার গ্রামের কৃষকদের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি উপকরণ হিসেবে পানি সেচের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে সরকার গ্রামে শ্যালু মেশিন, গভীর নলকুপ স্বল্পমূল্যে সরবরাহ করে কৃষকদের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছেন। নানা প্রতিবন্ধকতার কারণে কৃষকরা এসব পানি সেচ উপকরণ ন্যায্যমূল্যে পান না। তাছাড়া আবদ্ধ পানি দ্রুত নিস্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় ফসল পানির নীচে তলিয়ে গিয়ে কৃষকের সর্বস্ব শেষ হয়ে যায়। ২৫.০৪.১০ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে জানা যায়, "শেরপুরে বিস্তৃর্ণ এলাকার ইরি-বোরো ধান পানির নিচে তলিয়ে গেছে। এভাবে হাজার হাজার বিঘা জমির ফসল প্রতিবছর পানির নিচে তলিয়ে গিয়ে কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।"[৪] রাজনৈতিক দলের নেতা/কর্মীরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের জন্য টেন্ডারে কাজ পেয়ে নামে মাত্র কাজ করানোর ফলে বাঁধ ভেঙ্গে প্রতি বছর কৃষি জমিতে পানি ঢুকে এবং ফসল পানির নিচে তলিয়ে যাওয়ায় কৃষকদের সর্বস্ব শেষ হয়ে যায়। এভাবে রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় কর্মসূচীর কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় প্রকল্পগুলো আলোর মুখ কমই দেখে থাকে এবং গ্রামোন্নয়নে প্রতিবদ্ধকতা সৃষ্টি করে।

কৃষি ঋণ বিতরণের কর্মসূচীর বাস্তবতা : সরকার তফসিলী ব্যাংক এবং ঋণ দানকারী মন্ত্রণালয়, যেমন- স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের এর সমবায় অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধিদপ্তরের আওতায় কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে উৎপাদন বাড়ানোর ব্যবস্থা করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে ঋণ পেতে কৃষকদের দুর্ভোগের সীমা থাকেনা। জনপ্রতিনিধিদের সহায়তায় ব্যাংকের দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীরা তাদের অনুগত দালালের মাধ্যমে ব্যাপক হারে উৎকোচ নিয়ে কৃষকদের মাঝে ঋণ দান পদ্ধতি পরিচালনা করে থাকেন।

বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্তবতা : গ্রাহক সেবার মান সম্পর্কে বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বাস্তবতা হচ্ছে ২৪ ঘন্টায় সর্বসাকুল্যে ২০ ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকেনা গ্রাম এলাকায়। যে ৪ ঘন্টা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তাও আবার লোড শেডিংয়ের কারণে আধা ঘন্টা স্থায়ী হয় না। ফলে গ্রামবাসীর সে বিদ্যুৎ কোন কাজে আসেনা । আধা ঘন্টা স্থায়ী বিদ্যুতে সেচ পাম্প, চালের কল, বরফ কল চলেনা।

চিত্র নং -৮.৩

উপরের চিত্রে বিদ্যুতের অভাবে বোরো ধানের জমিতে পানি সেচ করতে না পারায়, রংপুর জেলার একটি গ্রামে নারী-পুরুষ মিলে কীভাবে জমিতে পানি সেচ করছেন তার বাস্তবতা তোলে ধরা হলো।

চাহিদা ও সরবরাহ বাস্তবতা (Demand and Supply Feasibility) : গ্রামে কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং হ্রাসের ফলে যে সব কারণে কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অর্থ্যাৎ অর্থনীতির ভাষায় চাহিদা বাড়লে যোগান কমে, চাহিদা কমে যোগান বাড়ে। তার বাস্তবতা নিচে আলোচনা করা হলো:

গ্রামীণ যাতায়াত সমস্যা : যথাযথ যাতায়াতের অভাবে গ্রামের কৃষকরা তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারেনা। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কঠোর পরিশ্রম করে কৃষকরা ফসল উৎপাদন করে। অথচ সহজ যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকায় উৎপাদিত ফসল থেকে তারা কোন প্রকার উপযোগিতা পায় না। এতে শ্রম ও ফসলের পেছনে অর্থ খরচ একেবারেই মূল্যহীন হয়ে পড়ে এবং তারা (কৃষক) ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখীন হয়ে থাকে। এভাবে বার বার কৃষকরা ক্ষতির শিকার হয়ে দিন দিন নিঃস্ব হয়ে পড়ছে। নিচে চিত্রে এমন একটি বাস্তবতা দেখানো হলো :

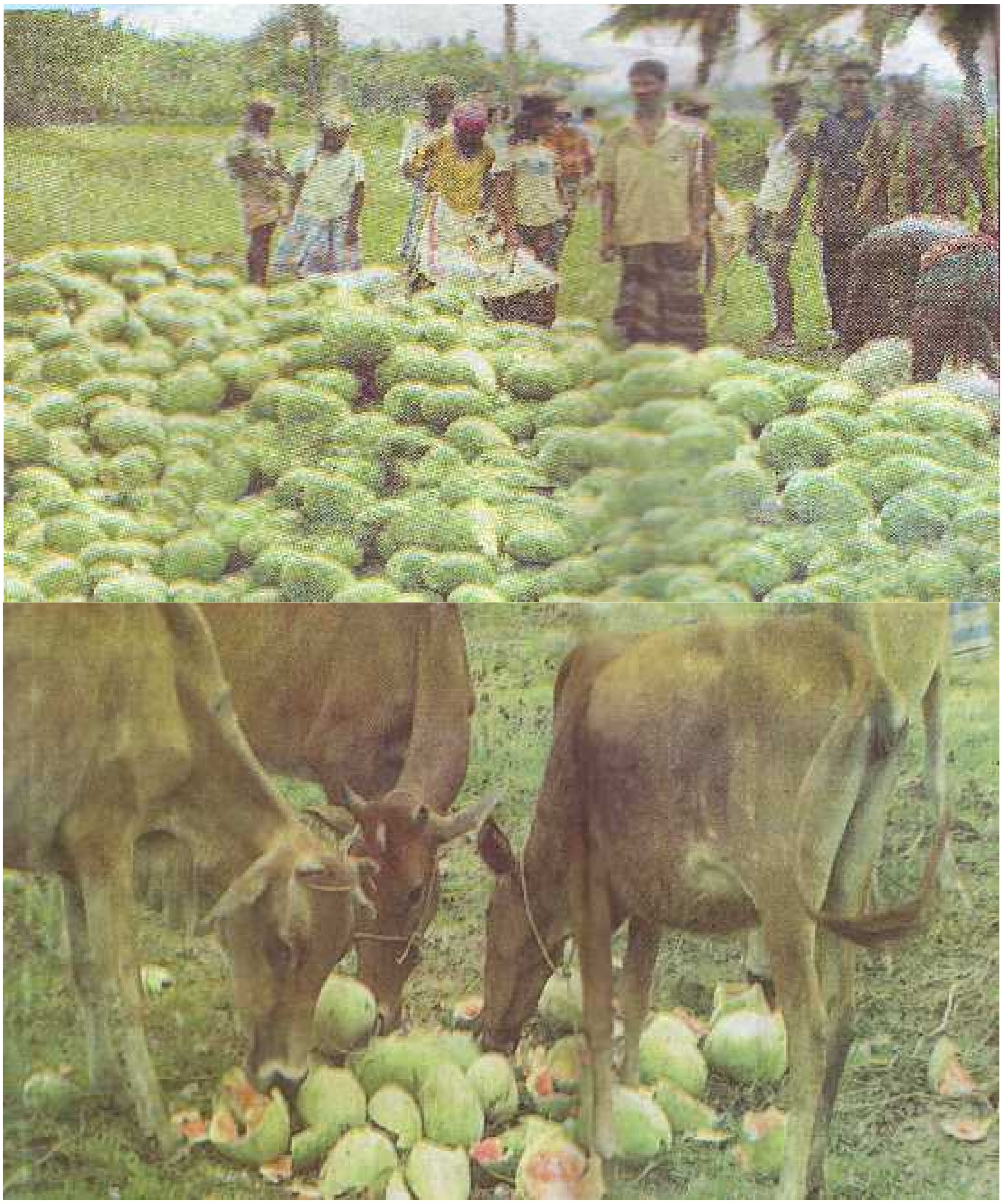

চিত্র নং-৮.৪

প্রায় প্রতি বৎসর পটুয়াখালী সহ উপকূলীয় অন্যান্য এলাকায় তরমুজের বাম্পার ফলন হয়ে থাকে। অনুন্নত যাতায়াতের অভাব এবং সরংক্ষণের সুব্যবস্থা না থাকায় তা চাষীদের উন্নয়নে কোন কাজেই আসেনি। গ্রামের হাট বাজারে তরমুজের ন্যায্যমূল্য না পেয়ে অনেক চাষীই এখন তরমুজ গো খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করছেন; যা গ্রামোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতারই সামিল।

Dhaka University Institutional Repository

রাজনৈতিক সহিংসার বাস্তবতা: বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে গ্রামের কৃষকদের দুর্ভোগের শেষ নেই। উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী হরতাল, অবরোধের কারণে যথাসময়ে শহর বন্দরে পৌঁছাতে না পারায় কৃষকদের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। নিচের চিত্রে কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতির এমন কিছু বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো:

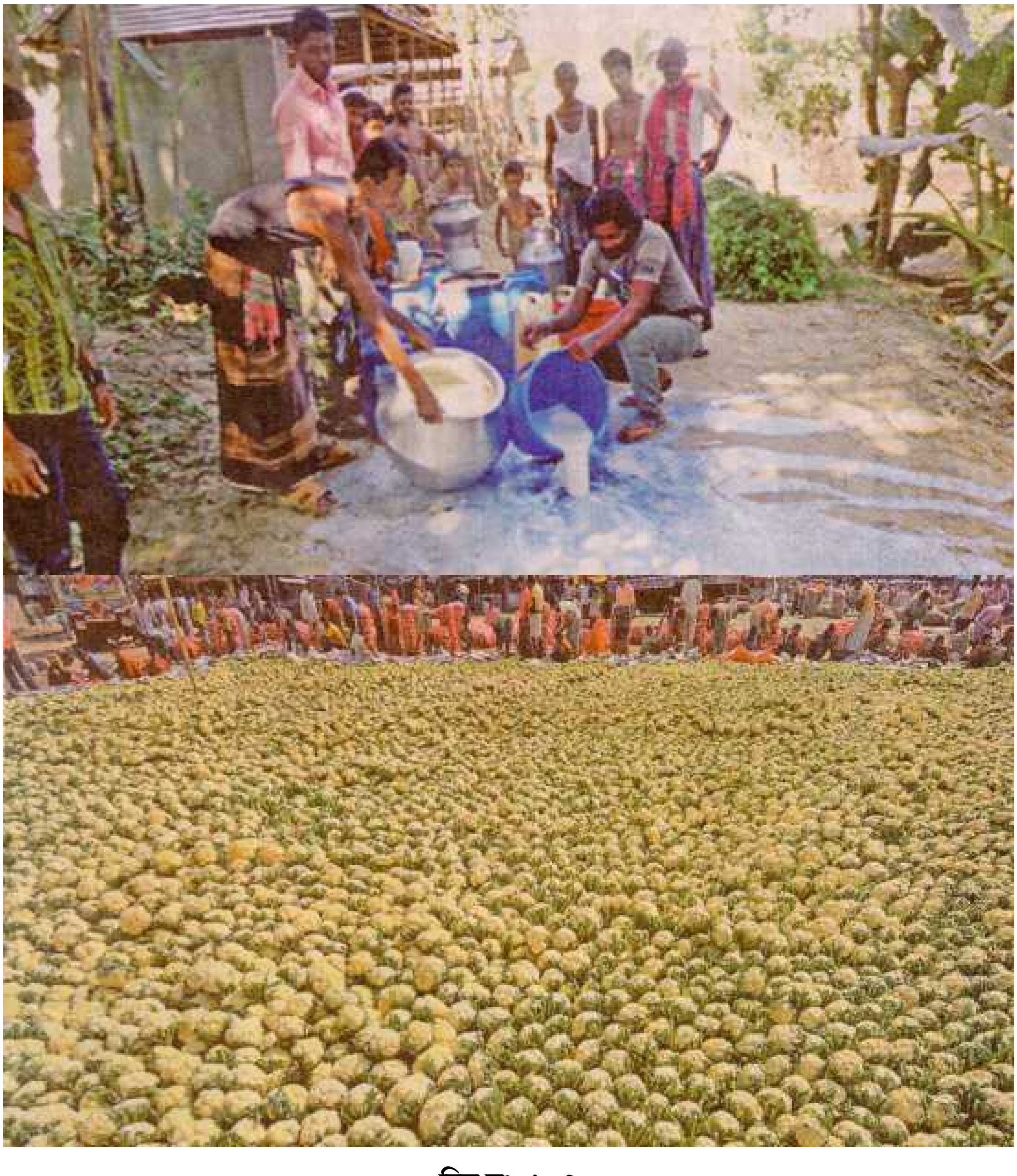

চিত্র নং- ৮.৫

জামালপুর জেলার কোন কোন দরিদ্র কৃষক পরিবার গাভী পালন করে জেলা সদর কখনও বা ব্যবসায়িক আড়তে দুধ বিক্রি করে যা আয়-রোজগার হয় তা দিয়ে পরিবারের ভরণ-পোষণ করে থাকে। বিগত 'জাতীয় সংসদ নির্বাচন-২০১৪' এর পূর্বে বিরোধী দলের নাগাতার হরতাল, অবরোধ ও সহিংসতার কারণে কৃষকরা যথাসময়ে দুধ বিক্রি করতে না পারায় দুধে পঁচন ধরে। ফলে তারা ঐ

পঁচনকৃত দুধ পুকুরে ঢালতে বাধ্য হয়। তাছাড়া চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবন নগর উপজেলায় এ বৎসর ফুল কপির বাম্পার ফলন হয়েছে। কিন্তু হরতাল ও অবরোধের কারণে পরিবহনের অভাবে কৃষকরা কপি বিক্রি করতে না পারায় তারা ব্যাপক ক্ষতির সন্মুখীন হচ্ছে। যা গ্রামোন্নয়নে পদে পদে বাধা সৃষ্টি করছে।

কৃষি পণ্য সংরক্ষণে হিমাগারের অভাব : কৃষি পণ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রামাঞ্চলে প্রয়োজনীয় হিমাগার না থাকায় অনেক সময় কৃষকরা উৎপাদিত পণ্য খোলা আকাশের নিচে ফেলে রাখতে বাধ্য হয়। নিচের চিত্রে কৃষকদের খোলা আকাশের নিচে আলু রাখার একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো :

চিত্র নং- ৮.৬

বাংলাদেশের সর্বত্র মানুষ আলুকে সব্‌জি হিসেবে ব্যবহার করে থাকেন। এমনভাবে আলু রাখায় অনেক সময় অযত্নে পণ্যটি পঁচে যাওয়ায় কৃষকদের ব্যাপকভাবে ক্ষতির সন্মুখীন হতে হয়; যা গ্রামোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। হিমাগারের অভাবে এভাবে গ্রামে খোলা আকাশের নিচে আলু পড়ে থাকার দৃশ্য প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে কৃষি কর্মসূচী ও বাস্তবতা : কৃষি উন্নয়নে আর্ন্তজাতিক পরিমন্ডলে বিভিন্ন দেশ কীভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছে, তা নিচে দু'একটি দেশের সামান্য উদ্বৃতি দিয়ে দেখানো হলো :

চীন: ২০০৯ সালে কৃষিখাতে সহায়তা দেয়ায় চীন সরকারের অর্থ বরাদ্দের পরিমান নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে। "এ খাতে ২০০৯ সালে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৭১৬.১ বিলিয়ন উইয়ান।

কৃষি এবং গ্রামীণ কৃষকদের জীবিকাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অর্থ বরাদ্দের পরিমান ছিল ২০০৮ সালের তুলনায় ১২০ বিলিয়ন উইয়ান বেশি।"[৫] ফলশ্রুতিতে কৃষি সহ গ্রামোন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন কল্যাণকর কর্মসূচী বাস্তবায়নে গ্রামের মানুষের জীবনমানে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়েছে। অবস্থাদৃষ্টে চীনে কৃষি ফসল উৎপাদন দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় গ্রামের মানুষের স্থিতিশীল উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে।

ইরান: একটি বার্তা সংস্থা থেকে জানা যায়, "ইরানের কৃষিখাতে ২০০৯ অর্থ বছরে বিনিয়োগ ৫০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে গেছে। উপরোক্ত ফার্সী অর্থ বছরের শেষের দিকে কৃষি খাতে বিদেশী ঋণ এবং বিনিয়োগের পরিমান ৫০ কোটি ডলার অতিক্রম করেছে। ফলে কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ইরানের চতুর্থ উন্নয়ন পরিকল্পনায় কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা ১৩.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছিল; যা পরবর্তী ফার্সী অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে।"[৬]

ইরানী সরকারের কৃষি খাতে উত্তরোত্তর অর্থ বরাদ্দের ফলে কৃষকদের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এমতাবস্থায় তাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সাধিত হয়ে তারা আজ আধুনিক বিশ্বে মাথা উচুঁ করে দাঁড়িয়েছে। পৃথিবীর বিভি্ন্ন দেশে কৃষি পণ্য রপ্তানী করে ইরান দেশে সমৃদ্ধি আনয়নে সক্ষম হয়েছে।

জার্মানী : জার্মান সরকার অন্যান্য শিল্পোন্নয়নের সাথে সাথে কৃষি শিল্প উন্নয়নে কৃষকদের ব্যাপক হারে সহায়তা প্রদান করছেন। বিশেষ করে দুগ্ধজাত কৃষি পণ্য রপ্তানী করে জার্মান প্রচুর পরিমান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে। একটি সংবাদ সংস্থা থেকে জানা যায়, "২০০৯ সালে জার্মান কৃষি খাতে ৭৫ কোটি উইরো এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে আরও ৭৫ কোটি উইরো ভর্তুকি প্রদান করে। ঐ সময় দুধের দাম কমে যাওয়ায় গোয়ালাদের কয়েক সপ্তাহ ব্যাপী আন্দোলন চলতে থাকায় তাদের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সরকার এ ভর্তুকি প্রদান করেন।"[৭]

মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ : কৃষি ফসল উৎপাদনের মতই কৃষকদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ থেকেই এদেশের মানুষ তাদের প্রয়োজনীয় পুষ্টির চাহিদা মিটিয়ে থাকে। অথচ কৃষক সমাজ তাদের এ সম্পদটি সংরক্ষণে নিত্য নতুন নানা প্রতিবন্ধকতার সন্মুখীন হচ্ছে। সরকার মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণে যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ তা যথাযথভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় কীভাবে কৃষকদের ক্ষতি সাধিত হচ্ছে, তা নিচে উল্লেখ করা হলো :

Dhaka University Institutional Repository

গৃহপালিত পাখি ও পশুর মৃত্যু : কৃষকের গৃহপালিত পাখি যেমন- হাঁস-মুরগী, কবুতর এবং পশু যেমন- গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষসহ বিভিন্ন প্রজাতির পশুপাখি প্রতিবছর ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। কৃষকদের পশুপাখির চিকিৎসার জন্য সরকার টিকাদান সহ নানা রোগ প্রতিরোধ কর্মসূচী গ্রহণ করলেও তার সুফল গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন মানুষ পায় না। বাস্তবতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দুর্নীতি বাজ কর্মকর্তা/কর্মচারীরা সঠিক ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন না করে অসৎ পথে গ্রামের মানুষের পশু পাখির চিকিৎসার সরকারী ঔষধপত্র অন্যত্র বিক্রি করে এ উপভোগ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে। ফলশ্রুতিতে কোন কোন কৃষকের হাঁস, মুরগী ও হালের গরু মরে গিয়ে ঐ পরিবারটিকে একেবারে পঙ্গু করে ফেলে। যা দারুণভাবে গ্রামোন্নয়নে অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করে।

ডিম ওয়ালা ইলিশ ও জাটকা নিধন : ডিম ওয়ালা ইলিশ ও জাটকা (ইলিশ মাছের পোনা) ধরা সরকার কর্তৃক আইনগত ভাবে নিষেধ থাকলেও দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকুলবর্তী এলাকায় কেহই এ নিষেধের তোয়াক্কা না করে অবাধে ডিম ওয়ালা ইলিশ ও জাটকা মেরে বাজারে বিক্রি করছে। এর পিছনে তৃণমূল পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা/কর্মীদের হাত রয়েছে বলে অনেকে মনে করছে।

পোনা মাছ নিধন : সরকারী আইনে ২৩ সেন্টিমিটারের কম কোন পোনা মাছ ধরা দন্ডনীয় অপরাধ। অথচ বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে কেহই এ আইনের তোয়াক্কা না করে ইচ্ছামত পোনা মাছ ধরছে। পাশাপাশি সমুদ্র উপকুলীয় এলাকা সমূহে গল্‌দা ও বাগ্‌দা চিংড়ির পোনাও অনুরুপ ভাবে নিধন করা হচ্ছে।

চিত্র নং -৮.৭

বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী এলাকায় মানুষ অবাধে ২৩ সেন্টিমিটারের নিচে পোনা মাছ ধরছে। এমন একটি দৃশ্য উপরের চিত্রে দেখানো হলো।

গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন : সরকার গ্রামোন্নয়নমূলক অবকাঠামো উন্নয়ন করে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের জন্য যে সকল অবকাঠামো গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেন নিচে সেগুলোর নেতিবাচক বাস্তবতা আলোচনা করা হলো :

মানব সম্পদ উন্নয়ন : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো মানব সম্পদ উন্নয়ন। এ ব্যাপারে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বাধীনতাত্তোর গ্রামের জনসংখ্যানুপাতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেনি। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষাদান পদ্ধতির কিছু নেতিবাচক বাস্তবতা নিচে পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো :

ভৌত অবকাঠামোগত বাস্তবতা : গ্রামে ছাত্র/ছাত্রীর ঘনত্ব অনুসারে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো না থাকায় প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের প্রায় প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই চাহিদা অনুপাতে শ্রেণী কক্ষ নেই। একটি কক্ষে চাপাচাপি করে ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষকের বক্তব্য শুনে খাতায় লিখতে খুবই অসুবিধা হয়। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে বা গাছ তলায় বসে শিক্ষকগণের পাঠদান শুনে থাকে। গবেষণা কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, কোন কোন গ্রামের বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা খোলা স্থানে বেঞ্চ পেতে শিক্ষকের পাঠ দান শুনছেন। এমতাবস্থায়, ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়ার পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধাা না থাকায় অনেকে লেখাপড়ার আগ্রহ হারিয়ে ফেলে কেহ বা ইতিটানে। গ্রামোন্নয়নের ক্ষেত্রে এমন শিক্ষার পরিবেশ প্রয়োজনীয় মেধা বিকাশে ব্যর্থ হচ্ছে।

চিত্র নং -৮.৮

উপরের চিত্রে লালমনিরহাট জেলার একটি গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোলা আকাশের নিচে ছাত্র/ছাত্রীদের ক্লাশে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষকের পাঠ দানে মনযোগ আকর্ষণ করতে দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি দখল : গ্রামের প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক নেতৃত্বে কোন বাণিজ্যিক এলাকার আশে পাশে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি দখল করে ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। লোক মুখে এমন কথা শুনে বগুড়া জেলার সোনাতলায় চরপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমন করে দেখা যায়, খেলার মাঠের সামনের খালি জায়গায় দোকান ঘর তোলে দখলের চেষ্টা করছে রাজনৈতিক দলের নেতা/কর্মীরা।

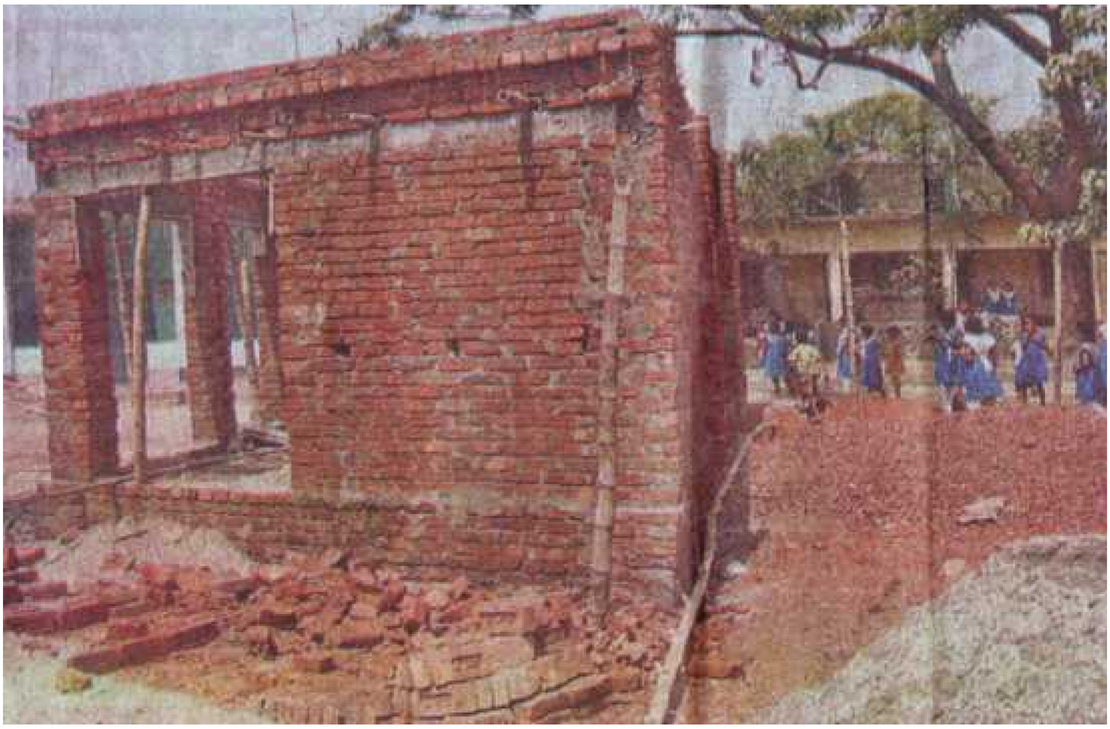

চিত্র নং- ৮.৯

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় **১২** জানুয়ারী **২০১০** সালে 'যশোরে **৮১**টি স্কুলের জমি প্রভাবশালীদের দখলে' শিরোনাম থেকে জানা যায়, ''৮১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫০ একর জমি দীর্ঘ কয়েক বছর যাবত প্রভাবশালীদের দখলে রয়েছে। যার আনুমানিক মূল্য কয়েক কোটি টাকা।''[৮]

গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজনৈতিক আদর্শ পুষ্টদের জমি দখলের হিড়িকে ছাত্র ছাত্রীদের লেখা পড়ায় বিঘ্নতা সৃষ্টি হচ্ছে। যশোর জেলার একটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে গড়ে উঠছে তৃণমূল পর্যায়ের কোন রাজনৈতিক দলের নেতা/কর্মীদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। উপরের চিত্রে এমন একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো।

দারিদ্র্যতা ও শিক্ষা : গ্রামের বেশীর ভাগ পরিবারের ছাত্র/ছাত্রী দরিদ্র্যতার অভিশাপে অভিশপ্ত। ধনী পরিববারের ছেলেমেয়েরা গৃহ শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে শিক্ষা কার্যক্রমে যে ভাবে

ভিত তৈরী করে, দরিদ্র পিতামাতার সন্তানরা সেভাবে পাঠের ভিত্তি মজবুত করতে না পারায় প্রতিযোগিতায় তারা স্বাভাবিক ভাবে পিছিয়ে পড়ছে। শ্রেণী কক্ষে ধনীর ছেলেমেয়েররা যেভাবে অতি দ্রুত শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দুর্বল মেধার ছেলেমেয়েরা সেভাবে উত্তর দিতে পারেনা। বেশী চিন্তা ভাবনা করারও সুযোগ পায়না। পর্যায়ক্রমে দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা পাঠে পিছিয়ে পড়ে এবং পরীক্ষায় ভাল ফলাফল করতে ব্যর্থ হওয়ায় একসময় লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করে।

শিক্ষাক্ষেত্রে অনিয়ম : গ্রামী শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মে ভরপুর। গত ০৭.০৪.২০১৩ ইং তারিখে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় 'জিয়া নগরে উপবৃত্তির টাকা বিতরণের অনিয়মের অভিযোগ' শিরোনাম থেকে জানা যায়, "উপজেলার জিয়া নগর ডিগ্রী কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের ১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৪০ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হয়। এ সময় বিজ্ঞান শাখায় ১৯৫০ টাকা এবং মানবিক শাখায় ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় ১৩৫০ টাকা হারে বিতরণের সরকারী নিয়ম থাকলেও ছাত্রী প্রতি ১৫০ টাকা করে কেটে রাখা হয়।"[৯] তাছাড়া বিবাহিত ছাত্রীদের সরকারী নিয়ম অনুযায়ী টাকা বিতরণের নিয়ম না থাকলেও কেন তাদের মধ্যে উপবৃত্তির টাকা বিতরণ করা হচ্ছে তা বোধগম্য নয়।

স্বাস্থ্য সেবা : গ্রামের মানুষ যে সকল উৎস থেকে চিকিৎসা সেবা পেয়ে থাকেন সে সকল অবকাঠামোর বাস্তবতার কিছু চিত্র নিচে আলোচনা করা হলো :

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা সেবার বাস্তবতা : গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের প্রধান উৎস হচ্ছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বাংলাদেশের বেশীরভাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স গুলোর সেবা দানের চিত্র বর্ণনা করলে দেখা যায়, এ্যাম্বুলেন্স নেই, থাকলেও অকেজো, প্রয়োজনীয় ঔষধ নেই, প্রাইভেট রোগী দেখা নিয়ে চিকিৎসকরা ব্যস্ত, রোগ নির্ণয়ের কোন যন্ত্রপাতি নেই, থাকলেও টেকনিসিয়ান নেই। চিকিৎসকের পদশূন্য। একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অসহায় দরিদ্র রোগীদের সকল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। সেবিকারা রোগীদের সাথে খারাপ আচরণ করে। ডাক্তারগণ হাসপাতালে একদিন উপস্থিত থাকলে অন্য দিন থাকেন না। দালাল ও রিপ্রেজেন্টেটিভদের দৌরাত্ম্যে রোগীদের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছে থাকে।

১২.০৪.১২ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় দেখা যায়, "বাঘেরহাটের চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দেড় লক্ষ্য মানুষের জন্য একজন ডাক্তার।"[১০] উপরোক্ত আলোচনার বাস্তবতায় এসব হাসপাতাল গুলো থেকে গ্রামের মানুষ কতটুকু স্বাস্থ্য সেবা পেয়ে থাকে সেটাই প্রশ্ন।

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা সেবা পেতে মাথায় রোগী বহন : গ্রামে চিকিৎসা সেবার সুবিধা না পাওয়ায় এবং যথাযথ রাস্তাঘাটের অভাবে ডাক্তারের সেবা প্রাপ্তির প্রত্যাশায় একজন অতসীপর বৃদ্ধাকে ঢালিতে মাথায় বহন করে তার ছেলে গ্রামের বাজারের মধ্য দিয়ে শহর পানে গমন করছেন। এমন একটি বাস্তবতার চিত্র নিচে দেখানো হলোঃ

চিত্র নং- ৮.১০

ইউনিয়ন সাব সেন্টারে স্বাস্থ্য সেবা : প্রতিটি উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ের সাব-সেন্টার গুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, এ সকল হাসপাতাল থেকে গরীব জনগণ চিকিৎসা সেবা কমই পেয়ে থাকেন। কোন কোন সাব-সেন্টারে এমবিবিএস ডিগ্রীধারী একজন সরকারী ডাক্তারের পোষ্ট থাকলেও শুধু চাকুরী রক্ষার্থে সপ্তাহে তাঁরা দু' এক দিন, শহর থেকে সাব সেন্টারে আসেন। তাঁরা সব সময় শহরের কোন একটি হাসপাতালে পোষ্টিং নেয়ার চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত থাকেন। চিকিৎসা কেন্দ্র গুলোতে সাধারণত ফার্মাসিষ্টরাই রোগী দেখে ব্যবস্থাপত্র ও ঔষধ দিয়ে থাকেন। তাছাড়া এসব সাব সেন্টারে শুধু সর্দি কাশির কিছু কিছু ঔষধ পাওয়া যায়। একই পর্যায়ে নব্য প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোর বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়।

গ্রামীণ অপচিকিৎসার বাস্তবতা : বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে উন্নত চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ সুবিধা থাকলেও গ্রামের মানুষ আধুনিক চিকিৎসার সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে এখনও অন্ধকার যুগের চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করে যাচ্ছে। অশিক্ষিত, অসচেতন গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক সংগতি না থাকাই এর মূল কারণ। তাদের চিকিৎসা গ্রহণের উৎসগুলো হলো জিনের বাদশাহ, কবিরাজ, পীর-

ফকির, সাধু-সন্নাসী নামক প্রতারকের ঝাড় ফুঁক, পানি পড়া ইত্যাদি। জটিল ও কঠিন রোগেও তারা এসব পদ্ধতি গ্রহণ করে রোগীকে চিকিৎসা করিয়ে থাকেন। নিচে এমন অপচিকিৎসার কিছু নেতিবাচক বাস্তব দৃশ্য তোলে ধরা হলো :

মানসিক রোগের চিকিৎসা : গ্রামের মানুষ কখনও মানসিক রোগে আক্রান্ত হলে তাদের ধারণা রোগীকে জিন-ভূত বা কোন প্রেতাত্মা আছর করেছে। তাই এ রোগের চিকিৎসা পাওয়ার জন্য তারা দ্বারস্থ হয় ভন্ড অপচিকিৎসক নামক জিনের বাদশাহ বা কবিরাজের কাছে । আর এ চিকিৎসার ব্যয় বহন করার জন্য কবিরাজকে দিতে হয় মোটা অংকের টাকা। এভাবে অনর্থক টাকা দিয়ে অপচিকিৎসা করতে গিয়ে অনেক পরিবারকে সব কিছু বিক্রি করে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়তে দেখা যায়।

চিত্র নং- ৮.১১

উপরের চিত্রে গ্রামের একজন মানসিক রোগীকে জিনের বাদশাহ খ্যাত একজন প্রতারক কবিরাজ গাছে রোগীর হাত পা বেঁধে পিটিয়ে জিন তাড়িয়ে রোগীকে সুস্থ করার বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো।

তাবিজ, কবচের চিকিৎসা সেবা : গ্রামের অসচেতন জনগোষ্ঠী বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা সেবা গ্রহণের আর্থিক স্বচ্ছলতা না থাকায়, কম টাকায় চিকিৎসা সেবা নিতে সাহায্য নেয় তাবিজ, কবচের অপচিকিৎসক গ্রাম্য কবিরাজদের। এসব কবিরাজের নেই সার্টিফিকেট বা প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা।

তবুও গ্রামের কবিরাজরা তাবিজ, কবচ, ঝাড়, ফুঁক এর পাশাপাশি এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার মাধ্যমে সর্বরোগের চিকিৎসা করে থাকে ।

চিত্র নং- ৮.১২

উপরের চিত্রে এমন একজন কবিরাজ যিনি প্রেমে ব্যর্থতা, অসাধ্যকে সাধন, মানুষকে বসে আনার কাজও পারদর্শিকতার সাথে করিয়ে দেয়ার ধোকা দিয়ে সহজ সরল গ্রামের মানুষের কাছ থেকে বিপুল পরিমান অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছেন প্রায় প্রতিদিন।

দন্ত রোগের চিকিৎসার : গ্রামের হাট বাজারে এমনকি বাড়ী বাড়ী ঘুরে দাঁতের চিকিৎসা করে থাকেন অসংখ্য ডাক্তার। বাচ্চা থেকে শুরু করে ৮০/৯০ বৎসরের বয়স্ক মানুষের দাঁতের চিকিৎসায় এসব ডাক্তাররা পারদর্শী বলে গ্রামের মানুষের কাছে ভূয়া তথ্য দিয়ে দন্ত চিকিৎসা করে থাকে।

১৫/২০ বৎসর যুবক যুবতীর দাঁত যেখানে ঔষধে বা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি গ্রহণ করে সুস্থ হয়, সেখানে হাতুড়ে অপচিকিৎসকগণ কোন প্রকারের তোয়াক্কা না করে এমন সুস্থ দাঁত টেনে উপড়ে ফেলে চিকিৎসার কাজ শেষ করে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.১৩

উপরের চিত্রে দু'জন গ্রাম্য অপচিকিৎসককে সাধারণ দরিদ্র মানুষের দাঁত তোলার দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। এ অপচিকিৎসক দু'জন গ্রামের নিরীহ মানুষের দাঁত একেবারে তোলে ফেলে কিছু লতাপাতার রস দিয়ে রোগীকে সুস্থ করছে।

পক্ষাঘাত রোগের চিকিৎসা : গ্রামের অশিক্ষিত, স্বাস্থ্য অসচেতন, দরিদ্র জনগোষ্ঠী পক্ষাঘাতগ্রস্থ একজন রোগীর চিকিৎসা করে তাবিজ, কবচ ও ঝাড়-ফুঁকের মাধ্যমে। শহরে নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করার সামর্থ্য এদের নেই। আর্থিক দৈন্যতাই এর মূল কারণ। তাছাড়া অন্ধ বিশ্বাস গ্রামের মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত। তাদের ধারণা রোগীর গায়ে বাতাস লেগেছে। ফলে রোগীর একদিক অবশ হয়ে পড়েছে। রোগীর শরীর থেকে বাতাস দূর করতে পারলেই সে সুস্থ হয়ে উঠবে। কবিরাজ এসে ঝাঁড়-ফুঁক, তাবিজ, কবচ করে দিলেই রোগী সুস্থ হবে। আধুনিক চিকিৎসায় এ ধরণের অসুখ ভাল হবেনা। তাই তারা বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ না নিয়ে ওঝা, বৈদ্য, কবিরাজ ডেকে এমন রোগের চিকিৎসা করিয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে রোগী ভাল না হয়ে এমন চিকিৎসায় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.১৪

উপরের চিত্রে একজন কবিরাজ মেয়েদের শাড়ী পরে পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগীকে বাড়ীর উঠোনে গর্ত করে কোমড় পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে একটি পাত্রে ধুলো নিয়ে মন্ত্র পড়ে তা রোগীর গায়ের উপর ফেলছে। একজন মহিলা অসুস্থ রোগীর হাতটি নেড়ে দিচ্ছে।

মাতৃসেবা কর্মসূচীর বাস্তবতা : গ্রামের অধিকাংশ মায়ের সন্তান প্রসব হয়ে থাকে বাড়ীতে। যদিও সরকারের মাতৃসেবা কর্মসূচীর আওতায় বলা হয়েছে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন সাব সেন্টার ও কমিউনিটি ক্লিনিকে মায়েদের প্রসবকালীন সময়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীদের মাধ্যমে সন্তান প্রসব করানো হয়। তবে সরকারের কর্মসূচী পুরোটা গ্রামে বাস্তবায়ন হয়না। এক্ষেত্রে গ্রামের অসচেতন জনগোষ্ঠীর মানুষ মায়েদের হাসপাতালে বা ক্লিনিকে না নিয়ে প্রতিবেশি বা স্বজনের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের কাজ সম্পন্ন করে থাকে। ফলশ্রুতিতে অদক্ষ ধাত্রীর মাধ্যমে সন্তান প্রসবের ফলে নানা জটিলতা, এমনকি মা ও সন্তানের মৃত্যু পর্যন্ত হয়ে থাকে।

পুষ্টিহীনতার বাস্তবতা : গ্রামের মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্যতা ও স্বাস্থ্য অসচেতনতার কারণে পুষ্টিহীনতায় ভোগে। আবার অনেকের ইচ্ছা থাকলে উপায় থাকেনা। এ প্রবাদ বাক্যের বাস্তবতা গ্রামের মানুষের মধ্যে নিত্য নতুন কাজ করে। এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, "বাংলাদেশের গ্রামের প্রায় সাড়ে সাত কোটি মানুষ অপুষ্টি সমস্যায় আক্রান্ত, যাদের অধিকাংশ নারী ও কম বয়সী পুরুষ। গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের প্রায় অর্ধেকই ভুগছে রক্ত স্বল্পতায়। প্রতি বছর যত শিশুর মৃত্যু হয় উহার দুই-তৃতীয়াংশই মারা যায় অপুষ্টিতে।"[১১] এমতাবস্থায় সকলের জন্য পুষ্টি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে

Dhaka University Institutional Repository

না পারলে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জাতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা সুদূর পরাহত বলে বিবেচিত হবে। বিশেষ করে গ্রামের মা, শিশু ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষকে এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার প্রদানের আবশ্যকতা রয়েছে।

চিত্র নং-৮.১৫

উপরের চিত্রে একজন মধ্য বয়সী দরিদ্র পুরুষ অপুষ্টির শিকারে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে দিন দিন বিছানায় শুয়ে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। সরকার দেশে যক্ষা নিরাময়ে কর্মসূচী গ্রহণ করে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করলেও গ্রামের এ রোগীটি তার সুফল হতে বঞ্চিত হচ্ছে।

জরাজীর্ণ গ্রামীণ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র : তদানীন্তন বৃটিশ ও পাকিস্তান উপনিবেশিক শাসন আমলে গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে বাংলাদেশের কোন কোন গ্রামে দু'একটি পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। সংস্কারের অভাবে বর্তমানে এসব স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলো জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। তাছাড়া সরকারী ডাক্তার ও ঔষধ পত্রের সার্বজনীনতা না থাকায় এসব কেন্দ্র থেকে গ্রামের মানুষ কমই উপযোগিতা পেয়ে থাকেন।

চিত্র নং- ৮.১৬

উপরের চিত্রে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ধুলাচর ইউনিয়নে পাকিস্তান শাসন আমলে নির্মাণ করা হয় এ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি। দু'বছর যাবত এলাকার জনগণ এ চিকিৎসা কেন্দ্রটি থেকে কোন প্রকার চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেননা। বর্তমানে সম্পূর্ণ অকেজো অবস্থায় এ পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রটি পড়ে রয়েছে।

গ্রামীণ যাতায়াত অবকাঠামো : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে মানব সম্পদ ও জনস্বাস্থ্য সেবার পাশাপাশি যাতায়াত ব্যবস্থা একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। গ্রামের অবকাঠামো উন্নয়ন বলতে গ্রামীণ যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়নকেই বুঝে থাকে। কোন্ জনপ্রতিনিধিকে ভোট দিলে রাস্তা পাকাকরণ, কাঁচা রাস্তা নির্মাণ, নদী, জলাশয়ের উপর ব্রীজ নির্মাণ করে যাতায়াত সহজসাধ্য করে দিবেন, জনগণ সে সকল জনপ্রতিনিধির প্রতিশ্রুতির প্রতি আশ্বস্ত হয়ে তাঁকে ভোট দিয়ে থাকেন। নির্বাচনের পূর্বে জনপ্রতিনিধিরা ঠিকই জনগণের কাছে ওয়াদা করে তাদের (জনগণ) ভোট আদায় করেন। কিন্তু নির্বাচিত হওয়ার পর, তারা (জনপ্রতিনিধি) জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যান। কোন কোন প্রতিনিধি যাতায়াত ব্যবস্থার কিছুটা উন্নতি সাধন করলেও তাতে নানা সমস্যায় জনগণকে আরও দুর্ভোগের শিকার হতে হয়। নিচে গ্রামীণ যাতায়াত অবকাঠামোর উন্নয়নমূলক নেতিবাচক কর্মসূচীর বাস্তবতা ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা হলো:

কর্মসূচী বাস্তবায়নে দীর্ঘ সূত্রিতা : জনপ্রতিনিধিরা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী গ্রহণ করে সরকারের কাছ থেকে অর্থ অনুমোদন করিয়ে থাকেন। অনুমোদিত অর্থ

ব্যয়ের জন্য টেন্ডার আহবান থেকে শুরু করে বাস্তবায়ন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। এভাবে মাসের পর মাস থেকে শুরু করে কোন কোন কর্মসূচী বছর, যুগ পেরিয়ে যায় তবুও বাস্তবায়িত হয় না। এর পিছনে জনপ্রতিনিধি, সরকারী কর্মকর্তা ও ঠিকাদারদের নিহিত থাকে অর্থ আত্মসাতের নানা কৌশল। তবে ব্যতিক্রম ভাবে এ কথা সত্য, কোন কোন সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ নানা কারণে কিছু কর্মসূচী বাস্তবায়নে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। নিচে চিত্রের মাধ্যমে কর্মসূচী বাস্তবায়ন দীর্ঘ দিন যাবত অবহেলিতভাবে পড়ে থাকার দৃশ্য দেখানো হলো :

(ক) ময়মনসিংহের ভালুকা-সখীপুর রাস্তার খিরু নদীর উপর প্রায় সাত কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত সড়ক ও জনপথ বিভাগের দ্বিতীয় ব্রীজটি প্রায় এক যুগ পরও জনগণের কোন উপকারে আসছে না। শুধু এ্যাপ্রোচ সড়কে মাটি ভরাটের জন্য।

চিত্র নং- (ক) ৮.১৭

উপরের চিত্রে সওজ ২০০১ সালের মাঝামাঝি সময়ে সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে এবং ২০০৩ সালে সেতুটির নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন যাবত দু' পাশের ১ কিলোমিটার রাস্তা পাকাকরণ না হওয়ায় জনসাধারণ এ সড়কের উপযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বরং বাড়তি দুর্ভোগের সৃষ্টি হচ্ছে। ১৫/২০ ফুট ঢালু রাস্তা মাড়িয়ে উপরে উঠে মানুষ গন্তব্যে পৌঁছতে বাধ্য হচ্ছে। বৃষ্টি বিঘ্নিত দিনে পিচ্ছিল মাটিতে পা ফসকে অনেককেই নিচে পড়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে।

(খ) অনুরূপভাবে জামালপুর জেলার সানন্দাবাড়ী সেতু নির্মাণ কাজও এক যুগেও সম্পন্ন হয়নি। নিচে চিত্রে সেতুটি ব্যবহার উপযোগী না হওয়ায় জনগণের দুর্ভোগের একটি চিত্র দেখানো হলোঃ

চিত্র নং- (খ) ৮.১৮

দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার তথ্য মতে, "২০০০ সালের মে মাসে ৯ কোটি ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হয় এবং তিন বছরের মধ্যে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও নির্দিষ্ট সময়ে এ কাজ সম্পন্ন হয়নি।"[১২] অবশ্য কাজের ধীরগতি ও গড়িমসির কারণে সেতুর নির্মাণ কর্তৃপক্ষ সেতু নির্মাণ নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হওয়ায় পরবর্তীতে কাজটি সমাপ্ত করতে ব্যর্থতায় দরপত্রের শর্ত ও চুক্তি ভঙ্গের কারণে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানটির চুক্তি বাতিল করতে বাধ্য হয়। বাস্তবে আর কতদিনের

মধ্যে জনগনণ এ সেতুর উপযোগিতা পাবেন এবং দুর্ভোগের প্রহর গুণা শেষ হবে তা সময়ই বলে দিবে।

গ্রামীণ জনপদে মানুষের যাতায়াত অবস্থা : বাংলাদেশে এমন অনেক গ্রামীণ জনপদ রয়েছে যেখানে আদৌ আধুনিক সভ্যতার আলো প্রজ্বলিত হয়নি। আবহমানকাল ধরে বাবা, দাদা তথা পূর্ব পুরুষের চলাচলের রাস্তাই সভ্য জগতে এ প্রজন্মের মানুষের একমাত্র যাতায়াতের রাস্তা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিভিন্ন বয়সের নারী পুরুষসহ প্রশস্ত নদীর উপর নির্মিত বাঁশের সাঁকো দিয়ে এপার ওপার পৌঁছে থাকেন। গৌরীপুর উপজেলার সুরিয়া নদীতে এমন বাঁশের সাঁকোতে মানুষ পারাপারের বাস্তব দৃশ্য নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.১৯

গৌরীপুর উপজেলার মাওহা ইউনিয়নের সুরিয়া নদীতে কত দিন আগে থেকে বাঁশের তৈরী ১৫০ ফুট দীর্ঘ সাঁকো দিয়ে ঐ এলাকার বিপুল জনগোষ্ঠী পারাপার করছে, তার কোন হদিস নেই।

Dhaka University Institutional Repository

জনগণ নিজেদের চলাচলের সমস্যার জন্য বাড়ী বাড়ী থেকে বাঁশ উঠিয়ে সাঁকোটি নির্মাণ করে আসছেন। "এ সাঁকো পাড়ি দিয়ে বিদ্যালয়ে যাওয়ার পথে পড়ে গিয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুবরণ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৭ বছরের শিশু আবুল হোসেন। ২০ বছর বয়সের যুবতী লুৎফা খাতুন এবং নসর আলীর স্ত্রী ৩৫ বছর বয়সের আমেনা খাতুন।"[১৩] স্কুলে কলেজে গমনকারী ছাত্র/ছাত্রীদের এবং কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য আনা নেয়া ও বিপননের একমাত্র মাধ্যম হলো সাঁকোটি। স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে যতজন সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, নির্বাচনের পূর্বে তাঁরা সবাই এ এলাকার মানুষের প্রাণের দাবী সাঁকোটি পাকাকরণের প্রতিশ্রুতি দিলেও নির্বাচিত হওয়ার পর তাঁরা আর দেয়া ওয়াদা রক্ষা করেন না।

নিম্ন মানের উপকরণে পাকা রাস্তা নির্মাণ : বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের রাস্তা গুলো নির্মাণের সময় নিম্নমানের উপকরণ এবং পরিমানমত উপকরণের চেয়ে কম উপকরণ দিয়ে রাস্তা পাকাকরণের ফলে অল্প দিনের মধ্যেই এ সকল রাস্তা চলাচলের অনুপযোগী হয়ে জনদুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আর এ জন্য ঠিকাদার এবং দেখভালের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রকৌশলী কেন দায়ী নন, তা বোধগম্য নয়। গ্রামের সহজ সরল জনগণ কি পরিমাণ উপকরণ দিয়ে রাস্তা তৈরী করতে হয়, সে সম্পর্কে অসচেতন থাকায়, ঠিকাদারগণ কোন ভাবে নিম্ন মানের উপকরন দিয়ে রাস্তা তৈরী করে ফায়দা লুটে থাকে। এভাবে সড়ক অবকাঠামো কর্মসূচীর টাকা লুটপাটের ফলে একদিকে সরকারের ক্ষতি সাধিত হয়, অন্য দিকে এ সকল রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে ব্যাপকভাবে জনদুর্ভোগের সৃষ্টি হয়ে থাকে। গ্রামের রাস্তা নির্মাণের এ বাস্তবতা চিরায়ত। রাস্তা নির্মাণের ৩ মাসের মধ্যেই ভেঙ্গে পড়ার বাস্তবতার চিত্র নিচে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২০

উপরের চিত্রে ভালুকা-গফরগাঁও পাকা রাস্তাটি চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়লে দীর্ঘদিন পর সড়ক ও জনপথ বিভাগ রাস্তাটি মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করে। রাস্তা মেরামতের ৩ মাসের মধ্যে আবারো রাস্তাটি পূর্বের ন্যায় বড় বড় খানাখন্দে পরিণত হয়।

পাকা রাস্তা সংস্কারের ধীর গতি : কোন পাকা রাস্তা বৃষ্টিতে বা অন্য যে কোন কারণে একটু খানাখন্দে পরিণত হলে তা দ্রুতগতিতে মেরামত না করে বছরের পর বছর ফেলে রাখায় পুরো রাস্তাটি যান চলাচলে একেবারে অনুপোযোগী হয়ে পড়ে। এতে জনসাধারণকে যাতায়াতে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হয়। গ্রামের পাকা রাস্তাগুলো সংস্কারের এ ঐতিহ্য যুগ-যুগান্তরের। নিচের চিত্রে এমন একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২১

উপরের চিত্রে গ্রামের একটি পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন যাবত মেরামত না করায় এখন আর পাকা রাস্তার নিদর্শন নেই। কয়েক বছর আগে রাস্তাটিতে দু'একটি খানা খন্দ দেখা দিলে, কর্তৃপক্ষ মেতামতের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। রাস্তা যখন যান চলাচলের একেবারে অযোগ্য হয়ে পড়ে তখন কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে।

তাছাড়া রাস্তা মেরামতের টেন্ডার আহবান করা হলে অনেকে রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার করে, টেন্ডার নেয়ার চেষ্টা করলে শুরু হয় মারামারি। দলীয় পরিচয়ে অযোগ্য ঠিকাদারদের টেন্ডার নেয়ার দৃশ্য এলাকার মানুষকে হতবাক করে ফেলে। বর্তমানে যান চলাচলের অযোগ্য এ রাস্তাটি জনগণ ব্যবহার না করে, কয়েক মাইল ঘুরে অন্য রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছে।

স্বেচ্ছাশ্রমে কাঁচা রাস্তা নির্মাণ: (ক) গফরগাঁও উপজেলার লংগাইর ইউনিয়নে পূর্ব ফুকসাইর গ্রামে জনগণের যাতায়াতের কোন রাস্তা নেই। তাদেরকে আঁকা বাকা পথ চলা রাস্তা দিয়ে অতি কষ্টে গন্তব্যে পৌছতে হয়। তাই গ্রামবাসী নিজেরাই রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। নিচের চিত্রে স্বেচ্ছাশ্রমে জনগনের রাস্তা নির্মাণের একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২২ (ক)

জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘ দিনের আশ্বাস ও প্রতিশ্রুতির বিপক্ষে বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন গ্রামবাসী। এলাকার জনগণ তাদের দীর্ঘ প্রতীক্ষিত রাস্তাটি জনপ্রতিনিধিরা নির্মাণ না করে দেয়ায় পরিশেষে স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করে কাঙ্খিত স্বপ্ন নিজেরাই পূরণ করতে যাচ্ছেন। গফরগাঁও বরমী সড়ক থেকে পূর্ব ফুকসাইর দৌলা সরকারের বাড়ী পর্যন্ত এলাকার অবহেলিত দরিদ্র জনগণ রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি দিতেও দ্বিধাবোধ করেননি।

(খ) স্বেচ্ছাশ্রমে রাস্তা নির্মাণের বাস্তবতা : অপর বাস্তবতাটি হলো জনপ্রতিনিধিদের প্রতি ক্ষোভেব বহিঃপ্রকাশ ঘটানোর জন্য গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়ার একটি গ্রামের নারী, পুরুষ সম্মিলিতভাবে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে রাস্তা নির্মাণ করেছেন। নিচে চিত্রে তা দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

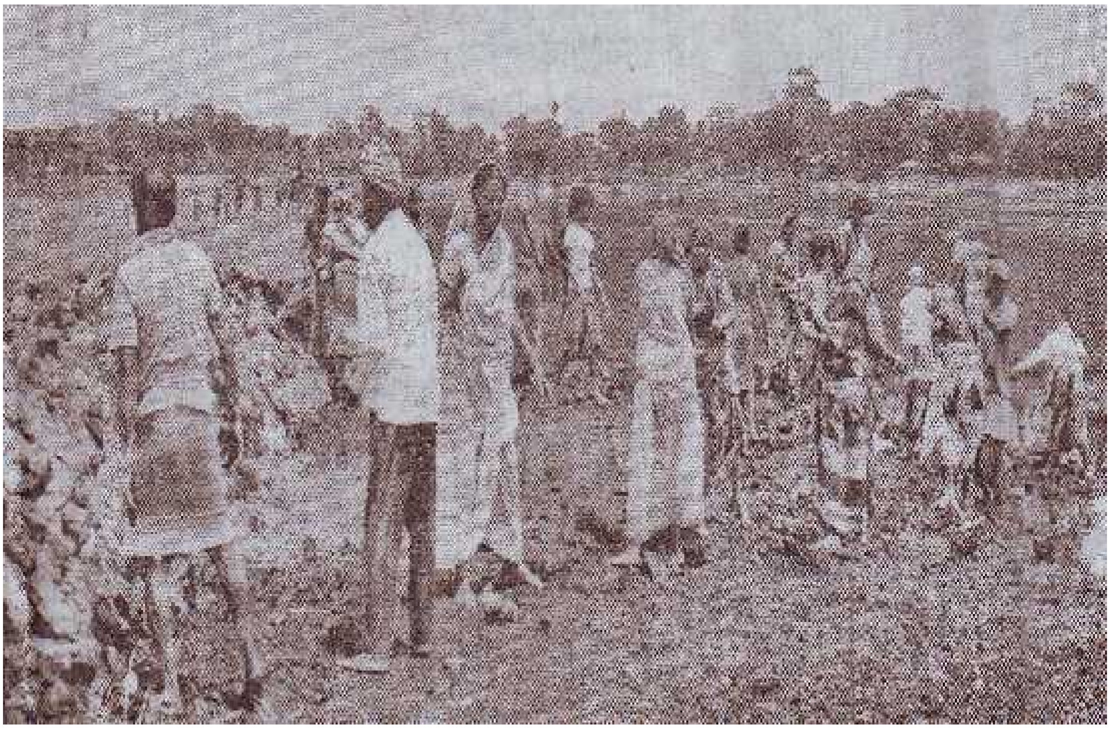

চিত্র নং- ৮.২২ (খ)

গ্রামের মানুষ রাস্তার অভাবে সহজ ভাবে যাতয়াত করতে না পারায় মেম্বার, চেয়ারম্যান এবং জাতীয় সংসদের মাননীয় সদস্য সাহেবের কাছে বার বার আবেদন করে কোন ফল না পেয়ে, অবশেষে গ্রামের মানুষ হতাশাগ্রস্থ হয়ে নারী, পুরুষ সম্মিলিত ভাবে কোদাল-ঢালি হাতে নিয়ে নিজেদের চলার রাস্তা নিজেরাই নির্মাণ করছেন।

রেল পথ বাস্তবতা : বর্তমান সরকার রেলওয়ের নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের বিষয়টি বিবেচনা করে এবং এটিকে লাভজনক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করেছেন। দেশবাসীর প্রত্যাশা সহজ সাধ্য ও অনেকটা নিরাপদ যাতায়াত এবং পরিবহনের মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত রেলওয়ে যোগাযোগে নতুন প্রাণ সঞ্চারিত হবে। তবে নেতিবাচক বাস্তবতার নিরিখে এখনও দেখা যায়, এ নতুন মন্ত্রণালয় অতীতের ঘুণে ধরা অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে পারছে না। বিনা টিকিটে যাত্রীদের জরিমানার টাকা সরকারী কোষাগারে জমা না দিয়ে অতীতের মতোই টি. টি.সাহেবরা নিজেদের পকেটেই রেখে দেন। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন স্থানে রেলওয়ের সরকারী সম্পতি অহরহ বেদখল হচ্ছে। এমতাবস্তায় নিচু থেকে সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে অতীতের গ্লানি মুছতে কত সময় লাগবে তা বিধাতাই জানেন।

চিত্র নং- ৮.২৩

উপরের চিত্রে রেলওয়ের সরকারী জমি বেদখল হওয়ার একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো। রাজনৈতিক মদদপুষ্ট প্রভাবশালী একটি মহল লালমনিরহাট জেলার একটি রেল স্টেশনের পার্শ্বে কোটি কোটি টাকার সরকারী জমি দখল করে কৃষিক্ষেত বানানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন এবং অপর দৃশ্যে আবাস তৈরির কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। অথচ এসব অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার মত কোন কর্তৃপক্ষ নেই।

নৌপথে যাতায়াত অবস্থা : নদীমাতৃক বাংলাদেশে এক কালে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম ছিল পানি পথ। পরিবেশগত কারণে পানি পথে যাতায়াত আজ কাল নেই বললেই চলে। নদী ভরাট, কল কারখানার বর্জ্যের দুর্গন্ধতা, বৃষ্টি পাত কমে যাওয়া, খাল, বিল, নদী নালায় পানি না থাকায় এ

যাতায়াত ব্যবস্থা অনেকটা বন্ধ হওয়ার পথে। নিচে পানি পথে যাতায়াতের নেতিবাচক কিছু বাস্তবতা দেখানো হলো :

নদী ভরাট বাস্তবতা : অতীতে বাংলাদেশের নদী গুলোর বুক চিরে সারা বছর নৌকা চলাচল করতো। মানুষের চলাচল এবং কৃষি পণ্য সহ যাবতীয় জিনিষ আনা নেওয়ার অন্যতম মাধ্যম ছিল এই নদী পথ। অথচ এখন অনেক নদীই মৃত। সুতরাং বাস্তবতা হচ্ছে আজকাল নদীপথের যাতায়াত সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় নদী ও হাওর-বাওর এলাকার মানুষের চলাচল ও কৃষি পণ্য স্থানান্তর কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ছে। এতে গ্রামের মানুষের উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে। এমনি একটি মৃত নদী ও নদী ভরাট বাস্তব দৃশ্য নিচে চিত্রে দেখানো হলো :

চিত্র নং- ৮.২৪

উপরের চিত্রে ফরিদপুর জেলার কুমার নদী তার অতীত যৌবন হারিয়ে পরিণত হয়েছে শস্যক্ষেত্রে। গত ৫০ বছরেও এ নদীটি একবারও খনন বা ড্রেজিং না করায় এবং বন্যার সময় উজান থেকে বয়ে আসা পলিতে দিন দিন নদীটি ভরাট হচ্ছে। বর্ষাকালে সামান্য পানি জমলেও শুস্ক মৌসুমে এটি থাকে একটি শস্যক্ষেত্র। তাছাড়া কোন বাণিজ্যিক এলাকার পার্শ্ববর্তী অপর একটি নদীতে কীভাবে বর্জ্য ফেলে ভরাট করা হচ্ছে তার বাস্তব দৃশ্য চিত্রে দেখানো হলো।

নৌযান চলাচলে নৌ-পথের নাব্যতা হ্রাস : দেশের নদী গুলোর নাব্যতা হ্রাস পাওয়ায় বর্ষাকলে গ্রাম গঞ্জের মানুষ নৌপথে যাতায়াত করতে পারলেও শুষ্ক মৌসুমে এ চলাচলে ব্যাপক প্রতিবন্ধতা সৃষ্টি হয়। নিচে এমন একটি দৃশ্য দেখানো হলো:

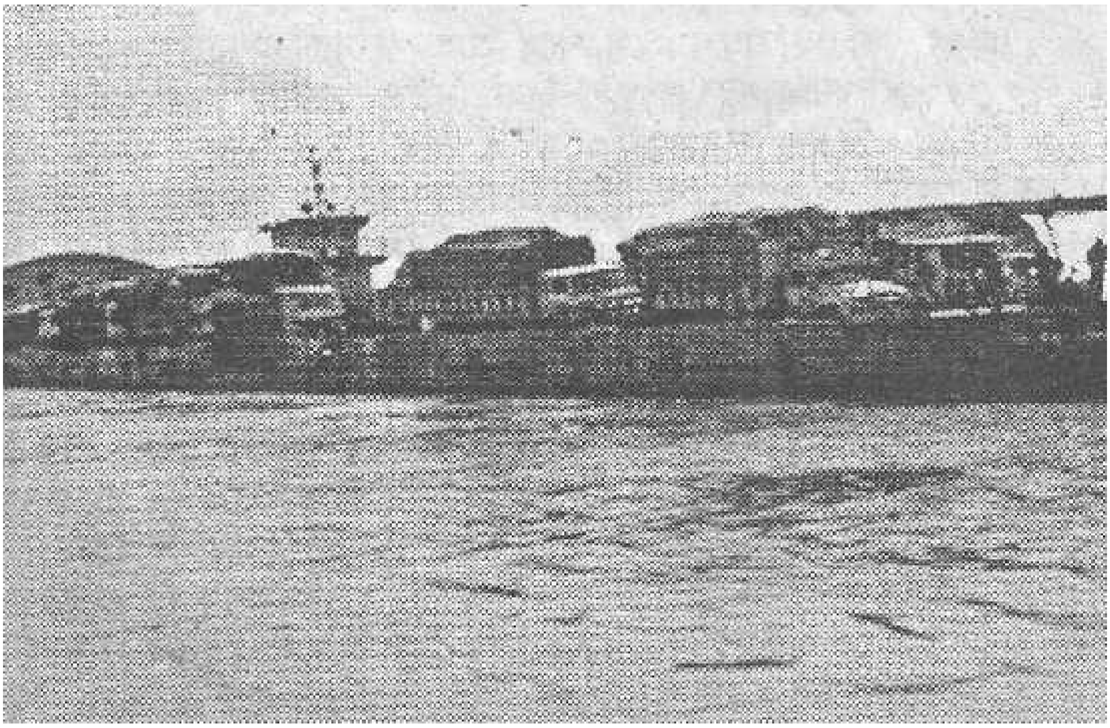

চিত্র নং- ৮.২৫

চিত্রে দেখা যাচ্ছে নদীতে নাব্যতা না থাকায় ফেরি গুলো চরে আটকা পড়ে আছে। ১৭ জানুয়ারী ২০১১ সালে দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে জানা যায়, “৪.৮৬ কোটি টাকা ব্যয়ে মাওয়া পাওডোবা মাগুরখন্ড চর জানাজাতের ১৮ কিলোমিটার রাস্তা ফেরি চলাচলের নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য খরচ করা হয়।”[১৪] অথচ বাস্তবতা হচ্ছে কিছু দিন পর ফেরি চলাচলের এ রাস্তাটি আবার নাব্যতা হারিয়ে পূর্বাবস্থায় পরিণত হয়েছে।

পানি সম্পদ উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা : সরকার পানি সম্পদ উন্নয়নে নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিভিন্ন খাতে প্রতি আর্থিক বছরের বাজেটে প্রচুর বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। কর্মসূচী বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা গণ নানা

ভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে গ্রামোন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করেন। নিচে সংশ্লিষ্ট কর্মসূচী বাস্তবায়নের নেতিবাচক কিছু বাস্তবতা দেখানো হলো:

দক্ষিণাঞ্চলের লোনা পানিতে ফসল ক্ষতি : দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সমুদ্র উপকূলীয় গ্রাম গুলোতে প্রতি বছর লোনা পানি ঢুকে কৃষকের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উৎপাদিত ফসল কীভাবে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে তার একটি চিত্র নিচে দেখানো হলো:

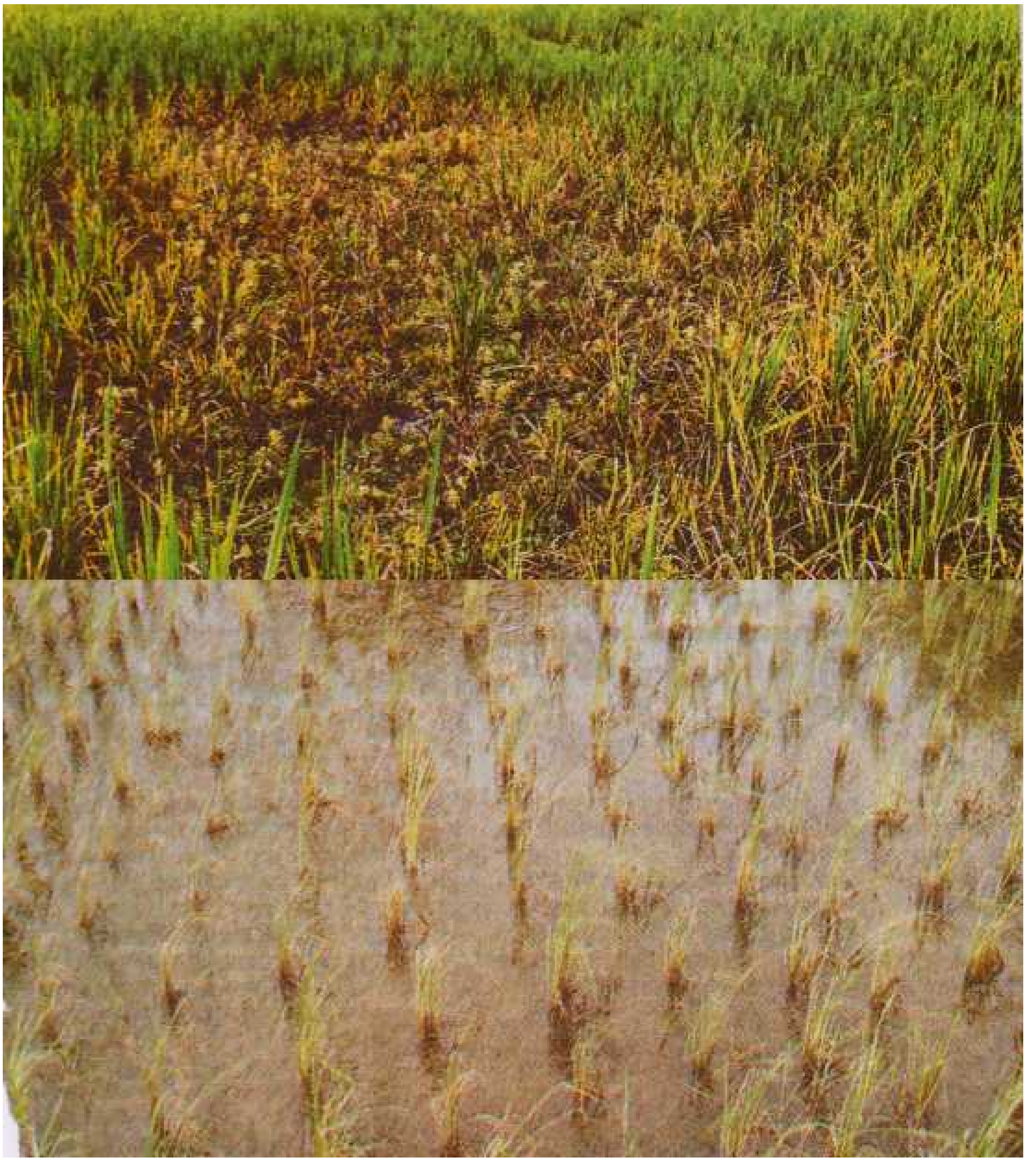

চিত্র নং- ৮.২৬

পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার নীলগঞ্জ ইউনিয়নের লস্কর ভাঙ্গা স্লুইস গেইট মেরামত না করায় লবণাক্ত পানি ঢুকে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করছে। এমনি একটি উঠতি কাঁচা ধান ক্ষেতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকে কীভাবে ফসল নষ্ট করছে তার দৃশ্য দেখানো হলো। তাছাড়া অপর একটি

ধান ক্ষেতে চারা রোপনের এক মাসের মধ্যে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকে ধানের কঁচি চারা নষ্ট করছে তার বাস্তব দৃশ্যও দেখানো হলো।

নদী খনন বাস্তবতা : নদীমাতৃক বাংলাদেশের ছোট বড় সকল নদ-নদী, খাল-বিল ও অন্যান্য জলাশয় প্রায় মৃত। সরকার দু'একটি নদী ড্রেজিংয়ের কর্মসূচী হাতে নিলেও বাকী নদী গুলোর নব্যতা হ্রাস পেয়ে জায়গা জায়গায় চর জেগে উঠেছে। এমন একটি বাস্তবতা নিচের চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২৭

কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ী উপজেলার উপর দিয়ে বহমান এক সময়কার খরস্রোতা ধরলা নদী এখন মৃত প্রায়। ৫৫ কিলোমিটারের এ নদীটি ভারত থেকে বাংলাদেশের মোগল হাটের কর্ণপুর দিয়ে প্রবেশ করে কুড়িগ্রাম জেলার অদূরে যাত্রাপুরে ব্রক্ষপুত্রের সাথে মিলিত হয়। বাস্তবতা হচ্ছে, বর্ষা শেষ হবার কিছুদিনের মধ্যে এ নদীতে বড় বড় চর জেগে উঠে। মানুষ শুষ্ক মৌসুমে নদীর মাঝখান দিয়ে এপার ওপার রাস্তা তৈরী করে চলাচল করে থাকে।

নদী ভাঙ্গনের বাস্তবতা : সরকার বাংলাদেশের নদী ভাঙ্গন রোধে   কর্মসূচী গ্রহণ করলেও এ কর্মসূচী গুলো সফলতার মুখ দেখতে পাচ্ছেনা। প্রতি বছর নদী ভাঙ্গনে হাজার হাজার মানুষ ঘর-বাড়ী হারিয়ে চিরদিনের মত নি:স্ব হয়ে যাচ্ছে। শত শত বাস্তবতার মধ্য থেকে নদীর ভাঙ্গনে টাঙ্গাইল জেলার ভুয়াপুর উপজেলার রুলিপাড়া স্বাস্থ্য ক্লিনিকটি কিভাবে যমুনা নদীতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তার একটি চিত্র নিচে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২৮

প্রবল বর্ষনে যমুনা নদীর তীর ভেঙ্গে বিলীন হয়ে যাওয়া রুলিপাড়া স্বাস্থ্য ক্লিনিকসহ শত শত ঘরবাড়ী, ফসলী জমি, পুকরের মাছ, গবাদি পশু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নদী গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়াও ক্ষতি হচ্ছে গ্রামের মানুষের নানা রকমের সম্পদ।

জলাবদ্ধতার বাস্তবতা : সরকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও বাস্তবে গ্রামের মানুষ কী তার সুফল পাচ্ছেন? যত্রতত্র রাস্তা নির্মাণ, মৎস্য চাষ প্রকল্প, নদী ভরাট সহ নানা প্রকার পরিবেশগত বিপর্যয়ে গ্রামের ফসলি জমি, বাড়ী ঘরের আনাচে কানাচে বৃষ্টির পানি জমে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। গ্রামের মানুষ জলাবদ্ধতার শিকার হয়ে কীভাবে দিনের পর দিন সময় কাটাচ্ছে তার একটি দৃশ্য নিচে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.২৯

এ গ্রামের মানুষ আজ পনের বছর যাবত বছরে আট মাস জলাবন্দী হয়ে থাকেন। গ্রামের প্রায় ছয় হাজার মানুষ তাদের দুর্ভোগের কথা বার বার যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন নিবেদন জানিয়ে কোনই সুফল পাচ্ছেন না। বর্তমানে গ্রামের অসহায় মানুষগুলো জলাবদ্ধতার কারণে মানবেতর জীবনযাপনকরছেন।

অন্যান্য অবকাঠামো : গ্রামীন অন্যান্য অবকাঠামোর উল্লেখযোগ্য দিক গুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

গ্রামে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বাস্তবতা : সরকার প্রতিবছর জাতীয় অর্থ বাজেটে গ্রামের মানুষের বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগগ্রস্থ এলাকা গুলোতে নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য কর্মসূচী গ্রহণ ও অর্থ বরাদ্দ দিয়ে থাকেন। এ এলাকায় বন্যা পরবর্তী সময়ে ব্যাপক ভাবে মানুষ জল কষ্টের শিকার হয়। জীবানুযুক্ত পানি পান করে প্রতি বছর উপকূলবর্তী এলাকায় অসংখ্য মানুষ পেটের পীড়া জনিত রোগে আক্রান্ত হয় এবং কখনও কেহ কেহ মৃত্যু বরণ পর্যন্ত করে থাকে। তাছাড়া গ্রীষ্মকালে প্রচন্ড গরমে অতিষ্ট মানুষ এক ফুটা বিশুদ্ধ পানির জন্য দিকবিদিক ছুটাছুটি করতে থাকে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৩০

পানি, পানি আর পানি। কিন্তু পানযোগ্য পানির বড়ই অভাব। বিশুদ্ধ পানি পানের আহাজারী করছে সাতক্ষীরা জেলার শ্যাম নগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের মানুষ। গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে লোনাপানির এলাকা শ্যামনগরে খাবার সপানির জন্য শুধু মানব সন্তানই নয়, হাহাকার পড়ে গেছে গবাদি পশু ও বন্য প্রাণীর মধ্যেও। বাস্তবতার চিত্র হচ্ছে, নিরাপদ ও বিশুদ্ধ পানির অভারের মানুষ এদিক ওদিক থেকে পানি সরবরাহের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। কোথাও বা মহিলারা কলসি কাঙ্খে লাইন দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের জন্য প্রতীক্ষার প্রহর গুনছে। এমন দৃশ্য উপরের চিত্রে দেখানো হলো।

জনবসতি স্থাপনের বাস্তবতা : বাংলাদেশে কৃষি ভূমির স্বল্পতা, জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, জনসংখ্যার ঘনত্ব এবং খাদ্য চাহিদা পূরণের কথা বিবেচনা করে সরকার কৃষি জমির যত্রতত্র বসতবাড়ি স্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু কেহই এ নীতিমালা অনুসরণ না করে, ইচ্ছামত যেখানে সেখানে পাকা বাড়ি নির্মাণের পরিকল্পনা করে যাচ্ছেন। নিচে চিত্রে এ কর্মসূচীর বাস্তবতা দেখানো হলোঃ

চিত্র নং-৮.৩১

ফসল উৎপাদনের জমিতে গড়ে উঠছে পাকা বাড়ী নির্মাণ প্রকল্প। এমন বাড়ী নির্মাণের বাস্তবতা বাংলাদেশে বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়। বিশেষ করে শহরের আশ-পার্শ্বের গ্রাম গুলোতে এ দৃশ্য নিত্য নতুন বিদ্যমান। এতে দিন দিন ফসলি জমিতে স্থাপনা নির্মাণের ফলে উৎপাদন কমে গিয়ে ভবিষ্যতে ব্যাপক খাদ্য সংকট সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবি কিছু নয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি : সরকারের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা কর্মসূচীর বাস্তবতা পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের জন্য নির্মিত দুর্যোগকালীণ আশ্রয় কেন্দ্রের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। প্রতি বছর এ অঞ্চলে মানুষ সহ ব্যাপক হারে পশু পাখির প্রাণ হানি, ক্ষেতের পাকা ফসল ধ্বংস হওয়ার লীলা স্বাভাবিক ভাবেই মানব হৃদয়কে মর্মাহত করে। এতে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয় গ্রামের হত

দরিদ্র মানুষ। ঝড়ে এ অঞ্চলের মানুষের ঘরবাড়ি লন্ড ভন্ড করে ফেলে। নিচে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত একটি কাঁচা বাড়ীর চিত্র দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৩২

প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঘর্ণিঝড়ে গ্রামের একটি কাঁচা বাড়ী সম্পূর্ণ ভাবে বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। শুধু বাড়ী নয়, বাড়ীতে থাকা গৃহপালিত পশু-পাখি এবং সম্পদও ধ্বংস লীলায় বিলীন হয়ে গেছে। তাই সর্বস্বান্ত হয়ে বিধ্বস্ত বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে আহাজারী করছে এক বৃদ্ধা। এভাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতি নিয়ত বাড়ি ঘর হারিয়ে নিঃস্ব হচ্ছে বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জের অসংখ্য পরিবার। ফলে সহায় সম্বলহীন এসব হত দরিদ্র পরিবার পদে পদে গ্রামোন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

খাদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচী : সরকারের নানামুখী গ্রামীণ খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী থাকা সত্ত্বেও দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী এখনও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাচ্ছে। সরকারী এক জরিপে দেখা গেছে, "দেশের ৬০.২ শতাংশ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা মোটামুটি নিশ্চিত হলেও এখনও ৩৯.৮ শতাংশ পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা নেই (দৈনিক যুগান্তরের ২০.০৫.১০ইং)।"[১৫] সরকারের খাদ্য নিরাপত্তা কর্মসূচী গুলোর বাস্তবতা নিচে উল্লেখ করা হলো।

ভিজিডি, ভিজিএফ কর্মসূচীর বাস্তবতা : গ্রামের অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী যাদের কোন প্রকার আয় রোজগার নেই, এমন পরিবার গুলোকে খাদ্য প্রদান এ কর্মসূচীর আওতাভূক্ত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, এ খাদ্য বিতরণের ভিন্ন চিত্র। গত ১০.০৩.১০ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে জানা যায়, "ভোলায় বিভিন্ন উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের পাশাপাশি ইউপি চেয়ারম্যানদের দলীয় করণের কারণে প্রকৃত দরিদ্র জনগোষ্ঠী ভিজিডি, ভিজিএফ সহ সকল প্রকার সরকারী খাদ্য প্রদান সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ সকল খাদ্য সাহায্য বিতরণ করা হচ্ছে মুখ দেখে দলীয় লোকদের।"[১৬]

চিত্র নং -৮.৩৩

উপরের চিত্রে ভিজিডি ভিজিএফ সাহায্য বিতরণ কালে এমনই একটি দৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

টি-আর, কাবিখা কর্মসূচীর বাস্তবতা : শিক্ষা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাঠে মাটি ভরাটের কাজ সহ নানামুখী কর্মে নিয়োগ দিয়ে শ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন সাধন তথা দারিদ্র্যতা বিমোচন করে তাদের খাদ্য সংস্থানের জন্য সরকার এ কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে,

দলীয় লোকজন, ইউপি চেয়ারম্যান এ কর্মসূচীর অর্থ নানা অজুহাত দেখিয়ে লুটপাট করে থাকেন। ১০.০৩.১২ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে টি-আর, কাবিখা কর্মসূচীর অর্থ লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে এক ইউপি চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে। জানা যায়, "জালিয়াতি করে টি-আর ও কাবিখার অর্থ হরিলুট করছেন ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার রাধানগর ইউপি চেয়ারম্যান "[১৭]

পল্লী বিদ্যুৎ বাস্তবতা : গ্রামের পল্লী বিদ্যুৎ অবকাঠামোর বাস্তবতা থেকে দেখা যায়, ২৪ ঘন্টায় সর্ব সাকুল্যে বিদ্যুৎ থাকে ৪ ঘন্টা। তাও আবার আধাঘন্টা স্থায়ী হয়না। ফলে গ্রামবাসীর জন্য যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয় তা কোন কাজেই আসেনা। পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির কর্মসূচীভুক্ত গ্রাম সমূহের মানুষের ভোগান্তির কোন শেষ নাই। অবস্থাদৃষ্টে, এসব এলাকার মানুষ দিন দিন ক্ষোভে ফুসে উঠছে। বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকগণ বিদ্যুৎ ব্যবহার করুন বা নাই করুন তাকে অবশ্য নির্দিষ্ট পরিমান বিল পরিশোধ করতে হয়।

বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে গিয়ে গৃহস্থালী থেকে শুরু করে সব ধরনের বৈদ্যুতিক সামগ্রী নষ্ট হয় নিত্য দিন। বিদ্যুতের উপযোগিতা গ্রহণের পাশাপাশি প্রায় গ্রাহককে মাসে ৩/৪ শত টাকার মোমবাতি, দু'শ টাকার কেরোসিন তেলও জ্বালাতে হচ্ছে। যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার হিসেবে আরও অতিরিক্ত খরচ হিসেব করতে হয় গ্রাহকগণকে। বর্তমান সরকারের বহু আশ্বাসে এ সমস্যা সামান্য সমাধান হলেও তা গ্রাহকগণের তেমন কোন কাজে আসছেনা। গ্রামীণ পল্লী বিদ্যুৎ অবকাঠামো সম্পর্কে গত ২২.০৪.১০ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকায় একজন গ্রাহক এভাবেই তার বাস্তব দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন, "এক বছর গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেয়া হোক। এতে আমরা আর বিদ্যুতের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকব না। পুরনো যুগে ফিরে যাব। কেরোসিনের লন্ঠন বাতি জ্বালিয়ে প্রয়োজনীয় কাজে করব। সেচ পাম্প চলবে ডিজেল দিয়ে। চালের মিল চলবে পেট্রোল দিয়ে, টিভি চলবে ব্যাটারী দিয়ে। যখন বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি হবে এবং শহর আলোকিত করার পর গ্রামে সরবরাহের মত বিদ্যুৎ থাকবে, তখনই যেন আমাদের জন্য বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। এ প্রতিবাদ সরকারের বিরুদ্ধে না, আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে, কেননা আমাদের অপরাধ আমরা গ্রামের বাসিন্দা।"[১৮]

সরকারের ঋণ দান কমসূচীর অনিয়ম : সরকার গ্রামোন্নয়নে কৃষি সহ বিভিন্ন উৎপাদনশীল খাতে কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের মাঝে ঋণ বিতরণ করে থাকেন। যাতে পুঁজির অভাবে গ্রামের কৃষকদের উৎপাদনমূলক কার্যক্রম ব্যাহত না হয়। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারী তফসিলী ব্যাংক গুলো সহ সমবায়, পল্লী উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ করে থাকে। নিচে এ কর্মসূচীর নেতিবাচক বাস্তবতা উল্লেখ করা হলো :

কৃষি ঋণ দানে দুর্নীতি : ঋণ দান পদ্ধতির স্বচ্ছতা নিয়ে গ্রামের কৃষক ও বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। প্রায়ই শোনা যায় এবং পত্রিকার পাতায় দেখা যায়, কৃষি ঋণে জনপ্রতিনিধি, ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীরা ব্যাপক দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন। উঁচু পর্যায়ের জন প্রতিনিধিদের সাথে ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যাপক সংযোগ রয়েছে। যাতে তাদের কর্মকান্ডের কেহ প্রতিবাদ করতে না পারে। এ স্বর্থোদ্ধারের জন্য ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সাথে আরো সংযোগ রয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশেষ করে সরকারী দলের তৃণমূল পর্যায়ের নেতা কর্মীদের। এসব নেতা কর্মী ও গ্রামের দালালরা ঋণ গ্রহীতার সাথে সংযোগ রক্ষাকারী হিসেবে গোপণে কাজ করে। শর্তের মাধ্যমে তারা গ্রহীতাদের সাথে ঋণ গ্রহণ নিশ্চিত করে। ফলে দেখা যায়, যে সকল কৃষকের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে তারা ঋণ পায়না বা কঠিন শর্তের বেড়াজাল পেরিয়ে ঋণ নিতে আগ্রহী হয় না। কারণ ঋণ পেতে ঋণের অর্ধেক বা তারও বেশী টাকা ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সেলামী দিতে হয়। একটি অংশ পায় দালালরা এবং একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দেয়া হয় কর্মকান্ডের বৈধতার জন্য প্রভাবশালী জনপ্রতিনিধিকে।

ঋণ দানের এ পদ্ধতির প্রতিবাদ করার ক্ষমতা গ্রামের একজন সহজ সরল গরীব কৃষকের নেই। কৃষকরা কঠিন শর্ত সাপেক্ষে ঋণ নিতে রাজি না হওয়ায়, দালালরা দ্বারস্থ হয় ভূমিহীন দরিদ্র লোকদের কাছে। তারা ইউনিয়ন পরিষদের তফসিল অফিস থেকে ঋণ গ্রহীতার নামে টাকা দিয়ে জাল কাগজপত্র সংগ্রহ করে। গ্রহীতারা ঐ কাগজপত্র ব্যাংকে জামানত রেখে শর্ত সাপেক্ষে ঋণের অর্ধেক বা তারও বেশী পরিমান টাকা ব্যাংকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উৎকোচ দিয়ে যা পায়, তা নিয়ে খুশি মনে ঘরে ফিরে। এভাবেই কৃষি ঋণ দান কর্মসূচীর প্রতিটি ফসল উৎপাদন মৌসুম শেষ হয়। আবহমানকাল ধরে চলে আসছে কৃষি ঋণ দানের এ ধারা।

অবস্থার প্রেক্ষাপটে বলা যায়, ঋণ গ্রহীতাগণ ঋণ পরিশোধ না করে, ঋণ খেলাপী গ্রাহক হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। সরকার পরিবর্তন হয়ে নতুন সরকার আসলেও ঋণ দানের এ অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না। সরকারের ঋণ দানের হাজার হাজার কোটি টাকা এভাবেই ঋণ খেলাপী হিসেবে পড়ে আছে। অন্যদিকে আসল কৃষক যারা ঋণ পেয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়নে বাস্তব ভূমিকা রাখবে, তারা ঋণ না পাওয়ায় সরকারের ঋণ দান কর্মসূচীর সফলতা ব্যর্থ হচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলো গ্রামের মানুষের ভোট প্রাপ্তির আশায় সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে ইশতেহারে ঘোষণা করেন , নির্বাচনে জয়লাভ করে সরকার গঠন করতে পারলে তারা নির্দিষ্ট অংকের কৃষি ঋণ মওকুফ বা সুদ মওকুফ করে দিবেন। তাই পরিশেষে বলা যায়, সরকারের কৃষি ঋণ কর্মসূচীতে গ্রামের সাধারণ কৃষক

Dhaka University Institutional Repository

পরিবার উপকৃত না হয়ে উপকৃত হয় দুর্নীতিবাজ, দালাল ও বাটপার শ্রেণির মানুষ। যা গ্রামোন্নয়নে কোন কাজেই আসে না।

পোল্ট্রি ঋণ বাস্তবতা : দেশী মোরগ-মুরগী এবং ডিমের উৎপাদন অপর্যাপ্ত থাকায় এবং জনগণের চাহিদা মেটানো সম্ভব না হওয়ায় ব্রয়লার মুরগি ও মুরগির ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সরকার এ খাতে খামারীদের ঋণ দিয়ে থাকেন। কিন্তু বার্ড ফ্লু ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর হাজার হাজার ব্রয়লার মুরগি মারা যাওয়ায় এ শিল্পটি একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। নিচে বার্ডফ্লুর কারণে অবিক্রিত ব্রয়লার মুরগির বাচ্চার বাস্তবতা চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো :

চিত্র নং -৮.৩৪

মৌলভী বাজার জেলার শ্রীমঙ্গল উপজেলায় শত শত পোল্ট্রি খামারে মুরগির বাচ্চা বিক্রি না হওয়ায় খামারীরা ব্যাপকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। শত শত শ্রমিক বেকার হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। গ্রামের পোল্ট্রি খামারের মালিকরা হতাশায় দিন যাপন করছেন।

বন্যা দুর্ভোগের বাস্তবতা : বন্যা প্রতিবছর বাংলাদেশের কোন না কোন জায়গায় ব্যাপকভাবে ধবংসলীলায় মেতে উঠে। গৃহপালিত পশু-পাখি, ঘরবাড়ী, জমির পাকা ফসল, সহায়-সম্পদ সবইপানিতে তলিয়ে যায়। বন্যার পানিতে নদী ভাঙ্গনে গ্রামের মানুষ চিরদিনের মতো আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। যা গ্রামোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি অন্যতম কারণ।

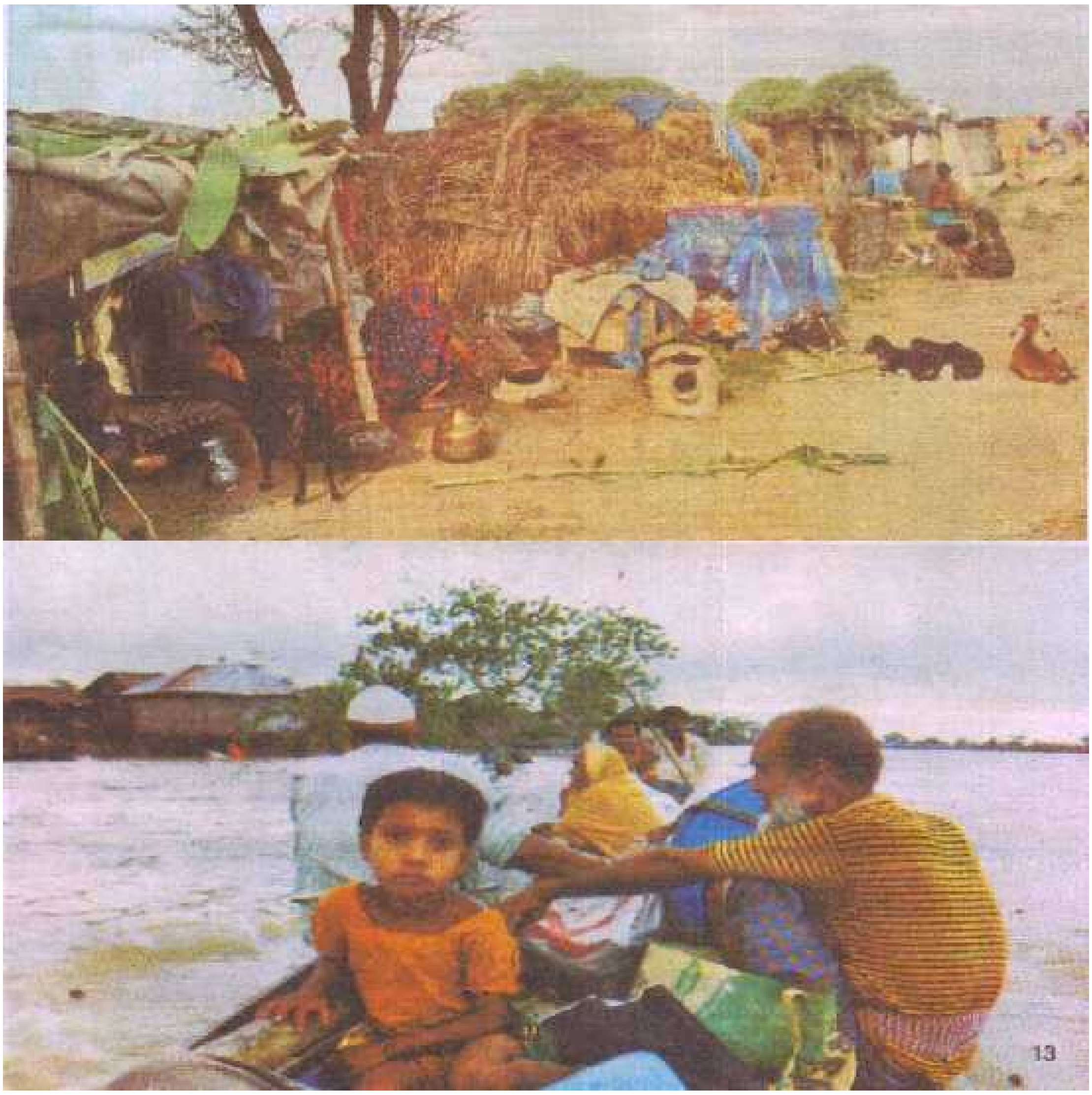

চিত্র নং– ৮.৩৫

উপরের চিত্রে পানিতে মানুষের ঘরবাড়ী তলিয়ে যাওয়া ও সহায় সম্পদ ধ্বংস হওয়ায় তারা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে মানবেতর জীবনযাপনকরছে। এমন একটি বাস্তব দৃশ্য দেখানো হলো।

অসহায় নারী সমাজ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তর গ্রামীণ নারী সমাজে জীবনযাত্রার মান ক্ষেত্র বিশেষে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, এ কথা সত্য। তবে সার্বিক ক্ষেত্রে এ সমাজের নারীদের জীবনযাত্রার মান তেমন পরিবর্তন হয়নি। নিচে গ্রামীণ নারী সমাজের উন্নয়নের নেতিবাচক বাস্তবতা আলোচনা করা হলো:

বাল্য বিবাহ : জনসংখ্যায় বিস্ফোরিত গ্রামীণ জনপদে অশিক্ষিত, দরিদ্র পরিবারের পিতামাতা বাল্য বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দায় সারতে চায়। নিচে চিত্রে এমন একজন নাবালিকা মেয়ের বাল্য বিবাহের ছবি দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৩৬

পত্রিকা মারফত জানা যায়, বাল্যবিয়ের হাত থেকে রক্ষা পেল ৫ম শ্রেণির এক ছাত্রী। কিশোর-কিশোরীর সাহসী তৎপরতায় মেধাবী ছাত্রীর বাল্যবিয়ে বন্ধ হয়েছে। ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্সের মিলেনিয়াম ষ্টারর্সের এক ছাত্রী জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর মেধাবী ছাত্রীটি প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মেধা তালিকায় প্রথম হয়ে আসছে। বাবা একজন রিক্শা চালক। ৬ সদস্য নিয়ে তাদের পরিবার। বিয়ে দিনক্ষণ ঠিক হয় ১৮ বছরের একজন ছেলের সাথে। এ খবর জানতে পেয়ে ছাত্রীর বান্ধবী পঞ্চম শ্রেণির অপর এক ছাত্রী গোপণে একটি পত্র পাঠায় ন্যাশনাল চিলড্রেন টাস্কফোর্সের এক সদস্যের কাছে। এরপর ঐ সংগঠনের যুবক/যুবতীরা ছদ্মবেশে পাত্রী ও তার বরের বাড়ির আশেপাশে খোঁজ খবর নিয়ে ঘটনার সত্যতা জানতে পারে। তারা দল বেঁধে ওই এলাকার বিশিষ্ট জনের সাথে দেখা করে এবং এ বাল্য বিয়ে বন্ধের জন্য অনুরোধ জানান। এরপর বাল্য বিয়ে বেআইনি, এ সম্পর্কে তারা আইনের ব্যাখ্যা জনসন্মুখে উপস্থাপন করেন। তাদের এ তৎপরতায় অবশেষে ওই বিয়ে বন্ধ হয়ে যায়। এ বাল্য বিবাহটি বন্ধ হলেও, গ্রামে অজস্র মেয়ে নিত্যদিন বাল্য বিবাহের শিকার হয়ে জীবন ধ্বংসের কাঠগোড়ায় পা রাখছে।

গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত ১০-১২ বছর বয়সের একজন মেয়েকে বিয়ে দিয়ে গ্রামের দরিদ্র পিতামাতা অনেক সময় মাথার ব্যথা শেষ করতে চায়। যদিও সরকারী আইনে একজন মেয়ে ১৮ বৎসর এবং একজন ছেলে ২৫ বছর বয়স হলেই বিবাহ যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

নির্যাতিত ও উপেক্ষিত নারী : সরকার নারী নির্যাতন অধ্যাদেশ ১৯৮৩ জারী ও জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করলেও গ্রাম-গঞ্জে অসহায়, অবলা নারীরা অবাধে নিত্য নৈমিত্তিক শারীরিক নির্যাতন ও হত্যাকান্ডের শিকার হচ্ছে। তাছাড়া এ সমাজের দরিদ্র নারীরা পেটে দায়ে অন্নের সন্ধানে হন্যে হয়ে পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অরক্ষিত নারীদের জন্য সরকার কিছু কিছু কমসূচী গ্রহণ করলেও তার বাস্তবতা গ্রামীণ এ সমাজের নারীদের জন্য সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই। নিচে গ্রামের নারীরা কীভাবে নির্যাতিত ও উপেক্ষিত হচ্ছে তার কিছু বাস্তবতা দেখানো হলো:

নারী হত্যা : পান থেকে চুন খসলেই গ্রামের অসহায়, অবলা, নিরীহ, অশিক্ষিত একজন নারীকে স্বামী, শ্বশুর, শাশুরী, স্বামীর আত্মীয় স্বজন মিলে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যা করে থাকে। গ্রামে এসব ঘটনা শুধু আজকালের নয়, এমন বাস্তবতা চলে আসছে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী। ছবিতে একজন গ্রামীণ গৃহবধুকে কীভাবে নির্যাতন করে হত্যা করা হয়েছে তার বাস্তবতা দেখানো হলো;

চিত্র নং- ৮.৩৭

গত ১৪.০৩.১২ ইং তারিখের দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে জানা যায়, "চারটি কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার অপরাধ দেখিয়ে আর্ন্তজাতিক নারী দিবসে স্বামী সহ শ্বশুড় বাড়ীর লোকজনের নির্যাতনে এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে।"[১৯] ঘটনাটি ঘটেছে সুনামগঞ্জ জেলার তাহিরপুর উপজেলার একটি গ্রামে।

তালাক প্রবণতা : গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের একজন নারীকে সামান্য অপরাধেই তালাকের শিকার হতে হয়। পুরুষ শাসিত এ সমাজে নারীদেরকে স্বামীরা চতুষ্পদ জন্তুর মত ব্যবহার করে থাকে। কারণ গ্রামের হত দরিদ্র পিতামাতার মেয়ে সন্তান যারা, এমন মেয়েদের রুজি-রোজগারের

একমাত্র ভরসা স্বামী। ফলে স্বভাবিক ভাবেই স্বামীর অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করার ভাষা ও ক্ষমতা দরিদ্র নারীদের থাকেনা। নিচের ছবিতে শিশু সন্তান সহ তালাক প্রাপ্ত একজন নারীর ছবি দেখানো হলোঃ

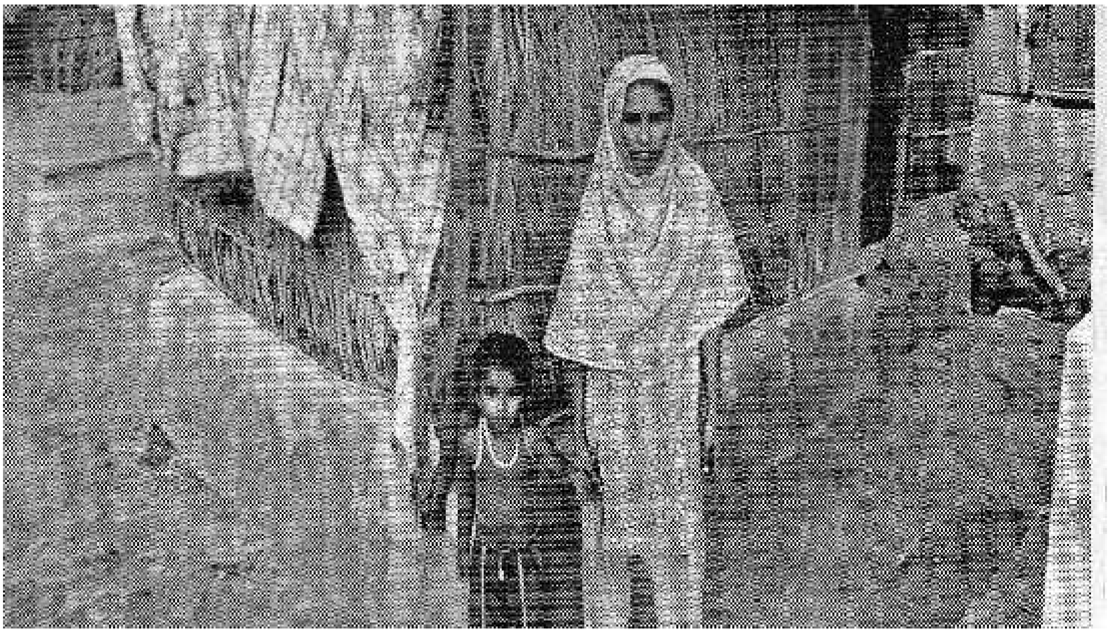

চিত্র নং- ৮.৩৮

অভাবের অসহ যন্ত্রণায় দরিদ্র সংসারের বোঝা বইতে না পেরে, স্ত্রী সন্তানের ভরণ-পোষণে অক্ষম হয়ে স্ত্রীকে তালাক দিয়ে নিরুদ্দেশ হয়েছে একজন স্বামী। দু' বছরের একটি শিশু সন্তান সহ তালাক প্রাপ্তা এমন একজন নারী। সে এখন কী করবে? কে তাকে ভরণ-পোষণ করবে? এসব চিন্তা মাথায় নিয়ে অপেক্ষার প্রহর গুনছে সহায় সম্বলহীন এ মহিলাটি। তালাক প্রাপ্তা এমন নারীদের দৃশ্যপট গ্রামে প্রায়ই দেখা যায়।

অসহায় গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের জীবনযাত্রা : গ্রামীণ অরক্ষিত নারীদের জন্য সরকারী সুবিধা ভোগের কর্মসূচী থাকলেও বয়সে যুবতী হওয়ার কারণে কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে একজন অসহায় নারী নিজের পেটের খোরাক নিজেই সংগ্রহ করছে। এমন একটি বাস্তব চিত্র নিচে দেখানো হলোঃ

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৩৯

দেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতবিক্ষত সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার স্বামী সন্তান ও পিতামাতাহীন একজন গ্রামীণ যুবতী নারী সরকারের কোন প্রকার সাহায্য সহযোগিতা না পেয়ে এভাবেই মাঠে কাজ করছে। জনপ্রতিনিধিরা তাকে সাহায্যের আশ্বাস দিলেও তা বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে না।

নারী শিশু শ্রমিক : সরকার নারী উন্নয়নের জন্য নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করলেও তার সুযোগ সুবিধা এখনও গ্রামের নারী সমাজ পায়নি। দারিদ্র্যতার করাল গ্রাসে নিষ্পেষিত শিশু মেয়েটি বিদ্যালয়ে না যেয়ে পেটের ভাত যোগাতে চা বাগান পরিস্কার করছে এমন একটি বাস্তব দৃশ্য নিচের ছবিতে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৪০

হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাট উপজেলায় একটি চা বাগানে পেটের দায়ে কাজ করছে একজন উপজাতীয় মেয়ে শিশু। জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের চোখের সামনে মাঠে-ঘাটে, পথে-প্রান্তরে এহেন কর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করছে এ দেশের এমন হাজারও শিশু।

গ্রামীণ নারী শ্রমিকের পারিশ্রমিক বৈষম্য : গ্রামের মানুষ নারী শ্রমিকের পরিশ্রমের যথার্থ মূল্যায়ন করেনা। নারী শ্রমিক কৃষি অকৃষি যে কোন খাতেই শ্রম বিনিয়োগ করুক না কেন, তার শ্রমকে সব সময় অবহেলার চোখে দেখা হয়। গ্রামীণ নারী শ্রমিকের শ্রম বৈষম্য দূর করার জন্য এখনও তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। এ সমাজের একজন নারী শ্রমিক আবহমানকাল ধরে গতানুগতিক ভাবেই জীবন পদ্ধতি চালিয়ে যাচ্ছে। এদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন নেই। নিচের চিত্রে কর্মরত এমন নারী শ্রমিকদের ছবি দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৪১

(ক) একজন নারী শ্রমিক একজন পুরুষ শ্রমিকের সমান কাজ করলেও কেবল নারী বলে তাকে পুরুষ শ্রমিকের সমান পারিশ্রমিক দেয়া হয়না। মাঠে মাটি কেটে ঢালি ভর্তি মাটি মাথায় নিয়ে একজন পুরুষ শ্রমিকের সমান কাজ করেও অর্ধেক মজুরী পায় এ মহিলা শ্রমিকটি। (খ) অপর চিত্রে একটি কাপড় কলে কাপড় বোনাচ্ছে কয়েক জন নারী শ্রমিক। এসব শ্রমিকরা সবাই সহায় সম্বলহীন নারী। শারীরিক শ্রম বিক্রি করে যা পায়, তা দিয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে কোন ভাবে সংসার চালায় এ শ্রমিরা। গ্রামের কয়েক কিলোমিটার রাস্তা পায়ে হেটে মিলকারখানায় উপস্থিত হয়ে এরা কাজে যোগদান করে। ৮ ঘণ্টা ঘাম ঝড়া পরিশ্রম করে আবার দু'খানা পায়ের উপর ভর করে আবাসে পৌঁছে তারা। এভাবেই কুলুর বলদের মত অবিরাম গতিতে চল্‌ছে সামান্য আয়ে এদের জীবন। সুভাষ চৌধুরীর লেখায় দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা থেকে জানা যায়, "সাতক্ষীরা সুন্দরবন টেক্সটাইল মিলে ৮

ঘণ্টা হাড় ভাঙা পরিশ্রম করে নারী শ্রমিকরা মজুরি পান মাত্র ১১০ টাকা। কাজ না থাকায় কম মজুরিতে কাজ করেন শাহিদা, আঞ্জুয়ারা ও সখিনা মতো নারী শ্রমিকরা।”[২০]

মেয়ে শিশুর যৌন নীপিড়ন ও আত্মহত্যার বাস্তবতা : গ্রামের দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী মেয়েরা শিশু বয়স হতেই ধনী লোকের বখাটে ছেলেদের লালসায় পড়ে প্রায়ই নীপিড়নের শিকার হয়ে থাকে। এসব বখাটে ছেলেদের অন্যায় প্রস্তাবে দরিদ্র পরিবারের সুন্দরী অবুঝ মেয়েরা রাজী না হলে তাদের উপর নেমে আসে নানা ধরণের নির্যাতন। অনেক সময় ধনী বখাটে ছেলেদের বিবাহের প্রলোভনে রাজী হয়ে কোন মেয়ে গর্ভবতী হলে তাকে বিয়ে না করে ছেলেটি কেটে পড়ে।

চিত্র নং-৮.৪২

উপরের চিত্রে গ্রামের একজন দরিদ্র পরিবারের মেয়ে ধর্ষণের শিকার হয়ে গর্ভবতী হলে বখাটে ছেলেটি তাকে বিয়ে করতে অস্বীকার করলে মেয়েটি শেষ রক্ষা হিসেবে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

সরকারের গ্রামীণ সমাজসেবার বাস্তবতা : সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে গ্রামের মানুষের সেবার জন্য কিছু কিছু কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। নিচে এসব কর্মসূচীর নেতিবাচক বাস্তবতা আলোচনা করা হলো :

গ্রামীণ শিশু সেবা : সরকার গ্রামের দরিদ্র ও এতিম শিশুদের কল্যাণে বাসস্থান, শিক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ নানা মুখী কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন। এদেশে গ্রামে অসংখ্য দরিদ্র, এতিম শিশুর

সেবা দানে সরকারের ঐ সকল কর্মসূচী কতটুকু কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে, তা নিচে আলোচনা করা হলো :

পেটের দায়ে শিশুদের শ্রম বিক্রি: গ্রামের যে সকল অসহায় দরিদ্র পরিবারের চিন্তা শুধু খাবার যোগাড় করা এবং এ কারণে পিতামাতা শিশু সন্তানদের লেখাপড়ার পরিবর্তে শ্রম বিক্রি করে খাবার সংগ্রহের কাজে পাঠিয়ে থাকে। অনেক সময় পিতামাতার রোজগারে সংসারের খরচ বহন করা সম্ভব হয় না। তারা খাবারের ব্যবস্থা করতে না পারলে পরিবারের সদস্যদের অনেক সময় উপোস থাকতে হয়। তাছাড়া অনেক এতিম শিশুকে পেটের দায়ে শ্রম বিক্রি করে নিজের অন্ন নিজেকেই সংস্থান করতে হয়। এমন একটি বাস্তব ঘটনা নিচের ছবিতে দেখানো হলো :

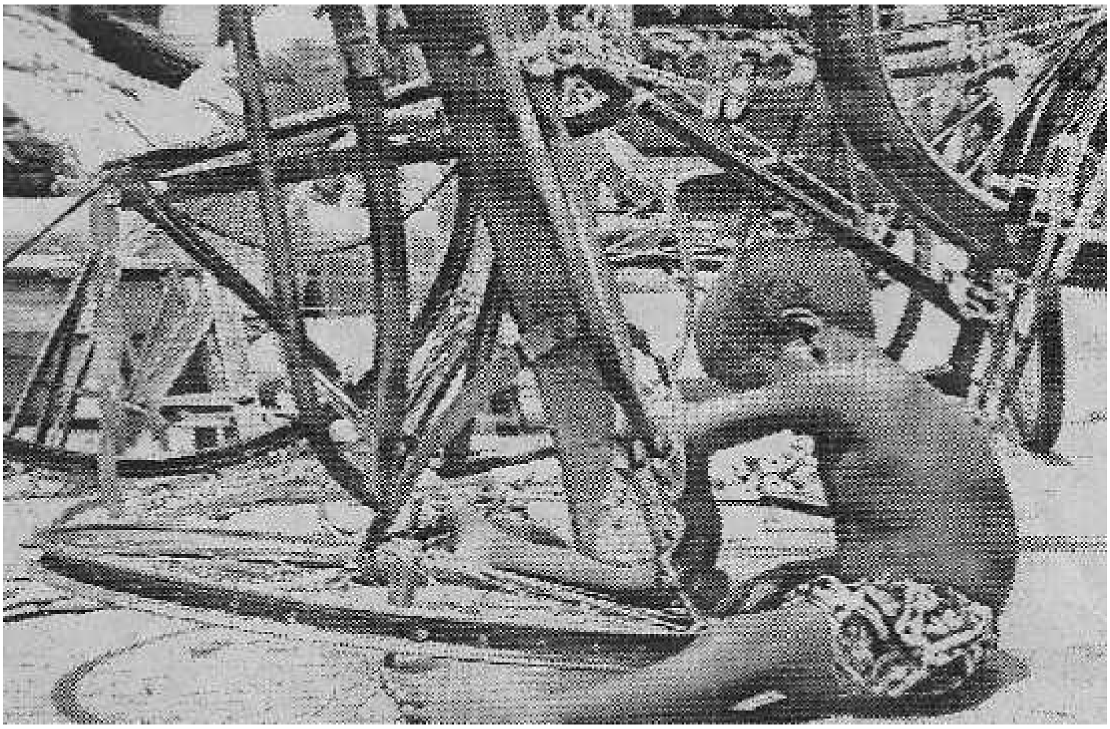

চিত্র নং- ৮.৪৩

৫ বছর বয়সী এ এতিম মেয়ে শিশুটির নাম চম্পা। সে পেটের ভাত যোগানোর জন্য গ্রামের একটি রিক্‌শা গ্যারেজে সারাদিন শ্রম বিক্রি করে। পারিশ্রমিক হিসেবে মালিক যা দেয় তা দিয়ে নিজের খাবারের ব্যবস্থা নিজেই করে থাকে। যদিও সরকার এসব এতিম শিশুদের পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ অধিদফতরের মাধ্যমে কর্মসূচী গ্রহণ করে থাকেন।

বিদ্যালয়ের অভাবে শিশুরা শিক্ষা বঞ্চিত : নীলফামারী জেলার ঝাড়সিংহেশ্বর গ্রামের একটি চড়ে ৩ হাজার পরিবার বসবাস করলেও এলাকার ৩ কিলোমিটারের মধ্যে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় শিশুরা শিক্ষার আলো হতে বঞ্চিত হচ্ছে। এসব শিশুদের শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ থাকলেও সংশ্লিষ্ট এলাকায় কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় জীবনের একটি দুর্গম যাত্রাপথে তারা অগ্রসর

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে। চরের বাসিন্দারা জনপ্রতিনিধিদের কাছে এ এলাকার শিশু সন্তানদের শিক্ষা দানের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য অনুনয় করে অবশেষে রিক্ত হস্তে বসে আছেন। নিচে চিত্রে শিক্ষার আলো বঞ্চিত শিশুদের শ্রম বিক্রির একটি দৃশ্য দেখানো হলো :

চিত্র নং- ৮.৪৪

উল্লিখিত জেলার ডিমলা উপজেলার বিভিন্ন চরাঞ্চলে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান না থাকায় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র পরিবারের শিশুরা পাথর ভঙ্গীর মত কঠিন শ্রম বিক্রি করে পরিবারের আয় বাড়ানোর জন্য অর্থ উপার্জন করছে।

বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্রম বিক্রির বাস্তবতা : পটুয়াখালী জেলার গলাচিপা উপজেলার সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় অসহায় দরিদ্র পরিবারের শিশুরা বিদ্যালয় ত্যাগ করে শ্রম বিক্রির একটি বাস্তব দৃশ্য নিচে দেখানো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৪৫

এ জেলার দরিদ্র পরিবারের শিশু সন্তানরা পিতামাতার সংসারের হাল ধরতে শ্রম বিক্রি করছে। গলাচিপার সোনারচর গ্রামের একটি আলু ক্ষেতে এসব শিশুরা অভাবের তাড়নায় অতিষ্ঠ পিতামাতার সংসারে আয় বাড়ানোর জন্য শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছে।

শিশু ভিক্ষাবৃত্তি : পিতা মাতার অধিক সন্তান থাকায় তারা সন্তানের খাদ্য সংস্থান না করতে পারায় শিশুরা পেটের দায়ে নিজেদের খাবার নিজেই যোগার করতে ভিক্ষার থলে কাঁধে করে গ্রামের বাড়ী বাড়ী ঘুরছে।

চিত্র নং-৮.৪৬

সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকায় পিতা মাতার অধিক সন্তান থাকায় এসব শিশুরা পেটের দায়ে গ্রামের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করছে। উপরের চিত্রে এমন একটি বাস্তব দৃশ্যটি দেখানো হলো।

সরকারের বয়স্ক ভাতা প্রদান : সরকার গ্রামীণ বয়ঙ্ক দরিদ্র অসহায় লোকদের খাদ্য সংস্থানের ব্যবস্থা করে থাকেন। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, এ কর্মসূচীতে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি পরিবেষ্টিত থাকায় প্রকৃত বয়স্ক অরক্ষিত মানুষ অনেকেই এর সুফল থেকে বঞ্চিত। নিচে এমন একটি বাস্তবচিত্র দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৪৭

লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার পাট গ্রামের অতিদরিদ্র একজন মানুষ তার নাম মনসুর আলী। তার বয়স প্রায় ৮০ বছর। বয়সের ভারে ন্যুজ এ মানুষটির হাঁটা চলাই কষ্টকর। একটি বয়ঙ্ক ভাতার কার্ড পেতে সে জনপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে দীর্ঘদিন যাবত ঘুরছে। জনপ্রতিনিধিরা আশ্বাস দিলেও তাকে বয়স্কভাতা প্রাপ্তির একটি কার্ড দেয়া হচ্ছেনা। তার প্রশ্ন, "আর কত গরীব ও বয়স হলে বয়স্ক ভাতা কার্ড পাওয়া যাবে? (দৈনিক যুগান্তর)"[২১]

গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ইতিবাচক বাস্তবতা : স্বাধীনতা পূর্ব উপনিবেশিক শাসন আমলে বাংলাদেশের গ্রাম গুলোর দৃশ্যপটে যে জরাজীর্ণতা লক্ষ্যণীয় ছিল, তার দৈন্যতা কাটিয়ে স্বাধীনতা উত্তর গ্রাম গুলো ধীর গতিতে হলেও উন্নয়নের দিকে ধাবিত হচ্ছে। আর এর পিছনে অবদান রয়েছে রাজনৈতিক নেতৃত্ব, এনজিও এবং জনগণের সচেতনতা। নিচে বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর ইতিবাচক বাস্তবতা ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো:

কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার : বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর দীর্ঘ সময় পরে হলেও কৃষিতে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে ফসল উৎপাদন উপনেবেশিক শাসন আমলের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে। যা গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। যে সকল প্রযুক্তিগত উপকরণ ব্যবহারে কৃষি ফলন উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে তার কিছু বাস্তবতা নিচে আলোচনা করা হলো:

সেচ সুবিধা : বাংলাদেশের কৃষকদের ফসল উৎপাদন সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হলো পানি। জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে সময় মত বৃষ্টিপাত না হওয়ায় এদেশের কৃষক সমাজ যথা সময়ে বীজ বপন, ফসলের চারা লাগাতে না পারায় প্রতিবছর ব্যাপক হারে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। আজ ফসল উৎপাদনে সে অবস্থা বিরাজমান নেই। বিশ্বের উন্নত দেশের মত বাংলাদেশের গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার আধুনিক বৈজ্ঞানিক কৃষি সেচ উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বাম্পার ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন।

চিত্র নং: ৮.৪৮

উপরের চিত্রে আধুনিক সেচ যন্ত্রের সাহায্যে কৃষকরা জলাশয় থেকে পানি তোলে কৃষি ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করে ফলন বৃদ্ধিতে সক্ষম হচ্ছেন। এক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় পানি উত্তোলন করে তারা ব্যাপক হারে কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

উন্নত বীজের ব্যবহার : বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশের কৃষকরা সংকরায়িত বীজ ব্যবহারের মাধ্যমে ফসলের ফলন কয়েকগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। এর ফলে গ্রামের কৃষকরা সারা বছর কৃষি জমিগুলো আবাদ করে ব্যাপক ভাবে ফসল ফলিয়ে সম্পূর্ণ না হউক কিছুটা হলেও

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব করেছে। আগে যেখানে গ্রামের মানুষ খাবার সন্ধানে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াত, আজকাল কিন্তু তারা গ্রাম থেকেই খাদ্যের সংস্থান করছে। ধনী কৃষকরা উন্নতবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে অনেক বেশী ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হচ্ছেন। নিচে তার দৃশ্য দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৪৯

গত ০৮-০৯-২০১৩ইং তারিখে "The Daily Star পত্রিকার একটি ছবি দেখে জানা যায়, "বাংলাদেশের কৃষি বিশেষজ্ঞগণ সরেজমিনে ফসল বৃদ্ধির কৌশল এবং বাম্পার ফলনের জমি পরিদর্শন করছেন।"[২২]

প্লাবিত জলাশয়ে শাক-সব্‌জি উৎপাদন : বাংলাদেশে বন্যা প্লাবিত এলাকায় মানুষ প্লাবন জলাশয়ে বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের মাধ্যমে ঢিবি তৈরী করে শাক-সব্‌জির চাষ করতে দেখা যায়। এমন চাষ পদ্ধতির ফলে বন্যাকালীন সময়ে দেশে দুর্গত মানুষের শাক-সব্‌জির চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়। এ সময় শাক সব্‌জির জমি গুলো পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় দেশে ব্যাপক হারে শাক সব্‌জির ঘাটতি দেখা যায়। বাড়তি ফসল উৎপাদনে গ্রামের কিছু মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামোন্নয়নে সহায়তা করছে। নিচের চিত্রে প্লাবন ভূমিতে শাক-সব্‌জি চাষ পদ্ধতি দেখানো হলো:

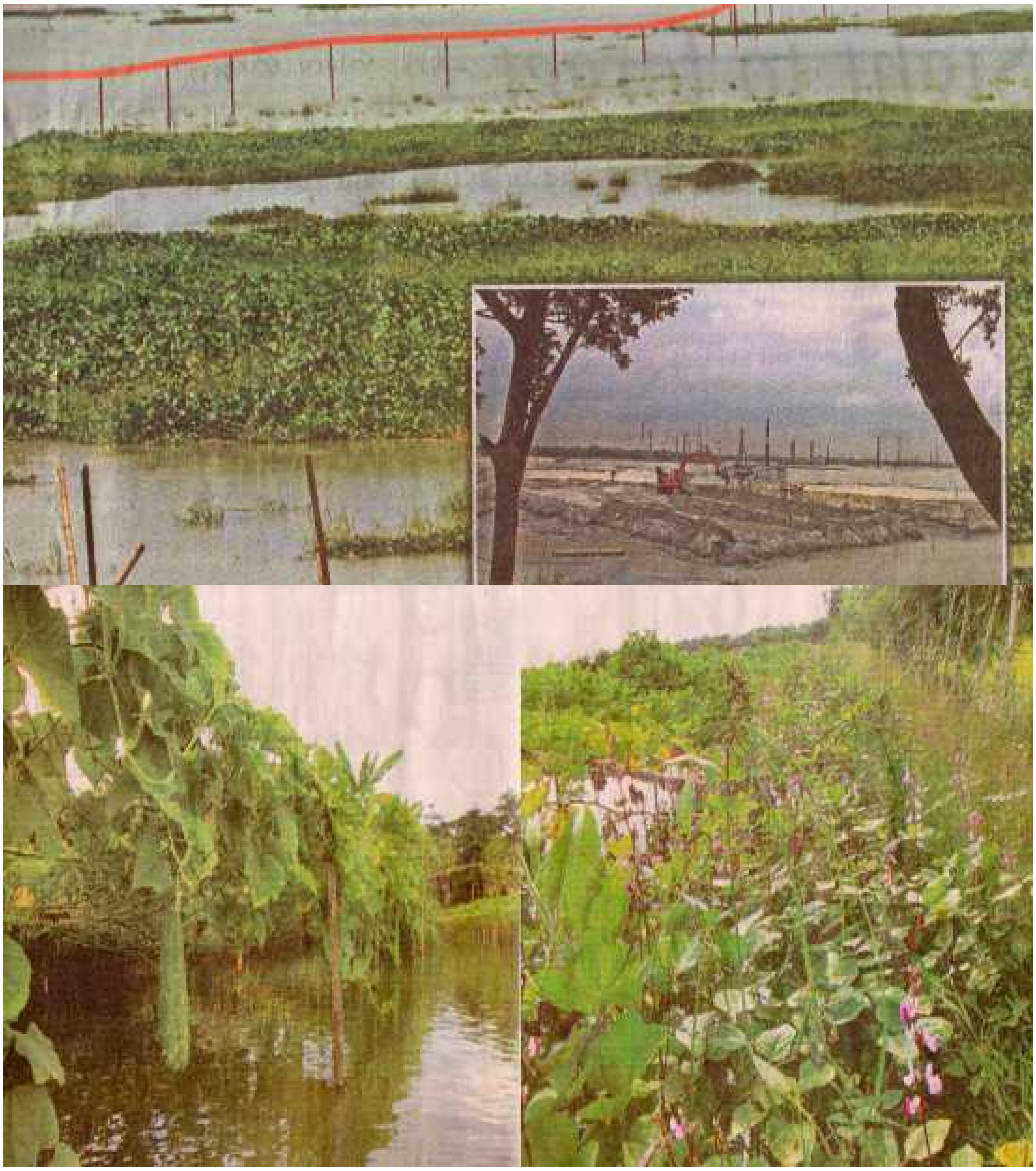

চিত্র নং- ৮.৫০

বাংলাদেশে বন্যা প্লাবিত এলাকার জমিগুলো পানিতে তলিয়ে থাকায় অনাবাদি অবস্থায় পড়ে থাকে। এ সময় গ্রামের মানুষ বেকার ও অলস জীবনযাপনকরে। অথচ আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বন্যার ভাসমান পানিতে ঢিবি তৈরী করে শাক-সব্‌জি চাষের মাধ্যমে একদিকে বেকার মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, অন্যদিকে বাড়তি উৎপাদন জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

ফুল চাষ : সৌন্দর্য্যের প্রতীক ফুল। তাই ফুলকে সবাই ভালবাসেন। বহুমাত্রিক কাজে ফুলের ব্যবহার থাকায় দেশ বিদেশে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক

সহ কৃষকরা ফুলের চাষ করে প্রচুর নগদ অর্থের মালিক হচ্ছেন; যা গ্রামোন্নয়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করছে। নিচে চিত্রে এমন একটি দৃশ্য দেখানো হলো :

চিত্র নং -৮.৫১

যশোহর জেলার কৃষকদের কৃষি ফসল উৎপাদনের পাশাপাশি একটি বাড়তি রোজগার হলো ফুল চাষ। দেশে এ জেলার উৎপাদিত ফুলের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। প্রতিদিন ট্রাক ভর্তি ফুল অন্য জেলাসমূহে বিক্রি করে জেলার ফুল চাষীরা অতিরিক্ত দু' পয়সা উপার্জন করে লাভবান হচ্ছেন।

অনবাদি ভূমিতে ফসল উৎপাদন : দেশের হাওর-বাওর এলাকায় নিচু জলাভূমিতে পানি নিষ্কাশন করে ব্যাপক হারে ফসল উৎপাদন করে এলাকার মানুষ স্বচ্ছলতার মুখ দেখছে। এতে গ্রামের কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে। নিচে চিত্রে কিশোরগঞ্জ জেলার ইটনা উপজেলার একটি জলাশয়ের পানি নিস্কাশন করে ফসলের বাম্পার ফলন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৫২

জলাশয় ও ঝোপ-ঝাড় বেষ্টিত অনাবাদি জমিতে ফসল উৎপাদন মানুষ কোন দিন চিন্তাও করেনি। অথচ অনাবাদি ভূমি পরিস্কার করে কৃষকরা এসব জমিতে ধান চাষ করে বাম্পার ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে অনেকেটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠেছেন।

পাহাড় অঞ্চলে ফসল উৎপাদন : পাহাড়ের পাদদেশে আবহাওয়া অনুকূল এবং কৃষি ফসল উৎপাদনের মত ভূমির বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান না থাকায় এ এলাকার মানুষ এক সময় খেয়ে না খেয়ে অতি কষ্টে জীবনযাপন করতো। আজ এ সকল অঞ্চলের মানুষ পাহাড় ও তার পাদদেশে নানামুখী ফসল উৎপাদন করে জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সক্ষম হচ্ছে। নিচে এমন একটি চিত্র দেখানো হলো :

চিত্র নং- ৮.৫৩

পাহাড়ের পাদদেশ বা তদ্‌সংলগ্ন এলাকায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রচুর পরিমান রকমারী ফসল, ফল-মূল, শাক-সব্জি উৎপাদিত হচ্ছে। এ অঞ্চলের জনগণের যখন জীবন ধারণের কোন মাধ্যম ছিলনা, বর্তমানে পাহাড়রের পাদদেশের মানুষের সে অবস্থা আর নেই। আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করে তারা ঐ হতাশা থেকে মুক্ত হয়ে স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন।

ভূমি কর্ষণে পাওয়ার টিলার ব্যবহার : গ্রামের কৃষক সমাজ মান্ধাতা আমলের হালের বলদ ও কাঠের লাঙ্গল দিয়ে সারাদিনে যে পরিমান জমি চাষ করতো , আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে অতি অল্প সময়ে সে পরিমাণ জমি চাষ করতে সক্ষম হচ্ছে । একটি কলের লাঙ্গল চালাতে একজন মাত্র লোকের প্রয়োজন হয়। এর ফলে সময় ও জনবল খরচ দু'টোই সাশ্রয় হয়। নিচে চিত্রে এমন একটি দৃশ্য দেখানো হলো :

চিত্র নং-৮.৫৪

গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার গুলো প্রাচীন পদ্ধতির ভূমি চাষের পরিবর্তে বর্তমানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কলের লাঙ্গল ব্যবহার করে বহুগুণে কৃষি ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করে গ্রামোন্নয়নে অবদার রাখছে।

ফসল মাড়াইয়ে কলের ব্যবহার : গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার দ্রুত ফসল ঘরে তোরার জন্য এবং দীর্ঘ মেয়াদি কায়িক পরিশ্রম লাঘবে আধুনিক পদ্ধতির ফসল মাড়াই কল ব্যবহার করে থাকেন। তবে গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারের এসব আধুনিক যন্ত্র ক্রয়ের সামর্থ্য না থাকায় তারা প্রয়োজন বোধে ধনী কৃষকের কাছ থেকে লিজ নিয়ে এ যন্ত্রের সুবিধাভোগ করে থাকে। নিচে ফসল মাড়াইয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি মাড়াই কলের চিত্র দেখানো হলো :

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৫৫

কৃষকের উৎপাদিত পাকা ফসল গরু ঘুরিয়ে মাড়াই করতে যে পরিমান সময় ও শ্রম অপচয় হয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরীকৃত ফসল মাড়াই কলে তার চেয়ে অনেক কম সময় সাশ্রয় হয়। দ্রুততর সময়ে কৃষকদের ফসল মাড়াইয়ের ফলে শস্যের গুণগত মান ও অপচয়ও রোধ হয়।

পানি সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ বাস্তবতা : বাংলাদেশে কোন কোন গ্রামে উন্নয়নের দৃশ্যপট দেখলে মনে হয়, সত্যিকারের গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হয়েছে। সরকারী কর্মসূচীর আওতায় দেশের কিছু সংখ্যক গ্রামে কৃষি উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে স্লুইস গেইট নির্মাণে ফলে পানি সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণের মাধ্যমে কৃষক সমাজ ব্যাপকভাবে উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্ষম হয়েছেন। আগে যে জমি জলাবদ্ধ এবং কখনও বা পানির অভাবে শস্য উৎপাদনের অনোপযোগী ছিল, আজ সে জমিতে পানি সংরক্ষণ ও অবমুক্তকরণ করে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকরা প্রচুর পরিমাণ ফসল উৎপন্ন করে জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে পরিবারকে স্বাবলম্বী করে তোলেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং-৮.৫৬

উপরের চিত্রে এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সরকারী কর্মসূচীর আওতায় স্লুইস গেইট নির্মাণ করে জনস্বার্থে কাজ করে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন। স্লুইস গেইটটি নির্মাণের ফলে জলাবদ্ধ পতিত ও অনাবাদি জমির পানি সংরক্ষণ কখনও বা অবমুক্তকরণ করে কৃষি কাজে সে পানি ব্যবহার উপযোগী করে কৃষকরা বাড়তি ফসল উৎপাদনের মাধ্যমে পারিবারি স্বচ্ছলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছেন; যা গ্রামোন্নয়নে যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামোন্নয়নের অন্যান্য ক্ষেত্র : অন্যান্য যে সকল পদ্ধতি গ্রহণ করে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে সেগুলো নিচে আলোচনা করা হলো :

মৎস্য চাষ : গ্রামের ধনী লোকেরা কেহ নিজস্ব জমিতে, কেহ গ্রামের সাধারণ মানুষের জমি লিজ নিয়ে, কখনও বা পতিত জলাশয়ে মৎস্যচাষ করে লাভবান হচ্ছেন এবং গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

গবাদি পশু পালন : গ্রামের ধনী পরিবারের লোকজন যাদের নিজস্ব চারণ ভূমি রয়েছে তারা গরু মোটাতাজাকরণ, ছাগল-ভেড়া, কেহ বা মহিষ পালন করে ব্যবসায় ব্যাপক ভাবে লাভবান হচ্ছেন। তাছাড়া তাদের পালিত গাভীর বাড়তি দুধও দেশের জনগোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে সক্ষম হচ্ছে।

পোল্ট্রি খামার : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে দেশীয় মোরগ মুরগী বাড়তি জনসংখ্যার মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণে দিন দিন ব্যর্থ হওয়ার পরিপূরক হিসেবে এ শিল্পটি গড়ে উঠেছে। পোল্ট্রি শিল্পে

গ্রামের ধনী পরিবারের লোকজন পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায় স্বচছলতা এনে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করে তোলছেন।

অবকাঠামোগত গ্রামোন্নয়ন : গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নের ইতিবাচক কর্মসূচীর বাস্তবতা নিচে আলোচনা করা হলো :

শিক্ষা : বর্তমানে গ্রামের ধনী জনগোষ্ঠীর সন্তানদের পাশাপাশি সাধারণ কৃষক, শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েরা সরকার, এনজিও, ব্যক্তি উদ্যোগে গড়ে উঠা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে নানামুখী সুবিধা ভোগের মাধ্যমে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাচ্ছে। গ্রামে শিক্ষার হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। স্বাধীনতা পূর্ব একটি কুঁড়ে ঘরে (মক্তবে) শিক্ষার্থীরা একজন শিক্ষকের কাছে সবক নিয়ে পাঠক্রম গ্রহণ করতো । স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমে সরকার বিদ্যালয় গুলোর ভৌত অবকাঠামোর উন্নয়ন সাধন করে পাকা বিল্ডিংয়ে রূপান্তরিত করেছেন । শিক্ষকগণ সরকারী কোষাগার থেকে বেতন প্রাপ্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করছেন। গ্রামের শিক্ষার হার ক্রমাগত বেড়েই চলছে। ছাত্র/ছাত্রীরা শিক্ষাজীবন শেষ করে অনেকেই সরকারীসহ বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে চাকরী করে স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন বাস্তবতা : দেশ স্বাধীনতা পূর্ব গ্রামের মানুষের চিকিৎসা ছিল হাতুড়ে ডাক্তারের লতাপাতার রস দিয়ে তৈরী ঔষধ এবং পীর ফকির, সাধু-সন্নাসীর ঝাড়, ফুঁক, তাবিজ, কবচ, পানি পড়া। গ্রামের ধনী পরিবার গুলো শহরে গিয়ে আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি গ্রহণ করতেন। আগে যেখানে সাধারণ রোগে একজন রোগী মৃত্যুবরণ করতো, বর্তমানে অনেক কঠিন রোগেও গ্রামের মানুষ যথাযথ চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠছেন। গ্রামে কোথাও কোথাও আধুনিক চিকিৎসা কেন্দ্র নির্মিত হয়েছে। মানুষ সাধারণ রোগের চিকিৎসা ঐ সব চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে পেয়ে থাকেন। সরকারী ও এনজিও স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতনতার পাঠ দিয়ে তাদেরকে সতর্ক করছেন। যক্ষা, কুষ্ঠ রোগের ঔষধ মানুষ ঘরে বসেই পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য কর্মীরা গ্রামের মানুষের বাড়ীতে বাড়ীতে গমন করে বা নির্দিষ্ট স্থানে ক্যাম্প স্থাপন করে শিশুদের ৬টি মারাত্মক রোগের টিকা দিয়ে শিশু মৃত্যুর হার কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রামের হাট বাজার গুলোতে ঔষধের দোকান রয়েছে। সেখান থেকে মানুষ সহজেই প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র ক্রয় করতে পারেন। কখনও কখনও গ্রামের হাট বাজারে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার গমন করে খুব কম পরামর্শ ফি নিয়ে দরিদ্র রোগীদের আধুনিক চিকিৎসা ভোগের সুবিধা প্রদান করছেন। জনপ্রতিনিধিরা এসব কর্মকান্ডে জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করছেন । তাছাড়া সরকারী খরচে উপজেলায় স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্স নির্মিত হওয়ায গ্রামের মানুষের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়েছে। নিচে উপজেলা পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিত্র দেখানো হলো:

চিত্র নং-৮.৫৭

বাংলাদেশের কিছু কিছু উপজেলায় জনপ্রতিনিধিগণ সরকারের সহযোগিতায় আধুনিক উন্নতমানের হাসপাতাল নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামের দরিদ্র জনগণের চিকিৎসা সেবা অনেকটা হাতের কাছে নিয়ে এসেছেন। হাসপাতাল সমূহে সরকারী অভিজ্ঞ এমবিবিএস ডাক্তারগণ গ্রামের হতদরিদ্র রোগীদের বিনা ফিতে ও বিনামূল্যে সরকার প্রদত্ত ঔষধপত্র বিতরণ করছেন। রোগীর যথাযথ চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য এসব হাসপাতালে ৫০-৮০টি বেড রয়েছে। ২৪ ঘণ্টা হাসপাতাল খোলা রেখে নিয়মিত ডাক্তার ও সেবিকারা রোগীদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। পথ্য প্রদান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

Dhaka University Institutional Repository

রোগীর রোগ নির্ণয় করে রোগীকে সুস্থ করে তোলছেন। এসব দরিদ্র মানুষ গ্রামে ফিরে আবার পরিবার পরিজনকে দেখভাল করে সংসারের হাল ধরছেন। সরকারের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হওয়ায় গ্রামের দরিদ্র মানুষ আজ অকালে মৃত্যু বরণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছেন।

আজ গ্রামের মানুষ অনেকটা স্বাস্থ্য সচেতন হয়েছেন। অসুস্থ হলেই তারা উপজেলা কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়ে সরকারী খরচে চিকিৎসাসেবা ভোগ করছেন। বর্তমান সরকার প্রতিটি সরকারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আবাসন সুবিধা পূর্বের তুলনায় অনেকটা উন্নত করেছেন। বাস্তবতার নিরিখে বিচার করলে এটা প্রমাণিত হয় যে, গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা একেবারেই অবহেলিত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এর সফলতা লক্ষ্য করা যায়, যেমনঃ উদরাময়-কলেরা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় ইপিআই এবং পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী কিছুটা হলেও প্রশংসা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। সরকারের নতুন স্বাস্থ্য নীতি এ খাতকে আরও গতিশীল করতে সক্ষম হয়েছে। গ্রামীণ মানুষের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য সরকার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ইউনিয়ন সাব-সেন্টার এবং নব্য প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে জনবল ও ঔষধপত্র বহুগুণে বৃদ্ধি করেছেন। গ্রামীণ স্বাস্থ্য খাতে আর্থিক বাজেটে বরাদ্দের পরিমান আরও বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সহজসাধ্য যাতায়াত : স্বাধীনতা লাভের পর থেকে অদ্যাবধি গ্রামে যাতায়াত অবকাঠামো অনকটা উন্নতি সাধিত হয়েছে। স্বাধীনতা পূর্ব মানুষের যাতায়াতের একমাত্র অবলম্বন ছিল আল্লাহ প্রদত্ত দু'খানি পায়ে মেঠো পথে হাঁটা। গ্রামীণ আঁকা বাঁকা কাঁচা রাস্তা দিয়ে গরু মহিষের গাড়ীতে চড়ে বড় লোকরা যাতায়াত করতেন। নদী পথে যাতায়াত ছিল দাড় বাওয়া নৌকা। বাংলাদেশের গ্রাম গুলোতে কোন পাকা রাস্তা বা ব্রীজ, কার্লভাট ছিলনা। মানুষ জলাশয় বা নদী পারাপার করতো সাঁতরিয়ে বা বাঁশ-কাঠের তৈরীকৃত সাঁকো দিয়ে। কখনও বা হাঁটু সমান কাঁদা বা ধুলো মাড়িয়ে গন্তব্যে গমন করতে হতো। গ্রাম ও শহরের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। গ্রামের মানুষ মানবেতর জীবনযাপন করতো । উন্নত জীবনযাত্রা ছিল তাদের কাছে স্বপ্ন মাত্র। বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক গ্রামে কাঁচা-পাকা রাস্তা নির্মিত হয়েছে। গ্রামের রাস্তায় প্রায়ই রিক্শা, ভ্যান, সাইকেল ও মটর সাইকেল চোখে পড়ে। এসব যানবাহন ব্যবহার করে মানুষ প্রয়োজন মত যত্র গমন করেছেন। গ্রামের সাথে শহরের যোগাযোগ ব্যাপক ভাবে উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রয়োজনের মুহূর্তে অতি সহজে গ্রাম থেকে মানুষ শহরে গমন করেছেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরা শহরে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের সুবিধা ভোগ করছে। গ্রামে দিন দিন ব্যবসা বাণিজ্য প্রসারিত হচ্ছে। দরিদ্র মানুষের সংখ্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। আগে মানুষ যেখানে না খেয়ে জীবনযাপনকরতো , এখন মানুষ তিন বেলা পেট ভরে ভাত খেয়ে সুখে শান্তিতে জীবনযাপনকরছে। রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা জনপ্রতিনিধিরা

প্রতিযোগিতার মাধ্যমে স্ব-স্ব এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়ন করে গ্রামোন্নয়নের স্বাক্ষর রাখছেন। নিচে গ্রামীণ যাতায়াতে পাকা রাস্তার একটি বাস্তব চিত্র দেখানো হলো :

চিত্র নং-৮.৫৮

বাংলাদেশের কোন কোন গ্রামে জনপ্রতিনিধিদের প্রচেষ্টায় ও তদবিরে পাকা রাস্তা নির্মিত হয়েছ। পাকা রাস্তা ব্যবহার করে মানুষ পণ্য সামগ্রী ও মালামাল এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সহজেই বহন করতে পাচ্ছেন। দরিদ্র মানুষ ভ্যান, রিক্‌শা, ঠেলাগাড়ী টেনে আয়-উপার্জন করে কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। কৃষকরা অতি দ্রুত কৃষি পণ্য শহরে রপ্তানী করছে। এভাবে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থান কর্মসূচীর বাস্তবতা : গ্রামীন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বেকারত্বর অবসান ঘটিয়ে সরকার কর্ম সংস্থানের জন্য সৃজন নামক ৪০ দিনের কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। যাতে গ্রামীণ অসহায় নারী পুরুষের রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হয়েছে। চিত্রে এমনি একটি কর্মসূচীর বাস্তবতার দৃশ্য দেখানো হলো:

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র নং- ৮.৫৯

নীলফামারি জেলার ডোমরা উপজেলার ৪০ দিনের কর্মসংস্থান কর্মসূচী প্রকল্পে নিয়োজিত অতি দরিদ্র মানুষ গুলো বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। ফলে, উপজেলার বিভন্ন গ্রামে তৈরী হচ্ছে নতুন নতুন রাস্তাঘাট, খাল খনন, মাটি ভরাট করা হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কবরস্থান, ঈদগাহ, মসজিদ, মাদরাসা ও শশ্মানের মাঠে।

ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র : সরকার এ কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রামের মানুষের তথ্য সেবা প্রদান করে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এসব সেবা প্রাপ্তির জন্য আগে গ্রামের মানুষকে শহর পানে দৌঁড়াতে হতো। অথচ সরকার বর্তমানে বাংলাদেদেশের প্রতিটি ইউনিয়নে তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সহজলভ্য করে তোলেছেন। এসব সেবা কেন্দ্র থেকে গ্রামের মানুষ যে সকল তথ্য সুবিধা পেয়ে থাকেন তা নিচে আলোচনা করা হলো :

কম্পিউটার প্রশিক্ষণ : এ কর্মসূচীর আওতায় গ্রামের শিক্ষিত বেকার যুবক/যুবতীরা ইউনিয়ন তথ্য কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে স্বল্প খরচে অভিজ্ঞ শিক্ষকের কাছ থেকে কম্পিউটার চালানোর প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুবিধা পেয়ে থাকেন। প্রশিক্ষণ শেষে এসব বেকার যুবক/যুবতীরা সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন সংস্থায় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে একদিকে পরিবারের আয় বৃদ্ধি করছে, অন্য দিকে নিজেরা স্বাবলম্বী হয়ে গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

ই-মেইল : ই-মেইল হলো ইলেকট্রনিক মেইল। গ্রামের মানুষ ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে ই-মেইল করার সুবিধা ভোগ করে থাকেন। আগে তাদেরকে শহরে গিয়ে এ সুবিধা ভোগ

Dhaka University Institutional Repository

করতে হতো। এর মাধ্যমে কম্পিউটার নেট ওয়ার্ক ব্যবহার করে এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে তথ্য আদান-প্রদান করা গ্রামের মানুষের জন্য সহজ সাধ্য হয়েছে। তারা লোকাল এরিয়া নেট ওয়ার্ক ব্যবহার করে সীমিত স্থানের মধ্যে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বের যে কোন স্থানে ই-মেইল পাঠাতে পারেন।

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি ফরম পূরণের সবিধা : গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীরা গন্তব্যে না গিয়ে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র থেকে কাঙ্খিত স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির ফরম পূরণ করতে পারেন। এতে তাদের সময় ও অপচয় রোধ হয় এবং অভিভাবকের অনেকটা আর্থিক সাশ্রয়ও হয়ে থাকে।

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তি : ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল প্রাপ্তির পূর্বে গ্রামের ছাত্র/ছাত্রীরা দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত ফলাফল পেতে অনেক বিড়ম্বনার শিকার হতেন। তাদেরকে এসব পরীক্ষার ফলাফল উপজেলায় বা মফস্বল শহর গিয়ে সংগ্রহ করতে হতো। বর্তমানে ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র চালু হওয়ার পর, পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ফলাফল প্রকাশের সাথে সাথেই ছাত্র/ছাত্রীরা হাতে পেয়ে যান।

ভিসা প্রসেসিং : ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রে ভিসা প্রসেসিংয়ের আগে গ্রামের মানুষ বিদেশ গমনের ক্ষেত্রে মিথ্যা ভিসার জটিলতায় পড়ে প্রায়ই প্রতারণার শিকার হয়ে টাকা পয়সা হারিয়ে একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ত। বিশেষ করে জনশক্তি রপ্তানীর ক্ষেত্রে প্রবাসে গমনিচ্ছুকদেরকে এ সমস্যায় বেশী সন্মুখীন হতে দেখা যায়। গ্রামের অশিক্ষিত, সহজ, সরল মানুষ এখন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে গমন করে ভিসার বৈধতা যাচাই বাছাই করে প্রতারণার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে সহজেই বৈধ ভাবে জনশক্তি বিদেশে পাঠাতে সক্ষম হচ্ছেন।

জমির সিএস ও আরওআর পর্চা প্রাপ্তি : বাংলাদেশে ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা আবহমানকাল ধরে চলে আসায় গ্রামের অসচেতন মানুষের পক্ষে শহরে গিয়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা অনেকটা কষ্টসাধ্য ছিল। সরকার গ্রামের মানুষের এহেন অবস্থা বিবেচনা করে, তারা যাতে সহজেই ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে জমির প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিশেষ করে সিএস ও আরওআর পর্চার তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন তার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন।

বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুবিধা : তথ্য সেবা প্রাপ্তির আগে গ্রামের মানুষকে বিদ্যুৎ বিল উপজেলা বা জেলায় গিয়ে পরিশোধ করতে হত এবং এটা অর্থ অপচয় ও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুবাদে গ্রামের মানুষের হয়রানি বহুলাংশেহ্রাস পেয়েছে।

মোবাইল ব্যাংকিং : মোবাইল ব্যাংকে গ্রামের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে টাকা পাঠানো একটি দ্রুততম পদক্ষেপ। এ পদ্ধতিতে টাকা পাঠানোর ফলে গ্রামের মানুষের হয়রানি বহুলাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মূহুর্তের মধ্যে কাঙ্খিতর ব্যক্তির হাতে টাকা পৌঁছে যাচ্ছে। এক সময় এ পদ্বতি গ্রামের মানষের জন্য দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিলনা। আগে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে পাঠানো টাকা পেতে গ্রামের মানুষকে দীর্ঘ দিনের প্রহর গুণতে হতো। কোন কোন সময় পাঠানো টাকার হদিসও পাওয়া যেত না। মোবাইল ব্যাংকিং কর্মসূচী চালু হওয়ার পর থেকে নানা ভাবে গ্রামের মানুষের জীবন মান পরিবর্তন হতে শুরু করছে এবং ধীরে ধীরে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

জীবন বীমা : গ্রামের মানুষ অতি সহজেই অন্যান্য জীবন বীমার মতই এখন ইউনিয়ন পরিষদ সেবা কেন্দ্র থেকে বীমা সুবিধাদি পাচ্ছেন।

সার ও মাটি পরীক্ষা : কৃষকরা নিয়মিত ভাবে কৃষি সংক্রান্ত বিষয়াদি যেমনঃ সারের গুণগত মান এবং মাটির উৎপাদনশীল ক্ষমতা এখন ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্রেই পাচ্ছেন। কী কারণে মাটির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, তার ফলাফলও তারা অতি সহজে এ সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে পেয়ে থাকেন ।

স্কাইপিয়ের মাধ্যমে কথা বলা : ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য ও সেবা কেন্দ্র থেকে আজকাল গ্রামের মানুষ স্কাইপিয়ের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে কাঙ্খিত ব্যক্তি, আত্মীয়-স্বজন ও প্রয়োজনীয় লোকের ছবি দেখে কথা-বার্তা বলতে সক্ষম হচ্ছেন। এভাবে স্কাইপিয়ের মাধ্যমে ছবি দেখে কথা বলতে আগে গ্রামের মানুষকে শহর পানে দৌড়াতে হতো।

প্রজেক্টর এর মাধ্যমে জাতীয় প্রোগ্রাম দেখানো : ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র জাতীয় প্রোগ্রাম যেমনঃ স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী ইত্যাদির অনুষ্ঠান সমূহ প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখানোর ব্যবস্থা করে জনসমক্ষে এর গুরুত্ব তোলে ধরে। গ্রামের অসচেতন জনগণ এ সকল জাতীয় প্রোগ্রাম দেখে এর মর্মার্থ উপলব্ধি করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে দিন দিন এ ব্যাপারে আরও আত্মসচেতন হয়ে উঠছেন।

ডাটা এন্ট্রি করা : গ্রামীণ যে কোন প্রতিষ্ঠানের বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেমনঃ স্কুল, কলেজ ও মাদ্‌রাসার সংশ্লিষ্ট প্রামাণ্য সকল প্রকার ডাটা ইউনিয়ন পরিষদের তথ্য সেবা কেন্দ্রে এন্ট্রি করার ব্যবস্থা রয়েছে। এ সকল তথ্যের জন্য গ্রামবাসীরা আর শহরে গিয়ে হয়রানির শিকার হননা।

জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধীকরণ : দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অগ্রগতির জন্য সঠিক সময়ে জন্ম-মৃত্যুর তথ্য জানা মানুষের একটি অপরিহার্য বিষয়। গ্রামীণ জনগণকে শিশু জন্মের এবং কোন মানুষ মৃত্যু বরণের সর্বোচ্চ ৪৫ দিনের মধ্যে ইউনিয়ন পরিষদের নিবন্ধন শাখায় জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন করতে

Dhaka University Institutional Repository

হয়। প্রতি বছর ৩ জুলাই জাতীয় ভাবে সভা-সমাবেশ ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে থাকে। এতে নিত্য- নৈমিত্তিক গ্রামের মানুষের মধ্যে সচেতনতা বোধ কাজ করছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশ ও বাংলাদেশের শহরের মানুষের মত গ্রামের মানুষ এ সচেতনতার সংস্পর্শে আসায় তাদের জরাজীর্ণতা দূর হয়ে তারা আধুনিকতার সংস্পর্শে আসতে সক্ষম হয়েছেন।

বিদ্যুৎ ভোগের সুবিধা : স্বাধীনতা পূর্ব এদেশে বিদ্যুৎ ছিল রূপকথার কল্প কাহিনী। স্বাধীনতা উত্তর সরকার শহরের পাশাপাশি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের জন্য গ্রহণ করেছেন নানামুখী কর্মসূচী। গ্রামের মানুষের বিদ্যুৎ অবকাঠামোর সুবিধা প্রাপ্তিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড। বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করে কৃষকরা পাতাল থেকে পানি উঠিয়ে ব্যাপকভাবে ফসল উৎপাদন করছেন। গ্রামে গড়ে উঠেছে ছোট খাট শিল্প কারখানা। এসব কারখানায় কাজ করে গরীব বেকার যুবক/যুবতীরা কর্মসংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছেন।

বিদ্যুৎ সুবিধার ফলে গ্রামের কোন কোন জায়গার মানুষ দেশ বিদেশের খবর রাখছেন। সার্বিক ক্ষেত্রে তারা আত্মসচেতন হতে শুরু করেছেন। এর পিছনে নিত্য নতুন কাজ করছেন জনপ্রতিনিধিরা বা রাজনৈতিক নেতৃত্ব। বিদ্যুৎ সুবিধা থাকায় কোন কোন গ্রামের মানুষ কম্পিউটার ব্যবহারের সুবিধা পাচ্ছেন। এসব গ্রামে অতীতের অন্ধকার দূর হয়ে মানুষের মধ্যে আধুনিকতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। ডিপ টিউব-ওয়েল বসিয়ে বিদ্যুতের মাধ্যমে কীভাবে কৃষকরা পানি সেচ করে ফসল উৎপাদন করছেন তা নিচে চিত্রে দেখানো হলো:

চিত্র নং- ৮.৬০

Dhaka University Institutional Repository

উপরের চিত্রে বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগের মাধ্যমে কৃষি জমিতে ডিপ টিউবওয়েল বসিয়ে পানি উঠিয়ে ফসল উৎপাদন করা হচ্ছে। কম জনবল ও খরচে পানি সেচের মাধ্যমে বাড়তি ফসল উৎপাদন করে কৃষকরা জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি করতে সক্ষম হচ্ছে। যা গ্রামোন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। আগে যেখানে গ্রাম গুলোতে ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ হাহাকার বা হতাশার মধ্যে জীবনযাপনকরতো , আজ সে সমস্যা দূরীভূত হয়েছে।

ব্যাংকিং সুবিধা : জনপ্রতিনিধিদের সহযোগিতায় গ্রামের বিশেষ কোন এলাকায় মানুষের কৃষি ঋণ প্রাপ্যতা, আর্থিক লেনদেন এবং ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের জন্য ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু হয়েছে। এতে গ্রামের মানুষ রক্তচোষা সুদখোর অর্থ লগ্নীকারী লোকদের হাত থেকে মুক্তি লাভ করেছে। যা গ্রামোন্নয়নে প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে।

উন্নত আবাসন সুবিধা ও অন্যান্য : গ্রামের কিছু পরিবার যাদের উন্নত আবাসনের সুবিধা রয়েছে। এসব পরিবার পাকা বাড়ি, মূল্যবান আসবাবপত্র, মান সম্মত শীত বস্ত্র সহ পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান, ফ্রিজ, রঙ্গিন টিভি, কম্পিউটার ব্যবহার, মান সম্মত পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করে থাকেন। শান বাঁধানো পুকুর ঘাট এবং কারও কারও বাড়ি পর্যন্ত পাকা রাস্তা রয়েছে। কোন কোন পরিবার যাতায়াতে মোটর বাইক এবং প্রাইভেট কার ব্যবহার করে থাকেন। নিচের চিত্রে গ্রামের একটি আধুনিক বাড়ীর দৃশ্য দেখানো হলোঃ

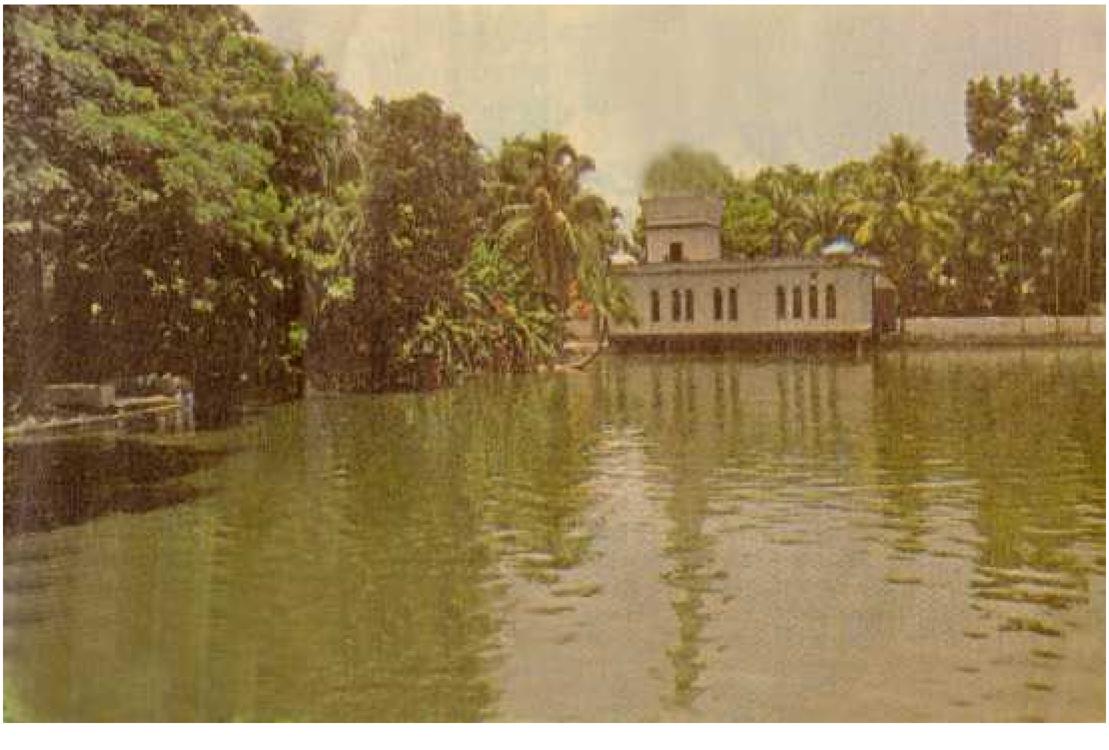

চিত্র নং- ৮.৬১

গ্রামের এ পাকা বাড়ীটি শহরের মত সকল সুবিধা সম্বলিত। বাড়ীতে রয়েছে গাত্রলাতের সুরম্য শান বাঁধানো ঘাট, পুষ্টির চাহিদা পূরণে রয়েছে নানা প্রজাতির মাছে ভর্তি স্বচ্ছ সলিল পুকুর এবং বিভিন্ন প্রকার ফল-ফুলের বাগান। এসব পরিবারের প্রতিটি সদস্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। কেহ কেহ শহরে উচ্চ পদ মর্যাদার সরকারী চাকরীতে কর্মরত আছেন।

অতি দারিদ্র্যের কর্মসংস্থান প্রকল্প : গ্রামের অতি দরিদ্র জন-গোষ্ঠীর খাদ্য সরবরাহের জন্য সরকার এ কর্মসূচীটি হাতে নিয়েছেন। যাতে গ্রামের দরিদ্র মানুষকে খাবার অভাবে ভুখা থেকে জীবনযাপননা করতে হয়। ক্ষুধা মুক্ত দেশ গড়তে সরকার ৪০ দিন পর পর বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কর্ম সম্পাদানের জন্য গ্রামের কর্মক্ষম দরিদ্র লোকদের নিয়োগ দিয়ে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকেন। এর ফলে এক দিকে গ্রামের অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে, অন্য দিকে অতি দরিদ্র মানুষ কর্মমুখী হয়ে খাদ্যের সংস্থান করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রকল্পের টাকা যাতে জনপ্রতিধি বা সরকার দলীয় লোকেরা কোন ভাবে লুটপাট করতে না পারে সে জন্য সরকার তফসিলী ব্যাংকের মাধ্যমে মজুরীর টাকা সরাসরি শ্রমিকদের হাতে হাতে প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। মজুরী হিসেবে একজন শ্রমিক প্রতি সপ্তাহে ৮০০ টাকা পেয়ে থাকে; যা তার পরিবারের ভরণ-পোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং ক্রমান্বয়ে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।

ডাচ-বাংলা ব্যাংকের বৃত্তি প্রদান কর্মসূচী : ডাচ-বাংলা ব্যাংক বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকার মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের লেখাপড়ার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে এ জন গোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য বেসরকারী উদ্যোগে এ প্রকল্পটি গ্রহণ করেছে। গ্রামীণ শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ২০০৪ সাল হতে ডাচ-বাংলা ব্যাংক এ প্রকল্পটি গ্রহণ করে। বর্তমানে ১০২ কোটি টাকার বৃত্তি দান কর্মসূচীটি গ্রামীণ মেধাবী ও দরিদ্র ছাত্র/ছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের দ্বার উন্মোচন করতে সক্ষম হয়েছে। ফলশ্রুতিতে গ্রামের মানুষের মধ্যে উন্নয়নের হাওয়া বইতে শুরু করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশের রাজনীতি ও গ্রামোন্নয়ন বাস্তবতা পর্যবেক্ষণ করলে যে জিনিষটি বেশী পরিস্ফুট হয়ে উঠে তা হলো, সরকার কোন উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীর দরপত্র আহ্বান করলে সরকারী তথা রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট নেতা/কর্মীরা কর্মসূচীর দরপত্র নিজেদের অনুকূলে নিয়ে বাস্তবায়নের দৌড় প্রতিযোগিতার হিড়িকে মেতে উঠেন। দলীয়ভাবে তৃণমূল থেকে রাজধানী পর্যন্ত জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও সরকারী কর্তা সাহেবদের মধ্যে সর্বদাই একটি 'Network' কাজ করে। সরকার দলীয় লোকদের স্বার্থ রক্ষা করে দল ভারী করার একটি কৌশল হিসেবেই কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব দেয়া হয় নেতা/কর্মীদের হাতে। কোন প্রকল্পের দরপত্র প্রাপ্তির পর ঠিকাদারগণ সরকারী নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে নিজেদের ইচ্ছামত কর্মসূচীর বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেন। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে নেতা/কর্মীদের ব্যক্তি বিশেষের নৈতিকতার উপর প্রকল্পের কার্যক্রমের স্বচ্ছতা কিছুটা নির্ভর করে। কোন ঠিকাদার যথা নিয়মে, কেহ আংশিক, কেহ বা দুর্নীতির পন্থা অবলম্বন করে নিম্নমানের উপকরণ দিয়ে বালির বাঁধের মত প্রকল্পের কার্যক্রম শেষ করেন। কোন কোন ঠিকাদারের প্রকল্পের কাজ বছরের পর বছর অসম্পন্নভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায়। যা জনগণের জীবন চলার ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রামের সহজ সরল জনগণ রাজনৈতিক ঠিকাদারদের এহেন কর্মের প্রতিবাদ করার কোন ক্ষমতাই রাখেন না। তবে গ্রামোন্নয়নমূলক কার্যক্রম যে একেবারে স্থবির হয়ে পড়ে আছে তা নয়। জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সরকারী কর্মকর্তা এবং বেসরকারী উদ্যোগের সমন্বয়ে উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে; যা গ্রামের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে ক্রমাগত অবদান রাখছে। তবে এ সামান্য উন্নয়ন অধিক জন বিস্ফোরিত গ্রামীণ জনপদের মানুষের জীবনমান পরিবর্তনের জন্য যথেষ্ট নয়।

তথ্য পঞ্জী (References)

১) A research article, The Daily Star, Dhaka: 10th August-2010, P. 8.

২) গবেষণা মূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: ২০১০, পৃ, ১৭।

৩) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১৫।

৫) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

৬) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

৭) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

৮) গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: ২০১১,পৃ, ১৮।

৯) গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: প্রাগুক্ত পৃ, ১৫।

১০) গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: প্রাগুক্ত পৃ, ১৮।

১১) দরিদ্র পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরীক্ষণ প্রকল্প, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ঢাকা: ২০০৯, পৃ, ১২।

১২) গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: প্রাগুক্ত পৃ, ১৮।

১৩) গবেষণামূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: প্রাগুক্ত পৃ, ১৮।

১৪) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

১৫) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

১৬) প্রাগুক্ত পৃ, ১৫।

১৭) গষেণা মূলক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: ২০১১, পৃ, ১৮।

১৮) গবেষণা মূরক প্রবন্ধ, দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: ২০১২, পৃ, ১৭।

১৯) প্রাগুক্ত পৃ, ১৫।

২০) চৌধুরী, সুভাষ, (গবেষণা মূলক প্রবন্ধ), দৈনিক যুগান্তর পত্রিকা, ঢাকা: ২০১৪, পৃ, ১৮।

২১) প্রাগুক্ত পৃ, ১৭।

২২) A research article, The Daily Star, Dhaka: 2013, P. 8.

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

উপসংহার

নবম অধ্যায়

উপসংহার

পুরো গবেষণা কর্মটির পরিসমাপ্তি ঘটাতে যেয়ে গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবতার দীর্ঘদিনের ইতিহাস আমরা একই ধরনের দেখতে পাই। একটি পরিবার থেকে একজন মাত্র মানুষ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে নামী দামী পদমর্যাদার অধিকারী হলে বাকী সদস্যরা নিরক্ষর থাকলে ঐ পরিবারকে একটি উন্নত পরিবার বলা যায় না। অনুরূপভাবে শহরে বসবাসরত দেশের ২০ জন লোক উন্নত জীবনযাপন করলেও গ্রামের ৮০ ভাগ মানুষকে ব্যতিরেকে বাংলাদেশেকে একটি উন্নত রাষ্ট্র বলা যায় না। সুতরাং উন্নত জীবনমানের জন্য পরিবারের সকল সদস্যকে লেখাপড়া শিখে প্রত্যেককেই সচেতন ও আত্মনির্ভরশীল হতে হবে। দেশের উন্নয়নের জন্য গোটা দেশের মানুষের উন্নত জীবনমান নিশ্চিত করতে হবে। আর এ জন্য গবেষকের গষেণায় যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব সে বিষয়ে নিচে আলোচনা করা হলো :

কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির ব্যবহার : আবহমানকাল ধরে চলমান গ্রামের মানুষের জীবন ধারনের প্রধান বাহন হলো কৃষি। কৃষিকে অবহেলা করে রাতারাতি অন্য কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। তাই গ্রামোন্নয়নের জন্য কৃষিতে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করতে হবে। পদ্ধতিসমূহ নিচে আলোচনা করা হলোঃ

কলের লাঙ্গলের ব্যবহার : গরু টানা লাঙ্গলের পরিবর্তে কৃষি জমি কর্ষণের জন্য আধুনিক কলের লাঙ্গলের ব্যবহার অপরিহার্য। গরু টানা একটি লাঙ্গলে সারাদিন যে পরিমান জমি কর্ষণ করা যায়, একটি কলের লাঙ্গলে ৩০-৪০ মিনিটে সে পরিমান জমি কর্ষণ করা সম্ভব। এতে শ্রম ও জনবল দু'টোই কম লাগে। তাছাড়া কাঠের লাঙ্গলে যেভাবে মাটি কর্ষণ গভীর হয়, কলের লাঙ্গলে তার চেয়ে অনেক বেশী মাটির কর্ষণ গভীর হয় এবং ভূমির উৎপাদন ক্ষমতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এতে কৃষি উৎপাদন বেড়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

কৃষিক্ষেত্রে শিক্ষিতদের শ্রম বিনিয়োগ : বাংলাদেশের কৃষিকার্যে যারা জড়িত, তারা অশিক্ষিত, তাদের গতানুগতিক চাষাবাদ বাড়তি ফসল উৎপাদনে কোন ভূমিকা রাখে না। শিক্ষিত সচেতন মানুষ কৃষি কাজে নিজেদের নিয়োজিত করলে, তারা বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফসলের ধরণ পরিবর্তন : বর্তমানে বাংলাদেশের অসচেতন কৃষকরা বার বার একই জমিতে একই রূপ ফসল উৎপাদন করায় ভূমির ফসল উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। অথচ ঐ ভূমিতে পালা বদলের মাধ্যমে ফসল চাষ করলে উৎপাদন অনেকটা বৃদ্ধি পাবে। ফলে কৃষকসমাজ পরিবারের ভরণ-পোষণ মিটিয়ে বাকী ফসল বিক্রি করে অতিরিক্ত উপার্জনের মাধ্যমে পরিবারের স্বচ্ছলতা আনয়নে সক্ষম হবে এবং গ্রামোন্নয়ন তরান্বিত হবে।

কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজের ব্যবহার : কৃষিক্ষেত্রে উন্নত বীজ ব্যবহার করে ফসলের উৎপাদন বাড়িয়ে কৃষকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা যেতে পারে। বাংলাদেশের কৃষক সমাজ আদি পদ্ধতিতে বীজ সংরক্ষণ করে। সুতরাং ফসল উৎপাদনে বীজ ব্যবহারের পুরোনো ধ্যান ধারণা পরিবর্তন করে আধুনিক উন্নত বীজ ব্যবহার করতে পারলেই উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

সবুজ সার ব্যবহার : বাংলাদেশে কৃষকরা রাসায়নিক সারের উপর বেশী নির্ভরশীল হওয়ায় মাটির ফসল উৎপাদনের কর্মক্ষমতা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তাই জমিতে কৃষকদেরকে সবুজ সার উৎপাদন করে জমিতেই প্রয়োগ করতে পারলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। তাছাড়া গ্রামে বর্তমানে প্রয়োজনীয় চারণ ভূমি না থাকায় গো-খাদ্যের অভাবে গোবর সারের ব্যবহার আজকাল ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়ায় জমির উৎপাদন ক্ষমতা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

কৃষিভূমির খন্ডতারোধ : বাংলাদেশের কৃষি ফসল উৎপাদনের ভূমিগুলো খন্ড খন্ডভাবে বিভক্ত থাকায় আইলের কারণে আদিকাল থেকে অনেক জমি অনাবাদি রয়েছ। জনসংখ্যাধিক্য দেশটির খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে সৃষ্ট জমিগুলোর খন্ডতা রোধ করে অখন্ডভাবে চাষাবাদের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়ানোর যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

যৌথ খামার ব্যবস্থাপনা : গ্রামের জমি সমূহকে বৃহদায়তনের মাধ্যমে যৌথভাবে খামার সৃষ্টি করে ফসল বাড়িয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব। কৃষকরা সম্মিলিতভাবে সমবায় পদ্ধতি চালু করে ভূমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারলে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয়, পুকুর খনন, পূন:খনন : বাংলাদেশের খাল-বিল, নদী-নালা, জলাশয় এমনকি পুকুরগুলো ভরাট হয়ে যাবার ফলে পানি সংরক্ষণ করে সেচের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন যে ব্যাহত হচ্ছে তাই নয়। এদেশের মানুষের প্রাণীজ পুষ্টি সরবরাহের প্রধান মাধ্যম মাছ উৎপাদনও ব্যাপক হারে হ্রাস পাচ্ছে। অনেক এলাকায় মানুষের গোসল ও গৃহস্থালির জিনিষপত্র ধোয়া, পরিস্কারকও বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে পানি প্রবাহের গতিপথ রুদ্ধ হওয়ায় বন্যার সৃষ্টি হয়ে প্রতি বছর মানুষের জীবনে ব্যাপকভাবে দুর্যোগ নেমে আসে। এতে গ্রামোন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে মানুষের জীবন মান নিম্নমুখী হচ্ছে ।

পল্লী পরিবেশ রক্ষা : শহরের জীবনের মত পল্লী জনপদেও আজ পরিবেশ প্রতিকূল অবস্থা বিরাজ করছে। অবাধে বৃক্ষ কর্তন ও প্রয়োজনীয় বৃক্ষ রোপন না করায় গ্রামের মানুষের জীবন আজ অতিষ্ট। অতি শীত ও অতি গরম বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে অহরহ বহমান থাকায় দিন দিন মানুষের স্বাভাবিক জীবন চলার পথ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। কলকারখানার দূষিত বর্জ্য, পশু-পাখি নিধন, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক সার ব্যবহার হওয়ায় গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ দিন দিন ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ছে। অপর দিকে যথাসময়ে বৃষ্টি কখনও অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টির কারণে কৃষি ফসল উৎপাদন দারুণভাবে বিঘ্ন ঘটছে।

লবণাক্ত বান্ধব ফসল উৎপাদন : দেশের দক্ষিণাঞ্চলে সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকার গ্রামীণ জনপদ সমূহে ফসলি জমিতে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি ঢুকে প্রতি বছর কৃষকদের ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে তাদের নিঃস্ব করে ফেলে। তাই লবণাক্ত পানি বান্ধব ফসল উৎপাদনের কৌশল অবলম্বন করে এসব অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব।

স্বল্পকালীন ফসল উৎপাদন কর্মসূচী গ্রহণ : বর্তমানে বাংলাদেশের কৃষক সমাজ যে পদ্ধতিতে দীর্ঘ মেয়াদী ফসল উৎপাদন করে, সে সকল ফসল ঘরে উঠতে ৩/৪ মাস সময় লাগে। এ দীর্ঘ সময়ে কৃষকরা প্রতি বছর জমি থেকে মাত্র দু'তিনটি ফসল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। উৎপাদিত ফসলে কৃষকদের সারা বছর পরিবারের ভরণপোষণ করা সম্ভব হয়না। ফলে নিম্নভাবে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। যার দরুণ বাংলাদেশে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হচ্ছে না। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কৃষি প্রযুক্তি উন্নয়নের আদর্শ অনুসরণ করে এদেশেও বেশী ফসল উৎপাদন করার কৌশল অবলম্বন করা যায়।

কৃষি ঋণ প্রাপ্তির সহজ লভ্যতা : বাংলাদেশের কৃষকরা কৃষি ঋণ প্রাপ্তিতে নানা প্রকার জটিলতার বেড়াজালে আবদ্ধ। সরকারের ঋণ দানের কঠিন শর্ত পূরণ করে কৃষকদের ঋণ প্রাপ্তির মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হয় না। ফলে কৃষকদের স্বাভাবিক ভাবেই পুঁজির জন্য গ্রাম্য চক্রবৃদ্ধি হারে ঋণ দানকারী সুদখোর মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হয়। সরকার সহজ শর্তে (স্বল্প সুদে) কৃষকদের মাঝে ঋণ বিতরণ করে তাদের পুঁজি সরবরাহের ব্যবস্থা করতে পারলে, তারা উৎপাদন বাড়িয়ে সহজেই আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন করে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করতে পারে ।

সেচ সুবিধার অপ্রতুলতা : সেচের অভাবে এবং অনাবৃষ্টিতে প্রতিবছর বাংলাদেশের কৃষকদের প্রচুর ফসল হানিতে তাদের মেরুদন্ড ভেঙ্গে যাচ্ছে। পরবর্তীতে পরিবারের ভরণ পোষণ চালানোর পথ রুদ্ধ হয়ে জীবন-যুদ্ধে তাদের সংসারের খরচ চালাতে হয়। তাই সরকারী উদ্যোগে কৃষকদের মাঝে

Dhaka University Institutional Repository

বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে সেচ উপকরণ বিতরণ করে বেশী ফসল উৎপাদনে সহায়তার মাধ্যমে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন সাধিত হলেই গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

কৃষিতে ভর্তুকি প্রদান : বিশ্বে কৃষকরা যখন কৃষি কাজে কোন প্রতিবন্ধকতা বা ক্ষতির শিকার হয়, সরকার তখন কৃষকদের ভর্তুকি দিয়ে তাদের ক্ষতি পুষিয়ে দেন। তাই বাংলাদেশ সরকারকেও গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে কৃষকদের ক্ষতি পূরণে ব্যাপকহারে ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা : নানা প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাংলাদেশের কৃষকদের প্রতি বছর হাজার হাজার ঘর বাড়ী বিধ্বস্ত, গাছপালা উপড়িয়ে, খেতের পাকা ফসল নষ্ট, গবাদি পশুর মৃত্যু ঘটিয়ে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। পূর্ব থেকে কৃষকদের এ ব্যাপারে সর্তক করতে পারলে তারা সজাগ হবে এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবে।

শিক্ষার উন্নয়ন সাধন : শিক্ষা ছাড়া কোন জাতিই উন্নতি লাভ করতে পারে না। গ্রামের মানুষ নিরক্ষর বিধায় তারা উন্নত জীবন ধারনের কৌশল সম্পর্কে অসচেতন। সরকারী ভাবে ব্যাপক হারে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে গ্রামের মানুষের জীবনমানের পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারের সাথে গ্রামের মানুষকেও ঐক্যবদ্ধ উদ্যোগ নিতে হবে। নিচে গ্রামের শিক্ষা উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম পরিকল্পনা গুলো আলোচনা করা হলো :

অবৈতনিক শিক্ষা : মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য গ্রামীণ শিক্ষা ব্যবস্থাকে অবৈতনিক করে এ জনগোষ্ঠীর সন্তানদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামের দরিদ্র জনগণ অসহায় বিধায় অনেকে তাদের ছেলে মেয়েদের বেতন, পোষাক-পরিচ্ছদ ও শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ করে বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেনা। শিশু সন্তানগুলো পরবর্তীতে তাদের মত করে নিরক্ষর জীবন পদ্ধতি বেছে নিতে বাধ্য হয়। অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে এ সমস্যার সমাধান করা যায়।

কর্মমূখী কারিগরী শিক্ষা প্রর্বতন : বাংলাদেশের শহরগুলোতে সরকারী নানা রকম কর্মমূখী কারিগরী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। গ্রামে শহরের অনুরূপ কর্মমূখী শিক্ষা কর্মসূচী চালু করে ছেলেমেয়েদের শিক্ষিত করে গড়ে তুলতে পারলে, শিক্ষা শেষে তারা বেকার না থেকে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। যা গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

নারী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ : গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা ছাড়া গ্রামোন্নয়ন সম্ভব নয়। মাতা শিক্ষিত হলে সন্তানও শিক্ষিত হয়। তাই সরকারী উদ্যোগে গ্রামের নারী শিক্ষা সম্প্রসারণের যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, তা অপর্যাপ্ত থাকায় জ্যামিতির

হারে নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটছেনা। তাই গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রামের পুরো নারী সমাজকে শিক্ষিত করে গড়ে তোলতে হবে।

সরকারী চাকুরীতে কোটা পদ্ধতি চালু : দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে সরকারী চাকরীতে কোটা পদ্ধতি চালু থাকলেও গ্রামীণ অসহায় দরিদ্র কৃষক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্য এ সুযোগ না থাকায়, তারা লেখাপড়া শিখে শহরের ছেলেমেয়েদের সাথে প্রতিযোগিতা করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে না। তাছাড়া দলীয়করণ, আত্মীয়করণ ও উৎকোচের মাধ্যমে চাকরী পাওয়ার মত কোন সামর্থ্য গ্রামীণ ছেলেমেয়েদের নেই। সরকার কোটা পদ্ধতি চালুর মাধ্যমে গ্রামীণ শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের কর্মসংস্থানের পথ উন্মুক্ত করে গ্রামোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারেন।

স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করণ : গ্রামের দরিদ্র জনগণ স্বাস্থ্য সচেতন না থাকায় তারা সারা বছর নানা রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে থাকে। কেহ বা অকালে মৃত্যু বরণ করে। স্বাস্থ্য অসচেতন এ শ্রেণির মানুষকে স্বাস্থ্য সচেতন করে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করা যায়। বাল্য বিবাহ ও পুষ্টিহীনতার শিকার হয়ে গ্রামের মানুষ অনেকেই স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। যারা উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে বরং পরিবারের গচ্ছিত সম্পদ বিক্রি করে সংসারের ব্যয় ভার চালিয়ে থাকে। তাই গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যবান হয়ে উৎপাদন বাড়িয়ে গ্রামোন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখার জন্য বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে সরকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে পারেন। নিচে গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে তা আলোচনা করা হলো :

স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি করা : গ্রামের জনগণকে স্বাস্থ্য সচেতনতা সম্পর্কে ধারণা দিতে পারলে তারা স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে কীভাবে রোগ-বালাই থেকে সতর্ক হওয়া যায়, সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে। অতীতের পুরোনো চিকিৎসা পদ্ধতি যেমন: তাবিজ-কবচ, পানি-পড়া, পীর-ফকির, সাধু-সন্নাসীর প্রতারণামূলক চিকিৎসা পরিত্যাগের মাধ্যমে আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করে গ্রামীণ জনগণকে সচেতন করতে হবে। তাদের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমুল হতে হবে আসলে ঐ পদ্ধতিতে চিকিৎসা গ্রহণ বিজ্ঞান সম্মত কোন বাস্তব নিরাময় নয়। এ পদ্ধতি অতীত অসহায় অজ্ঞ মানুষের মানসিক তৃপ্তির চিকিৎসা। এমন চিকিৎসার মাধ্যমে রোগী সুস্থ না হয়ে বরং অনেক সময় মৃত্যুবরণ করে।

বাড়ীতে বাড়ীতে উঠান বৈঠক : স্বাস্থ্যকর্মীরা কয়েক বাড়ীর মানুষ এক বাড়ীতে জড়ো করে রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে ধারণা দিয়ে অর্থ্যাৎ কী কী পদ্ধতি গ্রহণ করলে রোগ থেকে নিরাময় থাকা যায়,

আবার কোন্ কোন্ অনিয়মে কী কী রোগ হয়, সে সম্পর্কে মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট দিনে উঠান বৈঠক করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ধারণা দিলে তারা অনেক রোগ সম্পর্কে সতেন হয়ে অকাল মৃত্যুবরণের হাত থেকে রক্ষা পাবে। যেমন: ব্র্যাক কর্তৃক পরিচালিত স্বাস্থ্য কর্মীরা বাড়ীতে গিয়ে ডায়রিয়া রোগের কারণ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দেয়ায় এবং খাবার সেলাইন সম্পর্কে সচেতন করায় এখন গ্রামে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত কোন মানুষ মৃত্যুবরণ করেনা।

পুঁথি-পুস্তকে স্বাস্থ্য সেবার সবক দেয়া : ছাত্র/ছাত্রীদের পাঠ্য পুস্তকের বিজ্ঞান বইগুলোতে বিভিন্ন রোগ-ব্যাধির কিছু কিছু ধারণা দেয়া থাকে। তবে এ সম্পর্কিত ধারণাকে শ্রেণিভিত্তিক পুঁথি-পুস্তকে ব্যাপকভাবে তুলে ধরলে ছাত্র/ছাত্রীরা ঐ সমস্ত রোগ বালাই সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে নিজস্ব জীবন পদ্ধতি বেছে নিবে এবং তাদের পরিবারের অন্যান্য অশিক্ষিত মানুষকে ধারণা দিতে পারবে। এর ফলে রোগ-ব্যাধির হাত থেকে গ্রামের মানুষ কিছুটা হলেও রক্ষা পাবে।

গ্রামে গ্রামে সেমিনার সিম্পুজিয়াম অনুষ্ঠান : আমাদের দেশের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সেমিনার সিম্পোজিয়ামগুলো রাজধানী ও শহরে বন্দরে সীমিত থাকে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় নির্দিষ্ট রোগ-ব্যাধি নিয়ে গ্রামে গ্রামে সেমিনার সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করলে তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতা অনেকটা হাতের কাছে চলে আসবে।

বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শের সুযোগ : সরকার গ্রামগঞ্জের দাতব্য চিকিৎসালয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সর্বোতভাবে সেবা দান নিশ্চিত করলে গ্রামের মানুষের অকাল ও অপচিকিৎসায় মৃত্যুর ঝুঁকি অনেক কমে যাবে। গ্রামের যে দু'একটি দাতব্য চিকিৎসালয় আছে সেখানে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পদ থাকলেও ডাক্তারগণ মাসে দু'একবার কর্মস্থলে গিয়ে শুধু হাজির হয়ে চাকরী রক্ষা করাকেই মুখ্য মনে করেন। হত দরিদ্র অসচেতন গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সুবিধা দানকে গৌণ মনে করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণের এমন মন মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে হবে।

গ্রামীণ যাতায়াত সুবিধা বৃদ্ধি : গ্রামীণ যাতায়াত অবকাঠামো উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামোন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। যেভাবে যাতায়াত অবকাঠামো উন্নয়ন করা যায়, তা হলো :

পাকা রাস্তা নির্মাণ : পাকা রাস্তা নির্মাণের মাধ্যমে গ্রামীণ মানব সমাজের চলাচলের পথ নিষ্কন্টক করা যায়। এর ফলে গ্রামে উৎপাদিত কৃষিপণ্য তথা শহর-গ্রামের মধ্যে প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী আমদানী রপ্তানীর সুযোগ সুবিধা সহজ সাধ্য হবে। পাকা রাস্তা নির্মাণ হলে মানুষ দ্রুতগতিতে প্রয়োজনীয় উপযোগ মেটাতে যত্রতত্র গমন করতে সক্ষম হবেন। যা গ্রামোন্নয়নে বার্তা বাহকের ভূমিকা রাখবে।

কাঁচা সড়ক নির্মাণ : গ্রামের যে সকল এলাকায় মানুষের চলাচলের কোন মাধ্যম নেই, সে সকল অঞ্চলে প্রথমত কাঁচা সড়ক নির্মাণ করে কিছুটা হলেও যাতায়াতের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এতে জনগণের জীবনযাত্রায় কষ্ট লাঘব হবে। পর্যায়ক্রমে কাঁচা সড়কগুলো পাকা করণ করে ভবিষ্যতে জনগণের যাতায়াতের মান উন্নত করতে হবে।

জলাশয়ের উপর কালভার্ট, ব্রীজ নির্মাণ : নদীমাতৃক বাংলাদেশের গ্রামের মানুষের যাতায়াতের প্রধান অন্তরায় হলো রাস্তা চলাচল করতে যেয়ে জলাশয় পারাপার হওয়া। জলাশয় পারপার হয়ে স্বাভাবিকভাবে চলাচল ও পণ্য সামগ্রী গ্রামের একস্থান থেকে অন্যস্থানে পৌঁছানো দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে পড়ে। এমন সমস্যা জনগণের সহজ জীবনযাত্রা ব্যাহত করছে। বিশেষ করে বর্ষাকালে এ সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। তাই সহজ যাতায়াতের জন্য সরকারকে সার্বজনীন ভাবে গ্রামের জলাশয় গুলোর উপর কালভার্ট-ব্রীজ নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

রেলপথের দৈন্যদশা দূরীকরণ : রেলপথে যাতায়াতের দৈন্যদশা দূর করে গ্রামের মানুষের গন্তব্যে পৌঁছা সহজ সাধ্য করার জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান সরকার রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য যোগাযোগ মন্ত্রণালয় থেকে এটি আলাদা করে নতুন মন্ত্রণালয় গঠন করেছেন। তবুও এর দৈন্য দশা এখনও দূর হয়নি। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সরকারী কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা এ পরিবহনটিকে নিজেদের সম্পদে পরিণত করেছেন। নিরাপদ যাতায়াতের মাধ্যমটিকে দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত করেছেন। ফলশ্রুতিতে সরকারকে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা লোকসান গুণতে হচ্ছে। সঠিক সময়ে এ যাতায়াত মাধ্যমটি চলাচল না করায় জনগণকে বহু ভোগান্তির শিকার হতে হয়। সরকারের কঠোর হস্তক্ষেপে রেল পথে যাতায়াতের জরাজীর্ণতা দূর করে একটি আধুনিক নিরাপদ যাতায়াতে পরিণত করার মাধ্যমে গ্রামের জনগণের চলাচলকে সহজ সাধ্য করে তাদের জীবন মানের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব।

নৌ-পথে যাতায়াতে গুরুত্বারোপ: বাংলাদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এ যাতায়াত ব্যবস্থাটি আজ দুরবস্থায় পরিণত হয়েছে। এর মূল কারণ এ পথের নাব্যতা হ্রাস পেয়ে নদী ভরাট হয়ে নৌযান চলাচলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হওয়া। আজ গ্রামে গঞ্জে সেই পাল তোলা নৌকা ও মাঝির ভাটিয়ালি গানের সুর কানের পর্দায় স্পন্দন সৃষ্টি করেনা। বর্ষাকালে কয়েকদিন নৌপথে যাতায়াত দৃশ্যমান থাকলেও শুষ্ক মৌসুম আসার সাথে সাথে ভরাট জলাশয়গুলো শুকিয়ে দেশটি যেন মরুভূমিতে পরিণত হতে যাচ্ছে। তাই এ পথের সহজ সাধ্য চলাচল সচল রাখার জন্য সরকারকে প্রতিটি জলাশয়ের ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা সৃষ্টি করতে হবে। এতে মানুষের পক্ষে স্বল্প খরচে যাতায়াত ও পণ্য আনা নেয়া সহজ হবে এবং জীবন মানের পরিবর্তন সাধিত হবে।

বিদ্যুতায়নের সুবিধা প্রাপ্তি : সভ্য জগতে উন্নত জীবন মান নিশ্চিত করণের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হলো বিদ্যুৎ। এটি এমন একটি অবকাঠামো যার উপযোগিতা জীবন চলার প্রতিক্ষেত্রে প্রতিটি মুহুর্তের সাথে জড়িত। যতদিন না গ্রামের প্রতিটি ঘরে এর সুবিধা প্রাপ্তি সম্ভব হবে, ততদিন গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে না। প্রয়োজনীয় বিদ্যুতের ব্যবহার না থাকায় গ্রামগঞ্জে আশানুরূপ কল-কারখানা প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেনা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারণ ঘটছেনা। প্রতি পদে কৃষি কর্মকান্ড পরিচালনা ব্যাহত হচ্ছে। গ্রামের বেকারদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত হচ্ছেনা। তারা বেকার জীবনযাপনকরে কালক্ষেপন করছে। এভাবে জীবন যাপনকারী মানুষের দারিদ্র্যতার অভিশাপ মুক্ত না হয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই গ্রামোন্নয়নের জন্য বিদ্যুৎ অবকাঠামোর উপকার ভোগ গ্রামের মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছানো সরকারকে অত্যাবশকীয় কর্মসূচী হিসেবে বিবেচনায় আনতে হবে।

জনসংখ্যা হ্রাস : বাংলাদেশের গ্রাম গুলোতে জনসংখ্যার ব্যাপক বিস্ফোরণ লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত, অসচেতন গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর জনসংখ্যা বিস্ফোরণের নেতিবাচক দিক সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। নিচে যে সকল কর্মসূচী গ্রহণ করে গ্রামীণ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হ্রাস করা যায় তা আলোচনা করা হলোঃ

বাল্য বিবাহ রোধ : বাল্য বিবাহকে নিরুৎসাহিত করে গ্রামীণ জনসংখ্যার বিস্ফোরণ হ্রাস করা যেতে পারে। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে বাল্য বিবাহকে একটি বিলাস বহুল দিক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অভিভাবকগণ ছেলেমেয়েদের বাল্য বয়সে বিয়ে দিয়ে একদিকে আমোদ-উল্লাস অন্যদিকে দায়িত্ব ছাড়া হতে চায়। ধর্মান্ধ গ্রামীণ এ জনগোষ্ঠী মনে করেন সন্তানদের বাল্য বয়সে বিয়ে না দিলে তারা নানা প্রকার অসামাজিক কর্মে লিপ্ত হয়ে পাপ কাজে জড়িত হবে। এতে পিতামাতা গুণাহ্গার হবেন। সমাজে তারা মাথা উঁচু করে চলতে পারবেনা। এ ভয়ে এবং লজ্জা-শরমে গ্রামীণ সমাজের মানুষ ছেলেমেয়েদের বাল্য বয়সে বিয়ে দিয়ে থাকে। তাছাড়া পিতামাতার অধিক সন্তান লালন পালনের সামর্থ্যের দিকটিও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্রামীণ অভিভাবকগণকে এর কুফল সম্পর্কে সচেতন করে সমস্যা সমাধান করা যেতে পারে।

অধিক সন্তান জন্মদানে নিরুৎসাহিত করা : বাল্য বয়সে বিয়ে হওয়ায় গ্রামের এক একজন দম্পতির জনসংখ্যার বিস্ফোরণ সম্পর্কে ধারণা না থাকায় তারা অধিক সন্তান জন্মদান করে থাকে। এসব দম্পতির সন্তান জন্মদানের তুলনায় পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকায় সন্তান গুলো ক্লেশ-কষ্টে মানুষ হতে থাকে। তারা জীবন চলার পথে নিম্ন জীবনযাত্রা বেছে নিতে বাধ্য হয়। যা গ্রামোন্নয়নের পদে পদে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই সকল সচেতন মহলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে

জনসংখ্যার বিস্ফোরণের অভিশাপ সম্পর্কে গ্রামের মানুষকে জাগ্রত করতে পারলে জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

বহু বিবাহ নিষিদ্ধকরণ : ইসলাম ধর্মের অপব্যাখ্যা দিয়ে একজন সক্ষম পুরুষ স্ত্রী সন্তান রেখে একাধিক বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয় এবং অধিক সন্তান জন্মদান অব্যাহত রাখে। প্রয়োজন ব্যতিরেকে একাধিক বিয়ের প্রবণতা রোধ করে জনসংখ্যা হ্রাসের জন্য সরকারী আইন বাস্তবায়ন করার প্রবণতা গ্রামের জনগণের মধ্যে বদ্ধমূল করতে হবে। ফলে বাড়তি জনসংখ্যার চাপ কমে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে।

বিনামূল্যে গ্রামে জন্মনিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিতরণ : গ্রামের দরিদ্র সক্ষম দম্পতিদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা থাকায় তাদের পক্ষে জন্মনিয়ন্ত্রণমূলক প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় করে ব্যবহার করা সম্ভব হয়না। সরকার পূর্বের ন্যায় বিনামূল্যে নারী পুরুষের সংশ্লিষ্ট জন্ম নিয়ন্ত্রণ উপকরণ বিতরণের মাধ্যমে জনসংখ্যা হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

উন্নত বিশ্বের উদাহরণ গ্রহণ : বিশ্বের উন্নত দেশগুলো কীভাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রেখেছে এবং কোন কোন উন্নত দেশে আয়তনের তুলনায় কেন লোকসংখ্যা কম তা উদাহরণ হিসেবে এনে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ রোধের কৌশল গ্রহণ করতে হবে। গ্রামীণ অশিক্ষিত, অসচেতন জনগোষ্ঠীকে ঐ সব দেশের উদাহরণ দিয়ে সরকার তাদেরকেও অধিক সন্তান নয়, এক-দু'টি সন্তান নিয়ে সুখী পরিবার গঠনে উৎসাহিত ও উপদেশ হিসেবে গ্রহণের জন্য জনগণের সহায়তা কামনা করতে পারেন।

নারীর ক্ষমতায়ন : গ্রামীণ জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক মানবগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়ন না ঘটিয়ে কখনও গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের গ্রামগুলোতে পুরুষ শাসিত সমাজে নারীরা অবহেলিত হচ্ছে সর্বক্ষেত্রে। পুরুষরা এ সমাজের মানুষকে জীব জানোয়ারের মত যত্র তত্র ব্যবহার করে। অবশ্য উপনিবেশিক শাসনামলের চেয়ে স্বাধীনতাত্তোর অদ্যাবধি কিছু কিছু ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীরা অধিকার প্রাপ্ত হলেও তা সমুদ্রে শিশির বিন্দুর মতই। যৌতুক প্রথা, বাল্য বিবাহ, শারীরিক নির্যাতন, এসিড নিক্ষেপ প্রতিরোধে এবং শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নারীর সামান্য মানোন্নয়ন সাধিত হয়েছে। তবে এখনও এর প্রভাব গ্রামীণ নারী সমাজের রন্দ্রে রন্দ্রে প্রবাহিত না হওয়ায় তাদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটিয়ে গ্রামোন্নয়ন তথা ক্ষমতায়নে নানা প্রতিবন্ধকতা বিরাজমান রয়েছে।

সবশেষে, আমরা বলতে পারি, বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর একেবারে গ্রামোন্নয়ন হয়নি তা নিপাতনে সিদ্ধ নয়। উপনিবেশিক শাসনামলে শিক্ষার হারের তুলনায় বর্তমানে এ হার অনেকাংশে উন্নীত হয়েছে। এমন একদিন ছিল গ্রামে একটি চিঠি পড়ার জন্য একজন শিক্ষিত লোককে হন্যে হয়ে

খুঁজতে হতো। আজ কিন্তু সে অবস্থা বিরাজমান নেই। গ্রামের ঘরে ঘরে খুব বেশী না হউক সামান্য লেখাপড়া জানা হলেও দু'একজন লোক পাওয়া যায়। এসব লোকেরা নিজেদের প্রয়োজনীয় হিসাব-কিতাব সহ সংসার চালানোর মত লেখাপড়া জানেন।

স্বাস্থ্য সেবায়ও আদিকালের রূপ বদলিয়ে সামান্য হলেও আধুনিকতার হাওয়া বইতে শুরু করেছে। আগে গ্রামীণ মানব গোষ্ঠীর চিকিৎসা সেবা বলতে লতা পাতার রস, পানি পড়া, তাবিজ-কবচ, পীর-ফকির ও সাধু-সন্নাসীর ঝাড় ফুঁকই একমাত্র অবলম্বন ছিল। আজ সে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। গ্রামে এখন শিশুদের মারাত্মক ৬টি রোগ প্রতিরোধে টিকাদান কর্মসূচী, যক্ষা-কোষ্ঠ রোগের বিনামূল্যে রোগীদের মাঝে ঔষধ সরবরাহ কর্মসূচী চলমান রয়েছে। মাতৃত্ব ও শিশু সেবা দান বিষয়ে হাসপাতাল গুলোতে চিকিৎসা পাওয়ার সুব্যবস্থা আছে। আগে যেখানে মায়েরা সন্তান প্রসব কালীন সময়ে অহরহ মৃত্যু বরণ করতো, আজ আধুনিক পদ্ধতিতে সে সেবা প্রাপ্তি অনেকটা নিশ্চিত হয়েছে ও শিশু-মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। বিভিন্ন কঠিন-জটিল রোগে আক্রান্ত গ্রামের একজন মানুষ শহরে গিয়ে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। শহরের পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে এবং গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে। উদরাময় রোগ ও গুটি বসন্তে আগে যেখানে গ্রামের হাজার হাজার মানুষ মৃত্যু বরণ করতো, স্বাধীনতাত্তোর সে অবস্থা আর নেই। সরকার ও এনজিওরা বিভিন্ন ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করে মৃত্যুর এ ভয়াবহতা আয়ত্তে আনতে সক্ষম হয়েছে। এক কথায় গ্রামীণ মানুষের মান্ধাতার আমলের চিকিৎসা পদ্ধতির ভুল ধারণার পরিবর্তিত হয়ে আধুনিক চিকিৎসা সেবা গ্রহণের সচেতনতা কিছুটা হলেও বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা যদি কৃষি ফসল উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে দেখব, আগে বন্যা, খরা সহ প্রাকৃতিক নানা বিপর্যয়ে কৃষকদের ফসল হানি হয়ে তারা একেবারে স্বর্বসান্ত হয়ে পড়তো। বর্তমান কালে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে তেমন ফসল হানি হতে দেখা যায় না। সরকার বাংলাদেশের বন্যা প্লাবিত এলাকা গুলোতে বেড়ি বাঁধ ও স্লুইস গেইট নির্মাণ করে কৃষকদের ফসল রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। কৃষকরা খরার কবল থেকে ফসল রক্ষার জন্য গভীর নলকূপ বসিয়ে পাতাল থেকে পানি উঠিয়ে   ব্যাপক ভাবে ফসল ফলাতে সক্ষম হচ্ছে। আগে যেখানে ফসল ফলানোর জন্য হালের বলদ ও কাঠের লাঙ্গলই একমাত্র ভরসা ছিল, বর্তমান কালে এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। কৃষকরা কলের লাঙ্গল ও ফসল মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করে উৎপাদন বাড়াতে সক্ষম হচ্ছে। আগে শ্রমিকরা যে কাজ করতো, যান্ত্রিক পদ্ধতি ব্যবহারে কৃষকদের সে কাজ, কষ্ট, আর্থিক অপচয় ও সময় সংক্ষেপ হয়েছে। বিদেশী ফসলের বীজ ও বীজের সংকরায়নের ফলে ফসল উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। দুর্যোগ মোকাবেলা করে প্রতি বছর ফসলের বাম্পার ফলনে গ্রামের মানুষের অতীতের জরাজীর্ণতা কেটেছে। আজ তারা পেট ভরে দু'মুঠো ভাত খেয়ে বেঁচে থাকতে পারছে।

কোন কোন গ্রামের রাস্তা-ঘাটের দিকে তাকালে স্বাভাবিক ভাবেই নজরে আসে দু'একটি পাকা রাস্তা, ব্রীজ-কালভার্ট যা ব্যবহার করে মানুষ সহজেই শহর বন্দরে বা গন্তব্যে পৌছতে পারে। গ্রামের কাঁচা রাস্তাগুলোতে রিক্‌শা-ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী প্রায়ই চোখে পড়ে। মানুষের সহজ যাতায়াত ও পণ্য সামগ্রী আনা নেয়ার কাজে এ সকল বাহন ব্যবহৃত হচ্ছে। অতীত কালে গ্রামের চলাচলের প্রধান মাধ্যম ছিল দু'খানা পা এবং বড় লোকদের জন্য গরু-মহিষের গাড়ী। বর্তমানে গ্রামের অশিক্ষিত দরিদ্র বেকাররা এসব বাহন ব্যবহার করে আয় উপার্জনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে গ্রামোন্নয়নে স্বাক্ষর রাখছে। গ্রামের উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী কয়েক ঘন্টার মধ্যে মফস্বল শহরে, এমনকি দেশের একপ্রান্ত থেকে সে পণ্য একদিনের মধ্যে রাজধানীতে পৌঁছিয়ে তা বিক্রি করে ব্যবসায়ীরা কাঁচা পয়সা আয় করতে সক্ষম হচ্ছেন।

জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচনের পূর্বে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করে গ্রামে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে তা ক্রমাগত বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন। গ্রামে শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবাসহ অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিছুটা হলেও চোখে পড়ে। জনপ্রতিনিধিরা গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সবটাই লুটপাট করে, তা এক তরফাভাবে তাদের উপর দোষ চাপালেই হবে না। জনপ্রতিনিধিরাই গ্রামের মানুষের আপদে-বিপদে এগিয়ে এসে সুরাহা করে থাকেন। গ্রামের যে সকল বিবাদ আদালতে গড়ায় এবং উকিলদের পয়সা দিয়ে কোন ফল না পেয়ে মানুষকে নিঃস্ব হয়ে ঘরে ফিরতে হয়। জনপ্রতিনিধিরা গ্রামীণ সালিশ দরবারে স্ব-শরীরে উপস্থিত হয়ে দরিদ্র জনসাধারণের বিবাদ মীমাংসার মাধ্যমে আদালতের অপচয় থেকে তাদের মুক্ত করে ন্যায় বিচার প্রাপ্তির ব্যবস্থা করে থাকেন। যা গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

তবে একথাও সত্য, গ্রামোন্নয়নমূলক এ সামান্য কর্মসূচীর বাস্তবতার সত্যতা যাচাই করতে যেয়ে আমরা দেখি, কৃষিক্ষেত্রে কলের লাঙ্গল ও ফসল মাড়াই যন্ত্র ব্যবহার করেন গুটিকয়েক ধনী কৃষক পরিবার। গরীব মানুষের এখনও কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বেশী ফসল উৎপাদনের আর্থিক সক্ষমতা নেই। সরকারের ঋণ দান কর্মসূচীর সুফল তেমনভাবে গ্রামের কৃষকরা পায় না। উৎকোচ দিয়ে ঋণ গ্রহণ করার সামর্থ্য গ্রামের উল্লেখিত দরিদ্র কৃষকদের নেই। এ ঋণের সুফল ভোগ করেন ধনী কৃষক পরিবারগুলো। তারা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মৎস্য, পোল্ট্রি, গরু মোটাতাজাকরণ খামারসহ নানা প্রকার ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে আরও বড় লোক হচ্ছেন। গ্রামের বাকী কৃষক পরিবার জীবনযুদ্ধে সংগ্রাম করেই নিজেদের সংসার চালিয়ে যাচ্ছে।

সরকারের বা অন্য কোন সংস্থার গৃহীত শিক্ষা কর্মসূচী গ্রামে প্রসার ঘটলেও বাস্তবতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়, গ্রামগুলোতে আধুনিক শিক্ষা দানের মত কোন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মান্ধাতার আমলে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলোতে লেখাপড়া শিখে কৃষক পরিবারের সন্তানরা পরিবারের বোঝা ছাড়া আর কিছুই হয়না। তারা না পায় সরকারী চাকুরী, না পায় কৃষিক্ষেত্রে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে। গ্রামের ধনী কৃষক পরিবার তাদের সন্তানদের ঠিকই শহরে নিয়ে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের এবং সরকারী চাকুরীসহ যাবতীয় সুযোগসুবিধা ভোগের ব্যবস্থা করিয়ে থাকেন। সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক শিক্ষা উপবৃত্তির দিকে তাকালে এটাই দেখা যায়, এর সুবিধাভোগ করে অল্প কয়জন ছেলে-মেয়ে। বাকী দরিদ্র পরিবারের ছেলেমেয়েরা এক্ষেত্রে সুবিধা বঞ্চিত হয়ে শিক্ষার হাল বেশী দিন ধরে রাখতে পারেনা।

স্বাস্থ্য সেবার দিকটি বিবেচনা করলে দেখা যায়, গ্রামের বড় লোকেরা উন্নত স্বাস্থ্য সেবার সুবিধা ভোগ করে থাকেন। গ্রামের গরীব মায়েদের সন্তান জন্ম গ্রহণ করে আদি পদ্ধতিতে, অজ্ঞ ধাত্রীর মাধ্যমে। সন্তান প্রসব করতে গিয়ে এখনও গ্রামের অসংখ্য মা ও শিশু মৃত্যুবরণ করছে। সরকারী কোন কর্মসূচীর সুফলতা গ্রামের দরিদ্র মানুষ পুরোপুরি ভোগ করতে পারেনা এবং ঐ সবের খবর রাখার সচেতনতাও তাদের নেই।

গ্রামের রাস্তা উন্নয়নের কথা বলতে, কোন গ্রামে দু'এক কিলোমিটার পাকা রাস্তা, দু'একটি ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ একটি গ্রামের হাজার হাজার মানুষের প্রয়োজনীয় উপযোগিতা মেটাতে সক্ষম হয় না। গ্রামের শত শত মানুষ এখনও গ্রাম্য মেঠোপথ ও কাঁচা সড়কে কাঁদা-ধুলো মাড়িয়ে গন্তব্যে পৌঁছে থাকেন। যে কয়টি রিক্‌শা, ভ্যান ও ঠেলাগাড়ী গ্রামের রাস্তায় দেখা যায়, তার উপযোগিতা ভোগের আর্থিক স্বচ্ছলতা গ্রামের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর নেই। এগুলোর উপকারিতা ভোগ করেন গ্রামের ধনী পরিবারগুলো। এখনও গ্রামে মানুষকে নদীর উপর বাঁশের সাঁকো ও সাঁতরিয়ে নদী পার হওয়ার দৃশ্য চোখে পড়ে। একটি রাস্তার নির্মাণের জন্য জনপ্রতিনিধিদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে পরিশেষে গ্রামের মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবহারের রাস্তা নিজেরাই নির্মাণ করে থাকেন।

জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের দিকে তাকালে আমরা এটাই দেখতে পাই যে, তাদের রাজনীতিতে আগমন ঘটে জনস্বার্থে নয়, ব্যবসায়ী স্বার্থে। তাঁরা নির্বাচনের পূর্বে মোটা অংকের টাকা খরচ করে নির্বাচিত হন। নির্বাচিতদের জীবন বৃত্তান্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাদের অধিকাংশের শরীরের রন্দ্রে রন্দ্রে রয়েছে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, সরকারী সম্পদ লুটপাট এবং গ্রামীণ জনগণকে শোষণের হিড়িক। তাদের কেহ নিজে, কেহ বা পেটুয়া বাহিনী দ্বারা সন্ত্রাস লালন-পালন করেন। পেটুয়াদের

সম্পদ আহরণের সুযোগ করে দেয়ার জন্য দরপত্র গ্রহণ ও চাঁদাবাজিতে জনপ্রতিনিধিরা সহায়তা করেন। তারা তাদের কাছ থেকে অপকর্মের বখ্‌রা আদায় করে উভয়ই লাভবান হন। কোন কোন সময় সরকারী সম্পত্তি দখল করে গড়ে তোলেন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। বৈধ অবৈধ সম্পদ মিলে তারা কালো টাকার পাহাড় তৈরী করেন। আর ঐ টাকা পরবর্তী নির্বাচনে খরচ করে কেহ কেহ আবার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কেহ পরাজয় বরণ করলেও পরবর্তী নির্বাচনে আবার জয়ী হয়ে পূর্বের কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়ে জনগণকে শোষণ করতে থাকেন।

থানায় পুলিশের সাথে নেতাদের রয়েছে সখ্যতা। গ্রামের অশিক্ষিত, অসচেতন সাধারণ মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এবং কখনও কখনও টাকার বিনিময়ে অনেকের অবৈধ কাজকে বৈধতা দেয়ার মাধ্যমে পুলিশ-নেতার মধ্যে গড়ে উঠে সম্পর্ক। নেতাদের আশ্রয় প্রশ্রয়ে এমন কাজ নেই, যা পুলিশ করতে পারেন না। বিচার সালিশের নামে সংশ্লিষ্ট জনগণের কাছ থেকে টাকা নিয়ে নেতারা অবৈধ কাজকে বৈধ করে দেন।

গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর সামান্য কাজ বাস্তবায়ন করে নেতারা লোক দেখিয়ে সরকারী অর্থ লুটপাট চরিতার্থ করেন। স্বাধীনতা উত্তর থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত গ্রামোন্নয়নের জন্য সরকার কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচীর পুরো বাস্তবায়ন হলে গ্রামগুলো শহরের মত হয়ে গড়ে উঠত। মানুষ পুরোপুরি উন্নয়নের সংস্পর্শে আসলে দেশটি সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিণত হত। তাই বলা যায়, বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন হচ্ছে এমন ভাবে যা এক প্লেট ভাত ২০ জন মানুষকে খাইয়ে ক্ষুধা নিবারণের মত। গ্রামীণ উন্নয়ন কর্মসূচী বারিত হওয়ার পিছনে রয়েছে প্রথমত: রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দ্বিতীয়ত: তাদের সহায়তাকারী সরকারী কর্মকর্তা সাহেবদের দুর্নীতির আখড়া।

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে আবারও বলা যায়, রাজনৈতিক নেতা এবং সরকারী কর্মকর্তাদের দুর্নীতির মূলোৎপাটন করে গ্রামোন্নয়নের জন্য প্রয়োজন গ্রামে শিক্ষিত ও সচেতন মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব হওয়া। গ্রামের বিপুল জনগোষ্ঠীর অর্থ্যাৎ ৮০ ভাগ মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম প্রতিষ্ঠা, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, অতপর প্রয়োজনীয় কর্মসূচী গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একমাত্র গ্রামোন্নয়নের পথ উন্মোচন সম্ভব।

পরিশিষ্ট - ক

পরিশিষ্ট - ক (১)

BIBLIOGRAPHY

1. Ahsan, Kumrul, Munshi, Shishir Kumar: Rice Seed Scarcity in Advanced; BARD, Kotbari-Comilla, 2000.
2. Richardson, J. H: Economics and Financial Aspects of Social Security; London, 1960.
3. R. O: Washington and R. M. Ryan, Macro Practice in the Human Services; Free Press, New York, 1982.
4. Abdullah, Taherunnessa: Women's Education and Home Development Programme: 5th Report; BARD, Comilla, 1970.
5. Ahmed, Alauddin and Islam, Md. Shafiqul: 31st Annual Planning Conference; BARD, Comilla, 1997.
6. Ahmed, Alauddin et al: Migration and Rural labour Market Situation: A Survey of Two Villages in Bangladesh; BARD, Comilla. 1998.
7. Ahmed, Alauddin: Paterns of Land Transfer, (1972-81); BARD, Kotbari-Comilla, 1987.
8. Ahmed, Alauddin: Rural Land Use in Bangladesh; BARD, Comilla, 1998.
9. Ahmed, Badaruddin: BARD, Journal, Vol-17; BARD, Comilla, 1987.
10. Ahmed, Badruddin: Leadership in Village Co operatives; BARD, Comilla, 1972.
11. Ahmed, Dr. Salehuddin et al: Resources Transfer from Rural to Urban Areas in Bangladesh; BARD, Comilla, 1995.

12. Ahmed, Dr. Salehuddin: Changing National Policies and the Small Farmers; BARD, Comilla, 1997.
13. Ahmed, Dr. Salehuddin: Strategies Issues of Local Level Planning in Bangladesh; Kotbari-Comilla, 1998.
14. Ahmed, Md. Kamal Uddin et al: A Review of land Reform Measures in Bangladesh; BARD, Comilla, 1998.
15. Ahmed, Md. Kamal Uddin: Impact of Agriculture and Rural Development on Poverty Alleviation in SAARC Countries; BARD, Comilla, 2002.
16. Ahmed, Md. Kamal Uddin: Situation Report of Boro Baliatali: A Disadvantaged Village in Patuakhali District; BARD, Comilla, 1996.
17. Ahmed, Taherunnessa: Women's Education Programme; BARD, Comilla, 1965.
18. Ahsan, Dr. Kamrul and. Paul Dr. Md. Jillur Rahman: The Journal of Rural Development, Vol- 37, November, 2 BARD, Comilla. 2012.
19. Ahsan, Kumrul: River Erosion and Consequences to the Poor: From the Grass Roots; BARD, Comilla, 2003.
20. Ahsanullah et al: Socio- e-Economic Benchmark of Five Villagers: A study in the Villages; BARD, Comilla, 1977.
21. Akanda, A. M: Tests of IRRI Selections, Programme; BARD, Kotbari-Comilla, 1968.
22. Akhter, Nasima et al: Health, Nutrition and Educational Status of Rural Women and Children in CVDP Village of BARD; BARD, Comilla, 2004.

23. Alam, Dr. Md. Jahangir: Impact of Diversified Agriculture on the Socio Economic Enlistment of the Rural People of Bangladesh; BARD, Comilla, 2009.
24. Alam, Jahangir: Export Marketing of Vegetable in Bangladesh; BARD, Comilla, 2002.
25. Alam, Jahangir: Export Marketing of Vegetables in Bangladesh; BARD, Kotbari-Comilla, 2002.
26. Alam, Md. Manjurul and Rahman, Syed Aminur: Management of Rural Hats and Bazars: Some Case Studies; BARD, Comilla, 1981.
27. Alam, Md. Manjurul: Leadership Pattern: Problems and Prospects of local Govt. in Rural Bangladesh; BARD, Comilla, 1976.
28. Alam, Munjurul et al: Evaluation of Thana Irrigation Programme, (1974-75); Kotbari-Comilla, 1977.
29. Alamgir, M: Bangladesh, A Case of Below Poverty level Equilibrium; BIDS, Dhaka, 1978.
30. Ali Md. Shamsher: 6th Annual Planning Conference; BARD, Comilla, 1972.
31. Ali, Hazrat: Involvement of the Rural Development Through local Organisation: A Bangladesh Study; BARD, Comilla, 1980.
32. Ali, M. Easin and Anowar, Md:
Structure and Performance of Small And Medium; BARD, Comilla, 2011.
33. Ali, M. Hazrat: Development Planning at Upazila Level; BARD, Comilla, 1987.
34. Ali, Md. Easin and Bhuyan, Md.Anowar Hossain: Structure and Performance of Small and Medium Agro-Processing Industries in Bangladesh; Kotbari- Comilla, 2011.

35. Ali, Md. Easin: Impact of Skill Development Training on Proactive Rural Youths for Their Self-Employment in CVDP; BARD, Comilla, 1999.
36. Ali, Qazi Azher: Comilla Approach to Rural Development; BARD, Comilla, 1966.
37. Anisuzzaman, M. and Ahmed, Badruddin: Planning for local Development; BARD, Comilla, 1990.
38. Arens, J. and Beurdem, Jhagrapur: Poor Peasents and Women in village in Bangladesh; Amsterdam, 1977.
39. Ashrafuzzaman, A.K.M: Economics of Milk Production; BARD, Comilla, 1995.
40. Asplund, D: The Public Works Programme; Invyder, 1979.
41. Bagchi, Amiya Kumar: The Political Economy of Under Development; Combridge press. 1985.
42. Banu, Tahamin: Homestead Agriculture and Food Processing Project; BARD, Comilla, 1995.
43. Baran,: The Political Economy of Growth; Mr. Press, 1978.
44. BARD, Comilla: A Training Hand Book on Participatory Rural Development: For the Professionals and Practitioners in Rural Development; BARD, Comilla, 1988.
45. BARD, Comilla: Academy for village Development at Comilla; BARD, Comilla, 1961.
46. BARD, Comilla: An Evaluation of the Rural Public Works Programme; BARD, Comilla, 1963.
47. BARD, Comilla: Fishery Extension Programme Manual; BARD, Comilla, 1996.
48. BARD, Comilla: Fishery Extension Programme Report; BARD, Comilla, 1996.

49. BARD, Comilla: Rural Development in China: Tour Report of the BARD Team that Visited Chaina; BARD, Comilla, 1977.
50. BARD, Comilla: SAARC Workshop on Mobilization of Resource for Poverty Focused Rural Development; BARD, Comilla, 1985.
51. BARD, Study Team: Small Farmers Development Project: an Evaluation Report; BARD, Comilla, 1991.
52. Bardhan, P.K: On the Minimum Level of living and the Rural Poor Indian Economic Review; New Series, 1979.
53. Bari, Fazlul: Farmers Training Programme at Comilla; BARD, Comilla, 1979.
54. Bari, Fazlul: Role of Female Block Supervisor in Agriculture Extension; BARD, Comilla, 1989.
55. Bari, Fazlul: Small Efforts by Small Farmers; BARD, Comilla, 1987.
56. Bari, Fazlul: Small Farmers and landless laborers Development Programme, 1st Report, 1979; BARD, Comilla, 1981.
57. Bari, Fazlul: Small Farmers Development Project: Proceedings of the Annual Workship; BARD, Comilla, 1990.
58. Barua, Bijoy Kumar: Current Thoughts on Rural Development; BARD, Comilla, 2000.
59. Barua, Bijoy Kumar: Rural Credit Delivery System for Poverty Alleviation; BARD, Comilla, 1996.
60. Begum, Naher Nurun: Targeting the Rural Poor Through the Provision of Financial Services; BARD, Comilla, 1994.
61. Begum, Nurun Nahar: Targeting the Rural Poor Through the Provision of Financial Services in Bangladesh; BARD, Comilla, 1996.

62. Begum, Sawkat Ara: 32nd Annual Planning Conference; BARD, Comilla, 1998.

63. Bhattacharjee, Milan Kanti: The Essentials of Communication for Rural Development: The Case of SFDP; BARD, Comilla, 1994.

64. Biswas, Tapash Kumar:Women's Empowerment and Demographic Change;
BARD, Comilla. 2004.

65. Bose, Tapash Ranjan, 49th Annual Plan, BARD, Comilla, 2008.

66. Bridge, Willam R: Supervisor, School Club Manual; BARD, Comilla, 1966.

67. Btair H.W: Rural Development Class Structure and Bureaucracy in Bangladesh; New Series, 1978.

68. Carolus, R. I. and Kazi, Q. H: Observations Trails with Various Crops During the Boro Season in Comilla; BARD, Comilla, 1968.

69. Chowdhury, Dr. Masudul Hoq et al: 45th Annual Plan; BARD, Comilla, 2012.

70. Chowdhury, Dr. Masudul Hoq et al: 52th Annual Plan (2010-11); BARD, Comilla, 2011.

71. Chowdhury, Moqbul Ahmed and Kabir, M. Khairul: The Journal of Rural Development, Vol-22; BARD, Comilla, 1992.

72. Chowdhury, Newaz Ahmed et al: Impact of Women's Education, Income and Nutrition Improvement Project; BARD, Comilla, 2011.

73. Chowdhury, P.K. et al: Co-operative as Institutions fo Development of the Rural poor; BARD, Comilla, 1987.

74. Dasgupta Dr. Swapan Kumar et al: Study on Post Training Utilisation of Sewing Cources for Women; BARD, Comilla, 2010.

75. Dasgupta, Swapan Kumar et al: Viable Credit Compponent and Analysis: Fourteen Better Co-operatives; BARD, Comilla, 2002.
76. Dasgupta, Swapan Kumar: Different Models of Credit Supports to Rural Women: A Comparative Study; BARD, Comilla, 2000.
77. Dasgupta, Swapan Kumar: Poverty and Food Insecurity: the Case of Bangladesh; BARD, Comilla, 1994.
78. Dewatt, K. K. and et al: Economics of Growth and Development; S. Chand and Co. Ltd. New Delhi, 1985.
79. Dobb, Murice: Studies in the Development of Capitalism; Int. publisher, 1954.
80. Faruk, A.G: Capitalism of under Development in Latin America; Penguin, 1975.
81. Federrico, C. Ronad: The Sociol Welfare Institution: An Introduction, D. C. Health and Co. Lixunton, 1984.
82. Gali (Ed), Rosemary: The Political Economy of Rural Development; Xroom Helm, 1977
83. Gillin, J. L. and other: Social Problems; The Time of India Press, Bomby, 1869.
84. Goodman, Norman and Marx, Gray, T: Society Today; Random House, Inc. USA, (3rd ed), 1978.
85. Guha, Ranjan Kumar et al: Managing Social Safety Net Programme at the Local Level: A Case of Cash Transfer Programme; BARD, Comilla, 2009.
86. Guha, Ranjan Kumar et al: National Workshop Report on Process and Findings of Local level Poverty Monitoring, System; BARD, Comilla, 2007.
87. Habibulla, Md: A Co-operative Study of the Performances of TCCA's; Kotbari-Comilla, 1978.

88. Habibullah, Md. et al: Marketing of Paddy: A Situational Analysis; BARD, Comilla, 1999.
89. Habibullah, Md: Farm Management Survey in Comilla, Sadar Thana; BARD, Comilla, 1991.
90. Hamid, Dr. A et al: Technique of Overcoming Rice Yield Stagnancy; BARD, Comilla, 2002.
91. Hamid, Dr. Md. Abdul: Factor in Environment; BARD, Comilla, 2004.
92. Hamid, Dr. Md. Abdul: Performance Evaluation of Low-Cost Deep Tubewell Technology; BARD, Comilla, 2003.
93. Hasan, Sarwar: Co-operative Based Primary Health Care Experiment; BARD, Comilla, 1993.
94. Hoq, M. Ameerul: Five Years of Workmen's Co-operative: A Case Study; BARD, Comilla, 1965.
95. Huq, Anwarul: Costs and Returns: A Study of Irrigated Crops; BARD, Comilla, 1968.
96. Huq, M. Ameerul: Exploitation and the Rural Poor; BARD, Comilla, 1978.
97. Huq, M. N: Conference of Chairmen and Secretaries of Multipurpose Co-operative Societies; BARD, Kotbari-Comilla, 1959.
98. Huq, M. Nurul: Village Development in Bangladesh; BARD, Comilla, 1978.
99. Huq, Md. Lutful: BARD, Journal, Vol-7, No-2; BARD, Comilla, 1978.
100. Husain, Saadat: Imvolvement of Educated Womenof Bangladesh in Agriculture Activities; BARD, Comilla, 1988.

101. Hussain, Delwar and Gupta, Debebrata Datta: Rural Education and Youth Programme in Comilla; BARD, Comilla, 1973-78.
102. Hussain, Dr. Saadat et al: Poverty Alleviation in Bangladesh: Coverage and Nature of Government and NGO Programme; BARD, Comilla. 1998.
103. Hussain, M. Z: How to Organise Group for Pump Irrigation; Kotbari Comilla, 1966.
104. Hussain, Saadat: Villagers Struggle for Survival During Flood: A Story from Karaikandi; BARD, Comilla, 1989.
105. Hussain, Shirin et al: The Union Parishad: A study on Its Role in Development Administration; BARD, Comilla, 1996.
106. Hye, Abdul Hasnat and Quddus, M.A: Community Participation: Case Studies of Population and Health Programme in Bangladesh; BARD, Comilla, 1990.
107. Hye, Hasnat Abdul et al: Flood-1984; BARD, Kotbari-Comilla, 1986.
108. Hye, Hasnat Abdul: Dateline Gram Bangla: Notes from Rural Bangladesh; Kotbari-Comilla, 1986.
109. Hye, Hasnat et al: Village Studies in Bangladesh; BARD, Comilla, 1985.
110. Illah, S.M: Farmers knowledge on Modern Agriculture and Adoption of Improved Practice; BARD, Comilla, 1974.
111. Illah, S.M: The Journal of Rural Development, Vol-26; BARD, Comilla. 1996
112. Islam, Azizul: Intergration of Tax Planning into Development planning. The Case of Bangladesh ESCAP; Bangkok, 1982.
113. Islam, F. A. M. Nurul: Socio-Economic Study of Rice Sheath Blight Disease; BARD, Kotbari- Comilla, 2005.

114. Islam, F.A.M Nurul, et al: Shrimp Cultivation in Fresh Water Ponds: Problem and Projects; BARD, Comilla, 2002.

115. Islam, F.A.M. Nurul et al: Far Management Survey in Comilla Sadar Thana 1996-97; BARD, Comilla, 2001.

116. Islam, F.A.M. Nurul: Livestock and Poultry in Rural Area; BARD, Comilla, 1984.

117. Islam, F.A.M. Nurul: Livestock as a Component of Rural Development; BARD, Comilla, 1999.

118. Islam, M.A: Pilot Family Planning Action Research Report; BARD, Comilla, 1965.

119. Islam, Md. Shafiqul: Sustainable Livelihoods of Rural Community Through Comprehensive Programme of Bangladesh Academy for Rural Development; BARD, Comilla, 2004.

120. Islam, Rafiqul: Human Resource Development in Bangladesh; National Institute of Local Govt. 1990.

121. Islam, Serajul: The Story of Ten Model Farmers; BARD, Kotbari-Comilla, 1963.

122. Jahangir, B.K: Local Action for Self Reliant Development, CSS; Dhaka University Press, 1979.

123. Jashaimuddin, M. et al: Common Property Resources and Their Management; BARD, Comilla, 1999.

124. Kabir, M. Khairul et al: Impact of Radio and Television Programme on Rural People: A Case Study of Three Villages; BARD, Comilla, 1994.

125. Kabir, Nurun Nahar: Impact of Income Eduction, Nutrition and Family Planing; BARD, Comilla, 1996.

126. Karim, Abdul And Rahman, Md. Mizanur: Governance in Union Parishad of Bangladesh: Problems and Prospect; BARD, Comilla. 2008.

127. Karim, Abdul et al: Comprehensive: Village Development Co-operative Society; BARD, Comilla. 2003.

128. Karim, M. Rezaul and Begum, Nurun Nahar: Time Management in Rural Household: Situation in A Comilla Village; BARD Comilla, 1991.

129. Karim, M. Rezaul: Family Planning Programme: A study on the Recorded Clint of Rural Bangladesh; BARD, Comilla, 1980.

130. Karim, Md. Abdul: The Working of Upazila Parishad In Bangladesh: A Case Study of Dumki Upazilla; BARD, Comilla, 2012.

131. Karim, Md. Rezaul: The Journal of Rural Development, Vol-30; BARD, Comilla, 2000.

132. Kashem, Mohammad Mir et al: A Comparative study of Comprehensive Village Development Cooperative Societies and Traditional; BARD, Comilla, 2011.

133. Kashem, Mohammad Mir: Effictiveness of Thana Training and Development Centre in Bangladesh; BARD, Comilla, 1995.

134. Kazi, Q.H: Potato Project Research Report; BARD, Comilla, 1969.

135. Kazi, Q.H: Report on Chisty and Abhoy Asram Seed Multiplication Programme;
BARD, Comilla, 1969.

136. Khan, A.R: Poverty and Inequality in Rural Bangladesh, in Poverty and landless in Rural Area; ILO, GENEVA, 1976.

137. Khan, Akhter Hameed: Akhter Hameed Khan at the Third Women's Rally Held on March 6, 1966; BARD, Comilla, 1967.
138. Khan, Akhter Hamid: 1st Annual Report 1959-60; BARD, Comilla, 1960.
139. Khan, Akhter Hamid: The Workshop of Akhter Hamid khan, Vol-1; BARD 1965
140. Khan, Ali Akhter: Rural Credit Programme of Agriculture Co-operative Federation; BARD, Comilla, 1971.
141. Khan, Tanvir Ahmed et al: Rural Institutions and Enterprise Development; BARD, Comilla, 1998.
142. Khatun, Sharifa: Feeder School Experimental Programme, Annual Report; BARD, Comilla, 1966.
143. Kreitner, Robert: Management; Houghton, Minfflin Co. Boston, 1989.
144. Mabud, M. A: Woman Status at the Household Level in Rural Bangladesh; The Journal of Social Development.Vol. No. 1 June, 1984.
145. Majumdar, A. Mannan: Reclamation of Derelict tank Project, Annual Report; BARD, Comilla, 1978.
146. Mannan, M. A: Communication and Planned Change in Rural Bangladesh; BARD, Comilla, 1977.
147. Mannan, M. A: Intensive Family planning Information and Service Delivery Campaign; BARD, Comilla, 1976.
148. Mannan, M.A: The Comilla Pilot Projet in Family; BARD, Comilla, 1967.
149. Marun, M. Elizabeth: Woman in Foodwork in Bangladesh; United States Agency for International Development, 1981.

150. Miah, Md. Abdus Samad: The late life Story: Nutrition Securities and Empowering Status Elderly People in Rural Bangladesh: A Case of Four Villages; BARD, Comilla, 1999.
151. Mian, Md. Abdur: Costs and Returns of Amon Cultivation 1976; BARD, Comilla, 1977.
152. Mohsen, A.K.M: Evaluation of the Thana Irrigation Programme in East Pakistan; BARD, Comilla, 1969.
153. Mohsen, A.K.M: Report on Rural Public Works Programme, Organised by the Kotwali Thana Council of Comilla District; BARD, Comilla, 1962.
154. Munshi, Shisir Kumar et al: Impact of Crop Diversification Programme in Some Selected Areas in Bangladesh; BARD, Comilla, 2003.
155. Munshi, Shisir Kumar et al: Kharif Vegetable Cultivation in Some Potential Growing Area of Comilla; BARD, Comilla, 2002.
156. Nagpaul, Dr. Hans: Analysis of Social Work; Sage Publication, Vol. 36, 1993.
157. Nathan, R. Ctal: Bangladesh Bank Agricultural Credit Study Draft Final Report; Washington DC. 1979.
158. Paul, Jillur Rahman: Understanding the Effectiveness of Communication Media and Messages used by CARE to Build up Awareness on HIV/AIDS; A Study on High Risk People at Rajshhi, BARD, Kotbari-Comglla, 2008.
159. Paul, Jillur Rahman: Understanding the Effectiveness of Communication Media and Messages used by CARE to Build up Awareness on HIV/AIDS; A Study on High Risk People at Rajshhi, BARD, Kotbari-Comglla, 2008.

160. Pfiffner, j. Manad, Sherwood, F. B: Administrative Organization, Prentic Hall of India; New Delhi, 1964.

161. Qadir, S.A: Village Dhanishwar: Three Generations of Man-land Adjustment in a Bangladesh Village; BARD, Comilla, 1991.

162. Quadir, Md. Abdul: The Functions of Village Court in Bangladesh; BARD, Kotbari-Comilla, 1995.

163. Quddus, M.A: Evaluation of Primary Health Care and Midwifery Service Under the VCDP; BARD, Comilla, 1988.

164. Quddus, M.A: Primary Teachers Camp. Comilla V-AID Development Area; BARD, Comilla, 1960.

165. Quddus, Md, Abdul: The Journal of Rural Development, Vol-27; BARD, Comilla, 1997.

166. Quddus, Md. Abdul et al: Participating of Women in local Government Institute; BARD, Comilla, 2001.

167. Quddus, Md. Abdul: Employment and Income Raising for the Rural Poor Through Family Entrepreneurship; BARD, Kotbari-Comilla, 1977.

168. Quddus, Md. Abdul: Vaccination Coverage and Child Survival and Development Situation; BARD, Comilla. 1995.

169. Rahim, A: Amon Crops Survey in Comilla Kotwali Thana; BARD, Comilla, 1977.

170. Rahim, S.A: A Comparative Study of Improve and Country Method of Paddy Cultivation in Comilla Development Area; BARD, Comilla, 1960.

171. Rahim, S.A: Farmer’s Opinion on Selected Topics; BARD, Comilla, 1970.

172. Rahman, Atiur: Rural Power Structure: A Study of local level leaders in Bangladesh. BBI; Dhaka, 1985.

173. Rahman, Mahmudur: Development of Agriculture Marketing; BARD, Comilla, 1973.
174. Rahman, Mahmudur: Livestock Population: A survey in Comilla Katwali and Chandina Thana; BARD, Comilla, 1978.
175. Rahman, Md. Abdur, Nutritional Status of Children in Comilla, BARD, Comilla, 1983.
176. Rahman, Md. Ataur and Ahsan, Dr. Kamrul: Local Level Governance in Input Delivery; BARD, Comilla, 2012.
177. Rahman, Mizanur and Roy, Mihir Kumar: Comprehensive: Village Development Programme: An Institutional Analysis; BARD, Comilla, 2004.
178. Rahman, Mohibbur: Pilot Project on Mechanized Paddy Drying: Evaluation Report 1975-79; BARD, Comilla, 1980.
179. Rahman, Mohibbur: Use of Diesel and Electrically Operated Pumps for Irrigation in Comilla Kotwali Thana; BARD, Comilla, 1976.
180. Rahman, Syed Aminur et al: BARD 46th Annual Report; BARD, Comilla, 2005.
181. Raj, Hans: Principle of Administration; 1989.
182. Roy, Dr. Mihir Kumar: The Journal of Rural Development, Vol-33; BARD, Comilla, 2006.
183. Roy, Dr. Mihir Kumar: The Journal of Rural Development; Kotbari-Comilla, 2007.
184. Roy, Jayanta Kumar: Organising Villagers for Self Reliance: A Study of Deedar in Bangladesh; BARD, Comilla, 1983.
185. Roy, Mihir Kumar et al: Generation of Employment Through Small Farmers Development project; BARD, Comilla, 1999.

186. Roy, Mihir Kumar et al: Linkage Between GOVTs and NGOs in Rural Credit: A Study of Some Credit Programmes in Bangladesh; BARD, Comilla, 2011.

187. Rue, Leslie W. and Byars, Loyd L: Management, Theory and Applications; Richard, D. Irwin, Homewood, 1983.

188. Sarwar, Hasan and Akhter, Nasima: Social Mobilization for Education with Emphasis on Role of Food for Education and Female Stipend Programme; BARD, Comilla, 2007.

189. Sarwar, Hasan and Dr.Karim Rezaul: Technologies on Health and Nutrition of Rural Women; BARD, Kotbari Comilla, 1989.

190. Sarwar, Hasan et al: Impact of Micro-Credit on Food Consumption and Nutrition Status of Selected Rural poor; BARD, Comilla, 2003.

191. Sarwar, hasan: Basic Needs and Ecology: Baseline Survey of Village of Bangladesh; BARD, Comilla, 1995.

192. Sarwar, hasan: Impact of Poverty Allevation Programme on Health, Nutrition and Family Planning: A Case of Six Programme Villages; BARD, Comilla, 1998.

193. Sattar, M. Gulam: The Journal of Rural Development; BARD, Comilla, 1988.

194. Saukhder, M. M: The Welfare State; Deep and Deep Publications, New Delhi, 1985.

195. Saxena, R. C. and Saxena, S. R: Labour Problems and Social Welfare; Luck Know, India 1984.

196. Sharifullah, A.K. et al: Brick Making and Its Effects on Agriculture land; BARD, Comilla, 1991.

197. Sharifullah, A.K. et al: Status of Minor Irrigation Technology use in Bangladesh; BARD, Comilla, 2002.

198. Sharifullah, Dr. A.K. and Chowdhury, Newaz Ahmed: The Journal of Rural Development, Vol-37; BARD, Comilla, 2012.
199. Shirifullah, Dr. and Guha, A.K. Ranjan Kumar: 51th Annual Plan (2009-10); BARD, Comilla, 2010.
200. Solaiman, M. et al: A Review of TVD Programme; BARD, Comilla, 1980.
201. Solaiman, M. The Journal of Rural Development, Vol-25, BARD, Comilla, 1995.
202. Sultan, k. M. Tipu: The Works Programme in Comilla: A Case Study; BARD, Kotbari-Comilla, 1968.
203. Sultan, K.M. Tipu: Planning, Implementation and Evaluation of Rural Works Programme in Bangladesh; BARD, Comilla, 1977.
204. Sultan, K.M. Tipu: Politics and Development in Transitional Societies, BARD, Comilla, 1985.
205. Sultan, K.M. Tipu: Problem of Rural Administration in Bangladesh; BARD, Comilla, 1974.
206. White, L. D: Introduction to the Study of Public Administration; The Ronald Press Company, New York, 1967.
207. æYouth is Wealth, Youth is Future," Department of Youth Development; Ministry of Young and Sports, Dhaka, 2007.
208. Zahid Dr. S.J Anwar et al: BARD 47th Annual Report; BARD, Comilla, 2006.
209. Zahid S.J. Anwar Ph.D. Dasgupta, Swapan Kumar Ph.D. and Paul Dr.Jillur Rahman: Value Chain Analysis of Agricultural Commondities in Bangladesh; BARD, Comilla, 2012.
210. Zahid, S.J Anwar: Rural Development Planning and Project Management in Bangladesh; BARD, Comilla, 2010.

211. Zahid, S.J. Anwar: Development Planning and Project Management in Bangladesh; BARD, Comilla, 1993.

212. Zaidi, S.M. Hafeez: A Manual for Rural Public Works; BARD, Comilla, 1962.

213. Zaidi, Wiqar Hussain: A survey of Attitude of Rural Population Towards Family Planning; BARD, Comilla, 1961.

214. Zastrow, Charls: Itroduction to Social Welfare Institutions, Social Problems Services and Current Issues; The Dorsey Press, Illnois, 1982.

পরিশিষ্ট-ক (২)

তথ্য পঞ্জী

১. দত্ত, অম্লান, পল্লী ও নগর, আনন্দ পাবলিকেশন, ১৯৮৩।

২. দাশ, বিষ্ণু ও দাশ, উত্তম কুমার, মৎস্য সম্প্রসারণ শিক্ষা, বাংলা একাডেমী, ২০০৭।

৩. দাশগুপ্ত, ড. স্বপন কুমার ও আক্তার, নাছিমা, পল্লী উন্নয়ন, বার্ষিক জার্ণাল, জুলাই-২০০৯, ১৩ তম সংখ্যা, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০৯।

৪. গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ ছাত্রীদের কৃষি ও উৎপাদন কাজে অংশগ্রহণ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৬।

৫. গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, যুব কর্মসূচীর বার্ষিক প্রতিবেদন (৫ম), ১৯৯২। ৭৫। বারি, ফজলুল, বার্ষিক প্রতিবেদন (১৯৯১-৯২), কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৯৪।

৬. গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, কুমিল্লা জেলা সবুজ কর্মসূচী, বার্ড, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৭৬।

৭. গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৯।

৮. গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কৃষি প্রকল্পঃ প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৫।

৯. হেনা, হাছনা, দক্ষিণ কালিকাপুর মহিলা সমবায় সমিতি, বার্ড, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৮৪।

১০. হোসেন, মোতাহার, বাংলাদেশ উন্নয়ন প্রশাসন, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮।

১১. হোসেন, মাহবুব, খামার আয়তন, বর্গা ব্যবস্থা এবং ভূমির উৎপাদিকা বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা ১ম খন্ড, বাউগ্রপ্র, ১৯৮০।

১২. হোসেন, মুহম্মদ মুদাসসির, মুসলিম প্রশাসন ব্যবস্থার ক্রম বিকাশ, রাজশাহী প্যাভিলিয়ন, ১৯৭৯।

১৩. বেগম, শওকত আরা, বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ব্যবস্থায় পরিবার পরিকল্পনাঃ কুমিল্লার তিন উপজেলার পরিস্থিতি, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৮।

১৪. বেগম, সালেহা ও কবীর, এম. খায়রুল, বার্ড, ৩০তম প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৯।

১৫. হোসেন, শিরিন, ইউনিযন পরিষদ ও ভোটারদের ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৪।

১৬. চৌধুরী, মাসুদুল হক, পোনা মাছের চাষঃ কুমিল্লা অঞ্চলের একটি সমীক্ষা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৫।

১৭. চৌধুরী, মাসুদা আক্তার, সহজ সেলাই শিক্ষা নির্দেশিকা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৪।

১৮. চৌধুরী, জুলফিকার হায়দার ও গুপ্ত, দেবব্রত দত্ত, ইরি-২০ কর্মসূচীতে ছাত্রদের অংশগ্রহণ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৪।

১৯. চৌধুরী, ড. মাসুদুল হক, পল্লী উন্নয়ন, বার্ষিক জার্ণাল, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০৬।

২০. আকাশ, এম.এম, গ্রামীণ সমাজের স্বরুপ- একটি সমাজ নিরীক্ষণ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৩।

২১. আসাদুজ্জামান, মোঃ, গ্রামীন সমাজ বিজ্ঞান, ইউরেকা বুক হাইজ, ২০০১।

২২. আহমেদ, তোফায়েল ও দাস, রাখাল চন্দ্র, অংশ গ্রহণমূলক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনাঃ সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর দ্বাদশ বার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৪।

২৩. আহমেদ, তোফায়েল, সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীঃ কুমিল্লা সমবায়ের নবতর প্রাতিষ্ঠানিক পুর্নগঠন, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ২০১০।

২৪. আহমেদ, তোফায়েল, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীর পটভূমি, নীতি ও কৌশল, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৩।

২৫. আহমেদ, বদরুদ্দিন ও অন্যান্য, থানা সেচ কর্মসূচীর মূল্যায়ন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭২।

২৬. আহমেদ, বদরুদ্দিন, কৃষি সমবায়, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৩।

২৭. আহমেদ, সালেহ উদ্দিন, রুপালী ফসলের চাষ, বার্ড, কুমিল্লা ১৯৮৭।

২৮. আহমেদ, সালেহ উদ্দিন, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত গ্রাম সমূহে মাছ চাষের অবস্থা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৭।

২৯. আহসান, ড. কামরুল ও গুহ, রঞ্জন কুমার, পল্লী উন্নয়ন, বার্ষিক জার্ণাল, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০৮।

৩০. আজাদ, লেলিন, ভারতীয় সমাজতন্ত্র ও মুঘল আমলে বাংলার কৃষি কাঠামো, ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৯।

৩১. নবী, প্রফেসর মোহাম্মদ নূর, বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন কাল থেকে ১৭৯৫, অ. আ. প্রকাশনী, ২০০৫।

৩২. ইমাম, হাসান, উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন প্রসঙ্গ (সম্পাদিত), প্রাজ্ঞমুখ, ১৯৯৮।

৩৩. ইসলাম, মোঃ নূরুল, প্রবীণ সমস্যা ও আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস, বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত; প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা, ২০০৪।

৩৪. ইসলাম, মোঃ নূরুল, বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও সমাজসেবা কার্যক্রম, ইসলাম পাবলিকেশন্স, ২০০৭।

৩৫. ইসলাম, মোঃ শফিকুল ও হাসান, কামরুল, পল্লী উন্নয়ন, বার্ষিক জার্ণাল, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০৭।

৩৬. ইসলাম, মোঃ সফিকুল ও মুন্সী, ড. শিশির কুমার, পল্লী উন্নয়ন, বার্ষিক জার্ণাল, জুলাই-২০০৯, ১৪ তম সংখ্যা, বার্ড, কুমিল্লা, ২০১০।

৩৭. ইসলাম, আ. ফ. ম. নূরুল ও কামাল মোঃ মোস্তফা, সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বার্ষিক প্রতিবেদন, জুলাই- ১৯৯২, জুন-১৯৯৩।

৩৮. ইসলাম, আ.স.ম. নূরুল ও রহমান, মুহম্মদ হাবিবুর, সমাজকল্যাণ নীতি ও কর্মসূচী, বইপত্র (৩য় সংস্করণ), ২০০২।

৩৯. ইসলাম, ফ. আ. ম. নূরুল ও কামাল, মোঃ মোস্তফা, সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বার্ষিক প্রতিবেদন, জুলাই-১৯৯২, জুন- ১৯৯৩, ১৯৯৪।

৪০. ইসলাম, সিরাজুল, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থা বিন্যাস, কথা বিচিত্রা, ১৯৭৮।

৪১. ইয়াসমিন, রোমা গৃহপালিত পশু পাখি পালন ও চিকিৎসা, জনতা, ২০০৭।

৪২. উমর, বদর উদ্দিন, বাংলাদেশের কৃষক ও কৃষক আন্দোলন, জাতীয় গ্রন্থ কেন্দ্র, ১৯৮৫।

৪৩. উল্যাহ, ডা. এ. কে. এম. জাফর, আর্সেনিক রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মডিউল, ঢাকাঃ কনভেনশনাল এনসিডি প্রোগ্রাম,২০১২।

৪৪. উল্লাহ, মোঃ হাবিব, কোটসিসিএ লিঃ এবং এর প্রাথমিক সমিতির সাথে সম্পর্ক, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৮৮।

৪৫. ফয়জুল্লাহ,মোহাম্মদ,স্থানীয় সরকার উন্নয়ন, শান্তিনগর পাবলিশার, ১৯৮৭।

৪৬. বড়ুয়া, বিজয় কুমার, সিভিডিপিভুক্ত গ্রাম সমূহের অংশগ্রহনমূলক আর্থ সামাজিক সমীক্ষা,বার্ড, কুমিল্লা ২০০৫।

৪৭. বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, দারিদ্র্য পরিস্থিতির নিয়মিত ও ধারাবাহিক পরীক্ষণ প্রকল্প, ঢাকাঃ ২০০৯।

৪৮. বার্ড, কুমিল্লা, অধিক ফলনশীল শস্যের আবাদজনিত সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সেমিনার, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৫।

৪৯. বারি, ফজলুল, ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন প্রকল্পের বার্ষিক প্রতিবেদন ১৯৮৯-৯০, বার্ড, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৯১।

৫০. বারি, ফজলুল, পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষান্মাসিক পত্রিকা, ৫ম বর্ষ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯২।

৫১. বণিক, কৃষ্ণ রাম, খাদ্য, পুষ্টি ও শাক-সব্‌জি চাষ, মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

৫২. ভুঁইয়া, হোসন মোশারফ, আত্মকর্মসংস্থানে গ্রামীণ সম্পদ, টেকনোভায়া, ২০০৫।

৫৩. মজুমদার, আবদুল মান্নান, পুকুর সমবায় সমিতির উপবিধি, বার্ড, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৭৯।

৫৪. মজিদ, এম. এ. পশু সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্যতা বিমোচন, পাঠ্যপুস্তক বিতান, ২০০৬।

৫৫. মুহাম্মদ, আনু, বাংলাদেশের উন্নয়ন সংকট এবং এনজিও মডেল, প্রচিন্তা, ১৯৯৯।

৫৬. মুহাম্মদ, আনু, বাংলাদেশের এনজিওঃ দারিদ্র্য বিমোচনে এনজিও এর ভুমিকা, আগামী, ১৯৯৮।

৫৭. মুহাম্মদ, আনু, বাংলাদেশের গ্রামীণ সমাজ ও অর্থনীতি, মীরা, ১৯৮৫।

৫৮. ওবায়দুল্লা, এ.কে.এম. ও অন্যান্য, পল্লী শিশু ও দুস্থঃ পরিবার উন্নয়ন প্রকল্প, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৬।

৫৯. রহমান, মোঃ আতিকুর, বাংলাদেশের এনজিওএবং স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ, অনার্স পাবলিকেশন্স, ২০০৮।

৬০. রহমান, আখলাকুর, দারিদ্র্য নিরসনকারী বিকাশ, জার্নাল অব, ম্যানেজমেন্ট বিজনেস এন্ড ইকনমিক্স, ভল্যু-৫,৪, ঢাকা, বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৯।

৬১. রহমান, আসহাবুর, বাংলাদেশের কৃষি ভূমিকা, কৃষক সমাজ ও উন্নয়ন, ইউপিএল, ১৯৭৪।

৬২. রহমান, আতিউর, বাংলাদেশের উন্নয়নের সংগ্রাম, প্রর্বতক, ১৯৯১।

৬৩. রহমান, এ. এস. এম.আতীকুর, প্রবীণদের কল্যাণ বিধানে সমাজের নৈতিক দায়িত্ব; প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা (৩৬ বর্ষ), ১৯৯৯।

৬৪. রহমান, মাহবুব, উৎপাদন পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যপুস্তক বিতান, ২০০৬।

৬৫. রহমান, মাহবুবুর, কৃষি তত্ত্ব ও মাঠের শস্য, সানজানা, ২০০৯।

৬৬. রহমান, মাহমুদুর, কুমিল্লা থানার অ-কৃষি সমবায়, কোটবাড়ি- কুমিল্লা, ১৯৭৩।

৬৭. রহমান, মহিবুর, বাঁশের নলকূপ কি ও কেন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৭।

৬৮. রায়, সুকুমার, ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম, বুক ওয়ার্ড, ১৯৯৩।

৬৯. কবীর, এম. খায়রুল ও অন্যান্য, গ্রাম বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবর্তনে গণ মাধ্যম, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ২০০৬।

৭০. কবীর, এম. খায়রুল, পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর বার্ষিক জার্ণাল, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০১।

৭১. কবীর, এম. খায়রুল, বাংলাদেশের পল্লী এলাকার উন্নয়ন যোগাযোগ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৮।

৭২. কবীর, এম. খায়রুল, বার্ড, ২৮তম প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৭।

৭৩. কবীর, এম. খায়রুল, বার্ড, ২৯তম প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৮।

৭৪. শওকতুজ্জামান, সৈয়দ, বাংলাদেশের এনজিও ও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ, তাসলিমা পাবলিকেশন্স. ২০০৮।

৭৫. কাসেম, মোহাম্মদ মীর এবং অন্যান্য, নারীর আর্থ সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের সিভিডিপির প্র্রভাব, বার্ড, কুমিল্লা, ২০১২।

৭৬. কাসেম, মোহাম্মদ মীর, সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন কর্মসূচী (সিভিডিপি)ঃ বার্ষিক প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০৫।

৭৭. শামীম, মোহাম্মদ আবু, রায়, সুধেন কুমার, বাংলাদেশের সমাজ কাঠামো, বার্ড, কুমিল্লা, ২০১০।

৭৮. কাদির, সৈয়দা রওশন, মহিলা শিক্ষা ও গৃহ উন্নয়ন প্রকল্পের ৮ম সমাবেশ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৯।

৭৯. কুদ্দুস, মোঃ আব্দুল, সচিত্র ধাত্রী বিদ্যা প্রদর্শিকা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৯।

৮০. খান, আনছার আলী, গ্রাম আদালত আইন ও বিধিমালা, বুক হাউজ, ২০১০।

৮১. খান, আকতার হোসেন, আখতার হামিদ খান, পল্লী উন্নয়ন একাডেমী, কুমিল্লা, একটি স্মৃতিচারণ, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০০।

৮২. খান, আখতার হামিদ, জন্মনিরোধ সম্পর্কে ইসলামী মতবাদ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯১।

৮৩. খান, মনিরুল ইসলাম, কৃষক, সামাজিক সংগঠন ও বাংলাদেশের বিশেষ প্রেক্ষিত সমাজ নিরীক্ষণ,

৪৩, ঢাকা, ১৯৯২।

৮৪. সামাদ, ড. মুহাম্মদ, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র্যঃ স্বরূপ ও সমাধান, ডানা, ১৯৯০।

৮৫. সুলতান, কে.এম.টিপু, বিকেন্দ্রীকরণ স্থানীয় সরকারও সম্পদ আহরণ, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৮।

৮৬. হক, মোহাম্মদ লুৎফুল, পল্লী উন্নয়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা, বার্ড, কুমিল্লা, ২০০১।

৮৭. হক, মোঃ ফজলুল, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, ঢাকা: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, ২০১২।

৮৮. হামিদ, ড. মোঃ আবদুল এবং মুন্সী ড. শিশির কুমার, পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বার্ষিক জার্ণাল, ২০১১, (১৫ তম সংখ্যা),কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৯৪।

৮৯. হরিকেশী, হিতৈষী, কৃষি সম্প্রসারণ প্রতিবেদন, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৭৭।

৯০. ছাত্তার, মুহাঃ গোলাম, পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষান্মাসিক পত্রিকা, (১ম সংখ্যা),জানুয়ারী, ১৯৮৮।

৯১. ছাত্তার, মুহাঃ গোলাম, পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষান্মাসিক পত্রিকা, ৩য় সংখ্যা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৯।

৯২. ছাত্তার, মুহাঃ গোলাম, পল্লী উন্নয়নঃ বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন একাডেমীর ষান্মাসিক পত্রিকা, ৪র্থ সংখ্যা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৯।

৯৩. জাহিদ, এস. জে. আনোয়ার, সমবায় হিসাব ম্যানুয়েল, বার্ড, কোটবাড়ি-কুমিল্লা, ১৯৯০।

৯৪. জাহিদ, এস.জে আনোয়ার, প্রাথমিক সমিতির হিসাব রক্ষা ব্যবস্থা, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৮৭।

৯৫. জাহিদ,এস.জে আনোয়ার, স্থানীয় পর্যায়ে পরিবার পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, বার্ড, কুমিল্লা, ১৯৯৪।

৯৬. মিয়া, আবদুল হালিম, সমাজকল্যাণ পরিক্রমা, হাসান বুক হাউজ, ২০০০।

৯৭. মিঁয়া, মুহাম্মদ সেলিম ও হোসেন, মুহম্মদ মোশারফ, বাংলাদেশ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকর্ম ও এনজিও, প্রকাশক তারিক উল্লাহ তরুণ, ২০১০।

৯৮. সিরাজ, শাইখ, মাটি ও মানুষের চাষাবাদ, অনন্যা, ২০০৬।

৯৯. সিদ্দিকী, কামাল, বাংলাদেশের গ্রামীণ, দারিদ্র্যের রাজনৈতিক ও অর্থনীতি, গময়, ১৯৯২।

১০০ সিদ্দিকী, কামাল, বাংলাদেশর গ্রামীণ দারিদ্র্যঃ স্বরূপ ও সমাধান, ডানা, ১৯৯০।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-খ

(‘গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচীর ও বাস্তবতা’ শিরোনামে পিএইচ. ডি.গবেষণা কর্মের তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকার ভিত্তিক প্রশ্নমালা।)

পিএইচ.ডি. গবেষণা কাজে ব্যবহৃত প্রশ্নমালা।

গবেষণার শিরোনাম: ‘গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা।’

গবেষকের শিক্ষাবর্ষ: ২০১০-২০১১।

রেজি: নং : ১৭৪।

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ফরম নং-১

গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

চ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম: ২) ইউনিয়ন

৩) উপজেলা: ৪) জেলা:

২) ক) পেশা : খ) মাসিক আয় :

গ) পরিবারের লোকসংখ্যা:

১) পুরুষ : ২) মহিলা : ৩) মোট :

৩) ক) কৃষি জমির পরিমান:

১) আবাদী : ২) অনাবাদী : ৩) মোট আয় :

খ) অন্যান্য উপার্জন: ১) গবাদি পশু : ২) মাছ চাষ :

৩) ফলমূল : ৪) অন্যান্য :

৪) চিকিৎসা অবকাঠামোগত ব্যবস্থাপনা:

১) আধুনিক সরকারী/বেসরকারী চিকিৎসা গ্রহণের সুযোগ: ক) আছে খ) নেই

২) প্রত্যেকের শারীরিক অবস্থা: ক) সুস্থ খ) অসুস্থ

৩) অন্যান্য চিকিৎসা গ্রহণ:

ক) পানি পড়া, ঝাঁড় ফুঁক খ) হারবাল/আয়ুর্বেদ গ) হোমিও

৫) মা ও শিশুর জন্য সরকারি/বেসরকারী টিকাদান কর্মসূচী: ক) আছে খ) নেই

৬) দিনে তিনবার পেট ভরে খেতে পারেন কী? ক) হ্যা খ) না

৭) পরিবারের সদস্যদের পুষ্টিকর খাবার দিতে পারেন কী? ক) হ্যাঁ খ) না

৮) দারিদ্র্যতা ও পুষ্টিহীনতাই গ্রামে শিশু মৃত্যুহার বেশি: ক) হ্যা খ) না

৯) পানি পান :

ক) টিউবওয়েল খ) পুকুর/নদী নালা

গ) খালবিল ঘ) অন্যান্য

১০) শৌচাগার সুবিধা:

ক) পাকা খ) কাঁচা

গ) আধা কাঁচা-পাকা ঘ) উন্মুক্ত জায়গায়

১১) গ্রামে স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্ব উপনেবেশিক শাসন আমলের চেয়ে কেমন? ক) কম খ) বেশী

১২) আপনার গ্রামে যাতায়াত অবকাঠামো উন্নয়ন কীরূপ?

ক) রাস্তা ঘাট ১) পাকা সড়ক ২) কাঁচা সড়ক

৩) জলাশয়ে ব্রীজ/কার্লভার্ট/কাঠের সেতু/বাঁশের সাঁকো:

ক) আছে খ) নেই

১৩) শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়ন কেমন?

ক) প্রাথমিক: সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়/এবতেদায়ী মাদ্রাসা/কওমী মাদ্রাসা:

১) পাকা ২) কাঁচা ৩) আধাপাকা কাঁচা

খ) উচ্চ বিদ্যালয়: সরকারী/বেসরকারী/দাখিল মাদ্‌রাসা/
কওমী মাদ্‌রাাসা/উপানুষ্ঠানিক বিদ্যালয়:

১) পাকা ২) কাঁচা ৩)আধাপাকা কাঁচা

গ) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়/ডিগ্রী ও স্নাতকোত্তর মহাবিদ্যালয়/দাখিল, আলিম,
ফাজিল,কামিল মাদ্‌রাসা/ কাফিয়া, মেশকাত, দাওরা হাদিস কাওমী মাদ্‌রাসা:

১) পাকা ২) কাঁচা ৩) আধাপাকা-কাঁচা

১৪) বিদ্যুৎ অবকাঠামোগত সুবিধা:

ক) আছে খ) নেই গ) সামান্য আছে

১৫) গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতা সম্পর্কে ধারণা: ক) আছে খ) নেই

১৬) কর্মসূচী বাস্তবায়নক করেন:

ক) জনপ্রতিনিধি খ) সরকারী কর্মকর্তা গ)অন্যান্য

১৭) কর্মসূচী বাস্তবায়নকারীগণ: ক) সাধু ব্যক্তি খ) দুর্নীতিবাজ

১৮) স্বাধীনতাত্তোর থেকে অদ্যাবধি গ্রামোন্নয়ন:

ক) যথেষ্ট হয়েছে খ) সামান্য হয়েছে গ) মোটেই হয়নি

১৯) গ্রামের নদী নালা/খালবিল ও জলাশয় ভরাট, বন উজাড়, ইটের ভাটার কালো ধোঁয়া পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণ জানেন কী? ক) হ্যা খ) না

২০) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন উপনিবেশিক শাসন আমলের চেয়ে :

ক) বেশি খ) কম

২১) গ্রামের ধনী মানুষ দরিদ্র ভূমিহীনদের শোষণ করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২২) গ্রামের মানুষের অশিক্ষা ও অসচেতনতাই কী গ্রামোন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?

ক) হ্যা খ) না

২৩) গ্রামের মানুষের অধিকার সচেতনতা আছে কী? ক) হ্যা খ) না

২৪) গ্রামের ছেলে মেয়েরা সরকারী চাকুরী পান না, তাই অভিভাবকগণ সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে উৎপাদনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে ? ক) হ্যঁা খ) না

২৫) গ্রামের অসচেতন জনগোষ্ঠীর পরিকল্পিত পরিবার সম্পর্কে ধারণা :

ক) আছে খ) নেই

২৬) জনপ্রতিনিধি ও সরকারী কর্মকর্তা সাহেবদের দুর্নীতির কারণে গ্রামোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে:

ক) হ্যা খ) না

২৭) দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষমতা গ্রামের জনগণের:

ক) আছে খ) নেই

২৮) বিভিন্ন শোষণের কারণেই গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হচ্ছেনা: ক) হ্যা খ) না

২৯) গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রামের জনগণকে সংগঠিত হয়ে বৈধ আন্দোলনইএকমাত্র অবলম্বন:

ক) হ্যা খ) না

৩০) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবতার উপর মন্তব্য করুন:

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-২

গ্রামের একজন সাধারণ মহিলার সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রামঃ ২) ইউনিয়ন

৩) উপজেলাঃ ৪) জেলাঃ

২) গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কী? ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি যখন ছোট ছিলেন তখনের চেয়ে এখন গ্রামের কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) নির্বাচনের সময় প্রার্থীরা আপনার কাছে ভোট ভিক্ষা করতে আসেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৫) আপনি ভোটার হিসেবে একজন যোগ্য প্রার্থীকে কী ভোট দেন?

ক) হ্যা খ) না

৬) ভোটের সময় আপনি প্রার্থীদের কাছে কোন কিছু আবেদন করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৭) আপনার ভোটে নির্বাচিত একজন জনপ্রতিনিধি পরবর্তীতে আপনার আশা আকাঙ্খা পূরণ করেন কী ? ক) হ্যা খ) না

৮) আপনার গ্রামের জনপ্রতিনিধি গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কাজ করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৯) প্রতিবারই নির্বাচনের সময় জনপ্রতিনিধিরা গ্রামোন্নয়নের আশ্বাস দেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১০) আপনি কি নিজের বিবেক খাটিয়ে কাউকে ভোট দেন, না নিকট আত্মীয়দের কথামত ভোট দেন? ক) হ্যা খ) না

১১) ভোট দেয়ার সময় আপনাকে কোন প্রকার বক্‌শিস দেয়া হয় কী?

ক) হ্যা খ) না

১২) কোন্ ধরণের বক্‌শিস বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৩) যিনি বক্‌শিস দেন তিনি নির্বাচিত হতে না পারলে তা ফেরত চান কি?

ক) হ্যা খ) না

১৪) কেহ বক্‌শিস ফেরত দিতে না চাইলে তার বিরুদ্ধে কোন হয়রানিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় কী? ক) হ্যা খ) না

১৫) কোন কিছুর বিনিময়ে জনগণের ভোট নিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হলে তাঁরা কী গ্রামোন্নয়নের কোন কাজ করেন? ক) হ্যা খ) না

১৬) গ্রামোন্নয়নের জন্য কেমন লোককে ভোট দিতে হবে তা আপনি জানেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৭। কোন সালিশ দরবার, আবেদন নিবেদন নিয়ে গেলে জনপ্রতিনিধিরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৮) জন প্রতিনিধিদের গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে আপনি সহযোগিতা করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৯) আপনাকে কখনও কোন জনপ্রতিনিধি কর্মসূচী বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য করেছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২০) মহিলা হিসেবে এলাকার জনগণ আপনাকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

২১) আপনার এলাকার সার্বিক গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবতা সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করুন।

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম নং-৩

<u>গ্রামের একজন মড়লের সাক্ষাৎকার</u>

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতার নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম: ২) ইউনিয়ন

৩) উপজেলা: ৪) জেলা:

২) আপনার বয়স কত জানাবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৩) স্বাধীনতাপূর্ব ও স্বাধীনতাত্তোর গ্রামের অবস্থা সম্পর্কে আপনার কোন অভিজ্ঞতা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) আপনি কখনও কোন চেয়ারম্যান বা মেম্বারের কাছে গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচীর কথা জিজ্ঞেস করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৫) সরকার গৃহীত গ্রামোন্নয়নমূলক কোন্ কোন্ কর্মসূচী বাস্তবায়িত হয় তা আপনি জানেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৬) আপনি গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে অংশ নেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৭) গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে মেম্বার ও চেয়ারম্যানদের সাথে কেমন লোকজন চলাফেরা করে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৮) কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী জনপ্রতিনিধি ও সরকারী লোকদের সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৯) আপনার কী ধারণা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোপুরি গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হয়?

ক) হ্যা খ) না

১০) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় হচ্ছেনা এমন ধারণা আপনার মনে জাগ্রত হলে কোন প্রতিবাদ করেন কী? ক) হ্যা খ) না

১১) প্রতিবাদ করলে আপনার বিরুদ্ধে চেয়ারম্যান/ মেম্বারগণ কোন শাস্তিমুলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন কী? ক) হ্যা খ) না

১২) আপনি কী সরকারি অর্থের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে কখনও জনমত সংগ্রহ করেছে?

ক) হ্যা খ) না

১৩) গ্রামের জনগণ কী আপনার আহ্বানে সাড়া দিয়ে থাকেন?

ক) হ্যা খ) না

১৪) আপনি কী মনে করেন গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে গ্রামের সাধারণ মানুষের কোন ধারণা আছে? ক) হ্যা খ) না

১৫) সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে কী পূর্বের সরকারের গৃহীত কর্মসূচী বাতিল করা হয়?

ক) হ্যা খ) না

১৬) এমতাবস্থায় আপনার মতে গ্রামোন্নয়নে কী কোন বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়?

ক) হ্যা খ) না

১৭) নির্বাচনের পূর্বে কোন জনপ্রতিনিধি আপনাকে গ্রামোন্নয়নের কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন কী ? ক) হ্যা খ) না

১৮) নির্বাচনে পাশ করে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবার পর তাঁরা কী গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেন? ক) হ্যা খ) না

১৯) আপনার মতে, গ্রামোন্নয়নের জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২০) দয়া করে আপনার গ্রামে কতটুকু উন্নয়ন হয়েছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করুন:

উত্তরদানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-৪

গ্রামের মসজিদের একজন ইমামের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতার নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রামঃ ২) ইউনিয়ন

৩) উপজেলাঃ ৪) জেলাঃ

২) আপনি কত বছর যাবত গ্রামের এ মসজিদে ইমামতি করছেন জানাবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৩) এ গ্রামের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্পর্কে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) আপনি ২০ বছর পূর্বে গ্রামের যে অবস্থা দেখেছেন বর্তমানে কী তার কিছু ব্যতিক্রম লক্ষ্য করছেন? ক) হ্যা খ) না

৫) আপনার মসজিদের অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে কোন সহায়তা পেয়েছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৬) এ মসজিদে সরকারের মসজিদ ভিত্তিক কোন শিক্ষা কর্মসূচী চালু আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৭) সরকারের এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আপনাকে কোন পারিশ্রমিক দেয়া হয় কী ?

ক) হ্যা খ) না

৮) মসজিদ ভিত্তিক ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা জীবন চলার পথে কোন ভূমিকা রাখতে পারে কী ? ক) হ্যা খ) না

৯) প্রতি বছর কত জন ছাত্র/ছাত্রী এ মসজিদে অধ্যয়ন করে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১০) সরকারি সহায়তা ছাড়াও গ্রামের মানুষ আপনাকে কী বাড়তি কোন পারিশ্রমিক দেন?

ক) হ্যা খ) না

১১) আপনার উপার্জিত অর্থে সংসার চালানো কী কষ্ট সাধ্য হয়? ক) হ্যা খ) না

১২) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৩) সরকার এ গ্রামে অবকাঠামো উন্নয়ন মূলক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৪) কী কী ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন বলতে পারবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৫) কর্মসূচী কারা বাস্তবায়ন করেন, সে সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৬) মসজিদের ইমাম হিসেবে আপনার তো সমাজে সর্বস্তরের মানুষের গ্রহণযোগ্যতা আছে, সে দৃষ্টি কোণ থেকে আপনি কোন গ্রামোন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৭) আপনার মতে জনপ্রতিনিধিরা সরকারি বরাদ্দ যথাযথভাবে ব্যবহার করে গ্রামোন্নয়নে ভুমিকা রাখছেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৮) আপনার দেখা কোন কর্মসূচী সঠিকভাবে বাস্তবায়িত না হওয়ায় এমন কোন কর্মসূচী সম্পর্কে জনগণকে নিয়ে প্রতিবাদ করেছেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৯) রাস্তাঘাট নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ছাড়াও আর কোন্ কোন্ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে সরকার অর্থ বরাদ্দ দেন, সে ব্যাপারে আপনার কোন ধারণা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

২০) আপনার এলাকার বিভিন্ন ধর্মের মানুষ স্বাধীন ভাবে ধর্ম চর্চা করতে পারেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

২১) আপনার মতে গ্রামোন্নয়নে সরকারকে কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে দয়া করে মন্তব্য করুন:

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতারস্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম নং-৫

<u>গ্রামের একজন শিক্ষকের সাক্ষাৎকার</u>

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়ন:

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) আপনি যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা করছেন, তার নাম বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি কত বছর যাবত শিকক্ষতা করছেন দয়া করে বলবেন কি?

ক) হ্যা খ) না

৪) বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোর গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে একটু বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৫) আপনি কী কখনও আপনার এলাকার জনগণকে কেমন লোককে ভোট দেয়া উচিত, সে ব্যাপারে উৎসাহিত করেন? ক) হ্যা খ) না

৬) আপনার এলাকার শিক্ষার হার কেমন দয়া করে বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৭) শিক্ষকতার পাশাপাশি গ্রামের অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলতে কোন ভূমিকা পালন করেন কী ? ক) হ্যা খ) না

৮) আপনার এলাকায় সব মিলিয়ে কয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে, (সরকারি, বেসরকারি বা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) দয়া করে বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৯) আপনার প্রতিষ্ঠানে কী শুধু কৃষকের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পেয়ে থাকে?

ক) হ্যা খ) না

১০) গ্রামের অন্যান্য পেশাজীবি মানুষের সন্তানদের বিদ্যালয়ে আগমনের সংখ্যা বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১১) সরকার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে আপনার গ্রামে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করেছেন কী? ক) হ্যা খ) না

১২। কী কী অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেছেন, দয়া করে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৩) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে আপনি কখনও কোন প্রকল্প কমিটির সদস্য মনোনীত হয়েছেন? ক) হ্যা খ) না

১৪) সরকারি কর্মসূচী বাস্তবায়নে কোন অনিয়মে কখনও কী প্রতিবাদ করেছেন বা জনগণকে সংগঠিত করেছেন? ক) হ্যা খ) না

১৫) এহেন কর্মকান্ডের জন্য জনপ্রতিনিধি বা সরকারী কোন কর্মকর্তা আপনার বিরুদ্ধে প্রতিশোধকমূলক কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণের হুমকি দিয়েছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৬) আপনারর মতে গ্রামোন্নয়নের পথে কোন প্রধান বাঁধা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৭) গ্রামের জনগণের পক্ষে দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা কী অপরিরহার্য বলে আপনি মনে করেন? ক) হ্যা খ) না

১৮) আপনি কী মনে করেন কালো টাকার প্রভাবেই নির্বাচনে অসৎ জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হন?

ক) হ্যা খ) না

১৯) গ্রামের লোকজন কেমন লোককে ভোট দেবেন সে সম্পর্কে কোন পরামর্শ করতে আপনার কাছে আসেন কী? ক) হ্যা খ) না

২০) যতদিন না সৎ জনপ্রতিনিধি নির্বাচনে জয়লাভ করবে, ততদিন গ্রামোন্নয়ন পুরোপুরি ভাবে সম্ভব নয়, এ কথার সাথে আপনি কী একমত? ক) হ্যা খ) না

২১) আপনি কী কখনও গ্রামের শিক্ষিত সৎ লোককে নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন? ক) হ্যা খ) না

২২) শিক্ষক হিসেবে আপনি কী গ্রামোন্নয়নে সরকার গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখতে গ্রামে শিক্ষিত সচেতন শ্রেণী গড়ে ওঠা অনস্বীকার্য বলে মনে করেন?

ক) হ্যা খ) না

২৩) গ্রামোন্নয়নমূলক সরকার গৃহীত কর্মসূচী কারা বাস্তবায়ন করেন, এ সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা আছে কী? ক) হ্যা খ) না

২৪) কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি আপনার এলাকার কোন অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ বাস্তবায়নের জন্য গমন করেছেন কী? ক) হ্যা খ) না

২৫) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কী আপনাকে আশ্বাস দিয়ে কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেছেন?
ক) হ্যা খ) না

২৬) আপনি কী কী কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করেবেন- দয়া করে মন্তব্য করুন:

উত্তরদানের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-৬

<u>গ্রামের সাধারণ ওয়ার্ড মেম্বারের সাক্ষাৎকার</u>

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) আপনি কী দীর্ঘ দিন যাবত একজন জনপ্রতিনিধি হিসেবে ওয়ার্ড মেম্বারের দায়িত্ব পালন করছেন? ক) হ্যা খ) না

৩) কী কারণে ওয়ার্ডের জনগণ আপনাকে ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করেন, বলবেন কি?

ক) হ্যা খ) না

৪) আপনি কী জনগণের অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছেন?

ক) হ্যা খ) না

৫) আপনার দায়িত্ব পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা আছে কী? ক) হ্যা খ) না

৬) কেহ কোন সময় কী আপনার দায়িত্ব পালনে সহায়তা করেছেন?

ক) হ্যা খ) না

৭) প্রায়ই পত্রিকায় দেখা যায়, কোন কোন জনপ্রতিনিধি জনগণের জন্য সরকারী বরাদ্দকৃত অর্থ লুটপাট করেন, এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৮) স্বাধীনতার প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর কাছে এসেও গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হয়নি কেন, এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৯) আপনার মতে গ্রামোন্নয়নের জন্য কী আরও ব্যাপক ভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত?

ক) হ্যা খ) না

১০) নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে তা পরিচালনা করতে আপনার কেমন খরচ হয়েছে, বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১১) নির্বাচন কালীন সময় আপনি জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজকর্মের কোন প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকেন কী? ক) হ্যা খ) না

১২) কী ধরণের প্রতিশ্রুতি, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৪) আপনি কী পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার আশা রাখেন? ক) হ্যা খ) না

১৫) আপনার কী কোন আশ্রিত লোক আছে, যারা আপনাকে বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করেন ? ক) হ্যা খ) না

১৬) সহযোগিতাকারীগণকে আপনি কোন ধরণের সেলামী দিয়ে থাকেন কী? ক) হ্যা খ)না

১৭) আপনার কৃষি, অকৃষি জমির পরিমাণ কত, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৮) জমি থেকে উৎপাদিত ফসলের পরিমান কত, জানতে পারি কী? ক) হ্যা খ) না

১৯) কৃষি জমি ছাড়া আপনার কোন ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্য কোন আয় রোজগার আছে কী? ক) হ্যা খ) না

২০) ইউপি পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আপনার ভাল সম্পর্ক আছে কী? ক) হ্যা খ) না

২১) আপনার ওয়ার্ডের জনগণের জন্য সরকারী বরাদ্দ যথাযথভাবে প্রদান করেন কী? ক) হ্যা খ) না

২২) চেয়ারম্যান সাহেব আপনার ওয়ার্ডের জনগণের নির্ধারিত সরকারী বরাদ্দ যথাযথভাবে না দিলে আপনি কী কোন প্রতিবাদ করেন? ক) হ্যা খ) না

২৩) আপনি জানেন কী আপনার ওয়ার্ডের জনগণের জন্য সরকার কোন কোন খাতে বরাদ্দ দিয়ে থাকেন? ক) হ্যা খ) না

২৪)) আপনি যদি মনে করেন চেয়ারম্যান সাহেব আপনার এলাকার জনগণকে তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছেন, তখন এ সম্পর্কে সরকারের কাছে কী কোন প্রকার আবেদন নিবেদন করেন? ক) হ্যা খ) না

২৫) আপনি কত টাকা সরকারি ভাতা পান, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

২৬) আপনি কী মনে করেন স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদের ভাতার পরিমাণ বাড়ানো দরকার? ক) হ্যা খ) না

২৭) আপনার ওয়ার্ডের উন্নয়ন সম্পর্কে কিছু বলুন:

উত্তরদানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম নং-৭

সংরক্ষিত আসনের একজন মহিলা মেম্বারের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) আপনি কয়টি ওয়ার্ডের সংরক্ষিত আসনের নির্বাচিত মহিলা জনপ্রতিনিধি, বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৩) নারীর ক্ষমতায়নে জনপ্রতিনিধি হিসেবে কী কী কাজ করেছেন, জানাবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) আপনার কাজে গ্রামীণ নারী সমাজ সন্তুষ্ট কী?

ক) হ্যা খ) না

৫) আপনি এ সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে কত বার জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৬) আপনি একাধিকবার নির্বাচিত হয়ে থাকলে কারণ উল্লেখ করবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৭) গ্রামের মহিলারা সাধারণত সহজ, সরল জীবনযাপনকরে। নারীর প্রতিনিধি হিসেবে আপনি কী এসব নারীদের যথাযথ নেতৃত্ব দিতে পারেন ? ক) হ্যা খ) না

৮) পুরুষ শাসিত গ্রামীণ সমাজে মহিলা হিসেবে আপনার দায়িত্ব পালনে কোন প্রকার বাধাঁ-বিঘ্ন ঘটে কী? ক) হ্যা খ) না

৯) এমন কোন ঘটনা ঘটে থাকলে কী ধরণের তা বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১০) আপনার স্বামী কী গ্রামীণ মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য আপনাকে অনুমতি দিয়েছেন?

ক) হ্যা খ) না

১১) মুসলিম সমাজ ব্যবস্থায় আপনার এমন নেতৃত্বকে গ্রামের মানুষ কী মূল্যায়ন করেন?

ক) হ্যা খ) না

১২) জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন পুরুষ মেম্বার একটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচন করে নির্বাচিত হয়ে থাকেন, কিন্তু আপনাকে তিনটি ওয়ার্ডের জনগণের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হতে হয়, কারণ জানাবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৩) এমন প্রতিদ্বন্দ্বীতাকে আপনি নারী সমাজের প্রতি বৈষম্য হিসেবে দেখেন?

ক) হ্যা খ) না

১৪) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন মহিলা মেম্বারের বাড়তি ভাতা প্রাপ্তির সুবিধা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৫) নারী সদস্য হিসেবে চেয়ারম্যান সাহেব আপনাকে ভাল দৃষ্টিতে দেখেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৬) আপনি যেহেতু তিনটি ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন, এক্ষেত্রে আপনার জন্য সাধারণ ওয়ার্ড মেম্বারদের চেয়ে বরাদ্দ বেশী থাকে কী? ক) হ্যা খ) না

১৭) বাড়তি সুবিধা বা ন্যায্য অধিকারের জন্য আপনি কী কখনও কোন প্রতিবাদ করেছেন?

ক) হ্যা খ) না

১৮) আপনি জানেন কী সরকার কোন্ কোন্ কর্মসূচীর আওতায় আপনার ওয়ার্ডের উন্নয়নে বরাদ্দ দিয়ে থাকেন? ক) হ্যা খ) না

১৯) চেয়ারম্যান সাহেবের অনুকম্পায় যা পান তা নিয়েই কী আপনি সন্তুষ্ট থাকেন?

ক) হ্যা খ) না

২০) নারী জাগরণের জন্য আপনি কী আপনার সংরক্ষিত এলাকায় কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন?

ক) হ্যা খ) না

২২) আপনার গৃহীত পদক্ষেপ গুলোর কথা দয়া করে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২৩) আপনি জানেন কী গ্রামের নারী সমাজের উন্নয়ন ছাড়া গ্রামোন্নয়ন সম্ভব নয় ?

ক) হ্যা খ) না

২৪) আপনার নির্বাচনী এলাকায় নারী শিক্ষার হার কেমন বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

Dhaka University Institutional Repository

২৫) গ্রামের নারীর ক্ষমতায়নে আপনার ভূমিকা উল্লেখ করবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

২৬) গ্রামীণ নারী সমাজের উন্নয়নে সরকার কী কোন পৃথক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তকায়ন করেছেন? ক) হ্যা খ) না

২৭) সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে গ্রামের মেয়েদের কোটা ব্যবস্থা সম্পর্কে আপনার কী কোন ধারণা আছে? ক) হ্যা খ) না

২৮) আপনি কী গ্রামীণ মহিলাদের জন্য সরকারী চাকুরিতে আরও বেশী কোটা নির্ধারণের পক্ষপাতি?

ক) হ্যা খ) না

২৯) দয়া করে সার্বিক দিক বিশ্লেষণ করে আপনার এলাকার গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী ও বাস্তবতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন:

উত্তরদানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষরও তারিখ

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-৮

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) কত বছর যাবত আপনি এ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জানাবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি কতজন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে নির্বাচিত হয়েছেন বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) নির্বাচনে কত ভোটের ব্যবধানে নিকটতম প্রতিদ্বন্ধীকে হারিয়ে আপনি নির্বাচিত হয়েছেন তা আপনার মনে আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৫) সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার এবং সাধারণ ওয়ার্ডের মেম্বারগণ আপনাকে কোন প্রকার সহায়তা করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৬) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সংশ্লিষ্ট?

ক) হ্যা খ) না

৭) সরকারি দলের হলে কোন বাড়তি বরাদ্দ এবং বিরোধীদলের হলে কোন বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় কী?

ক) হ্যা খ) না

৮) সরকার আপনাকে কত টাকা ভাতা প্রদান করেন বলবে কী?

ক) হ্যা খ) না

৯) আপনার এলাকার উন্নয়নে সরকার কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন তা বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১০) আপনার নির্বাচনী এলাকায় বেসরকারী সংস্থা গুলো কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে বাস্তবায়ন করছেন কী? ক) হ্যা খ) না

১১) বেসরকারী সংস্থা গুলো কী ধরণের কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে দয়া করে বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১২) বেসরকারী সংস্থাগুলো গ্রামোন্নয়নের নামে গ্রামের মানুষকে শোষণ করে, এটা কী সত্যি কথা?

ক) হ্যা খ) না

১৫। এনজিও সংস্থা থেকে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করতে না পারলে অনেক হত দরিদ্র মানুষ তাদের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্চিত হয়, এ ব্যাপারে আপনি কী একমত?

ক) হ্যা খ) না

১৬) সরকারী কর্মসূচী গুলো আপনার পরিষদ না অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাস্তবায়ন হয়ে থাকে, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৭) অন্য কোন প্রতিষ্ঠান গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকলে তাতে স্বচ্ছতা কী প্রশ্নবিদ্ধ হয়? ক) হ্যা খ) না

১৮) কোন কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিঘ্নতা পরিলক্ষিত হলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে তখন আপনি কী কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন? ক) হ্যা খ) না

১৯) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন আপনি কী কখনও সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করেন?

ক) হ্যা খ) না

২০। কর্মসূচী বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারদের সাথে আপনার কী সুসম্পর্ক রয়েছে?

ক) হ্যা খ) না

২১) আপনি ইউনিয়ন পরেষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পূর্বের এবং বর্তমান উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের তুলনামূলক আলোচনা করবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২২) সংরক্ষিত মহিলা আসন থেকে নির্বাচিত মহিলা মেম্বারদের অর্থ বরাদ্দে আপনি কী ন্যায়পরায়নতা দেখিয়ে থাকেন? ক) হ্যা খ) না

২৩) আপনার সহায়তার ফলে গ্রামের মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়নের পথ কী উন্মুক্ত হয়েছে? ক) হ্যা খ) না

২৪) গ্রামোন্নয়নে নারী পুরুষের সম্মিলিত অবদানের কথা আপনি স্বীকার করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২৫) আপনার ইউনিয়নে নারীর সার্বিক উন্নয়নে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২৬) ইউনিয়ন পরিষদের বিচারক হিসেবে গ্রামীন জনগণের সালিশ দরবারের মাধ্যমে বিরোধ মীমাংসায় আপনি কী কোনরুপ ভূমিকা পালন করেন? ক) হ্যা খ) না

২৭) গ্রামীণ সালিশী বিরোধ যথাযথভাবে নিস্পত্তি না হওয়ায় আদালতে মোকদ্দমার জট দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনি কী একমত? ক) হ্যা খ) না

২৮) গ্রামীণ জনসাধারণের বিরোধ মীমাংসা না হওয়ায় এবং আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করে গ্রামের মানুষ জমিজমা ও সহায় সম্পদ বিক্রি করে মোকদ্দমার খরচ চালিয়ে থাকে। ফলে অর্থনৈতিকভাবে এসব লোক ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং গ্রামোন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। আপনার মতে এটি কী সত্য? ক) হ্যা খ) না

২৯) চেয়ারম্যান সাহেবদের পক্ষপাতিত্ব,উৎকোচ গ্রহণ সহ নানা ভাবে প্রভাবিত হওয়ায় গ্রামের মানুষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, মানুষের এমন ধারণা কী সঠিক ?

ক) হ্যা খ) না

৩০) তৃণমূল পর্যায়ের নেতাররা জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগসাজশে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ লুটপাট ও জোর করে প্রকল্প গ্রহণ করে নি্ম মানের উপকরণ দিয়ে নির্মাণ কাজ শেষ করে। এ ব্যাপারে কিছু বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৩১) আপনার মতে গ্রামোন্নয়নের জন্য কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করলে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে। মন্তব্য করুন:

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতা স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম নং-৯

উপজেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনের ভাইস চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়ন:

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) উপজেলার সংরক্ষিত মহিলা আসনের প্রথম ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আপনার অনুভুতি ব্যাখ্যা করবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৩। আপনার কাজের পরিধি কী শুধু মহিলা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট, না অন্যান্য ব্যাপারও তত্ত্বাবধানের এখতিয়ার আছে? ক) হ্যা খ) না

৪) গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

৫। আপনি ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর মহিলাদের জন্য কোন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন কী? ক) হ্যা খ) না

৬) গ্রামীণ মহিলাদের জীবনযাত্রার মান নিু হওয়ার কারণ আপনি জানেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৭) আপনি নির্বাচিত হওয়ার পূর্বে মহিলাদের জন্য কী কোন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? ক) হ্যা খ) না

৮) এখনও গ্রামের অশিক্ষিত, নিরীহ মহিলারা নানাভাবে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে, এ ব্যাপারে আপনি কী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? ক) হ্যা খ) না

৯) নির্যাতন রোধে গ্রামীণ মহিলাদের আপনি কী সংগঠিত করেছেন বা করবেন বলে মনে করেন?

ক) হ্যা খ) না

১০) ‘বিশ্বে যাহা কিছু আছে মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্ধেক তার নর’-জাতীয় কবির এ পংক্তিটিকে আপনি কী যথাযথ ভাবে মূল্যায়ন করেন?

ক) হ্যা খ) না

১১) নেপোলিয়ান বোনাপার্টের কথা মত, মেয়েদের শিক্ষিত করার ব্যাপারে আপনি কী কোন প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন? ক) হ্যা খ) না

১৩) ‘পুরষের পাশাপাশি নারীরা গ্রামোন্নয়নে ভূমিকা না রাখলে গ্রামীণ উন্নয়ন সম্ভব নয়’-এ উক্তিটির সাথে আপনি কী একমত? ক) হ্যা খ) না

১৪) মহিলাদের উন্নয়নে পৃথক ভাবে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করার এখতিয়ার আপনার আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৫) উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব এ ব্যাপারে আপনাকে কোন সহযোগিতা করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৬) উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহোদয়ের সাথে আপনার কাজের কোন সমন্বয় আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

১৭) আপনি গ্রামের দরিদ্র, নিরীহ মহিলাদের অবস্থার পর্যবেক্ষণ করতে কখনও গ্রামে যান কী?

ক) হ্যা খ) না

১৮) বিভিন্নভাবে নির্যাতিত গ্রামীণ মহিলারা আপনার কাছে কখনও বিচারের জন্য অভিযোগ নিয়ে আসে কী? ক) হ্যা খ) না

১৯) দৈনিক পত্রিকায় দেখা যায়, চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান সংরক্ষিত আসনের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানকে হেয় করে দেখে, গালিগালাজ করে, বিচ্ছিন্নভাবে দু’এক জায়গায় দেখা যায়, শারীরিক ভাবে নির্যাতনও করে, এ সম্পর্কে আপনার মত প্রকাশ করবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২০) যেখানে একজন নির্বাচিত মহিলা প্রতিনিধিই বৈষম্যের শিকার সেখানে গ্রামীন নারী উন্নয়নের প্রসার ঘটানো কী আপনার পক্ষে সম্ভব? ক) হ্যা খ) না

২১) গ্রামোন্নয়ন জন্য নির্ধারিত কর্মসূচীর বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন হয়না বলেই গ্রামোন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে, দয়া করে মন্তব্য করুন:

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

ফরম নং-১০

উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে আপনি কত দিন যাবত দায়িত্ব পালন করছেন, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৩) উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি হওয়ায় আপনি জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন এতে জণগনের বাড়তি কোন সুবিধা আছে কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) গ্রামোন্নয়নমূলক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের এখতিয়ার আপনার আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৫) আাপনি কী ধরনের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব করতে চান বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৬) আপনার সাথে উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেবের কাজের কোন সমন্বয় আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৭) উপজেলা চেয়ারম্যান সাহেব আপনার উন্নয়নমূলক কাজে কোন সহযোগিতা করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৮) উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সাথে আপনার কোন কাজের সমন্বয় আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৯) আপনি জনগণকে গ্রামোন্নয়নমূলক কাজের কোন অঙ্গীকার দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন কী? ক) হ্যা খ) না

১০) জনগণকে দেয়া অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করতে পেরেছেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১১) আপনার দায়িত্ব পালনে কি কোন বাধ্যবাধকতা আছে?

ক) হ্যা খ) না

১২) কার কাছে কী ধরণের জবাবদিহিতা করতে হয় বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৩) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য?

ক) হ্যা খ) না

১৪) সরকারী বা বিরোধী দলের সদস্য হলে কী কোন প্রকার সুবিধা-অসুবিধা পরিলক্ষিত হয় ?

ক) হ্যা খ) না

১৫) চেয়ারম্যান সাহেব সরকারী দলের এবং আপনি বিরোধীদলীয় লোক হলে আপনাকে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের সাথে তিনি শরিক করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৬) আপনি কী কখনও গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী পর্যবেক্ষণ করতে গ্রামে যান ?

ক) হ্যা খ) না

১৭) সরকার যে কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করেন বা করতে চান, সেক্ষেত্রে বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ কী অর্থ লুটপাট করেন, এতে আপনার কোন ধারণা আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৮) আপনি কী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে কখনও কোন প্রতিবাদ করেছেন?

ক) হ্যা খ) না

১৯) আপনার কাজের মাধ্যমে জনগণকে সন্তুষ্টি অর্জন করে পুনরায় কী ভাইসচেয়ারম্যান বা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার আশা রাখেন? ক) হ্যা খ) না

২০) আপনার উপজেলার গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সম্পর্কে দয়া করে কিছু পরামর্শ ও মতামত দিন।

উত্তর দানের জন্য ধন্যবাদ

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-১১

উপজেলা চেয়ারম্যানের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পিতা/স্বামীর নাম ....

গ) মাতার নাম ....

ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) আপনি কি কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত আছেন? ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি কী একাধিকবার উপজেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধির (চেয়ারম্যানের) দায়িত্ব পালন করছেন? ক) হ্যা খ) না

৪) আপনার উপর সরকারের গ্রামোন্নয়নমূলক কোন্ কোন্ কর্মসূচী বাস্তবায়নের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৫) আপনি কী নিজেই কর্মসূচী গুলো বাস্তবায়ন করেন? ক) হ্যা খ) না

৬) কর্মসূচী বাস্তবায়নে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কী? ক) হ্যা খ) না

৭) কেমন সমস্যা হয়, দয়া করে বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৮) আপনার কাজে বা আপনি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের কাজে কোন সহযোগিতা করেন কী? ক) হ্যা খ) না

৯) কর্মসূচী বাস্তবায়নে দুজনের মধ্যে কখনও সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয় কী?
ক) হ্যা খ) না

১০) মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখা যায়, উপজেলার চেয়ারম্যান ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের দ্বন্দের কারণে সঠিকভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়ন হচ্ছে না, সঠিক কী?
ক) হ্যা খ) না

১১) আপনার মতে এমন দ্বন্দ গ্রামোন্নয়নে কী প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে?
ক) হ্যা খ) না

Dhaka University Institutional Repository

১২) আপনার কর্তৃত্বাধীন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গুলো সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করতে পারেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৩) লোক মুখে শোনা যায় এবং পত্রিকায় দেখা যায় কর্মসূচী নিুমানের উপকরণ দিয়ে সম্পন্ন হওয়ায় অল্পদিনেই তা নষ্ট হয়ে যায়, এ ব্যাপারে আপনি কী একমত?

ক) হ্যা খ) না

১৪) গ্রামোন্নয়নমূলক যে কোন কর্মসূচী গ্রহণের পর তা বাস্তবায়নের কাজ কচ্ছপের গতিতে বছরের পর বছর যাবত চলতে থাকে, আপনি সত্যতা স্বীকার করেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৫) আপনি কী কোন সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন? ক) হ্যা খ) না

১৬) সরকার প্রদেয় মাসিক ভাতা বা অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গুলোর কথা বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

১৭) আপনি কী কখনও আপনার এলাকার গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীর বাস্তবতা দেখতে গ্রামে যান?

ক) হ্যা খ) না

১৮) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের গৃহীত কর্মসূচীর সাথে আপনার কর্মসূচীর কোন সংযোগ আছে কী? ক) হ্যা খ) না

১৯) আপনি আপনার নির্বাচনী এলাকার সংসদ সদস্য মহোদয়ের কাছ থেকে কোন সহযোগিতা পান কী? ক) হ্যা খ) না

২০) লোক মুখে শোনা যায় এবং পত্রিকায়ও মাঝে মাঝে দেখা যায়, মাননীয় সংসদ সদস্যগণ কর্মসূচীর কার্যক্রম কাউকে বাস্তবায়ন করতে না দিয়ে নিজের দলীয় লোকের মাধ্যমে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করেন? আপনার অভিমত বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২১) সরকার আপনাকে উপজেলা পরিষদ চালানো জন্য স্বতন্ত্রভাবে কার্যক্রম গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা কী যথেষ্ট? ক) হ্যা খ) না

২২) আপনাদের দায়িত্ব আরোও সম্প্রসারিত করার জন্য বিভিন্নভাবে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করে যাচ্ছেন ? এতে কী কোন সফলতা অর্জিত হয়েছে?

ক) হ্যা খ) না

২৩) স্থানীয় সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধিদেরই বাস্তবায়ন করা উচিত, আপনি কী তা মনে করেন? ক) হ্যা খ) না

২৪) মাননীয় সংসদ সদস্যদের কাজ কর্মসূচী বাস্তবায়ন নয়, সংসদেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত- এ ব্যাপারে আপনার যুক্তি দেখাবেন কী? ক) হ্যা খ) না

২৫) আপনি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর কী কী কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন, বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২৬) আপনি কি পুনরায় আপনার নির্বাচনী এলাকা থেকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার আশা রাখেন? ক) হ্যা খ) না

২৭) দয়া করে আপনার মতে কী কী কর্মসূচী গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করলে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হবে, মন্তব্য করুন:

উত্তর দানের জন্য আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ

ফরম নং-১২

জাতীয় সংসদের মাননীয় সাংসদের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদান সম্পূর্ণ গোপণীয় ও সংরক্ষণীয়)

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) নির্বাচনী এলাকা ....

গ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ....

ঙ) বয়স ....

ছ) স্থায়ী ঠিকানা ১) গ্রাম : ২) ইউনিয়নঃ

৩) উপজেলা : ৪) জেলা :

২) আপনার আদর্শের রাজনৈতিক দলের নাম বলবেন কি?

ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি কী একাধিকবার এ নির্বাচনী এলাকা থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন?

ক) হ্যা খ) না

৪) আপনি কী প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর চেয়ে ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন ?

ক) হ্যা খ) না

৫) দয়া করে আপনার গৃহীত গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী ও বাস্তবায়নের কথা বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৬) আপনি নির্বাচনের আগে জনগণকে দেয়া প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করতে পেরেছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৭) কোন কারণে গ্রামোন্নয়ন সম্ভব না হলে পরবর্তী নির্বাচনে পুনরায় গ্রামের জনগণের ভোট চেয়ে উন্নয়নের জন্য আশ্বস্ত করেন কী? ক) হ্যা খ) না

৮) কোন কোন জনপ্রতিনিধি সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর আর নির্বাচনী এলাকার গ্রাম-গঞ্জের মানুষের জীবন মানের চিত্র দেখতে গ্রামে গমন করেন না, আপনি কী এ কথার সাথে একমত? ক) হ্যা খ) না

৯) মাননীয় সাংসদগণের অনেকেই নির্বাচনী এলাকায় না গিয়ে শহর/রাজধানীতে থেকে বিলাস বহুল জীবনযাপন করেন, আপনি কী এ কথা সত্য বলে মনে করেন?

ক) হ্যা খ) না

Dhaka University Institutional Repository

১০) নির্বাচনী এলাকার জনগণকে প্রয়োজনে শহর/রাজধানীতে গিয়ে মাননীয় সাংসদগণের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়, আপনি কী এ কথা স্বীকার করেন ?

ক) হ্যা খ) না

১১) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত প্রতিনিধিদের বাস্তবায়ন করতে না দিয়ে সাংসদগণ দলীয় মদদ পুষ্ট লোকজনদের মাধ্যমে সম্পন্ন করেন, দয়া করে আপনার মতামত জানাবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১২) স্বাধীনতা অর্জন প্রায় অর্ধ শতাব্দীর কাছাকাছি, কিন্তু গ্রামের মানুষের দারিদ্র্যতার অভিশাপ এখনও কাটেনি, আপনি কী তা মনে করেন?

ক) হ্যা খ) না

১৩) বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে গ্রামোন্নয়নমূলক সহ পূর্বের সরকারের গৃহীত অন্যান্য কর্মসূচীও বাস্তবায়ন না করে নতুন সরকার তা অসম্পূর্ণ/বাতিল ঘোষনা করেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৪) রাজনীতিবিদদের পরমত অসহিষ্ণুতাই বাংলাদেশের উন্নয়নের পথকে স্থবির করে রেখেছে, এ কথা আপনি স্বীকার করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৫) ঠিকাদারগণ গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী নিুমানের উপকরণ দিয়ে নির্মাণ করার কিছুদিনের মধ্যেই ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ে, আপনি কী একথার সাথে একমত পোষন করেন ?

ক) হ্যা খ) না

১৬) সরকার গৃহীত কর্মসূচী বাস্তবায়নের দীর্ঘ সূত্রিতার কারণ দয়া করে বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৭) কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার দুর্নীতিবাজদের তথ্য জানার পরও তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় না, এব্যাপারে কিছু বলবেন কী ? ক) হ্যা খ) না

১৮) গবেষণায় দেখা যায়, বাংলাদেশের সর্বত্রই উন্নয়ন হয়েছে কচ্ছপের গতিতে, আর দুর্নীতি হয়েছে খরগোশের গতিতে, আপনার মতামত জানাবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৯) ধারণা করা হয়, গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে বিদেশী সাহায্যপ্রাপ্ত অর্থ সরকারী কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে বাস্তবায়নের ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে অনিয়ম হয়ে থাকে, এ সম্পর্কে কিছু বলবেন কী?

ক) হ্যা খ) না

২০) কখনও কখনও সরকার দলীয় ঠিকাদাররা কাজ পাওয়ার জন্য একজন অপর জনকে হত্যা পর্যন্ত করতে দ্বিধাবোধ করেনা, এ কথার সাথে আপনি একমত?

ক) হ্যা খ) না

মহামূল্যবান সময় নষ্ট করে গবেষণা কর্ম ফলপ্রশু করার জন্য তথ্য-উপাত্ত দেয়ায় আপনাকে আন্তরিক ভাবে ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-১৩

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের (ইউএনও) সাক্ষাৎকার

(উত্তরদাতার প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত এবং অভিমত সম্পূর্ণভাবে গোপণ রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে)।

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পদবী ....

গ) উপজেলা ....

২) আপনি কতদিন যাবত এ উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৩) গ্রামের মানুষের ভাগ্যান্নয়নে সরকার গৃহীত (নির্ধারিত) কর্মসূচী গুলো সম্পর্কে একটু বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৪) কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাথে আপনি কীভাবে জড়িত আছেন, জানাবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৫) উপজেলার গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজে আপনাকে কে কে সহায়তা করেন, বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

৬) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেবের সাথে আপনার সুসম্পর্ক বিদ্যমান আছে কী ?

ক) হ্যা খ) না

৭) পত্রিকায় মাঝে মাঝে দেখা যায়, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা চেয়ারম্যান দ্বন্দ্বে জড়িয়ে গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে বিঘ্নতা সৃষ্টি হয়। এটা কী সত্যি ?

ক) হ্যা খ) না

৮) সংসদ সদস্য মহোদয় সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোন হস্তক্ষেপ করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৯) এ নির্বাচনী এলাকার মাননীয় সাংসদ আপনার কর্ম তৎপরতা ভাল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন কী ? ক) হ্যা খ) না

১০) গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে কখনও কোন ধরণের টেন্ডার আহবান করার এখতিয়ার আপনার আছে কী ? ক) হ্যা খ) না

১১) ঠিকাদারদের কাজ প্রাপ্তির বিষয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কোন তৎপরতা আছে কী ?
ক) হ্যা খ) না

১২) আপনার প্রশাসনিক এলাকার গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচীতে রাজনৈতিক নেতৃত্ব (বিশেষ করে সরকারী দল) কোন প্রভাব বিস্তার করে কী? ক) হ্যা খ) না

১৩) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নে আপনার এখতিয়ারের উপর প্রশাসনের উঁচু স্তরের কোন দিক নির্দেশনা থাকে কী? ক) হ্যা খ) না

১৪) উপরের স্তরের প্রশাসনের কাজ থেকে কর্মসূচী বাস্তবায়নে আপনি কোন সহযোগিতা পান কী?
ক) হ্যা খ) না

১৫) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ আপনার গঠন মূলক কর্মপরিকল্পনায় কোন প্রকার সহায়তা করেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৬) ইউপি চেয়ারম্যানগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে অন্যায় কোন দাবী আদায়ে আপনাকে বাধ্য করতে চান কী? ক) হ্যা খ) না

১৭) আপনি উপজেলা প্রশাসনের প্রধান হিসেবে চেয়াম্যান সাহেবদের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক বজায় রাখতে সর্বদা সচেষ্টা থাকেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৮) আপনি কী কখনও এমন ধারণা পোষণ করেন যে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বারগণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গুলো সঠিক ভাবে বাস্তবায়ন না করায় গ্রামোন্নয়ন সম্ভব হয়নি ?
ক) হ্যা খ) না

১৯) আপনার এখতিয়ারভুক্ত এমন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কর্মসূচীর বাস্তবায়নের কাজে কোন প্রকার অনিয়ম দেখলে আপনি কী কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন? ক) হ্যা খ) না

২০) স্বাধীনতা অর্জনের চল্লিশ বছর পরও আশানুরূপভাবে গ্রামোন্নয়ন সাধিত হয়নি, আপনি কী এ ব্যাপারে একমত? ক) হ্যা খ) না

২১) দয়া করে 'গ্রামোন্নয়নে বাংলাদেশের রাজনীতি: কর্মসূচী ও বাস্তবতা' শিরোনামের উপর মন্তব্য করুন:

গবেষণা কাজে সহায়তার জন্য আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে তথ্য-উপাত্ত প্রদান করেছেন, এ জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

উত্তরদাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

Dhaka University Institutional Repository

ফরম নং-১৪

জেলা প্রশাসকের সাক্ষাৎকার

(উত্তরদাতার প্রদত্ত তথ্য-উপাত্ত এবং অভিমত সম্পূর্ণভাবে গোপণ রাখা হবে এবং শুধুমাত্র গবেষণা কাজে ব্যবহৃত হবে)।

১) ক) উত্তর দাতার নাম ....

খ) পদবী ....

গ) জেলা ....

২) আপনি কতবছর যাবত এ জেলার প্রশাসনের মধ্য মণি হিসেবে আসীন আছেন বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৩) আপনি এ জেলার জেলা প্রশাসক হওয়ার পর গ্রামোন্নয়নের ব্যতিক্রম কিছু লক্ষ্য করছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৪) দেশের অন্যান্য জেলার চেয়ে এ জেলার উন্নয়নে কোন বৈসাদৃশ্যতা আছে বলে আপনি মনে করেন? ক) হ্যা খ) না

৫) বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধিদের সাথে আপনার সম্পর্ক কেমন, বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

৬) আপনার দায়িত্ব প্রাপ্ত জেলার গ্রামোন্নয়নে কোন্ কোন্ দিকে প্রতিবন্ধকতা আছে, তা আপনার জানা আছে কী ? ক) হ্যা খ) না

৭) স্বাধীনতা প্রাপ্তির দীর্ঘ দিনে এ জেলার গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে আপনার কোন তথ্য উপাত্ত জানা আছে কী? ক) হ্যা খ) না

৮) আপনি জেলা প্রশাসক থাকা অবস্থায় অদ্যাবধি কোন গ্রামে গমন করেছেন কী?

ক) হ্যা খ) না

৯) গ্রামের অশিক্ষিত, সরল, সোজা মানুষকে গ্রামোন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মসূচীর বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোন দীক্ষা দেয়া হয় কী ? ক) হ্যা খ) না

১০) আপনার প্রশাসনিক এলাকার গ্রামগুলোর উন্নয়নে কী কী খাতে অর্থ বরাদ্দ করে কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয়, তা বলবেন কী ? ক) হ্যা খ) না

Dhaka University Institutional Repository

১১) গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের কোন দরপত্র আপনার অফিস থেকে আহ্বান করা হয় কী ? ক) হ্যা খ) না

১২) ঠিকাদারের দায়িত্ব পালনকারী সরকার দলীয় বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ দরপত্র নিজেদের অনুকূলে নেয়ার ব্যাপারে আপনার উপর চাপ প্রয়োগ বা প্রভাব বিস্তার করেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৩) আপনার মতে গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচীর টেন্ডার আহ্বান ও প্রদান কার্যক্রম সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় কী? ক) হ্যা খ) না

১৪) পত্রিকা মারফত এবং সরেজমিনে দেখা যায়, ঠিকাদারগণ নিম্মানের উপকরণ দিয়ে নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ করেন এবং অল্পদিনেই তা নির্মাণের পূর্বাবস্থায় পরিণত হয়, এতে আপনি কী একমত? ক) হ্যা খ) না

১৫) কোন কোন টেন্ডার গ্রহীতা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে থাকেন, এ ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতা বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৭) আপনার দায়িত্ব পালন সময়ে এ জেলার দু'একটি উল্লেখযোগ্য গ্রামোন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের কথা বলবেন কী? ক) হ্যা খ) না

১৮) পুরোপুরি গ্রামোন্নয়ন হয়নি বলেই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হচ্ছেনা, এ সম্পর্কে আপনার মতামত জানাবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

১৯) গ্রামোন্নয়নে যে সকল ক্ষেত্রে বৈষম্য পরিলক্ষিত হয় সেগুলো একটু বলবেন কী ?

ক) হ্যা খ) না

২০) দয়া করে গ্রামোন্নয়নমূলক গৃহীত কর্মসূচীর বাস্তবতা সম্পর্কে মন্তব্য করুন:

আপনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে গবেষণা কাজে তথ্য-উপাত্ত দেয়ার জন্য অশেষ ধন্যবাদ।

উত্তর দাতার স্বাক্ষর ও তারিখ:

-০-